# ইসলামে জিহাদ

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

# ইসলামে জিহাদ

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী সনের শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

ইসলামে জিহাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১২৪৪
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ২৯৭·৭২

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ ১৯৮৬
ফাল্গুন ১৩৯২
জমাদিউসসানী ১৪০৬

প্রকাশক :
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ অংকনে : এম. এ. কাইয়ুম

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

মূল্য : ৬০·০০ টাকা

---

ISLAME JIHAD : Concept of Zihad in Islam written by Muhammad Abdur Rahim in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the Fifteenth Century Al- Hijrah. March 1986

Price ; Tk. 60·00 (Inland), U. S. Dollar : 4·00 (Foreign)

www.pathagar.com

# আমাদের কথা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ সম্বন্ধে কী মুসলিম কী অমুসলিম উভয় সমাজের মধ্যেই সঠিক ধারণার অভাব অত্যন্ত প্রকট। জিহাদ মানেই যুদ্ধ, রক্তারক্তি বা খুনাখুনি নয়—জিহাদ যে ইবাদতের একটি স্তর এবং জিহাদ যে মানুষের সার্বিক মুক্তি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য—এ ধারণা আমাদের মধ্যে খুব কমই রয়েছে। বৃটিশ প্রবর্তিত পাঠ্য-সূচীতে, এমনকি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যও, জিহাদ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ একটি বিষয়। অমুসলমানদের মধ্যে জিহাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে তারা নানারূপ অপপ্রচারের শিকার হয়েছে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা তাদের অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইসলামের জিহাদে অমুসলমানদেরকে যদৃচ্ছা হত্যা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আরও প্রচার করা হয়েছে যে, ইসলাম তরবারির জোরেই দুনিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। জিহাদ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর ধারণা এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে নানারূপ অসত্য কল্পকাহিনী এত বেশী প্রচারিত হয়েছে যে, জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য মানুষ বর্তমানে একরূপ ভুলতেই বসেছে। এ অবস্থা মুসলিম-অমুসলিম কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনেনি।

www.pathagar.com

এই বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং জিহাদের অর্থ, তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ গবেষণাধর্মী একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমকে দায়িত্ব প্রদান করেছিল। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ বিষয়ে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পুস্তকখানি বহু পূর্বেই মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেয়া হয়েছিল। নানা অসুবিধার কারণে পুস্তকখানির প্রকাশ যথেষ্ট বিলম্বিত হয়ে গেলেও অবশেষে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি যে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে, এজন্য আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শোকরিয়া জানাচ্ছি।

পুস্তকখানি আমাদের মধ্যে জিহাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ॥ ২৬. ৩. ৮৬

**আবদুল গফুর**
**প্রকাশনা পরিচালক**

www.pathagar.com

# গ্রন্থকারের বক্তব্য

১৯৭৯ সনের কথা। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তদানীন্তন মহাপরিচালক জনাব শামসুল আলম আমাকে বলেছিলেনঃ 'আমাকে জিহাদ বিষয়ে একখানি বই লিখে দিন, ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করব।'

এই মুহূর্তে যখন 'ইসলামে জিহাদ' নামের বইখানি পাঠকবৃন্দের সমীপে উপস্থিত হতে যাচ্ছে, আমি অকপটে স্বীকার করছি, এই গ্রন্থটি তাঁরই আহ্বানের প্রতিধ্বনি।

'জিহাদ' বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার প্রবল ইচ্ছা লেখক জীবনের শুরু থেকেই আমার মনে জাগ্রত ছিল। কিন্তু প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলেই পূর্বে সে ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি লেখনী চালাইনি। ফাউণ্ডেশনের মহা-পরিচালকের আহ্বান এবং প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর রচনায় কার্যত হাত দেওয়া ছাড়া আমার জন্য আর কিছুই করণীয় ছিল না। আন্দোলন পরিচালনা, সংসদ সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় আরও বহু লেখার কর্তব্য পালনের সাথে সাথে এই গ্রন্থ রচনার কাজ দ্রুতবেগে চালাতে হয়েছে। এতসব সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে রচনা-কাল খুব দীর্ঘ হয়নি।

আজ সেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়ে দেশবাসীর হাতে পৌঁছতে যাচ্ছে দেখে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে। আল্লাহ্‌র এই অসীম অনুগ্রহের শোকর আদায়ের উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। শুধু এতটুকু প্রার্থনাই অন্তর ও মুখে উচ্চারিত হচ্ছেঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফসল এই গ্রন্থখানি কবুল করে এবং পরকালের কঠিন দিনে আমাকে তোমার পরম সন্তুষ্টি এবং অশেষ রহমতের উপযুক্ত বানিয়ে নাও! আমীন!'

www.pathagar.com

বস্তুত 'জিহাদ'-এর বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থখানি আমার দীর্ঘ দিনের জ্ঞান-আহরণ, চিন্তা-গবেষণা এবং তত্ত্ব, তথ্য সংগ্রহের মহামূল্য ফসল। জিহাদ দীন-ইসলামের প্রাণশক্তি ; ঈমানের মৌল ভাবধারা, ইসলামী জীবন-বিধান বাস্তবায়নের একমাত্র উপায়। এই জিহাদই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা।

দীন ইসলাম নিছক একটা 'ধর্ম' নয়। তা একটি বিপ্লবী বিশ্বাস, একটি বিপ্লবী আদর্শ, একটি বিপ্লবাত্মক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের প্রতি প্রথম যখন ঈমান গড়ে উঠে, তখনই ঈমানদারকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হ'তে হয় বিপ্লবী। যা কিছু অনৈসলামী মনে-মগজে বাসা বেঁধে আছে আবহমান কাল থেকে, তা নির্মমভাবে উৎপাটিত করার জন্য তাকে সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে হয়। এরপর ব্যক্তির বাস্তব জীবন পরিচালিত করতে হয় ইসলামী আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সর্বপ্রকারের প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তিকে প্রবলভাবে প্রতিহত করে। অতঃপর ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে হয় সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন থেকে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মহা-সমুদ্রের দিকে। প্রতি পদে তাকে মুকাবিলা করতে হয় অনৈসলামী নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও সেসবের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরাক্রমশালী তাগুতী শক্তির সহিত। এই মুকাবিলাই 'জিহাদ'। এই মুকাবিলার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অনৈসলামী তাগুতী শক্তিকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে মহান আল্লাহ্র একক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তাঁরই দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়—প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। প্রকৃত-পক্ষে এ-ই হচ্ছে জিহাদ, এ-ই হচ্ছে জিহাদের অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্রম। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়। এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না হয়ে কোন ঈমানদারের পক্ষে 'ঈমানদার' হয়ে থাকাই সম্ভবপর হতে পারে না। তাই জিহাদ হচ্ছে ঈমানের ঐকান্তিক তাকীদ। জিহাদ হচ্ছে ঈমানী জীবনের বিশেষত ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, সর্বোচ্চ ধাপ।

ইসলাম মানব জীবনের শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন বিরাট মহীরুহ। তার মূল নিহিত, গ্রথিত ও বিস্তারিত ঈমানের গহন গভীরে। পরিবেশের চাপ

www.pathagar.com

অগ্রাহ্য করে অসীম প্রকৃতি থেকে শক্তি আহরণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তাকে চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। প্রতিমুহূর্তই তাকে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার সহিত যুজতে হয়, প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করতে হয় এবং প্রত্যাঘাত করতে হয় প্রতিটি আঘাতের জওয়াবে। তা-ই হচ্ছে মুসলিম জীবনের নৈমিত্তিক জীবন ধারা। এই জীবনধারাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা দীন-ইসলাম পালনেরই অস্বীকৃতি, নিতান্তই বৈরাগ্যবাদী জীবন। ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত, অসমর্থিত। যারা বলে ঃ ইসলামে জিহাদ নেই কিংবা বলে ঃ জিহাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, তারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে, ইসলামকে অপমান করে এবং আল্লাহ্‌র দীনকে একটি অবাস্তব কল্পনা বিলাস বা বস্তাপচা বিধানে পরিণত করে। দীনকে পরিণত করে ব্যবসায়ের একটি অসহায় পণ্যে।

বাস্তব ইসলামী জীবনে জিহাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান-দের পারস্পরিক ও অ-মুসলিমদের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণের প্রধান সূত্র এই জিহাদ। মুসলমানদের ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণের তাকীদ দান জিহাদের প্রথম পর্যায়। অমুসলিমদের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জিহাদের দ্বিতীয় পর্যায়। সর্বপ্রকারের মানবীয় সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক শক্তি-শাসন ও আইন-কানুনের উৎসাদন করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের তৃতীয় পর্যায়। আর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে মজলুম বিশ্বমানবতাকে এবং মানবীয় প্রভুত্ব কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বজনিত সর্বপ্রকারের নির্যাতন-নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনার যাঁতাকল থেকে মুক্তিদান। এ সবই ঈমানদার ব্যক্তির করণীয়, যদিও তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ-সমষ্টি ও সার্বিক জাতীয় পর্যায়ে আঞ্জাম দেয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত।

জিহাদ-এর এই কার্যক্রমই আমার জীবনের ধারাবাহিকতা। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কালেমা তাইয়্যেবা'র ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে কুরআন মজীদের তাফসীর, হাদীস শরীফের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, পারিবারিক ও সামাজিক বিধান উপস্থাপন পর্যন্ত এই জিহাদ বিস্তীর্ণ। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জিহাদের আহ্বান সমান্তরালভাবে চালিয়ে যাওয়াই আমার সাধনা। ব্যক্তি থেকে শুরু করে জনসমষ্টিকে সুসংগঠিত করে গণ-সচেতনতা,

www.pathagar.com

গণ-ঐক্য ও গণজাগরণ পর্যন্ত অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমার জিহাদী কর্মধারা।

'ইসলামে জিহাদ' এই সুবিন্যস্ত ও অব্যাহত সংগ্রামের আহ্বান সম্বলিত চিন্তা ও জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ একখানি গ্রন্থ। সাফল্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, ব্যর্থতা আমার অক্ষমতা। তবু এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে একজন ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আমার একটি গুরুতর দায়িত্ব প্রতিপালন সম্ভব হচ্ছে। এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শোকর। তাঁরই পরম সন্তুষ্টি ও অশেষ রহমত লাভ আমার জীবনের চরম লক্ষ্য ও চিরন্তন কামনা।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا
انك انت التواب الرحيم -

মুস্তফা মনযিল
১৭৩, নাখাল পাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

www.pathagar.com

# পূর্বাভাস

ইসলামের বিধান প্রণয়নের ইতিহাসে জিহাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কয়েকটি দিক দিয়েই তা বিবেচনা করা যায়ঃ

প্রথম, ইসলামী কর্মজীবনে জিহাদের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুনিয়ার অপরাপর জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের সহিত মুসলমানদের সম্পর্কের দিক দিয়েও তার ভূমিকা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পূর্ণত্ব বিধানে, মুসলিম জাতি ও জনগণের স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণে এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত দাসত্ব নিগড়ে বন্দী মানবতার মুক্তি সাধনে—শত্রু ও আক্রমণকারী সম্প্রসারণবাদীদের লোভ-লালিছত আগ্রাসনী হস্তের আঘাত থেকে মুসলিম দেশসমূহকে রক্ষা করার দিক দিয়েও জিহাদের একটি সাধারণ ভূমিকা রয়েছে, যা কোন-ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়, প্রাচ্যবিদ (orientalists) পাশ্চাত্য পন্থী ও খৃস্টধর্ম প্রচারকরা ইসলামী জিহাদের নিতান্ত ভুল ব্যাখ্যা দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে। যে মহান ও বিরাট লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে জিহাদকে বিধিবদ্ধ করেছেন, সেই মৌল তত্ত্ব ও সত্যকে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়ে দিতে এবং তাকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিতে সর্বাত্মক-ভাবে চেষ্টা চালিয়েছে, তারা ইসলামের একটা বিকৃত রূপ দুনিয়ার সমক্ষে উপস্থাপিত করে তার উপর সর্বপ্রকারের বীভৎসতা, হিংস্রতা, পৈশাচিকতা ও অমানবিকতা আরোপ করেছে, তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে কুৎসিৎ মানসিকতার সমস্ত আক্রোশ জাহির করেছে, ইসলামের মহান মানবতা-বাদী দাওয়াত ও আন্দোলনকে জনগণের নিকট সংশয়াপন্ন করে তুলেছে, ইসলামী দাওয়াত উপস্থাপকের আনীত যাবতীয় মহামূল্য নীতি আদর্শ

www.pathagar.com

ও মূল্যমান এবং চিন্তা-বিশ্বাস ও সংবেদনশীলতাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়েছে।

তৃতীয়, উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সহিত মুসলিম জনগণের সাধারণ ও নিত্য সংঘটিত মারামারিকে ভিত্তি করে ইসলামের মহান জিহাদ ব্যবস্থাকে কলুষিত করতে এই অঞ্চলের অমুসলিমরা নানা-ভাবে চেষ্টা চালিয়েছে এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে—প্রসঙ্গ এসেছে, কোন-না-কোন উপলক্ষ ঘটেছে, উচ্চকণ্ঠে প্রচার চালিয়েছে : এই জাতির ইতিহাস থেকেই রক্তের গন্ধ আসে, 'অস্ত্রবলেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে'—'কুরআন শুধু অমুসলিমদের হত্যার নির্দেশ নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে'—এবং 'দুনিয়ার বুকে যদ্দিন এই কুরআন থাকবে, তদ্দিন রক্তপাত বন্ধ হবে না'- ইত্যাদি ধরনের অমূলক-অশোভন ও হিংসা-বিদ্বেষ উদ্রেককারী উক্তিতে গোটা পরিবেশকেই তিক্ত-বিষাক্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছে।

এসব এবং এ ধরনের আরও কয়েকটি কারণে ইসলামের জিহাদ পর্যায়ে একখানি ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। ১৯৬৫ সালে উপমহাদেশের তদানীন্তন দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার পরই বিদগ্ধ সমাজের নিকট ইসলামের জিহাদ বিষয়টি একটি প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দেয়। এই সময় তদানীন্তন ঢাকাস্থ ইসলামী একাডেমীর উদ্যোগে 'জিহাদ ও তার বাস্তবায়ন' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং তাতে আমাকে একটি রচনা পেশ করার আহ্বান জানানো হয়। তাতে আমার তাড়াহুড়ো করে লিখিত যে প্রবন্ধটি পেশ করা হয়, পরে তা 'ইসলামী একাডেমী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে তা 'জিহাদের তাৎপর্য' শিরোনামে পুস্তিকা আকারেও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এই পর্যায়ের মৌলিক ও ব্যাপক আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজন অবশিষ্টই থেকে যায় এবং এই পর্যায়ে আমার অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজও অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

সম্প্রতি পুনর্গঠিত ও নতুন উদ্যম ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব শামসুল আলম আমাকে 'ইসলাম ও জিহাদ' পর্যায়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

এই আহ্বানই বর্তমান গ্রন্থের উদ্‌গাতা। এই পর্যায়ে আমি বিশ্বমানবতার সম্মুখে ইসলামী জিহাদ সংক্রান্ত যাবতীয় দিক ও বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। জিহাদের মৌল তত্ত্ব, তার সাধারণ তাৎপর্য, তার সামগ্রিক রূপরেখা, মৌলিক পরিকল্পনা, অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাবধারা ও দর্শন, তা বিধিবদ্ধকরণের কারণ, তার বাস্তবায়ন ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

বস্তুত ইসলাম জিহাদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি, ধরন, কারণ ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেছে তা হচ্ছে মানবতাবাদী আদর্শিক দয়াশীলতার কার্যকরতা। তার লক্ষ্যভূত তাৎক্ষণিক ব্যাপারসমূহ অগ্রাধিকার পেতে থাকে কখনও নম্রতা ও দয়ার্দ্রতার মাঝে, আবার কখনও কর্তব্য ও তীক্ষ্ণতার মাঝে। এই পর্যায়ে আমরা জিহাদের ব্যাপারটি উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তোলার উদ্দেশ্যে কতগুলো ইসলামী রূপরেখা উপস্থাপিত করব, বিভিন্ন বিশ্বাস ও বিধানের মধ্যে জিহাদের বিধিবদ্ধকরণের বিশেষ দর্শনটিকে স্পষ্ট করে তোলার লক্ষ্যে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হবে। ফলে যার ইচ্ছা, যেভাবে ও যে কোন দিক দিয়ে ইচ্ছা, জিহাদের মূল্যায়ন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে। ইসলামের শত্রুরা, বিদ্বেষীরা, ঘৃণা পোষণকারীরা যে ভুল, ভিত্তিহীন ও অমূলক ধারণার সৃষ্টি করেছে জিহাদের ব্যাপারে এবং তার প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরোপ করেছে তার গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুধাবন করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সহজ হয়ে উঠবে।

জীবনের চরম লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ মান অর্জন ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মত, পথ ও দৃষ্টিকোণের পার্থক্য বিভিন্ন ব্যক্তি-ব্যষ্টি ও গোষ্ঠি বা জাতির ক্ষেত্রে যেমন দৃশ্যমান, অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও তা অত্যন্ত প্রকট ও জাজ্জল্যমান। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চরম লক্ষ্য অর্জনের মূলে বিভিন্ন কারণ ও দর্শন তীব্রভাবে কার্যকর থাকতে দেখা যায়। জীবন সম্পর্কিত ধারণা দুনিয়ার বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, গোষ্ঠি বা ধর্মের নিকট কিছুমাত্র অভিন্ন নয়। দীন ইসলামের গ্রন্থ আল-কুরআন জীবনকে শক্তির প্রতীক রূপে দেখতে চেয়েছে। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ ইসলামের মু'মিন-মুসলিমের আল্লাহ্ হচ্ছেন শক্তিমান, সকল শক্তির একমাত্র অধিকারী, মালিক ও উৎস।

www.pathagar.com

কুরআন মজীদে উদাত্ত কন্ঠে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

'সমগ্র শক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই।'

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।'

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

'যা ইচ্ছা করতে সম্পূর্ণ পারঙ্গম।'

কুরআনের আরও ঘোষণা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে বিধান ও আইন আদেশ এসেছে, লোকেরা যেন তা শক্ত হস্তে ধারণ করে। তারা যেন শক্তি অর্জন করে, শক্তি প্রকাশ ও প্রয়োগের উপায়-উপকরণ যথেষ্ট মাত্রায় সংগ্রহ করে ও সদা প্রস্তুত রাখে, যদ্দ্বারা তারা 'আল্লাহ্‌র দুশমন' ও 'তাদের নিজেদের দুশমনদের' ভীত-সন্ত্রস্ত ও সদা কম্পমান করে রাখতে পারে। কুরআন যে শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা মানব মনে নিহিত বিজয় লাভ ও প্রতিপক্ষের উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। জীবনকে মৌল স্বভাব-প্রকৃতির ভিত্তিতে সক্রিয় ও প্রবহমান বানানোর লক্ষ্যে শক্তির উদ্বোধন হৃদয়-মনকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিয়োজিতকরণ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ-করণের জন্য বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিপক্ষকে দমন, অধীন বানানো ও তার উপর বিজয় এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে প্রচণ্ড আবেগ রয়েছে, কুরআন মজীদ তাকে অর্থহীন ও অনিয়ন্ত্রিত থাকতে দিতে প্রস্তুত নয়। বরং আল-কুরআন তাকে প্রশিক্ষিত ( Trained ) ও বিনীত করে তোলে। তার তীব্রতা-তীক্ষ্ণতা ও প্রচণ্ডতা হ্রাস করে, তার দুষ্কৃতিকে চূর্ণ করে। ফলে তা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বনী আদম উপযোগী সুকোমল-সুমহান ভাবধারা-সম্পন্ন জীবন লাভের পথে একটা দুর্লভ অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন মজীদ একদিকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ঘোষণা করেছে ঃ

www.pathagar.com

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ - اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○

'আল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন—আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিমান, সর্ববিজয়ী।'

—সূরা মুজাদালা ঃ ২১

তারই সাথে কখনও এই ইযযত (عزت—সর্ববিজয়ী হওয়া)-এর সহিত আল্লাহর গুণবাচক পরিচিতি হিসেবে কখনও 'হাকীম' (মহাবিজ্ঞানী), কখনও 'আলীম' (মহাজ্ঞানী), কখনও 'গফুর' (মহাক্ষমাশীল ) এবং রহীম (বিপুল রহমত ও অনুগ্রহকারী) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এই শক্তির কল্যাণকরতা ও ভারসাম্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিজ্ঞানী আল্লাহ্কে ভয়কারীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বিবেচিত হয়।

কুরআন ইযযত (সর্ববিজয়ী শক্তি, মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম)-কে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ্র জন্য প্রমাণ করেছে, যেমন শক্তিকে নিরংকুশভাবে তাঁরই জন্য প্রমাণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

'সমগ্র বিজয়ী শক্তি মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

অনুরূপভাবে তা আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল এবং মু'মিন মুসলমানদের জন্যও রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

'আর আল্লাহ্র জন্য 'ইযযত' এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।'

মু'মিনদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

'তোমরা দুর্বল হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ো না, তোমরা দুঃখিত-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না—তোমরাই উচ্চতর-বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

আর আল্লাহ্ নিজে যেমন মু'মিনদের জন্য চেয়েছেন, তোমরাও তেমনি সেই জিনিসেরই অভিলাষী—তিনি তোমাদের ঈমানকে যেমন সুসজ্জিত করে দিয়েছেন, তোমাদের মান-মর্যাদাও যেন তেমনিভাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন।

কুরআন মজীদে শক্তি ও বিজয়ী মর্যাদাকে যেমন করে মুসলিম উম্মত ও জাতির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে জাতির লক্ষ্য হিসেবে তাদের সম্মুখে তাকেই তুলে ধরা হয়েছে, দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে তাতেই তাদের বিশিষ্টতা নিহিত বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অনুরূপভাবে এই 'উত্তম জাতির' কর্তব্য হচ্ছে, তারা শক্তিমান হয়ে উঠবে, একবিন্দু দুর্বল হবে না, দুর্বলতাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেবে না। তা'হলেই তারা 'খায়রা-উম্মত' 'সর্বোত্তম জাতি' হওয়ার মর্যাদা পাবে। তারা হবে শক্তিশালী, সর্ববিজয়ী ; লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে না। তারা হবে সকলের উপরের স্থান অধিকারী ; মর্যাদাহীন হবে না।

কুরআন সাধারণত চরিত্রবান আদর্শবাদী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমাজ গঠনের পক্ষপাতী। পবিত্র এককের সমন্বয়ে উন্নত মানের সমষ্টি গড়ার এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। তাই কুরআনে কাঙ্ক্ষিত মানের ব্যক্তি সম্পর্কিত পরিচিতি আমরা পাঠ করতে পারছি, সেই ব্যক্তির গুণ পরিচিতির বিস্তারিত বর্ণনা এবং তার জীবন-ধারার বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখতে পাচ্ছি।

আর সামষ্টিক জীবনের কল্যাণ পর্যায়ে কুরআনের বক্তব্য কয়েক-ভাবে বিধৃত। বিভিন্নরূপে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে। তা কখনও কাহিনীরূপে উদ্ধৃত হয়েছে, কখনও সংবাদ রূপে। কখনও আলোচনা প্রসঙ্গে, কখনও বিতর্ক ও কথোপকথন রূপে। আবার কখনও নির্দেশ ও হিদায়তদান রূপে। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তা সবই উন্নতমানের সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত। আর সে লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

'সর্বোত্তম মানব সমষ্টি—যা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।'

www.pathagar.com

কাহিনী বর্ণনা পর্যায়ে কুরআন বলেছে ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ○

'আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম কাহিনীসমূহ বর্ণনা করি।'
নির্দেশ হয়েছে ঃ

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

'অতএব তুমি (উত্তম) কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, আশা করা যায়, তারা চিন্তা বিবেচনা করবে।'

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ○

নিশ্চয়ই এটা সত্য বৃত্তান্ত। —সূরা আলে ইমরান ঃ ৬২

এই পর্যায়ের কোন কোন কাহিনী পর্যায়ে এমন সব গুণ পরিচিতি-সম্পন্ন ব্যক্তির বর্ণনা আমরা কুরআনে দেখতে পাই, যাদের সমন্বয়ে শক্তিমান ও সর্ববিজয়ী সমাজ সমষ্টি গড়ে উঠা কুরআনের কাম্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর দুই কন্যার সহিত হযরত মূসা (আঃ)-এর শালীনতাপূর্ণ আচরণের কাহিনী উল্লেখ্য। পানির কূপে পুরুষদের ভিড় দেখে কন্যাদ্বয় তাদের ছাগল নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছিল। তখন হযরত মূসা (আঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তিনি তাদের পানি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবতী কন্যাদ্বয়ের প্রতি তিনি চোখ তুলেও তাকান নি। তারা বাড়ীতে গিয়ে পিতার নিকট ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলে পিতা শুয়াইব (আঃ) তাঁকে ডেকে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কুরআন বলছে ঃ

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ○ قَالَتْ إِنَّ
أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ○

'তাদের একজন তাঁর নিকট লজ্জা কুন্ঠিত পদে চলে এসে বললে, আমার পিতা তোমাকে ডাকছে, যেন সে তুমি যে আমাদের পানি তুলে দিয়েছ তার মজুরি তোমাকে দিতে পারে।'

www.pathagar.com

পরে সে যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে এল, বললে :

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

'হে পিতঃ ! তুমি এই ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত কর। নিঃসন্দেহে তুমি যাকে কাজে নিযুক্ত করবে সে শক্তিসম্পন্ন, একান্তই বিশ্বস্ত !'

শুয়াইব কন্যার এই শুভ চিন্তা ও উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে তার উক্ত বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এমন সব সৎকর্মশীল কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তির পরিচিতি, যাদের সমন্বয়ে শক্তি ও মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ সমষ্টি গড়ে তোলার উপর কুরআন গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআনেরই অপর একটি কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠিক এই শব্দটিরই পুনরুদ্ধৃতি দেখতে পাই।

আল্লাহ্‌তা'আলা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর অধীন বানিয়ে রেখেছিলেন অসংখ্য জ্বিন কর্মচারী। তিনি যখন সেই রাণীর—যার সহিত তাঁর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ও সর্বজনপরিচিত ব্যাপার ছিল—সিংহাসন তুলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, তখন নির্দেশ প্রাপ্ত জ্বিন্‌ বলেছিল :

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝

'আপনি আপনার আসন থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট নিয়ে আসছি। আর আমি তো এই কাজে যেমন সক্ষম, তেমনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।'

•

'শক্তিমান' ও বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য'—এই দুইটি গুণকে কুরআন মজীদ কর্মের জন্য সর্বোত্তম ও সেবামূলক কাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছে। কুরআনের তাফসীরকারগণও শুরু থেকেই এই দুটি গুণের ব্যাখ্যা দান করে এসেছেন এই বলে যে, এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত

www.pathagar.com

ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কালাম। এর অধিক কথা এই পর্যায়ে বলা যেতে পারে না। কেননা 'উপযুক্ততা' ও বিশ্বস্ততা-নির্ভরযোগ্যতা—এই দুটি গুণকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকা নিশ্চিন্তা ও কর্মের যথার্থতার জন্য পূর্ণ মাত্রায় যথেষ্ট।

আগের কালের লোকেরাও অনুভব করেছেন যে, এই দুটি গুণের মধ্যে অতীব নৈপুণ্য ও গোপনীয়তা সহকারে কার্য সম্পাদনের এবং মর্যাদাসম্পন্ন স্বভাব-চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাতে রয়েছে সর্বপ্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট সামগ্রীর ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষিতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর এই উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য ঃ

أَشْكُوْ إِلَى اللهِ خِيَانَةَ الْأَمِيْنِ وَضُعْفَ الْقَوِىِّ

'আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকতা ও শক্তিমান ব্যক্তির দুর্বলতার অভিযোগ পেশ করছি।'

তাফসীর লেখকগণ উপরোক্ত কাহিনীর প্রেক্ষিতে শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ শুয়াইব-তনয়া যখন পিতার নিকট ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে উক্ত গুণ দুটির উল্লেখ করল, তখন পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি করে জানলে? তনয়া বললে ঃ তার শক্তিশালী হওয়ার পরিচয় পেয়েছি এই ঘটনা থেকে যে, সে (হযরত মূসা) একাই সেই প্রস্তর খণ্ডটি উর্ধ্বে তুলে নিয়েছিল, যা দশজন লোকও তুলতে সক্ষম হবে না। আর তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বুঝতে পেরেছি এ থেকে যে, আমি যখন তার সঙ্গে চলে আসছিলাম, আমি তার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলাম। তখন সে আমাকে বললে ঃ 'তুমি আমার পিছনে পিছনে আস। কেননা বাতাসে তোমার পরিধেয় বস্ত্র সরে গিয়ে তোমার দেহের কোন অংশ আমার চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ুক, তা আমি আদৌ পছন্দ করি না।'

এই বর্ণনায় একদিকে যেমন শক্তির বিশ্লেষণ রয়েছে, তেমনি অপর দিকে রয়েছে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার বর্ণনা। দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য কর্মোপযোগিতার পরিচায়ক আর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা লালসা মানসিক বিকৃতির নিয়ন্ত্রণকারী ও চারিত্রিক পবিত্রতার সংরক্ষক। আর

www.pathagar.com

তা-ই বস্তুত উত্তম শক্তি ও বিশ্বস্ততা। কিন্তু কাহিনীর বিশেষ প্রেক্ষিতের বাইরে কুরআনের এই বাক্যটুকু বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'শক্তি' দৈহিক ও বস্তুগত জিনিস হওয়ার তুলনায়ও অধিক ব্যাপক, মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যসম্পন্ন বা বুদ্ধিকেন্দ্রিক বিষয়। নবী করীম (স.)-এর কথা থেকেও তাই জানা যায় :

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ يَّغْلِبُ نَفْسَهُ

عِنْدَ الْغَضَبِ ٥

'কুস্তিকার্যে পটু ব্যক্তিই শক্তিমান নয়। ক্রোধের উদ্রেক হলে মনকে দমন করতে সক্ষম ব্যক্তিই প্রকৃত বলবান।'

'বিশ্বস্ততা' ও 'নির্ভরযোগ্যতা'র ব্যাপারটিও অনুরূপভাবে মান-মর্যাদা ও সম্মান-শালীনতার সংরক্ষণকেও শামিল করে। যেমন ধন-মাল ও বস্তুর আমানতদারী কিংবা কর্তব্য দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততা রক্ষাও বোঝায় অথবা জ্ঞান ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস এবং দেশ-জাতির বিশ্বস্ততাও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদে তার অকাট্য প্রমাণ বিধৃত। বলছে :

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ٥

اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ٥

'আমরা আমানত (কঠিন-কঠোর সামষ্টিক বিশ্বস্ততার দায়িত্ব) আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালার সম্মুখে পেশ করেছিলাম। কিন্তু এরা সকলেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং সে ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেল। অবশ্য মানুষ তা গ্রহণ করেছে। আর মানুষ ছিল জালিম ও মূর্খ।'

এ আয়াতে উদ্ধৃত 'আমানত' শব্দটি দীন পালনের সমস্ত দায়িত্বই বোঝায় যেমন, তেমনি মানুষের সকল প্রকারের বিশ্বস্ততা রক্ষা করার কথাও বুঝিয়েছে। বিশেষভাবে কোন একটি বুঝায় না।

www.pathagar.com

এ আয়াতে রূপকভাবে মানুষের বিশেষ মর্যাদা ও অন্য সকল সৃষ্টির উপর একটা বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের পজিশনের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষ ছাড়া আল্লাহ্‌র অপরাপর সৃষ্টিকুল যে দায়িত্বের বোঝা বহন করতে অস্বীকৃতি ও অসামর্থ্য বলে প্রকাশ করেছে, মানুষ তা অগ্রসর হয়ে মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। মানুষের নিকট সে আমানত পেশ করা হয়েছে, কোন বিশেষ কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ফলে তাকে তার নিজের জন্য অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার যোগ্যতাও দান করা হয়েছে। আর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও পর্বতমালা নিজ নিজ অক্ষমতা বুঝতে পেরে এই 'আমাদের' দুর্বহ বোঝা বহন করতে যখন অস্বীকার করেছে, তখন মানুষ স্বীয় অক্ষমতা বুঝতে না পেরে এই বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। এক্ষণে সে যদি তার নিজের সাগ্রহে গৃহীত এই বোঝা বহন করার দায়িত্ব পালন না করে, তা' হলে তা অবশ্যই জুলুমের কাজ হবে।

বস্তু মানুষের মধ্যে দায়িত্ব বহনের যে যোগ্যতা রয়েছে, সেই দৃষ্টিতে কুরআনের নিকট এই আমানতটি হচ্ছে অতি বড় গুরুদায়িত্ব। অতিশয় মহানুভবতা। সব মানুষের মান-সম্মান-মর্যাদা, ধনমাল, এই পৃথিবী আবাদকরণ, উন্নয়ন সাধন, শান্তি-শৃঙখলা, সুবিচার-ইনসাফ সংরক্ষণ ও সার্বিকভাবে গোটা মানবতার কল্যাণ এই সবকিছুই এ আমানতের অন্তর্ভুক্ত, কোন একটিও এর বহির্ভূত নয়। আর 'শক্তি' বলতে মন-মানসিকতা, বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং দৈহিক সকল পর্যায়ের শক্তিই বোঝায়। আমানতের উক্ত ব্যাপক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার পূর্ণাঙ্গতার প্রতিই কুরআনের القوى الامين শব্দদ্বয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ব্যাপক শক্তির অধিকারীই হচ্ছে কুরআনের মানুষ। আর যে 'ইজ্জাত' আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য বলা হয়েছে, তার প্রতিভূই হচ্ছে কুরআনের এই মানুষ। এই ধরনের ব্যক্তি মানুষের সমন্বয়েই কুরআন সেই উম্মাত গড়ে তুলতে ইচ্ছুক, যাকে তা 'খায়রা উম্মাত' নামে অভিহিত ও অভিষিক্ত করেছে। তাকেই বলেছে পৃথিবী সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম মানব সমষ্টি। 'শক্তি' ও 'আমানত' এই দুই-দুইটি গুণের মধ্যেই তা পুরোপুরিভাবে সমন্বিত।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, মুসলিম জাতিই হচ্ছে অন্য সকলের আগে 'নির্ভরযোগ্য শক্তি'র আহবায়ক, উদ্বোধক। সত্যের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য তারাই হচ্ছে শক্তিমান দায়িত্বশীল। যারা অত্যাচারীর অত্যাচার, উৎপীড়কের উৎপীড়নের এক বিন্দু পরোয়া করবে না, মহান উন্নত

নৈতিকতার দিকে বিশ্বমানবতাকে পরিচালিত করবে তারাই। গোটা সৃষ্টিলোককে আল্লাহ্‌র সেই পথের নির্দেশ দেবে, যে আল্লাহ্ মু'মিনদের জান-প্রাণ ও ধন-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তিনি তাদের জান্নাতদান করবেন।

ধরে নেওয়া হয়েছে যে, এই লোকেরাই অগ্রসর হয়ে মানুষের সারি বিন্যাস করবে, সুসংবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে, ক্রমাগত সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাবে, পড়ে যাওয়ার, আছাড় খাওয়ার বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একবিন্দু ভয়ে পশ্চাদপদ হবে না। আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া অন্য কোন কিছুরই আশ্রয় গ্রহণ করবে না তারা। কেননা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শক্তি—শক্তির সমস্ত উৎসের একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্।

আর আজকের দুনিয়া অত্যাচার, নিপীড়ন, বন্ধুতা ও প্রতারণা, হঠকারিতা ও দুর্ধর্ষতার দুনিয়া। নিপীড়িত মানুষের সকরুণ ফরিয়াদে আকাশ-বাতাস দলিত-মথিত, তিক্ত ও বিষাক্ত। আজকের বিশ্বমানব 'শক্তিমান'-'আমানতদার' মানব গোষ্ঠীর বিশ্ব-নেতৃত্বকে বরণ ও সংবর্ধনা জানানোর অপেক্ষায় উদগ্রীব এবং যদ্দিন পর্যন্ত তা না হচ্ছে, তদ্দিন পর্যন্ত দুনিয়ায় শান্তি আসবার নয়, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির পথ তদ্দিন উন্মুক্ত হবার নয়, একথায় আজ আর কোনই সন্দেহ নেই।

বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাক, তারা অগ্রসর হয়ে অত্যাচারী নিপীড়কদের হস্ত ও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক—এই উদ্দেশ্যেই আমার বহু চিন্তা গবেষণা ও সাধনা-অধ্যয়নের ফসল 'ইসলামে জিহাদ' নামের এই বিরাট গ্রন্থখানি বিরচিত হ'ল এবং ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করে মজলুম মানবতার মুক্তি বিধানের সংগ্রামে যারা লিপ্ত তাদের দরাজ হস্তেই উৎসর্গিত হল এই গ্রন্থখানি।

এই গ্রন্থ রচনার আসল ও মৌলিক লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁরই দেয়া জিহাদ নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যেন এই ব্যাপারে কারুর মনে একবিন্দু সংশয় অবশিষ্ট থাকতে না পারে, যেন ইসলামের দুশমনরা এ ব্যাপারে কোন সংশয় সৃষ্টির সুযোগ না পায়।

আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে তার তওফীক দাও এবং আমার এই নিঃস্বার্থ সাধনা—হে মহান আল্লাহ্ তুমি কবুল কর।

www.pathagar.com

# সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ জিহাদের বাস্তবতা/১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জিহাদ ও যুদ্ধ এক নয়/৩৭
তৃতীয় অধ্যায় ঃ জিহাদের নির্দেশ কেন/৭৯
চতুর্থ অধ্যায় ঃ তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি/২৩৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলাম ও অমুসলিম/৩১১
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইসলামই শান্তি/৩৮৫
সপ্তম অধ্যায় ঃ জিহাদের প্রকৃতি ও ধারা-পদ্ধতি/৪২৯

www.pathagar.com

# ইসলামে জিহাদ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

# জিহাদের বাস্তবতা

[ নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ—শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ—কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ—জিহাদ ও হিজরত—জিহাদের সব কয়টি পর্যায় অতিক্রমকারী ব্যক্তিত্ব দীনী দাওয়াতের সূচনায়—দীনী দাওয়াতের ফলশ্রুতি—ইসলামী জিহাদের বিশেষত্ব ]

www.pathagar.com

জিহাদ ইসলামী বিধানের সর্বোচ্চ-শিখরে অবস্থিত কার্যক্রম। জিহাদ-কারীদের স্থান জান্নাতের সর্বোন্নত মনযিলে সুনির্ধারিত। তাদের এই উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শুধু দুনিয়ার মর্যাদার ক্ষেত্রেই নয়; দুনিয়া ও আখি-রাত—উভয় পর্যায়েই তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্নত ও সর্বোচ্চ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই হচ্ছেন এই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার প্রকৃত ও বাস্তব প্রতীক। জিহাদকে তিনিই বাস্তবে প্রতিভাত করে তুলেছেন নিজের জীব-নের বাস্তবতা দিয়ে সর্বতোভাবে, সর্ব দিক দিয়ে। বস্তুত তিনিই জিহাদের প্রবর্তক, জিহাদের আহবায়ক, জিহাদের উদ্গাতা ও উদ্বোধক।

তিনি আল্লাহ্‌র জন্য—আল্লাহ্‌র দিকে ও আল্লাহ্‌তে জিহাদকারী, যেমন জিহাদ করা সম্ভব, যেমন জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি জিহাদ করেছেন তাঁর অন্তর দিয়ে, মন ও হৃদয় দিয়ে। তিনিই সর্ব প্রথম জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন, জিহাদের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এবং তার নিয়মতন্ত্র ও পন্থা-পদ্ধতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

তিনি জিহাদ করেছেন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ ওহী ধারণ করে—তার প্রচণ্ড কম্পন সহ্য করে। তিনি জিহাদ করেছেন ঈমান গ্রহণ ও ইসলাম অনুসরণের দাওয়াত দেয়ার কাজ করে মুখের ভাষা ও বর্ণনার দ্বারা। জিহাদ করেছেন তরবারি ও বল্লম দ্বারা। তাঁর নুবুওয়াতী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তো উৎসর্গীকৃত ছিল এই জিহাদে। এই কারণে জিহাদ পর্যায়ের আলোচনায় তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এই দিকদিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নবী-রসূল হিসেবে মনোনীত করে সর্বপ্রথম যখন ওহী নাযিল করেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে জিহাদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ নিহিত ছিল প্রথম অবতীর্ণ আয়াত কয়টিতেঃ

www.pathagar.com

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

পড় তোমার সেই রব্-এর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়, তোমার রব্ তো মহামর্যাদাসম্পন্ন—যিনি লেখনীর সাহায্যে শিক্ষাদান ও জ্ঞান বিস্তার করেছেন। —সূরা ইকরা ঃ ১-৪

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে পাঠ শুরু করার নির্দেশ পালনই ছিল জিহাদের সূচনা, জিহাদের প্রথম পদক্ষেপ। এর ছয় মাস পর অবতীর্ণ দ্বিতীয় ওহীতেও ছিল এই জিহাদেরই নির্দেশ ঃ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ

فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ

فَاصْبِرْ ۝

চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা হে ব্যক্তি! উঠো। (সকলকে) সাবধান, সতর্ক ও ভীত কর। কেবল তোমার রবই সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথার ঘোষণা দাও (ও তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর)। তোমার ভূষণ পরিবেশ পবিত্র ও নিষ্কলুষ কর। সকল প্রকার শিরকের মলিনতা-পংকিলতা কলুষতা পরিহার ও উৎপাটিত কর। বেশী বেশী লাভের লক্ষ্যে কারুর প্রতি অনুগ্রহ করো না। আর কেবল তোমার রব-এর জন্যই অবিচল ধৈর্য ধারণ করে থাক। —সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৭

বস্তুত এই কয়টি কাজের আদেশই আসলে মহাজিহাদের নির্দেশ এবং এই আদেশসমূহ পালন করতে শুরু করাই কার্যত জিহাদরূপেই গণ্য।

www.pathagar.com

মক্কী জীবনেরই এক সময়ে অবতীর্ণ অপর একটি আয়াতেও রসূলে করীম (স.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলেন :

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا -

অতএব হে নবী! আপনি কাফিরদের আনুগত্য কক্ষণই করবেন না ; বরং তাদের বিরুদ্ধে এই কুরআনের সাহায্যেই বিরাট ধরনের জিহাদ করুন। —সূরা ফুরকান : ৫২

তবে মক্কায় অবতীর্ণ এই আয়াতটিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই তরবারির যুদ্ধ নয়। তা হচ্ছে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, বর্ণনা-বিশ্লেষণ এবং নীতি ও আদর্শগতভাবে তাদের মুকাবিলা করার জিহাদ। সত্যবিরোধীদের সম্মুখে সত্য কথা বলা, ইসলামের দুশমনদের সম্মুখে ইসলামের বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব স্পষ্ট করে তুলে ধরা, তাদের হাজারও বিরোধিতা ঠাট্টা-বিদ্রূপ সত্ত্বেও তাদেরকে এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকা এবং অবিচলভাবে তা দিয়ে যাওয়াই হচ্ছে জিহাদ। এরই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে মক্কী জীবনে। তাই মক্কায় অবতীর্ণ কুর-আন মজীদের আয়াত ও সূরায় 'জিহাদ' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই কারণেই মক্কী সূরাসমূহে 'কিতাল' শব্দের ব্যবহার গোচরীভূত নয়।

ফলে কুরআন মজীদে অবতীর্ণ জিহাদের চারটি পর্যায় লক্ষ্যণীয় :

১. নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ,
২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ,
৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং
৪. কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

## নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ

মানুষের মধ্যে রয়েছে নফ্স। নফ্স একটি বিরাট শক্তি। আধ্যা-ত্মিকতার দৃষ্টিতে তাকে vital force বা প্রধান জীবনী শক্তি নামে

www.pathagar.com

অভিহিত করা যায়। ব্যক্তির সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই নফ্‌সকে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানো। কেননা এই শক্তিটি আল্লাহ্‌র অনুগত না হলে এবং আল্লাহ্‌র দীন পালনে প্রস্তুত না হলে কারুর পক্ষেই ঈমানদার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আশ্‌-শামস্‌-এর আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা এই নফ্‌সের উল্লেখ করেছেন এই ভাষায়ঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا ○ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا -

মানব-প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে তার পাপ ও তার সতর্কতা—তাক্‌ওয়া—তার প্রতি ইলহাম করেছেন।

—সূরা শামস্‌ ঃ ৭-৮

আলোচ্য নফ্‌সকে এ আয়াতে 'প্রকৃতি' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বহু সংখ্যক অংগ-প্রত্যংগ দিয়ে একটি পূর্ণাংগ দৈহিক সত্তা দান করেছেন, যে সবের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের উপযোগী জীবন যাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেইসাথে মানুষকে একটি সুস্থ প্রকৃতিও দিয়েছেন। সে প্রকৃতিকে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন করা হয়েছে। মানুষকে সৃষ্টিকালেই তার প্রকৃতিতে পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন। মানুষের অবচেতনায় এই ধারণা গচ্ছিত করে দিয়েছেন যে, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বলে একটা কথা আছে। তাই যা ভালো, তা করা ভালো চরিত্রের লক্ষণ এবং যা মন্দ ও অন্যায়, তা করা মন্দ চরিত্রের পরিচিতি। অতএব ভালো-ন্যায়-পুণ্য গ্রহণ এবং মন্দ-অন্যায়-পাপ বর্জন মানব-প্রকৃতিনিহিত ভাবধারা।

এই নফ্‌সেরই একটি রূপ হচ্ছে, তা মানুষকে মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ করতে আদেশ করে। কুরআনের মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইউসুফ-এ বলা হয়েছেঃ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ -

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই নফ্স নিশ্চিতরূপেই অন্যায় পাপ কাজ করতে আদেশ করে।
—সূরা ইউসুফ ঃ ৫৩

মানুষ মন্দ, পাপ ও অন্যায়কে স্বভাবতই খারাপ জ্ঞান করেও তার সেই মন্দ-পাপ-অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এই নফ্সের তাকীদ বা প্ররোচনায়ই সম্ভবপর হয়। এই কারণে তার পাশাপাশি আরও দুটি প্রবণতা সংরক্ষিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে 'নফসে লাউয়্যামা' (لوامه) তিরস্কার ও ভৎসনাকারী মানসিকতা। মানুষ যখন নফ্সের খারাপ প্রবণতার চাপে কোন অন্যায় পাপ কাজ করে বসে, তখন সেই নফ্সেই স্বাভাবিকভাবে জাগে তীব্র অনুতাপ। সে অনুতাপের তীব্র চাপে সে অতঃপর খারাপ কাজ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাকে প্রস্তুত করে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করার জন্য এবং নবী করীম (স.)-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত তাঁর দীন পালন করে চলতে বাধ্য করে। তখন তার সম্মুখে ভেসে উঠে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সমুখে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে ভয় পাবে এবং স্বীয় হৃদয়-মনকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, জান্নাত তার চূড়ান্ত পরিণতির স্থান হবে। সূরা নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১

নফ্সের খারাপ বাসনা-কামনা দমন করা আল্লাহ্ভীরু প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। এই জিহাদেরই আহ্বান জানিয়েছেন রসূল-ই-করীম (স.) এই কথা বলে ঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

তোমাদের কেউ-ই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তার মন-হৃদয়-অন্তর আমার নিয়ে আসা আল্লাহ্র দীনের অধীন না হবে।
—বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

তাই যে ব্যক্তি সংগ্রাম করে নিজের নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানাবে, সে একজন মুজাহিদ বটে। নবী করীম (স.) বলেছেনঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللهِ -

যে লোক স্বীয় নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানাবার লক্ষ্যে জিহাদ করলো, সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ।

—মুসনাদে আহ্‌মদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম

নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর জন্য আল্লাহ্‌র দীনের শিক্ষা লাভ সর্বপ্রথম প্রয়োজন। তাই এই লক্ষ্যে যে-ব্যক্তি দীনী শিক্ষা লাভ করবে, সে-ও আল্লাহ্‌র নিকট মুজাহিদ গণ্য হবে। কেননা তার এই কাজটা জিহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষত স্বীয় নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত না বানালে তার পক্ষে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। তা ছাড়া নিজের মধ্যে বিরাজমান বিদ্রোহী মনকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানো না হলে বাইরে অবস্থিত আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই উঠে না। অতএব নফ্‌সের বিরুদ্ধে এই জিহাদ পরিচালনা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই একান্ত কর্তব্য। নির্বিশেষে সমস্ত ঈমানদার লোকের জন্যই এই জিহাদ 'ফরযে আইন' পর্যায়ে গণ্য।

নিজের ভিতরকার নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর পর প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য তার বাইরের পরিবেশকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর জন্য জিহাদ পরিচালনা করা। ব্যক্তির বাইরের পরিবেশের মধ্যে সর্ব প্রথম তার সম্মুখে আসে তার পরিবার---পরিবারের লোকজন। নিজের নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানাবার পর পরই তার কর্তব্য তার পরিবারবর্গকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানো! আল্লাহ্‌র অনুগত বানিয়ে পরকালের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا -

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। —সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৬

পরিবারের বাইরে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর জন্য চেষ্টা করাও ঈমানদার ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য সামষ্টিকভাবে কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে ব্যক্তি ও সমাজ-সমষ্টি উভয়কেই কঠিন বাধা-বিপত্তির সমুখীন হতে হয়। ফলে এই লক্ষ্যে তাকে ও তাদের সকলকে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হয়। এই সংগ্রামও একটি অতি বড় জিহাদ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই পর্যায়ের জিহাদের একটা স্পষ্ট রূপরেখা প্রকট হয়ে উঠেছে নবী করীম (স.)-এর নিম্নোদ্ধৃত বাণীতে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ـ

তোমাদের যে-কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাবে সে যেন তা তার হস্তশক্তি—দ্বারা বদলে দেয়। যদি তা সে না পারে, তা হলে মুখে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আর তা-ও যদি তার করা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্তর দিয়ে তার বিরোধিতা করতে হবে। —বুখারী, মুসলিম

হাদীসে অন্যায় প্রতিরোধের তিনটি স্পষ্ট পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। তার বাস্তবতা স্পষ্ট করার জন্য বিন্যাসকে উল্টে দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমে সেই খারাপ—-শরীয়ত বিরোধী—-কাজটিকে অন্তরদিয়ে খারাপ জানতে হবে, তার প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতে হবে। তারপর তার বিরুদ্ধে মুখের কথা বা লেখনীর ভাষা প্রয়োগ করতে হবে এবং তারপরে শেষ পর্যায়ে এমন শক্তি অর্জন ও প্রয়োগ করতে হবে, যার ফলে সেই অন্যায়কে উৎখাত ও নির্মূল করা সম্ভব হবে। এর কোন একটিও করা না হলে সেই ব্যক্তির মু'মিন হওয়া শুধু অর্থহীনই নয়, অগ্রহণযোগ্যও। হাদীসে বলা তিনওটি পর্যায়ের কাজ মূলত জিহাদ

www.pathagar.com

বই আর কিছু নয়। এই জিহাদ চালানো ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। এটা জিহাদের প্রথম পর্যায়।

**শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ**

বান্দার ভিতরে অবস্থিত এবং বাইরে অবস্থিত দীনের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দারা। এই দুই শত্রুর মাঝখানে রয়েছে তৃতীয় এক শত্রু। প্রথমোক্ত দুই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব হতে পারে না এই তৃতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা ব্যতীত। কেননা এই দুই শত্রুর মাঝখানে অবস্থান করে এই তৃতীয় শত্রুটি। উক্ত দুই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে---নফ্‌স ও বাইরের পরিবেশকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর লক্ষ্যে জিহাদ করতে বাধা দান করে এই তৃতীয় শত্রুটি। সে হচ্ছে শয়তান। শয়তান মানুষকে উক্ত জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে সব সময়। সে জিহাদে যেহেতু ব্যক্তিকে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করতে হয়, স্বীয় বাসনা-কামনা-লালসার দাবী প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, সে কাজ শুরু করলেও শয়তান তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালায়। ফলে তার পক্ষে সে দুইটি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার—জিহাদ করে নফ্‌কে আল্লাহ্‌র অনুগত বানানোর পর-পরই এই তৃতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا -

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। —সূরা ফাতির : ৬

শয়তানকে শত্রুরূপে গ্রহণ করার অর্থ, সে শত্রুকে দমন করার জন্য জিহাদ করতে হবে। এই জিহাদ ছাড়া শত্রু কখনই দমন করা যেতে পারে না। অতএব শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ঈমানদার লোকদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থ শয়তানের সব ধোকা, প্রতারণা ও প্ররোচণাকে প্রবল শক্তিতে প্রতিহত করা। শয়তানের সকল ইচ্ছা

www.pathagar.com

বাসনাকে ব্যর্থ করে দেয়া। শয়তানের ঐকান্তিক বাসনা, মানুষ আল্লাহ্‌র দাসত্ব না করে শয়তানের দাসত্ব করবে, একান্তভাবে তার আদেশানুবর্তী হবে। শয়তানের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঃ

لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ○ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ اللَّهِ ○

হে আল্লাহ্‌ ! তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে আমি একান্তভাবে আপনার করে নেব। আর আমি তাদের গুমরাহ বানিয়ে ফেলব এবং তাদের সম্মুখে আমার কুহক জাল বিস্তার করে দেব। তাদের আমি আমার একান্ত আদেশানুবর্তী বানিয়ে নেব। অতঃপর তারা আমারই আজ্ঞাবহ হয়ে গবাদি পশুর কান চিরে দেবে। আমি তাদের আরও বেশী করে আমার আদেশানুবর্তী বানিয়ে নেব। ফলে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি লক্ষ্যকে পরিবর্তন করে ফেলবে।

—সূরা নিসা ঃ ১১৮-১১৯

বস্তুত এই চ্যালেঞ্জদাতা শয়তান প্রথম দিন থেকেই মানুষের সাথে চরম শত্রুতা করে আসছে। তার এ শত্রুতার লক্ষ্য মানুষকে প্রাণে সংহার করা ও জীবন বঞ্চিত করা নয়। শয়তানের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে তার মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা, তার ভিতরের নফসে লাউয়্যামা[১] ভৎর্সনাকারী, অনুশোচনার উদ্রেককারী নফসকে খতম করে নফসে আম্মারাকে প্রবল ও অধিকতর শক্তিশালী করে দেয়া। যেন মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দ ও পাপ-পুণ্যের অনুভূতিটুকু হারিয়ে একটা নির্ভেজাল পশুতে পরিণত হয়ে যায়, আর মু'মিন বান্দাকে শয়তানের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই অত্যন্ত শক্তভাবে ও দৃঢ়তা-অবিচলতা সহকারে জিহাদ করতে হবে। সে জিহাদ হচ্ছে, মানুষের ভৎর্সনাকারী নফসকে প্রবলভাবে জাগ্রত করে নফসে আম্মারাকে সংযত করা এবং

---

১. Censurer.

www.pathagar.com

বাইরের পরিবেশকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও দীন পালনে বাধ্য করে ব্যক্তির নফসে মুত্‌মায়িন্নার সাথে[২] একাকার করা। এইরূপ এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

প্রথমে ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ নফ্‌সে আম্মারা, দ্বিতীয় পর্যায়ে শয়তান এবং তৃতীয় পর্যায়ে বাইরের আল্লাহ্‌দ্রোহী পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে তিন-ওটি শক্তিকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানিয়ে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের বাস্তবতা বিধান করা ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের একান্ত কর্তব্যঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ -

হে লোকগণ যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর পুরাপুরিভাবে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। —সূরা বাকারা ঃ ২০৮

'যারা ঈমান এনেছ' বলতে সেই লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা নফ্‌সে আম্মারার বিরুদ্ধে লড়াই করে নফ্‌সে মুত্‌মায়িন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের প্রতিই নির্দেশ হচ্ছে, অতঃপর তোমরা শয়তানের প্ররোচণাকে প্রতিহত করে সমগ্র জীবন সমাজ ও পরিবেশকে এক আল্লাহ্‌র অনুগত বানিয়ে দাও।

কিন্তু এই কাজ অতিশয় কঠিন ও দুরূহ। এই কাজের নির্দেশ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তায়ালা মানবকুলকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছেন। আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ -

---

২. Tranguil.

www.pathagar.com

এবং আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সমুখীন করবো, যেন আমরা তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি। এবং তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও নিজ নিজ স্থানে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বনকারীদের জানতে পারি। —সূরা মুহম্মদ : ৩১

এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, বিবেক শক্তি; নাযিল করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ্র নিজের কালাম। তাদের নিকট পাঠিয়েছেন নবী ও রসূল এবং ফিরিশতা দিয়ে তাদের বাস্তব সাহায্য করার ব্যবস্থাও নিয়েছেন। শত্রুদের উপর জয়লাভের জন্য সবচাইতে বড় সাহায্যকারী কার্যাবলীরও নির্দেশ করেছেন। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে, তা'হলে তারা আল্লাহ্র এবং তাদের নিজেদের শত্রুদের উপর নিরন্তর বিজয়ী হতে পারবে। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মুত্তাকীন, মুহ্সিনীন, সাবেরীন ও মু'মিনীন-এর সংগে রয়েছেন। অর্থাৎ তারা যদি তাক্ওয়া অবলম্বনকারী, ইহ্সান গ্রহণ-কারী, ধৈর্য ধারণকারী ও ঈমান পোষণকারী, রক্ষাকারী হয়ে থাকে, তা হলে তারা সব সময়ই আল্লাহ্র অব্যাহত-অফুরন্ত সাহায্য লাভকারী হতে পারে। মু'মিন বান্দারা নিজেদের প্রতিরক্ষা যতটা না করে বা করতে পারে, তার চাইতে অনেক বেশী করেন—করতে পারেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা। আর আল্লাহ্ই যদি তাদের রক্ষা না করেন, তা'হলে তাদের শত্রুরা কোন্ মুহূর্তে ছোঁ মেরে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত, তা তারা টেরও পেত না।

এই প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম সংঘটিত হয় বান্দাদের ঈমান অনুপাতে, ঈমানের মাত্রা ও পরিমাপ অনুযায়ী। ঈমান শক্তিশালী হলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও শক্তিশালী হয়। এইরূপ প্রতিরক্ষার সুফল ও কল্যাণ যদি কেউ লাভ করে, তা হলে তার উচিত আল্লাহ্র শোকর করা। আর তা না পেলে সেজন্য সে নিজেই দায়ী।

আল্লাহ্তো তাঁর পক্ষে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন বান্দাকে, যতটা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়, অনুরূপভাবে তাঁকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন যতটা ভয় তাঁকে করা শোভন।

www.pathagar.com

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -

এবং তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র জন্য যতটা জিহাদ বান্‌ছনীয়, তিনিই তোমাদিগকে পসন্দ ও বাছাই-মনোনীত করে নিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌তো দীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতারই প্রশ্রয় দেননি তোমাদের জন্য। সূরা হজ্জ ঃ ৭৮

বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ط وَلَا تَمُوتُنَّ

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যতটা ভয় তাঁকে করা শোভন ও বান্‌ছনীয়। আর 'মুসলিম' না হয়ে তোমরা মৃত্যু বরণ করো না। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১০২

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে সব সময়ই স্মরণে রাখবে, কোন মুহূর্তেই ভুলে যাবে না, আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করবে না। তাঁর শোকর করবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করবে। এজন্য হৃদয়-মন-নফ্‌সকে সদা সক্রিয় রাখতে হবে। আর তা-ই হচ্ছে নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদ করতে হবে শয়তানের বিরুদ্ধে। শয়তান দুইটি দিক দিয়ে মানুষকে গুমরাহ করতে চেষ্টা চালায়। প্রথমত শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে নফ্‌সের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে। এই শয়তান বাইরের শক্তিসমূহকেও নিজের অধীন বানিয়ে তার আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে। তাই মু'মিন বান্দাকে নিজের নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব খতম করতে হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইরের জগত থেকে শয়তানের রাজত্বকে উৎখাত করতে হবে। এই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয় মানবরূপী শয়তানের চেলা-চামুণ্ডাদের দ্বারা। মানুষের ভিতরে শয়তানের প্রতিপত্তি খতম করলেই ঈমানদারের দায়িত্ব পালন হবে না। সেই সময় বাইরের জীবন ও পরিবেশ থেকেও শয়তানের কর্তৃত্বকে নির্মূল করতে হবে।

শয়তান মানব মনে আল্লাহ্, পরকাল, ওহী ও রিসালাত ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। এ সবের প্রতি জাগিয়ে দেয় নিদারুণ সংশয় ও অবিশ্বাস। আল্লাহ্র কুরআন অনুধাবনের সাহায্যেই শয়তানের এই ওয়াস্ওয়াসার মুকাবিলা করা সম্ভব। এটা এই জিহাদের প্রথম পর্যায়ের কাজ। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, বান্দার মনে শয়তান যে সব খারাপ বা পাপ-ইচ্ছা, বাসনা, লোভ ও লালসা জাগিয়ে দেয়, আল্লাহ্র নাফরমানীর প্রবণতা তীব্র করে তোলে, তার প্রতিরোধ করা। এই জিহাদের ফলে বান্দার মনে জেগে উঠে ইয়াকীন, দৃঢ় প্রত্যয় ও অকৃত্রিম বিশ্বাস। এই ইয়াকীনের সাহায্যে বান্দা অর্জন করতে পারে সবর-এর মহৎ গুণ——এটা ইতিবাচক জিহাদ। কুরআনের আয়াতে এই কথাই ধ্বনিত ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ -

এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বানিয়েছি এমন সব জননেতা, যারা আমাদের বিধান অনুযায়ী হিদায়ত দান ও পথ প্রদর্শন করে। কেননা তারা এই বিধান অনুযায়ী চলার জন্য ধৈর্যধারণ করেছে, আর আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তারা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে।

—সূরা সাজদাহ ঃ ২৪

এ আয়াত অনুযায়ী দীনী নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব সবর ও ইয়াকীনের সাহায্যে এবং দীনী নেতৃত্বই সবর ও ইয়াকীনের মহান গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারে জনগণের মধ্যে।

www.pathagar.com

সবর গুণটি লোভ-লালসা, খারাপ ইচ্ছা-বাসনা ও পাপ-নাফরমানীর কাজের উদ্যোগকে প্রতিরুদ্ধ করে এবং ইয়াকীন প্রতিরুদ্ধ করে সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়, বিভ্রান্তি-ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনা-কুসংস্কারকে। ফলে বান্দা সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত হয় দীনের দুশমন শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য। এই দৃঢ় প্রত্যয় ও সবর গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দই পারে ইসলামী জিহাদের ময়দানে সফল নেতৃত্ব দিতে। প্রকৃত পক্ষে তাঁরাই হন 'ইমামুল মুজাহিদীন।'

## কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় হচ্ছে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদেরও চারটি পর্যায়। এই জিহাদ করতে হবে দিল দ্বারা, মুখ---মুখের ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা, ধন-মাল দ্বারা, নফ্স বা জান-প্রাণদ্বারা। বিশেষ করে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রধান উপকরণ হচ্ছে হাত, অর্থাৎ হাতিয়ার, শক্তি বা অস্ত্রশস্ত্র। আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে মুখ, বক্তৃতা, ভাষণ, যুক্তিতর্ক এবং উন্নতমানের, বলিষ্ঠ, বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্য এবং শেষ পর্যায়ে অস্ত্র। রসূলে করীম (স.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রথম নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى انفسهم قولا بليغا -

অতএব তুমি মুখ ফিরাও মুনাফিকদের দিক থেকে---ওদের উপর নির্ভরশীল হবে না ; বরং তাদের বুঝাও---উপদেশ দাও এবং তাদের সম্পর্কে পূর্ণমাত্রার প্রভাব বিস্তারকারী উচ্চমানের ও যথার্থ কথা বল।

—সূরা নিসা ঃ ৬৩

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يايها النبى جاهد الكفار والمنفقين واغلظ عليهم -

হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোরতা, নির্মমতা কার্যকর করুন।

—সূরা তওবা ঃ ৭৩

www.pathagar.com

এবং এই জিহাদে অস্ত্রের প্রয়োগ অনিবার্য।

যালিম, বিদয়াতপন্থী ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতার কাজের উদ্‌গাতা ও প্রবর্তক-দের বিরুদ্ধে মু'মিনদের অবশ্যই জিহাদ করতে হবে। সে জিহাদেরও রয়েছে তিনটি পর্যায়।

প্রথমে শক্তিদ্বারা, অস্ত্রদ্বারা। এই শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিন জনসমষ্টি ও ইসলামী রাষ্ট্র সরকারকে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ط

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এবং সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শক্তি ও যানবাহন অশ্ব (ইত্যাদি), যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়। তোমরা তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত করবে।
—সূরা আনফাল ঃ ৬০

অস্ত্র সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী তৈরী করে তাদের বিরুদ্ধে বাস্তব-ভাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব হলে বা তা করতে অক্ষম হলে অন্তত মুখের ভাষা ও সাহিত্যকে পুরাপুরি একাজে ব্যবহার করতে হবে। এই পর্যায়ে রসূলে করীম (স.) থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীস উল্লেখ্য ঃ

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অত্যাচারী শাসকের নিকট ইনসাফ ও সুবিচারের কথা বলা অতীব বিরাট বা মহান জিহাদের মধ্যে গণ্য। —তিরমিযী

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী যালিম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা অতীব উত্তম জিহাদ, (আর তা করাও অসম্ভব হলে 'দিল' দিয়েই জিহাদ করতে হবে।) —আবু দাউদ



www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.) বলেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ ـ

যে লোক মরে গেল, কিন্তু যুদ্ধ বা জিহাদ করলো না--জিহাদ করার কোন ইচ্ছাও তার মনে জাগেনি, সে মুনাফিকীর একটা অংশ নিয়েই মরলো। —মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসাঈ

**জিহাদ ও হিজরত**

জিহাদের পূর্বে হিজরতের স্থান। হিজরত না করা পর্যন্ত জিহাদ কখনই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হতে পারে না। আর হিজরত ও জিহাদের কোনটিই পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না—গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ঈমান ব্যতীত। আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার প্রকৃত ও সংগত আশাবাদী তাঁরাই, যাঁরা এই তিন-ওটি কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

যারাই ঈমান এনেছে, এবং যারাই হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে আল্লাহ্র পথে, তারাই আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার আশা পোষণ করে এবং আল্লাহ্ তো অতীব ক্ষমাশীল, অশেষ দয়াবান।—সূরা বাকারা ঃ ২১৮

আর ঈমান গ্রহণ যেমন প্রত্যেকের জন্যই ফরয, তেমনি দুইটি হিজরত করাও প্রত্যেকেরই কর্তব্য এবং তা প্রতি মুহূর্তের জন্য। একটি হিজরত আল্লাহ্র দিকে—আল্লাহ্কে এক, একক, অনন্য, লা-শরীক বিশ্বাস করে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গতা সহকারে তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরতা গ্রহণ করে তাঁকে ভয় করে; তাঁর নিকট থেকেই সবকিছু পাওয়ার আশা পোষণ করে, তাঁকে ভালোবেসে এবং সর্বপ্রকারের গুনাহ্ থেকে তওবা করে।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসূলের দিকে—তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, তাঁর অনুসরণ গ্রহণ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর জানানো সব খবরকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে, অন্য যে-কোন নেতৃত্বকে অস্বীকার করে এবং অন্য যে-কারুরই আদেশ-নিষেধের উপর তাঁর আদেশ-নিষেধ—সুন্নতকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

এইরূপ হিজরতের পরই জিহাদ ফরয মনে করতে হবে। সে জিহাদ আল্লাহ্‌র জন্য নফ্‌সের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে। এই দুই পর্যায়ের জিহাদ প্রত্যেক মু'মিনের উপর 'ফরযে আইন।' কোন লোকই এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয় এবং এই জিহাদও করতে হবে ব্যক্তিগত-ভাবে, করতে হবে সমষ্টিগতভাবেও।

অতঃপর কাফির, মুনাফিক ও অত্যাচারী শাসক-শোষক-নির্যাতক-দের বিরুদ্ধে জিহাদের পর্যায়। মুসলমানদের বহু লোককে এই কাজে প্রত্যেক্ষভাবে নিয়োজিত থাকতে হবে। আর অবশিষ্ট সকলকে তাতে অংশীদার হতে হবে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে হলেও। মোট কথা, জিহাদের লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হতে হবে। অন্যথায় সকলকেই সেজন্য গুনাহ্‌গার হতে হবে।

**জিহাদের সব ক'টি পর্যায় অতিক্রমকারী ব্যক্তিত্ব**

জিহাদের এইসব ক'টি পর্যায় অতিক্রমকারী ব্যক্তিত্বই আল্লাহ্‌র নিকট সেরা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে গণ্য। এই জিহাদের দিক দিয়ে যে-লোকের যে মর্যাদা, আল্লাহ্‌র নিকটেও তার সেই মর্যাদাই নির্দিষ্ট। এই কারণে বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.) যেমন সর্বশেষ নবী ও রসূল, তেমনি জিহাদের উপরিউক্ত সব কয়টি পর্যায় অতিক্রমকারী পূর্ণত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বও একমাত্র তিনিই। আর এই কারণেই তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক উচ্চতর মর্যাদারও অধিকারী। তিনি আল্লাহর জন্য জিহাদ করেছেন, যেমন তাঁর জন্য জিহাদ করা বাঞ্ছনীয় এবং এই জিহাদ তিনি শুরু করেছেন সেইদিন থেকেই, যেদিন সর্বপ্রথম তাঁর উপর আল্লাহ্‌র ওহী নাযিল হয়েছিল। আর তা শেষ করেছেন সেই দিন, যেদিন তিনি দুনিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

**দীনি দাওয়াতের সূচনায়**

প্রথমে তিনি অতিশয় গোপনে ও সন্তর্পণে তাওহীদী দীনের দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেন। পরে যখন নাযিল হ'ল :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

চতুর্দিকে প্রকাশ ও প্রচার করে দাও যা করার জন্য তুমি আদিষ্ট হয়েছ তা। —সূরা হিজর : ৯৪

তখন তিনি প্রকাশ্যভাবেই তাওহীদী দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ ও দাস-স্বাধীন সকল পর্যায়ের মানুষের নিকটই তিনি এই দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে লাগলেন। এই কাজে তিনি দিন-রাত্রি একাকার করে দিলেন। তখন যারা তাঁর এই দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত ছিল না, তারা তাঁর উপর নানাভাবে পীড়ন ও জ্বালাতন-অত্যাচার চালাতে শুরু করলো। আর এটাই হচ্ছে নবী-রসূলগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কার্যকর করা চিরন্তন রীতি। ইরশাদ হয়েছে :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ -

হে নবী! তোমার সম্পর্কে (বিরুদ্ধে) যা কিছুই বলা হচ্ছে তা তো সে সব কথাই যা তোমার পূর্বেকার নবী-রসূলেগণকে বলা হয়েছিল। —সূরা হামীম-আস্-সাজদাহ্ : ৪৩

তখন মনে হচ্ছিল, যে-পরিমণ্ডলে নবী করীম (স.) জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি বৎসর পর্যন্ত অতি আদর-সম্মান, বিশ্বস্ততা সহকারে লালিত হয়েছেন, সেই গোটা পরিবেশই এখন পুরোপুরিভাবে তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। যেমন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

এমনি ভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে দিয়েছি জ্বিন্ ও মানুষ শয়তানগুলোকে। —সূরা আনয়াম ১১২

www.pathagar.com

وَكَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا

سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝

এমনি-ই হয়ে আসছে চিরকাল। এদের পূর্ববর্তী লোক সমষ্টির নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তারা বলেছে : লোকটি যাদুকর, কিংবা জ্বিন্ প্রভাবিত। --- এরা কি পরস্পরে কোন চুক্তি করে নিয়েছে যে, সেকালের ও একালের লোকেরা একই কথা বলে? -- আসলে এরা সকলেই সীমা লংঘনকারী আল্লাহ্‌দ্রোহী লোক।

—সূরা যারিয়াত : ৫২-৫৩

আসলে এ তে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। যখনই কোন রসূল আসবেন, তখন কিছু লোক তাঁকে মানবে, আর কিছু লোক অমান্য করবে। ফলে সমাজের লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা মেনে নেবে তারা রসূলের সাথে আনুকূল্য ও সহযোগিতা করবে। আর যারা অমান্য করবে তারা সর্বশক্তি দিয়ে করবে এর বিরোধিতা। উপরন্তু যারা মেনে নিয়ে আনুকূল্য করবে, অমান্যকারী ও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের উপরও অত্যাচার-নিপীড়ন চালাবে। আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের পরীক্ষা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

যারা দীনের তাওহীদী দাওয়াত অগ্রাহ্য ও অমান্য করে ঈমানদার লোকদের উপর নিপীড়ন চালাবে, প্রথমে তারা মনে মনে খুবই সুখ ও তৃপ্তি পাবে। পরে তাদেরকেই ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি, দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান গ্রহণ করে নবীর আনুকূল্য ও সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে, তারা প্রথমে খুবই কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করবে অমান্যকারীদের হাতে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারাই হবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী ইহকালেও, পরকালেও। এতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই। তাই কষ্ট ভোগ যখন একান্তই অনিবার্য এবং তা থেকে কারুরই নিষ্কৃতি নেই, তখন প্রথমেই তা ভোগ করে পরবর্তীকালে অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

www.pathagar.com

বস্তুত এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানদার লোকদের পথ। এর বিপরীত যারা উপস্থিত সুখ ভোগের লোভে দীন ও ঈমানকে অগ্রাহ্য করে, তারা প্রথমে কিছুটা সুখ ভোগ করার সুযোগ পেলেও ইহকালীন সারাটি জীবন এবং পরকালীন অনন্তজীবন শুধু দুঃখ ও আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে। এটা কাফির-মুশরিকদের অবলম্বিত পথ। এদের যে বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তার কোন প্রমাণ নেই।

## দীনী দাওয়াতের ফলশ্রুতি

রসূলে করীম (স.)-এর এই দীনী দাওয়াতের ফলে মক্কায় প্রায় প্রত্যেকটি গোত্র ও কবীলা থেকেই বিশেষ বিশেষ লোকগণ এগিয়ে এসে তা কবুল করেন এবং রসূলের উম্মতের মধ্যে শামিল হয়ে যান। একেবারে প্রথমে যাঁরা দাওয়াত গ্রহণে এগিয়ে এলেন, তাঁদেরও দাওয়াতী প্রাচেষ্টায় আরও বহু লোক দীন-ইসলামের ছায়াতলে স্থান গ্রহণ করলেন। রসূলে করীম (স.) তাওহীদী দীনের বিশেষত্ব প্রচারের সাথে সাথে প্রকাশ্যভাবে শিরক ও জাহিলিয়তে পরিপূর্ণ ধর্মমতসমূহের তীব্র সমালোচনা এবং সে সব ধর্ম ও মতসমূহে নিহিত দোষ-ত্রুটি, কলুষতা-পংকিলতা প্রকাশ করে দিতে থাকলেন; তার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা চালাতে থাকলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা আর যার যার ইবাদাত কর, তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। ওদের না আছে কোন ক্ষতি করার শক্তি, না উপকার বা কল্যাণ করার। গোটা কুরাইশ এবং বিশেষ করে সরদাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রসূলের প্রতি প্রথমে রুষ্ট-অসন্তুষ্ট এবং পরে আক্রমণমুখী হয়ে উঠলো বিষধর অজগরের মত। যে-সব দুর্বল ও দাস শ্রেণীর লোক দীন-ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশ কঠিন ও কঠিনতর এবং তীব্র ও তীব্রতর হতে লাগলো। এই সময় আল্লাহ্ তায়ালা রসূলে করীম (স.)-এর চাচা আবু তালিবকে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক-রূপে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব যদিও তিনি তাঁর পৈতৃক ধর্মমত কখনই ত্যাগ করেননি।

কাফির-কুরাইশদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম পর্যায়ে কিছু মুসলমান হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করে যান। কুরাইশরা

www.pathagar.com

হাবশা পর্যন্ত তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য হাব্‌শা অধিপতির দরবারে মামলা দায়ের করতেও ত্রুটি করল না। কিন্তু সবই চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদিকে কুরাইশ সরদাররা সম্মিলিতভাবে রসূলে করীম (স.) ও সব নও মুসলিম সহ গোটা বনুহাশিম মাত্রকে সর্বতোভাবে 'বয়কট' করে। এজন্য একটি চুক্তি পত্রও তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এবং সেটি কা'বা ঘরের প্রাচীরে টাঙিয়ে দেয়া হয়। প্রায় তিনটি বৎসর পর্যন্ত এই 'বয়কট' চলতে থাকে। এরপর রসূলে করীম (স.) তায়েফে গমন করেন দীনের তাওহীদী দাওয়াত পেশ করার জন্য। কিন্তু সেখানকার কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, গুণ্ডা ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে রসূলে করীম (স.)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করায়। সে আঘাতে দেহ মুবারক থেকে এতই রক্ত প্রবাহিত হয় যে, তাঁর সমস্ত শরীর, কাপড় ও জুতা সিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পথিপার্শ্বে ঢলে পড়ে যান। এই সময় তিনি মহান আল্লাহর নিকট পূর্ণমাত্রার আত্মসমর্পন-মূলক এক দীর্ঘ কাতর প্রার্থনা করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে জ্বিনদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর নুবুওওয়্যাতের দ্বাদশ বৎসর শেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মি'রাজে স্বীয় একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যান, মি'রাজ অভিযাত্রায় আল্লাহ তাঁকে নিজস্ব গায়বী জগতে নিহিত গভীর রহস্য আবৃত ব্যবস্থাপনা ও ঘটনাবলী ملكوت السموات والارض নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শন করান এবং দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার সাথে সাথে চৌদ্দ দফা সম্বলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পর্যায়ের এক ফরমানও জারী করেন। যা সূরা আল-ইস্‌রায় উদ্ধৃত রয়েছে।

অতঃপর হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন বহিরাগত হজ্জ যাত্রীদের সম্মুখে তাওহীদী দীনের দাওয়াত উপস্থাপন প্রসংগে মদীনার খাজরাজ বংশীয় ছয়জন লোকের সাথে সাক্ষাত ঘটে এবং তাঁরা ইসলাম কবুল করেন। এঁদেরই দাওয়াতী প্রচেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়। পরবর্তী বছর মোট বারোজন মদীনাবাসী তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন রসূলে করীম (স.) আমর ইবনে উম্মে মাকতুম ও মুসয়্যিব ইবনে উমাইর (রাঃ) নামের দুইজন সাহাবীকে মদীনায় প্রেরণ করেন সেখান-কার মুসলমানদের কুরআন ও ইসলাম শিক্ষাদানের জন্য।

www.pathagar.com

পরবর্তী বৎসর বরা-ইবনে মা'রুর-এর নেতৃত্বে দুইজন মহিলা সহ মোট পঁচাত্তরজন মদীনাবাসী আকাবায় রসূলে করীম (স.)-এর সাথে অতি গোপনে একত্রিত হন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সংগে থাকার, সংগী হওয়ার, আনুগত্য ও অনুসরণ করার, তাঁর পূর্ণ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে ব'য়আত' করেন। ফলে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠার সাথে সাথে মদীনায় ইসলাম একটি শক্তি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে।

অতঃপর রসূলে করীম (স.) মক্কায় কাফির কুরাইশদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে লক্ষ্য করে মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। মুসলমানগণ অনুমতি লাভ করার পর একে একে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে কুরাইশ সরদারগণ বিশেষভাবে শংকিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে প্রবল আশংকা দেখা দিল যে, হযরত মুহম্মদ (স.)-ও যদি মদীনায় গিয়ে এদের সংগে একত্রিত হন, তা হলে তথায় যে শক্তির উদ্ভব হবে, তার সাথে মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে তারা ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে 'দারুন নদওয়া'য় একত্রিত হলো। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে এক-একজন লোক নিয়ে প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন এক হামলাকারী বাহিনী গঠন করে হামলা করিয়ে এই নবোদ্ভূত শক্তির মূল চিরতরে উৎপাটিত করতে হবে।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রসূলে করীম (স.)-কে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দেয়ার সাথে সাথে তাঁকে হিজরত করার অনুমতিও প্রদান করেন। গভীর নিশিথে শত্রু পরিবেষ্টিত ঘর থেকে সহজেই বে'র হয়ে তিনি হিজরত করার প্রক্রিয়া শুরু করলেন।

মদীনায় উপনীত হয়ে তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন এবং আনসার ও মুহাজির লোকদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ইসলামী সমাজের বাস্তব প্রতিষ্ঠা করলেন। অতঃপর তাঁর ও মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন, যা 'মদীনার সনদ' নামে অভিহিত। এইভাবে রসূলে করীম (সঃ) মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। আল্লাহ্ তাঁকে কতভাবে যে সাহায্য করেছেন,

www.pathagar.com

তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে আনসার ও মুহাজির সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সমাজ শক্তিদ্বারা এই সাহায্যকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও সম্প্রসারিত করেছেন। এখানে বস্তুত পক্ষে গড়ে উঠে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র।

এই শক্তি মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে নি। এই কারণে তখন আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদের অত্যাচার-নিপীড়নের জওয়াবে শুধু ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনেরই নির্দেশ দিয়েছেন। আঘাতের জও-য়াবে প্রত্যাঘাত—শক্তি প্রয়োগে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তিনি দেন নি।

কিন্তু মদীনায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হওয়ার ফলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। অতঃপর যুলুম, আগ্রাসন, উৎপীড়ন, নীরবে নিঃপ্রতিবাদে সহ্য করে নেয়ার আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই প্রথমে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের শুধু অনুমতি প্রদান করা হল। সূরা আল-হজ্জ-এর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ۝

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরও (তা করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা নির্যাতিত (নিঃপীড়িত, অত্যাচারিত)। আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্যে খুবই সক্ষম। তারা তো সেই লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী থাকে অন্যায়ভাবে ও অকারণে বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু ততটুকুই ছিল যে, তারা বিশ্বাস করতো ও মুখে বলতো যে, আমাদের রব্ তো আল্লাহ্।

—সূরা হজ্জ ঃ ৩৯-৪০

www.pathagar.com

আয়াতটিতে মুসলমানদেরকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার[১] অনুমতি দেয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে ওরা মযলুম, নিপীড়িত। পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে কাফিরদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হওয়ার কারণে রসূলে করীম (স.)-এর নিকট নিপীড়িত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সে বিষয়ে অভিযোগ পেশ করতেন ও প্রতিকার চাইতেন। কিন্তু জওয়াবে তিনি বলতেন, যুদ্ধ করার কোন অনুমতি বা নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা মক্কায় মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-প্রয়োগে যুদ্ধ করার কোন অনুমতিই দেন নি। তার পরিবর্তে তাঁদেরকে ধৈর্যধারণ ও 'সবর' অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পর্যায়ে বেশ কয়টি আয়াত নাযিল হয়েছে। তন্মধ্য থেকে এখানে দু'টি আয়াতের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন্-নহল-এর আয়াত ঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ -

এবং ধৈর্য ধারণ কর। তোমার এই ধৈর্য ধারণ কেবল আল্লাহরই জন্য। ওদের ব্যাপারে দুঃখ বোধ করবে না এবং ওরা তোমার বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করে সে কারণেও তুমি মনে কুন্ঠিত হবে না।

—সূরা নহল ঃ ১২৭

সূরা আল-আহ্কাফ-ও মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। এর ৩৫ নম্বরের আয়াত ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
لَّهُمْ -

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন فهى اول اية نزلت فى القتال (فتح البارى - شرح البخارى ٧ ص ٣٨) 'সশস্ত্র জিহাদ পর্যায়ে এটাই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।

www.pathagar.com

ধৈর্য ধারণ কর যেমন অতীব আত্মশক্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছে। আর ওদের (কাফির বা অমান্যকারীদের) ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করবে না। —সূরা আহ্‌কাফ ঃ ৩৫

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল-মুযযাম্মিল-এর আয়াত ঃ

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ـ

এবং ধৈর্য ধারণ কর ওরা যা কিছু বলে সে ব্যাপারে এবং ওদের খুব সুন্দরভাবে পরিহার করে চল। —সূরা মুযযাম্মিল ঃ ১০

মক্কায় অবতীর্ণ এসব আয়াত সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, মক্কী জিন্দেগীতে রসূলে করীম (স.) এবং মুসলিমগণকে কাফির-মুশরিকদের অমানুষিক অত্যাচার-যুলুম নীরবে সইতে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন প্রক্রিয়া তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি বা করেন নি। এজন্যে যে, তা করার অনুমতি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া যায় নি। আর এ অনুমতি ছাড়া এ পর্যায়ে কোন পদক্ষেপ নিজেদের ইচ্ছামত গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না রসূলে করীম (স.) ও মুসলিমদের ব্যাপারে।

প্রতিরোধ করার অনুমতি সম্বলিত উপরোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে হিজরতের পরপরই। কেননা 'হিজরত'---অর্থাৎ মক্কা থেকে মুসলমানদের অন্যায়-অমানুষিকভাবে বহিষ্কৃত হওয়াকে যুদ্ধের অনুমতি দানের ভিত্তিরূপে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের নির্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানগণ মদীনা নগরে একত্রিত ও সুসংহত হয়েছিলেন এবং কায়েম করেছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর জিহাদ করার জন্য এই দুইটি জিনিস একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধচালানো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মক্কায় এই দুইটি সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ত ছিল না বলেই তথায় মুসলিমদের কোন শক্তি প্রয়োগের অনুমতিই দেয়া হয় নি[১]

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ওরওয়া ইবনু জুবাইর, জায়দ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ও কাতাদাহ প্রমুখ মণীষিগণ একমত হয়ে বলেছেন, জিহাদ সম্পর্কেই এই আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। (الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ، ص٦٨)

www.pathagar.com

মক্কায়ও জিহাদের শুধু অনুমতি নয়, আদেশই দেয়া হয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সে জিহাদ অস্ত্র বা শক্তি প্রয়োগ করে করার আদেশ বা অনুমতি ছিল না। তা ছিল দীন-প্রচার, বিরোধীচিন্তা-বিশ্বাস প্রতিরোধ ও দীনের দুশমনদের সব মিথ্যা প্রচারণা বা ভুল ধারণা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ, অকাট্য দলীল ও বিজ্ঞানসম্মত লজিক ব্যবহার করে লোকদের নিকট দীন-ইসলামকে উদ্ভাসিত করে তোলা। এ জিহাদ তরবারির দ্বারা চালানো হয় না, চালানো হয় মুখ ও লেখনীর সাহায্যে। সে জিহাদকে তাবলীগী জিহাদও বলা যায়। সূরা আল-ফুরকান-এর এ আয়াতে সেই জিহাদেরই নির্দেশঃ

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا -

> অতএব হে নবী! আপনি কাফিরদের আনুগত্য-অধীনতা মেনে নেবেন না ; বরং এই কিতাব আল্-কুরআন দিয়েই ওদের বিরুদ্ধে খুব বড় ধরনের জিহাদ চালিয়ে যান। —সূরা ফুরকান ঃ ১৫০

'জিহাদ' চালানোরই নির্দেশ। কিন্তু সে জিহাদ অস্ত্রের সাহায্যে নয় বা এই জিহাদে অস্ত্রের প্রয়োগ হবে না। সে জিহাদ হবে কুরআনের দ্বারা, কুরআনের আয়াতের অকাট্য শক্তি ও যুক্তির সাহায্যে।

সূরা আল-ফুরকান মক্কায় অবতীর্ণ। এটি সহ মক্কায় অবতীর্ণ কোন একটি সূরার কোন আয়াতেই 'কিতাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি (যেমন শুরুতে বলে এসেছি) যা শুধু মাত্র সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝায়—যে যুদ্ধে রক্তপাত হয়, মানুষ নিহত হয়। মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে শুধু জিহাদের নির্দেশ। একটি পরিভাষা হিসেবে এই 'জিহাদ' শব্দটি ইসলামী দীনী তাওহীদী-দাওয়াত, তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন এবং প্রতিপক্ষের বিপরীত কথার যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করা, তাদের সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয়, ভুল ধারণা ও শিরকী আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন ও ইতিবাচকভাবে দীন-ইসলামের ব্যাপক প্রচার-অভিযান পরিচালন থেকে শুরু করে সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত।

এ থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'জিহাদ' সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আর 'কিতাল' বিশেষ ও নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক শব্দ। জিহাদ'-এর অর্থ ইমাম রাগেব-এর ভাষায়ঃ

www.pathagar.com

وَالْجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِىْ مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ

জিহাদ ও মুজাহিদার অর্থ, শত্রু প্রতিরোধে সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ করে প্রয়োগ ( Endeavour ) করা। আর 'কিতাল' বা 'মুকাতিলা' অর্থঃ

اَلْمُحَارَبَةُ وَتَحَرِّى الْقَتْلِ

পারস্পরিক যুদ্ধ করা ও হত্যা করার জন্য চেষ্টা ( Parsue ) করা।[১]

'জিহাদ' প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তিরই কর্তব্য—ফরযে আইন', আর কিতাল যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসহ অবতীর্ণ হয়ে শত্রু নিধনে আত্ম নিয়োগ। কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষম লোকদের জন্য কর্তব্য---সাধারণ মুসলমানের জন্য তা' ফরযে কিফায়া। তার অর্থ যুদ্ধক্ষম লোকেরা যুদ্ধের ময়দান শত্রু সমক্ষে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র প্রয়োগ সহকারে যুদ্ধ করলেই সর্ব সাধারণ মুসলমানের উপর থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য তার সহযোগিতায় থাকতে হবে সকলকে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র চালাতে পারুক আর না-ই পারুক।

যুদ্ধের অনুমতি সম্বলিত উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যত যুদ্ধ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় মদীনায় অবতীর্ণ সূরা আল-বাকারা'র নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

وَقَاتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সূরা বাকারা ঃ ১৯

এ দুইটি আয়াতে স্পষ্টভাবে 'কিতাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, জিহাদ নয়। প্রথমোক্ত আয়াতে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আদেশ বা নির্দেশ নয়। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য ফরয সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু অতঃপর মাত্র কয়েকটি মাসের ব্যবধানেই যুদ্ধ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যা উপরিউক্ত আয়াতে বিধৃত।

---

১. مفردات امام راغب ص ۱۰۰

এ আয়াতটিতে 'তোমরা যুদ্ধ কর' বলে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যুদ্ধ করার। কিন্তু সাথে সাথেই সে নির্দেশকে সীমিত করে দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের মধ্যে। অর্থাৎ শত্রুপক্ষ তোমাদের উপর আক্রমণ করলে ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে তবেই তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে, নতুবা নয়। তা হলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরাও যুদ্ধ করতে পারবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে নির্বিশেষে সমস্ত কাফির-মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধ মুসলমানদের চালাতেই হবে। কেউ আগে-ভাগে তাদের উপর আক্রমণ করুক, আর না-ই করুক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ চালাক, আর না-ই চালাক।

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হলেই তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও। তাদের পরিবেষ্টিত কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাক। قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً তোমরা যুদ্ধ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে।

—সূরা তওবা : ৫

অতঃপর দীন-ইসলামকে পুরাপুরি গ্রহণ করেনি যেসব আহ্‌লি কিতাব—ইয়াহূদী ও খৃস্টান লোক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

www.pathagar.com

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

তোমরা যুদ্ধ কর সেই সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনেনি, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে যারা হারাম গণ্য করে না এবং সাবিকভাবে আল্লাহ্‌র নাযিল করা পূর্ণাংগ সত্য দীন পালন করে না—আহলি কিতাবের মধ্য থেকে (তাদের সকলের বিরুদ্ধে)। —সূরা তওবা ঃ ২৯

এ আয়াতে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার কারণ অপর পক্ষের আক্রমণ শুরু করা নয়। তা হচ্ছে দীন-ইসলাম কবুল ও পালন না করা। যারাই তা করবে না এবং যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তারা দীন-ইসলাম গ্রহণ ও পালন করবে এমন আশা বা সম্ভাবনা নেই, তখনই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করতে হবে। কেননা এই পর্যায়টি আসে তখন, যখন আল্লাহ্‌র দীনের সত্যতা পুরাপুরি প্রতিভাত হয়েছে, সে সম্পর্কে যা কিছু জানবার, বুঝবার ও অনুধাবন করবার, তা সকলেই মোটামুটিভাবে করে নিয়েছে। অতঃপর দীন-ইসলাম অগ্রাহ্য করার নিতান্তই শত্রুতা ও অন্ধ বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন কারণ অবশিষ্ট নেই, তখন দীন-ইসলাম গ্রহণ না করার কারুরই অধিকার থাকতে পারে না। তখন আল্লাহ্‌র এই প্রাকৃতিক জগতে বসবাস করে, তাঁরই দেয়া আলো-বাতাস-পানি ও খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থেকে সেই আল্লাহরই নাযিল করা দীনকে অগ্রাহ্য করা নিতান্তই অনধিকার চর্চা বা মারাত্মক ধরনের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই হয় না। আর আল্লাহ্‌র জগতে এই-রূপ অনধিকার চর্চা বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সেই ধৃষ্টতা চূর্ণ করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। তখন স্মরণীয় ও পালনীয় হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

www.pathagar.com

بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ

فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

অতএব যারাই পরকালের পরিবর্তে ইহকালকে ক্রয় করবে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কর্তব্য। আর যারাই এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিহত বা বিজয়ী হবে, আল্লাহ্ তাদের বিরাট শুভ ফল দান করবেন। সূরা নিসা ঃ ৭৪

অতঃপর মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে পড়ে দুনিয়ার নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানবতার মুক্তি বিধানের জন্য যালিম, শোষক ও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। এরূপ অবস্থায়ই আল্লাহ্র নিকট থেকে মুসলিম জনগণের প্রতি এই জিজ্ঞাসা এসেছে ঃ

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا

اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَّاجْعَلْ لَّنَا

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন যুদ্ধ করছ না, অথচ অবস্থা এই যে, দুর্বল-অক্ষম-অসহায়-নির্যাতিত-বঞ্চিত পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই যালিম শাসিত দেশ থেকে বাইরে বে'র করে নাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক-দরদী ব্যক্তি একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও। সূরা নিসা ঃ ৭৫

www.pathagar.com

এই জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ, তিরস্কার ও কৈফিয়ত তলবের ভাবধারা স্পষ্ট। এ প্রতিবাদ, তিরস্কার ও কৈফিয়ত চাওয়ার বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে অত্যাচারিত, নিপীড়িত জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার কারণে। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা অতিবড় অপরাধ। এ যুদ্ধ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধ এবং তা করা মুসলিমমাত্রের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

বস্তুত জিহাদ ও যুদ্ধের এই পর্যায়সমূহ কুরআনের এতদ্‌সংক্রান্ত আয়াতসমূহের নাযিল হওয়ার বিন্যাস ও পরম্পরা এবং স্বয়ং রসূলে করীম (স.)-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জীর ক্রমিকতা থেকে অকাট্যভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। আর রসূলে করীম (স.)-কে অনুসরণ করাই হচ্ছে সুন্নত। তাই জিহাদ ও যুদ্ধের এই পরম্পরা ও ক্রমিকতা অনুসরণ করাও প্রত্যেকটি মুসলিমেরই কর্তব্য।

ইসলামী জিহাদের উপরিউক্ত পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সমগ্র পাশ্চাত্য জগত এই জিহাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তাতে নিহিত পবিত্র ভাবধারা, অকাট্য যুক্তি ও যৌক্তিকতার সাথে কিছুমাত্র পরিচিত নয় পাশ্চাত্য জ্ঞানী-বিদ্বান-মণীষীরা। তারা জিহাদ চিনে না, জানে না। তারা জানে যুদ্ধ নিরপরাধ মানুষকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়া। আর যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ

> Human warfare is not merely the climax and the symbol of the strife, which pervades the realm of nature, it is itself an institution which have been involved in the struggle, The institution is rooted in a deep instinct and an inveterate habit of the race.[১]

পাশ্চাত্যের লোকদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা হয়েছেঃ

> The cause of war : war is traceable to elemenient at desires and passions of human nature'. According to hobbes, its threefold root is the desire of gain, The fear of enjury, and the love of glory. In the nature of man, we find three principal

১. Encyclopaedia of Religion and Ethics, VXII P. 675



www.pathagar.com

causes of a warrel, First, competition, secondly, diffidence, Thirdly, glory.[১]

যুদ্ধের এই ব্যাখ্যার সাথে ইসলামী জিহাদের কোনই সাদৃশ্য নেই, নেই দূরতম কোন সম্পর্কও।

## ইসলামী জিহাদের বিশেষত্ব

ইসলামী জিহাদের দুইটি বিশেষত্ব অত্যন্ত প্রকট। বলা যেতে পারে, জিহাদ-এর ইসলামী হওয়ার জন্য এই দুইটি বিশেষ ও অলংঘনীয় শর্ত। তার একটি হচ্ছে, ঈমান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'ফী সাবীলিল্লাহ্।'

কুরআনের যেসব আয়াতে জিহাদ শব্দটি কোন না কোনরূপে বা ধারাবাহিকতায় উদ্ধৃত হয়েছে, সেইসব আয়াতেই জিহাদের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে ঈমান এবং পরশর্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে 'ফী সাবীলিল্লাহ।' অর্থাৎ ঈমানের তাকীদে ও ঈমানের ভিত্তিতে জিহাদ অনুষ্ঠিত হতে হবে। যে জিহাদ-এর পশ্চাতে ঈমানের তাকীদ নেই, যে জিহাদ ঈমানের ভিত্তিতে পরিচালিত নয়, তা কখনই ইসলামী জিহাদ হতে পারে না। অনুরূপভাবে জিহাদ-এর লক্ষ্য ও পন্থা-পদ্ধতি প্রক্রিয়ার গুণ পরিচিতি হতে হবে ফী সাবীলিল্লাহ—আল্লাহ্‌র পথে—হওয়ার। যে জিহাদ-এর লক্ষ্য আল্লাহ্‌র দীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন নয়, এবং যে জিহাদ আল্লাহ্‌র নাযিল করা নিয়ম-নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাকেও ইসলামী জিহাদ নামে অভিহিত করা চলে না।

কুরআনের জিহাদ সংক্রান্ত সব কয়টি আয়াত সম্মুখে রেখে বিশ্লেষণ করলেই এই কথার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে উঠবে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের বিশেষত্ব, যা দুনিয়ার অপর কোন কার্যক্রম বা পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের দ্বারা অনুষ্ঠিত যুদ্ধে খুঁজে পাওয়া কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। তাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাচ্ছি, ইসলামের জিহাদ এবং পাশ্চাত্য বা আধুনিককালের যুদ্ধ কোন দিকদিয়েই এক বা অভিন্ন নয়। এই দুইটির মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান।[২]

---

১. ibid. P. 676

২. مختصر سيرة الرسول صلعم ص ١٦١ — ١٦٢

زاد المعاد لابن القيم الجوزيه ج ٣ ص ٥ — ١٩

www.pathagar.com

## জিহাদ অনিবার্য

ইসলাম শিরক-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। লড়াই করেছে সেই-সব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যারা শিরকভিত্তিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষকে তার অধীনে নির্যাতিত নিপীড়িত হতে বাধ্য করেছে নির্মমভাবে ও প্রতিটি মুহূর্তে।

তার কারণ, শিরক মানবতা ও মানব সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে। অথচ ইসলাম এসেছে সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য। এবং সে জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা শুধু যুক্তিসংগতই নয়; বাধ্যতামূলকও।

রসূলে করীম (স.) জাযীরাতুল আরবে যখন তাওহীদী দীন প্রচার শুরু করেছিলেন তখন সমগ্র ভূ-খণ্ডে শুধু মূর্তি পূজারই শিরক ছিল না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তথায় শুধু মূর্তি পূজারই শিরক ছিল এবং নবী করীম (স.) কেবল সেই শিরক থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তা হলেও তা মানুষের মর্যাদার দৃষ্টিতে কিছু-মাত্র অযৌক্তিক, বিবেচিত হতে পারে না। কেননা মানুষ নিজ হাতে প্রস্তর, কাষ্ঠ বা মাটি-খড়-কুটা সমন্বয়ে নির্মিত মূর্তির পূজা করে মনুষ্য-ত্বেরই চরম অবমাননা করে। মানুষ হয়ে এই মূর্তির পূজা করা, তার সম্মুখে আত্মনিবেদিত হওয়ার মত মানবীয় মর্যাদাহানিকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। মানুষের এইরূপ লাঞ্ছনার অনুষ্ঠান কোনক্রমেই যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু না। তিনি শুধু মূর্তি পূজার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন নি। আসলে এই মূর্তি পূজার শিরক একটি সমাজ ব্যবস্থা ও একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বাত্মক প্রথার প্রতীক। একটা বিশেষ ধরনের বিশ্বাস ও অভ্যাসের ফলশ্রুতি হচ্ছে এই মূর্তি পূজা। এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে একটা পূর্ণাংগ সমাজ কাঠামো। এই সমাজ কাঠামোর আওতাধীন মানুষের জীবন হীন ও জঘন্যতম দাসত্বমূলক জীবন। তা একালের বলশেভিক বা আধুনিক সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের অধীন জীবনের সাথেই তুলনীয়। সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়া, সীমা-সংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণ, অত্যন্ত নির্মম ধরনের সুদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী স্বৈরতন্ত্র ও চরম মাত্রার চরিত্রহীনতাকে তা শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সময়কার আরব

www.pathagar.com

দেশের শিরকভিত্তিক সমাজে মানুষ নিকৃষ্টতম অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল।

এই প্রেক্ষিতে দুনিয়ার যে-কোন সময়ের, যে-কোন দেশের সুস্থ মন-মানসিকতা ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট প্রশ্ন করা যায়, এইরূপ একটি সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকাকে কোন্ যুক্তিতে বরদাশ্ত করা যায়? এরূপ একটি সমাজ-ব্যবস্থা মানব-দেহে একটি প্রচণ্ড বিষ ফোঁড়ার মত নয় কি? যার দেহেই এইরূপ বিষ ফোঁড়ার অস্তিত্ব দেখা দেবে, অনতিবিলম্বে অস্ত্রোপচার করে তাকে নির্মূল করা না হলে গোটা দেহ সত্তাকেই যে মারাত্মক বিষে জর্জরিত করে ফেলবে, তাতে কি একটুও সন্দেহ আছে? তদানীন্তন অন-ইসলামী শিরকভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে নবী করীম (স.)-এর অস্ত্র ধারণের মূলে নিহিত এই যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করতে পারে?[১]

১. The Life of Muhammad S.M. by Haykal P. 470

www.pathagar.com

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# জিহাদ ও যুদ্ধ এক নয়

[ কুরআন মজীদে জিহাদ শব্দের ব্যবহার—হাদীসে জিহাদ শব্দের ব্যবহার—লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—জিহাদের দাবী—জিহাদ ও যুদ্ধ—পর্যালোচনা—শরীয়তবিদ ও আন্তর্জাতিক আইনবিদদের অভিমত—এক অপরিহার্য দুষ্কৃতি—সামষ্টিক প্রকাশমানতা—যুদ্ধের প্রভুরা—আনদিকাল থেকে যুদ্ধ—উত্তম নিদর্শন ]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## কুরআন মজীদে জিহাদ শব্দের ব্যবহার

উপরের দীর্ঘ ও মৌলিক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে. 'জিহাদ' বলতে কেবল যুদ্ধ-ই বুঝায় না। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলিম সমাজে আবহমানকালের প্রচলনে 'জিহাদ' শব্দটি কখনই পুরোপুরিভাবে 'লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার লক্ষ্যে পরিচালিত যুদ্ধ'-এর সমার্থবোধক ছিল না এবং যুদ্ধ জিহাদ-এর প্রতিশব্দও নয়। এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কুরআন মজীদের শব্দ-ব্যাখ্যাতা রাগিব ইস্ফাহানী এই শব্দটির যে তাৎপর্য লিখেছেন, তাতে এই সমার্থবোধকতার কোন প্রমাণ নেই। উক্ত 'মুফরাদাত' গ্রন্থে 'জিহাদ' শব্দের ভিন্নতর রূপ 'মুজাহিদাতুন' (مجاهدة) এর অর্থ লেখা হয়েছে ঃ

مُحَاوَلَةُ الْقُوَّةِ لِدَفْعِ الْعَدُوِّ

শত্রু দমনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ।

এই 'জিহাদ' তিন প্রকারের ঃ

১. দৃশ্যমান বা প্রকাশ্য শত্রু---যালিমের বিরুদ্ধে জিহাদ,
২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ,
৩. দুর্বিনীত মন-মানসিকতা ও নফ্সের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ।

غريب الحديث والاثار নামের গ্রন্থে জিহাদের অর্থ করা হয়েছে ঃ

الْمُحَارَبَةُ ضِدَّ الْكُفَّارِ وَاسْتِعْدَادُ شَخْصٍ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ

وَكَفَاءَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ ...

www.pathagar.com

কাফিরদের সাথে পারস্পরিক যুদ্ধ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-উপযুক্ততা অনুপাতে প্রস্তুতি গ্রহণ। --তা কথার দ্বারা হোক, কি কাজ দ্বারা, উভয়ই সমান।

মোদ্দা কথা, কুরআনের আয়াতসমূহে যুদ্ধ অর্থে জিহাদ এবং তার তুলনায় সাধারণ অর্থে তার ব্যবহারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূরা আল-আন্‌কাবুত-এর সর্বশেষ আয়াত ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

আর যে সব লোক আমাদের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা করছে, আমরা নিশ্চয়ই তাদের দেখাব আমাদের পথ (পরিচালিত করব আমাদের পথে)। এবং নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ রয়েছে মুহ্সিন লোকদের সাথে।

আয়াতটি নুবূওয়াতের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে জিহাদ অর্থ ঃ শক্তিব্যয় বা মুকাবিলা করা, যুদ্ধ করা নয়।

সূরা আল-ফুরকান-এর ৫২ নং আয়াত ঃ

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

এবং জিহাদ কর তাদের সাথে এই কুরআন দ্বারা বড় রকমের জিহাদ।[১]

---

১. 'বড় রকমের জিহাদ' বলতে তিন পর্যায়ের কাজ বুঝায় ঃ ক) চূড়ান্ত মাত্রার চেষ্টা, যাতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রাণপণ কষ্ট স্বীকারের কোন মাত্রাই অব্যবহৃত রাখা হবে না। খ) বড় আকারে ও মাত্রায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যাতে সমস্ত উপায়-উপকরণ নিয়োগ করা হবে এবং গ) ব্যাপক ও সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যাতে চেষ্টার কোন দিক এবং মুকাবিলা করার কোন ক্ষেত্রই ছেড়ে দেয়া হবে না। শত্রু পক্ষের শক্তি যে যে ক্ষেত্রে কাজ করছে, তাতেই শক্তি প্রয়োগ করা হবে, সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য যে যে দিকে ও ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হবে, তাই করতে হবে। তাতে লেখনী ও সাহিত্যের জিহাদ রয়েছে, জান ও মালের জিহাদ রয়েছে এবং শেষত অস্ত্র-শস্ত্রের জিহাদও রয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা আল-আনকাবুত-এর ষষ্ঠ আয়াত :

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আর যে লোক জিহাদ করল, সে জিহাদ করল তার নিজের জন্য—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গোটা বিশ্বলোকের উপর অ-নির্ভরশীল, তার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন।

এ আয়াতে জিহাদ শব্দটি 'শক্তি ব্যয় ও মুকাবিলা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে অস্ত্র ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠে না।

আবার এই সূরারই অষ্টম আয়াত :

وَإِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ

আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার উপর প্রাণ-পণ চেষ্টা চালায় এজন্য যে, তুমি আমার সাথে এমন জিনিস শরীক বানাবে, যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, তা হলে তুমি তাদের মানবে না (তাদের কথামত শিরক করবে না।)

এ আয়াতে জিহাদ শব্দটি মুখের কথা বা অন্য কোনভাবে চাপ প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করার কথা বলা হয়নি। তার অবকাশও এখানে নেই।

সূরা 'আত্-তাহরীম'-এর নবম আয়াত এবং সূরা আত-তওবার ৭৩ আয়াত :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...

وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

www.pathagar.com

হে নবী ! জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপর কঠোরতা প্রয়োগ কর - - - - -তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা খুবই খারাপ পরিণতি।

আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াতে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করার নির্দেশ নবী (স.)-কে দেয়া হয়েছিল, তা 'যুদ্ধ' অপেক্ষা সাধারণ অর্থজ্ঞাপক।

আয়াতটিতে কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রয়েছে। অথচ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মদীনীয় সমাজে মুনাফিকদিগকে মুসলমানদের মধ্যে শামিল গণ্য করা হত ও মুসলমানদের ন্যায়ই তাদের প্রতি আচরণ গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র যুদ্ধ' করতে বলা হয়েছিল, এমন কথা কেউ-ই বলেন নি; কোন ইমামও এই মত প্রকাশ করেন নি। যদিও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লেগেই ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এই নির্দেশ এ কথা প্রমাণ করে যে, এই জিহাদ অর্থ নিশ্চয়ই 'যুদ্ধ' নয়; বরং মুনাফিকদের চাল-চালনকে এ পর্যন্ত নীরবে বরদাশ্‌ত করা হয়েছে, তারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থেকে গোপনে ও অপ্রকাশ্যভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা করে যাচ্ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়নি, যুদ্ধ করা হয়েছে প্রকাশ্য দুশমন কাফিরদের বিরুদ্ধে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে নয়। কাজেই এ'তে কোনই সন্দেহ নেই যে, উক্ত আয়াতে জিহাদ শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তার অর্থ হচ্ছে ঃ

دَعْوَتُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ بِالْحُجَّةِ وَالْاِقْنَاعِ-

তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ ও অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে খাঁটিভাবেই ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া এবং তাদের অক্ষম ও লা-জওয়াব করে দেয়া।[১]

---

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কাফিরদের সাথে জিহাদ করতে হবে তরবারির দ্বারা, আর মুনাফিকদের সাথে 'যুদ্ধ' করতে হবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ-(রাঃ) বলেছেন ঃ অন্যায়ের বিরোধিতার তিনটি পর্যায়ই এক্ষেত্রে স্মরণীয় ঃ হাত বা শক্তিদ্বারা না পারলে মুখ দ্বারা, তা না পারলে অন্তর দ্বারা।—আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, তাফসীর মাহাসিনিত-তা'বীল, আল-খাযেন।

www.pathagar.com

জিহাদ শব্দের এই অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক। এতে ব্যক্তির মানসিক শক্তি, বাক-শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-শক্তি প্রয়োগ করে জিহাদ করা যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি শামিল রয়েছে অস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে শত্রু বিধ্বংসী যুদ্ধ করা।

কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে আল্লাহ্র পথে মানসিক শক্তি, অর্থশক্তি ও অস্ত্রশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا... أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ -

যে সব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তাদের ধন-মাল দিয়ে ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য দিয়েছে---এরা সকলেই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। —সূরা আনফাল ঃ ৭২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে আল্লাহ্র পথে, তারা সকলে আল্লাহ্র রহমতের আশা করে এবং আল্লাহ্ বস্তুতই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। —আল-বাকারা ঃ ২১৮

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ

www.pathagar.com

رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا

نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

কোন একটি সূরা যখন নাযিল হয় এই নির্দেশ সহ যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং জিহাদ কর তাঁর রসূলের সংগে মিলে, তখন তুমি দেখছ, তাদের মধ্যে যারাই সামর্থ্যবান ছিল, তারাই তোমার নিকট দরখাস্ত করেছে যে, তাদের জিহাদে শরীক হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক, এবং তারা বলেছে, 'আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা বসে থাকা লোকদের সংগে থাকব।' —সূরা তওবা : ৮৬

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ

مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ... تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ...... ذٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের পথ দেখাব যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে মুক্তিদান করবে? তা'হচ্ছে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং তোমরা জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের ধন-মাল দিয়ে তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। —সূরা সাফ : ১০-১১

এই সব কয়টি আয়াতেই 'জিহাদ' শব্দটি বিশেষভাবে যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অস্ত্রের প্রয়োগের পরিবর্তে অন্যান্য শক্তি ও উপায়-উপকরণ ব্যবহারই অধিক প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

### হাদীসে 'জিহাদ' শব্দের ব্যবহার

রসূলে করীম ( স. )-এর বহু সংখ্যক হাদীসেও 'জিহাদ' শব্দটি 'যুদ্ধ' অপেক্ষা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছে :

اَلْحَجُّ مِنْ اَرْقَى الْجِهَادِ

হজ্জ হচ্ছে উন্নতমানের জিহাদ।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে :

مِنْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ مُجَاهِدُوْنَ -

ইল্‌মধারী লোকদের মধ্যে অনেকেই জিহাদকারী রয়েছে।

উদ্ধৃত হাদীসদ্বয়ের কোনোটিতে জিহাদ শব্দটি যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকারের অর্থে।

তবে মুজতাহিদ ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ 'জিহাদ' শব্দটিকেও 'কিতাল' বা 'সশস্ত্র যুদ্ধ' অর্থেই ব্যবহার করেছেন। আর এরূপ ব্যাপক ব্যাবহার ও তার ব্যাপক প্রচারের দরুণ ক্রমশ শব্দটির সাধারণ অর্থ প্রায় বিলুপ্ত ও লোকদের চোখের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং তার বিশেষ অর্থই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তা প্রকৃত ব্যাপার নয়।

এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদ্‌গণ নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁরা যখন মুসলিম সমাজের পারস্পরিক কার্যাদি প্রসংগের আইন রচনা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁরা জিহাদ ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার দিকদিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে জিহাদকে শুধু মাত্র কিতাল বা যুদ্ধ অর্থেই ব্যবহার করে বসেছেন। এই সময় মুসলিম সমাজ ও উম্মত বিভিন্ন যুদ্ধ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিন বলে এই প্রয়োগ ছিল সাম্প্রতিক অবস্থা ও প্রেক্ষিতের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা তখন সে জিহাদ ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের সশস্ত্র যুদ্ধ এবং তাতে অংশগ্রহণ করা সব মুসলমানের জন্যই 'ফরযে আইন' বা প্রত্যক্ষ কর্তব্য হয়ে পড়ে-

www.pathagar.com

ছিল। এই কারণে তখন ব্যবহারিকতার দিক দিয়ে জিহাদ ও কিতাল এই শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার অবকাশও তাঁরা পাননি।

শব্দটির এই বিবিধ ব্যবহারের জঞ্জাল থেকে আমরা এভাবে মুক্তি পেতে পারি যে, ইসলামে এই শব্দটির ব্যবহার নিম্নোদ্ধৃত তিনটি অর্থের যে কোন একটিতে গ্রহণীয়।

প্রথম, নফ্সের সাথে জিহাদ। মক্কা বিজয়ের অভিযানে বের হয়ে নবী করীম (স.) বলেছিলেনঃ

خَرَجْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ -

আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে বের হয়ে এসেছি।

মক্কা বিজয়ের অভিযান ছিল 'জিহাদ-ই-আকবর' বড় জিহাদ। আর এই অভিযানে বের হয়ে আসার পূর্ববর্তী অবস্থা ছিল ছোট জিহাদ। একটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাপার, আর অপরটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অবস্থা নয়। কিন্তু উভয়-ই ছিল জিহাদ।

দ্বিতীয়, অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে অমুসলিম মুশরিক-কাফিরদের পরাজিত ও দুর্বল করে দেয়া। প্রতিপক্ষের আরোপিত সর্ব-প্রকারের জ্বালা-যন্ত্রণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি অকাতরে সহ্য করা এবং এই অবস্থার মুকাবিলায় ধৈর্য ধারণ। কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহে এই জিহাদের কথাই বলা হয়েছে।

আর তৃতীয়, ফিক্হী তাৎপর্য অর্থাৎ যুদ্ধ।

এই তৃতীয় অর্থটি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। তখনকার সময়ে মুসলিম উম্মত যে অবস্থা ও প্রেক্ষিতের মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিল, সেই কারণে জিহাদ শব্দের এই প্রয়োগ হয়েছিল। তার অর্থ ফিকহের দৃষ্টিতে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' অভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

পূর্বোদ্ধৃত বিস্তারিত বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মহালক্ষ্য, উচ্চ মূল্য ও আকর্ষণীয় বস্তু অর্জনের জন্য চূড়ান্ত মাত্রার শ্রম-চেষ্টা

www.pathagar.com

নিয়োগ, কষ্ট স্বীকার ও স্বীয় যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষে প্রয়োগ করাই হচ্ছে জিহাদ শব্দের সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্য। আর মহান আল্লাহ্‌র নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর আইন-বিধানের অধীনতা স্বীকার করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে চলা এবং তাঁর সন্তোষ-সন্তুষ্টি লাভই মুসলিম ব্যক্তির সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও বিরাট আকর্ষণীয়, কামনীয় জিনিস, এতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কাজের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রাম ও প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করা একান্তই আবশ্যকীয় যে কোন প্রতিবন্ধক ও পরিপন্থী শক্তির মুকাবিলায়। তা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে হোক, নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে হোক, আইন-শাসন ও জীবন বিধানের ক্ষেত্রে হোক, কি একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান পালনের ও ইবাদত করার ক্ষেত্রে হোক, কোন একটি ক্ষেত্রও এর আওতার বাইরে পড়ে না, সবই এর আওতার অন্তর্ভুক্ত। এই সব ক্ষেত্রেই পূর্ণ নিষ্কন্টকতা ও পরিপন্থীহীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং একচ্ছত্রভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও নিজের উপর, গোটা পরিবেশের সমস্ত জনগণের উপর, একটি দেশের সর্বত্র আল্লাহ্‌র আইন-বিধান কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এর একটি দিকে মহান আল্লাহ্‌র অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ এবং অপর দিকে বান্দার উপর আল্লাহ্‌র আরোপিত বিরাট কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই কাজ প্রথমত ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণীয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির একার পক্ষে এই কাজ সমাধা করা কঠিন বা অসম্ভব। এই কারণে এ অবস্থাকে কুরআন 'ফিত্‌না' বলে অভিহিত করেছে--তাই এই ফিতনাকে খতম করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা গোটা ঈমানদার সমাজ ও জাতির জন্য একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। অন্য কথায় ইসলামী জিহাদ ব্যক্তিকে করতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ক্ষেত্রে এবং মুসলিম জনসমষ্টিকে করতে হবে সামষ্টিক পর্যায়ের বিশাল বিরাট ক্ষেত্রসমূহে।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, গোটা বিশ্বলোক, সমগ্র বিশ্ব চরাচর, প্রাকৃতিক জগত—জগতের প্রস্তর, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু, প্রাণী ও মানুষ (মানুষের জৈবিক দিক ও ক্ষেত্র) মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (مشيئة) ও তাঁর জারী করা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধান ও স্বাভাবিক আইন প্রণালীর একান্ত অধীন হয়ে রয়েছে। কোন একটি বিন্দু-অণু-পরমাণু, কোন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী বা বিরাট

www.pathagar.com

বিরাট বস্তু ও জন্তু কোন কিছুই তাঁর নিরংকুশ অধীনতার বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত নয়। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, তা জীব ও প্রাণী হোক বা বস্তু-জড়, সবই তাঁর অধীনতা-আনুগত্য স্বীকার করে আছে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় এবং তাদের সবাইকেই তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। —সূরা আল-ইমরান ঃ ৮৩

গোটা প্রাকৃতিক জগত আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে চলছে এবং সবকিছুই তাঁর অনুগত হয়ে আছে। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই কথা অতীব স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَ

الدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ - وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ -

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্‌র জন্য অবনত হয়ে আছে যা আছে আকাশ-মণ্ডলে এবং পৃথিবীতে, আর সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র, গ্রহরাজি, পর্বত-মালা বৃক্ষরাজি, ভূ-পৃষ্ঠে চলমান জীব-জন্তু এবং বহু সংখ্যক মানুষ ; অবশ্য অন্য বহু সংখ্যক মানুষের উপর আযাব বাস্তবায়িত হয়েছে।

—সূরা হজ্জ ঃ ১৮

অতএব প্রাকৃতিক জগতের উপর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব স্বতঃই সংস্থাপিত ও কার্যকর হয়ে আছে। এই কাজের জন্য মানুষের কিছুই করণীয় নেই। মানুষ নিজেও তারই অধীন। এই প্রাকৃতিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক

www.pathagar.com

স্বতঃই কার্যকর। এছাড়া আরও একটি বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব স্বতঃই কার্যকর নয়। তা হচ্ছে মানুষের কর্মজীবনে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্র। এখানে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে মানুষের সমুখে উপস্থাপিত হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়ত। নবী ও রসূলগণ তা মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী সূত্রে লাভ করেছেন। তাঁরা তা জনগণের সম্মুখে পেশ করেছেন, তা বুঝে-শুনে বিশ্বাস করার এবং কর্মজীবনের বিধানরূপে গ্রহণ করার ও অনুসরণ করে চলার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাকে পূর্ণ শক্তিতে কার্যকর করেছেন। সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে যেমন একচ্ছত্রভাবে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হয়ে আছে, মানুষের ইচ্ছামূলক কর্মের জগতে ওহীসূত্রে-প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র-বিধান অনুরূপ একচ্ছত্রভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। ফলে প্রাকৃতিক জগত ও মানব জগত—উভয় ক্ষেত্রেই কেবল এক আল্লাহ্‌র বিধান পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়েছে। নবী-রসূলগণের আগমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র সে সব বান্দার উপর অর্পিত হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্‌ ও নবী-রসূলগণ—সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমানদার। বস্তুত আল্লাহ্‌র এই বিধান মানব সমাজে পুরোমাত্রায় কার্যকর করে তোলার জন্য ঈমানদার মানুষকেই চেষ্টা করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। এরই নাম জিহাদ এবং এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে।

এই জিহাদের কয়েকটি প্রকার, ধরন ও রকম রয়েছে। তা বিশেষ একটি রূপে সীমিত নয়। যুদ্ধ তন্মধ্যে একটি ধরন বা পদ্ধতি। তা সর্বাধিক কার্যকর ও চূড়ান্ত পদ্ধতি, সন্দেহ নেই। এর লক্ষ্য হচ্ছে, জগতে সমানভাবে প্রভাবশালী ও কার্যকর দুইটি শক্তির কার্যকরতা থাকবে না, থাকতে পারবে না, থাকতে দেয়া যেতে পারে না। যদি থাকে তা'হলে যে দুইটির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে, মানুষের খাহেশ ও কামনা-বাসনাকে পারস্পরিকভাবে আকর্ষণ করতে থাকবে, তাতে মানুষের চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার আশংকা অত্যন্ত প্রকট। এই কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষের শক্তিকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌-বিরোধী শক্তিকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে হবে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে ঃ



www.pathagar.com

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

যুদ্ধ কর আল্লাহ্ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে, যেন শেষ পর্যন্ত ফিত্না—আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ববিহীন অবস্থা—নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে যায়। এবং সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব ও আনুগত্য-অধীনতা হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। —সূরা আনফাল ঃ ৩৯

## জিহাদের দাবী

উক্ত জিহাদের *ঐকান্তিক* দাবী হচ্ছে, মানুষ দীন-ইসলাম সম্পর্কে পুরোমাত্রায় অবহিত হবে। কেননা তাকে তো এই দীন প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ করতে হবে। তাকে জানতে ও চিনতে হবে কুফরকে ; জানতে হবে জাহিলিয়তকে। কেননা এই কুফর ও জাহিলিয়তকে পর্যুদস্ত ও উৎখাত করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার এই জিহাদের লক্ষ্য।

দীন-ইসলাম সম্পর্কে তাকে যে জ্ঞান ও অবহিতি অর্জন করতে হবে, তা হতে হবে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল, সর্বপ্রকার সংশয় ও অস্পষ্টতা মুক্ত, তা হতে হবে যথাসম্ভব ব্যাপক ও পূর্ণাংগ। সেইসাথে তাকে কুফর ও জাহিলিয়ত সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে, যেন তার বাহ্যিক প্রকাশ তাকে প্রতারিত করতে না পারে, যেন তার রূপ-বৈচিত্র্য তার চোখ ঝলসে দিতে না পারে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর একটি উক্তি এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন, "ইসলাম স্তরে স্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—এভাবে যে, যারা ইসলামী পরিমণ্ডলে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়, তারা জাহিলিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে যায়।" অর্থাৎ জাহিলিয়ত সম্পর্কে অনবহিতি ইসলামের শক্তির পক্ষে বিপর্যয়ের কারণ। 'ধর্মীয় গোঁড়ামীর সমাধি' গ্রন্থের ভূমিকায় ভল্টেয়ার লিখেছেন, 'কোনরূপ চিন্তা-বিবেচনা ব্যতীতই যারা কোন ধর্ম গ্রহণ করে—অধিকাংশ লোকেরই এই অবস্থা—তারা সেই ষাঁড়ের মত, যা জোয়াল কাঁধে বসিয়ে নেয় এবং তা স্বতস্ফূর্তভাবেই বহন করতে থাকে।' কিন্তু ইসলাম সেরূপ অন্ধত্বের সমর্থক নয়। ইসলাম চায়, ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী সবকিছু সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি।

www.pathagar.com

তবে কুফর ও জাহিলিয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব, এ দুটির বাহ্যিক প্রকাশ, রূপ-বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকার সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হওয়া সর্বসাধারণের জন্য কর্তব্য নয়। কেননা তা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু ইসলামের পক্ষে যারা নেতৃত্ব দেবে, ইসলামী আন্দোলনের যারা পুরোভাগে থাকবে, যারা হবে ইসলামী সেনাবাহিনীর পরিচালক, কুফর ও জাহিলিয়ত সম্পর্কে তাদের অবশ্যই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা ইসলামের পক্ষে নেতৃত্ব দান সম্ভবপর হবে না। সাধারণ ও মধ্যম মানের মুসলিম জনগণের তুলনায় এ পর্যায়ে তাদের জ্ঞান ও অবহিতি হতে হবে অতীব ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম এবং উচ্চতর। কুফর ও জাহিলিয়তের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, বৈজ্ঞানিক ভুল ও মানব-জীবনে তার নিয়ে আসা ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের তত্ত্বগত জ্ঞানের সাহায্যে তার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। লৌহকে লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত হানলেই চলবে না, তার তুলনায় অধিক শক্ত ও শাণিত অস্ত্র দ্বারা আঘাত হানতে হবে। নতুবা লৌহকে চূর্ণ করা অসম্ভব থেকে যাবে। মৃদুমন্দ বায়ুর প্রতিরোধ করতে হবে প্রবল বায়ু প্রবাহ ও ঝন্ঝাবাত্যা দিয়ে ; কুফর ও জাহিলিয়তকে রুখতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে। ভাঙ্গতে হবে তার প্রচার-প্রভাব-কর্তৃত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এজন্য মানুষের সম্ভাব্য সকল শক্তি ও উপায় বিনিয়োগ করতে হবে, উদ্ভাবিত ও উৎ-পাদিত সর্বপ্রকার হাতিয়ার ও কলা-কৌশল ব্যবহার করতে হবে এই কাজে। আল্লাহ্ তায়ালা তারই নির্দেশ দিয়েছেন এ আয়াতে ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۝

এবং তাদের (কাফির—শত্রুপক্ষের) মুকাবিলা করার লক্ষ্যে যে শক্তি ও যানবাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব---সাধ্যায়ত্ব হবে, তোমরা তা সব অবশ্যই সংগ্রহ করবে। তারদ্বারা তোমরা আল্লাহ্র শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, তোমাদের শত্রুদেরও। এদের ছাড়া আরও

www.pathagar.com

যারা আছে। তোমরা তাদের চিনো না, জানো না, আল্লাহ্ তাদের ভালো করেই জানেন। —সূরা আনফাল ঃ ৬০

দীনের দুশমনদের পর্যুদস্ত ও প্রতিরুদ্ধ, ভীত ও সন্ত্রস্ত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণে মুসলিমদের প্রতি এ হচ্ছে সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ যত প্রকারে প্রস্তুতি গ্রহণ সম্ভব এবং যত অস্ত্র ও কলা-কৌশলই আয়ত্ব করা সম্ভব, তা সবই করতে হবে। সে সবের মধ্যে কোন একটির প্রতিও একবিন্দু উপেক্ষা দেখানো যেতে পারে না।

**জিহাদ ও যুদ্ধ**

পূর্বে যেমন বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, 'জিহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি বিনিয়োগ, চূড়ান্তভাবে কার্য সম্পাদন, শত্রু প্রতিরোধ ও দমনে সঞ্চিত শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষে প্রয়োগ।

এই জিহাদ তিনটি ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিতব্য ঃ

১. প্রকাশ্য শত্রুর মুকাবিলায়,
২. শয়তানের প্রতিরোধে, ও
৩. নফ্‌সকে সংযতকরণে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দীনের প্রকাশ্য দুশমন, শয়তান ও মানব মনে নিহিত নফ্‌স—নফ্‌সে আম্মারা বা অন্যায় কাজের প্ররোচণাদাত্রী মন-মানসিকতা সমান মাত্রার শত্রু, ব্যক্তির ঈমান ও মুসলিম জীবন ধারার প্রতিপক্ষ। নিম্নোদ্ধৃত তিনটি আয়াতে এই তিনওটি শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধাভিযানের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।

وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۝

এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যেমন করে জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়।
সূরা হজ্জ ঃ ৭৮

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ

এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ পালন এবং সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ও রাখার।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ঃ

جَاهِدُوْا اَنْفُسَكُمْ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَرُدُّوْهَا عَنِ الْهَوٰى

وَجَاهِدُوْا الشَّيْطَانَ فِىْ رَدِّ وَسْوَسَتِهٖ وَالظَّلَمَةَ فِىْ

رَدِّ ظُلْمِهِمْ وَالْكَافِرِيْنَ فِىْ رَدِّ كُفْرِهِمْ ٥

তোমরা জিহাদ কর তোমাদের নফ্‌সের বিরুদ্ধে তাকে আল্লাহ্‌র অনুগত বানাবার জন্য এবং খাহেশাত-লালসা-বাসনা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তার প্ররোচনা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ও যালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তাদের যুলুম বন্ধ করার জন্য এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তাদের কুফরী কার্য প্রতিরুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।[১]

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ...

তোমরা সকলে জিহাদ কর তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে। —সূরা তওবা ঃ ৪১

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত ও আবু দাউদ উদ্ধৃত এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন—

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ-

---

১. কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ না, এ আয়াতটি মানসূখ নয়। কেননা আয়াতে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সকলের পক্ষেই ওয়াজিব বা করা দরকার এবং চিরন্তন।

الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١٢ ص ٩٩ -

www.pathagar.com

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-মাল, জান-প্রাণ ও মুখ (ভাষা ও সাহিত্য) দিয়ে।

পূর্ণাংগ ও আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে জিহাদ, উপরিউক্ত আয়াতে সেই জিহাদ করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে ধন-মালের বিনিয়োগের কথা সর্বাগ্রে বলা হয়েছে। কেননা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য ধন-মালের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। [১]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

যে সব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে তাদের ধনমাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে - - -

ঈমান, আল্লাহ্, রসূল ও পরকালের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস মানুষের জীবনে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারই অনিবার্য পরিণতি আল্লাহ্‌র যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ পরিহার ও অ-ইসলামী দেশ ত্যাগ এবং তারই নিশ্চিত ও বাধ্যবাধকতাপূর্ণ দাবী ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। প্রসংগত উল্লেখ্য, জিহাদ সংক্রান্ত সকল আয়াতেই প্রথমে ধন-মালের কথা বলা হয়েছে এবং তার পরে জান-প্রাণের কথা। কেননা জিহাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই ধন-মালের প্রয়োজন দেখা দেয় জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। তারপরে আসে জান-প্রাণ দেয়ার প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত মানুষ জান দিতে প্রস্তুত হলেও মাল দেয়া তার তুলনায় অনেক বেশী কষ্টকর। তাই জিহাদে ধন-মাল নিয়োগের উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২]

## ফিকাহবিদদের মন্তব্য

ফিকাহবিদগণ জিহাদের বহু কয়টি সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে তার মধ্য থেকে কয়েকটি প্রখ্যাত সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

---

১. جامع لاحكام القرآن ج ٨ ص ١٥٣

২. ঐ

www.pathagar.com

**ইমাম আবু হানীফার পক্ষের লোকদের সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ**

শরীয়তের পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থে কাফিরদের সাথে জিহাদই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তা হচ্ছে, তাদের দীন-ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো। তা গ্রহণ না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা।

কিন্তু আভিধানিক দৃষ্টিতে তা এ থেকে অধিক ব্যাপক অর্থবোধক। আর তা হচ্ছে, সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা আল্লাহ্র পথে নিয়োগ করা—জান-প্রাণ দিয়ে, ধন-মাল দিয়ে এবং মুখের (ভাষা ও সাহিত্য) শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা চালানো।

**ইমাম মালিকের মতের লোকেরা বলেছেন ঃ**

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্র কলেমার প্রচার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ জাতি ছাড়া আর সব কাফিরের সাথে যুদ্ধ করা।

**শাফেয়ী পন্ডিগণের কথা হচ্ছে ঃ**

দীন-ইসলামের সাহায্যকল্পে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা।
নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকেও ইসলামে জিহাদ বলা হয়।

**ইমাম বাজুরী বলেছেন ঃ**

জিহাদ অর্থ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা। তা مجاهدة থেকে গৃহীত। আর তার অর্থ, দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে (পারস্পরিক) যুদ্ধ করা। এটি হচ্ছে ছোট জিহাদ। আর 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ হচ্ছে নফসের সাথে মুজাহিদা করা।

এই কারণে নবী করীম (স.) যখন কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন বলতেন ঃ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ -

আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম।[১]

---

১. المرقاة شرح المشكواة ص ٣٦٣ باكستاني - فلسفة الجهاد في الاسلام ص ٣٦ - ٣٥

www.pathagar.com

ইসলামী ফিকাহ্‌বিদদের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে জিহাদের সাধারণ অর্থ ও তাৎপর্য। এ থেকে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, শত্রুর দিকথেকে প্রয়োজন দেখা দেয়ার পর ইসলামের সাহায্যার্থে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

আসল কথা, প্রথমত সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ ও শান্তিপূর্ণ যাবতীয় উপায়-পন্থায় প্রতিরোধ ও মুকাবিলা করাই হচ্ছে জিহাদ।

তারপর রাষ্ট্র সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন দেখা দিলে যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ। সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বাস্তবায়নের প্রয়োজন এর মধ্যেই গণ্য। এই লক্ষ্যে যত চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করা হবে, তা সবই আল্লাহ্‌র পথে গণ্য হবে। সব-ই হবে কেবল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার মানসে। তাতে মুসলমানদের কোন বৈষয়িক বা বস্তুগত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-বাসনা-লোভ চরিতার্থ করার কিংবা দুনিয়ার স্বাধীন মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে বন্দী করা, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বের জাতিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার ইত্যাদির একবিন্দু সংস্পর্শও থাকবে না। তা হলে প্রকৃত পক্ষে ন্যায়বাদী সুবিচারকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আশা-আকাঙক্ষা পূরণ ও অধিকার আদায়ের পথ অবাধ ও উম্মুক্ত করা এবং জনগণের স্বাভাবিক স্বাধীনতা, আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ ও রক্ষার নিরংকুশ আজাদী ও তাকে সর্বপ্রকারের প্রতিবদ্ধকতামুক্তকরণ, যালিম প্রশাসকের প্রতিপত্তি থেকে নিষ্কৃতিদান ছাড়া জিহাদের অপর কোন লক্ষ্যই হতে পারে না।[১]

জিহাদের এই অর্থ ও তাৎপর্য একদিকে। আর অপর দিকে রয়েছে, জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে একটা উপায়রূপে গ্রহণ করা। যুদ্ধ করে জনগণ কে ঠেকিয়ে ফেলে তাদের মন ও জীবনের উপর কোন ধর্মকে চাপিয়ে দেয়া—এই দুইটিকে কোনক্রমেই এক ও অভিন্ন মনে করা যায় না। কেননা বিবেক-বুদ্ধির প্রশস্ততা তা মেনে নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে, অন্তর ও মন যে আকীদা গ্রহণে প্রস্তুত নয়, যার সাথে স্বাভাবিক মনের কোন মিল বা সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য নেই, কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়াই হৃদয়-মন যা গ্রহণ করে নিতে রাজী বা আগ্রহী হয় না, তা জোর করে কখনই

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٦ - ٣٥

www.pathagar.com

চাপিয়ে দেয়া যায় না। আর চাপিয়ে দিলেও তা কখনই স্থায়ী হয় না। এ অতীব স্বভাবসম্মত কথা।

কিন্তু যুদ্ধ! আন্তর্জাতিক আইন বিশারদদের নিকট তার একটা গতানুগতিক সংজ্ঞা রয়েছে। তা হচ্ছে, দুইটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের দুইটি পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষকেই যুদ্ধ বলা হয়। এর লক্ষ্য হয় যুদ্ধমান রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও কল্যাণ সংরক্ষণ।[১]

অতএব 'যুদ্ধ' কেবলমাত্র একাধিক রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে একই রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যেও অনেক সময় সশস্ত্র সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোন জনসমষ্টি অনেক সময় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু তাকে যুদ্ধ বলা হবে না। সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে তার কোন উল্লেখও পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্যাপার রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ আইন-বিধানের আওতাভুক্ত এবং তা স্থানীয়ভাবেই রচিত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে কোন রাষ্ট্রের অধীন কোন অঞ্চল, জিলা বা প্রদেশ বিদ্রোহী হয়ে দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, অথবা ফেডারেল সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন প্রাদেশিক সরকার বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন জনসমষ্টি যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তা হলে তাও যুদ্ধ বিবেচিত হবে না।

**পর্যালোচনা**

লক্ষ্যণীয় যে, উপরে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধের যে সংজ্ঞার উল্লেখ করেছি, বর্তমানে তা একটা গতানুগতিক সংজ্ঞায়ই পরিণত হয়ে রয়েছে। যুদ্ধের আধুনিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপকতা প্রবণ। এক্ষণে যে কোন সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষকেই যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হচ্ছে। যদিও তাতে উক্ত সংজ্ঞার সবকয়টি উপকরণ উপস্থিত থাকে না। আন্ত-র্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রাষ্ট্রের আওতায় আসে না এমন সব দল বা জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষকেও আজ-কাল যুদ্ধ বলা হচ্ছে এবং তার উপর যুদ্ধের আইন-কানুন প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন ১৯৪৮ সনে ফিলিস্তিনে আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ইয়াহুদী

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٨

www.pathagar.com

গোষ্ঠীসমূহের পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল. তাকেও যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও আরব রাষ্ট্রসমূহ ইসরাঈলকে একটি রাষ্ট্ররূপে তখনও স্বীকৃতি দেয়নি।

বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্র সংঘ কোন সামষ্টিক লক্ষ্যে যে যুদ্ধ করে, কোন রাষ্ট্রের নামে নয় এবং কোন বিশেষ রাষ্ট্রের জন্যও নয়, তার উপরও যুদ্ধের নিয়ম-কানুনসমূহের প্রয়োগ করা হয়ে যাকে।

সত্য কথা হচ্ছে, যুদ্ধের তাৎপর্যে এবং তার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সেই প্রথম হিসাবটাই অব্যাহতভাবে চলে এসেছে।

অতএব যুদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যাপার। আর আজকের দিনে যুদ্ধের সংজ্ঞা এরূপ দেয়া যেতে পারে যে, 'শান্তি রক্ষার সমস্ত উপায় ও পন্থার ব্যর্থতার পর রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিরোধ দূর করা ও জবরদস্তি-মূলক পন্থায় তার সমাধান করাই হচ্ছে যুদ্ধ।'

আন্তর্জাতিক বিরোধ ও বিবাদ-বিসম্বাদ রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত ; বরং তা সেই অবস্থারই ফলশ্রুতি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই স্বীয় জাতীয় সামষ্টিক ও অর্থ-নৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়ন রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি ঝগড়া ও বিবাদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী ও সর্বোচ্চ ফয়সালাকারীরূপে নিজেকেই গণ্য করে, এমনকি সে ঝগড়া ও বিবাদের কারণটা তার দ্বারা সৃষ্ট হলেও। যুদ্ধের তাৎপর্যে এটা একটা আধুনিক প্রবণতা !

এসব কারণে আমরা মনে করি, যুদ্ধের কোন একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রচনা ও উপস্থাপন খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। একালের যুদ্ধের অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট মনে হয়, প্রচলিত নিয়ম-কানুনের সাথে তার সামঞ্জস্য রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## শরীয়তবিদ ও আন্তর্জাতিক আইনবিদদের অভিমত

ইসলামী শরীয়তবিদ ও আন্তর্জাতিক আইনবিদদের উপস্থাপিত জিহাদ ও যুদ্ধের সংজ্ঞাদ্বয় এ ব্যাপারে অভিন্ন যে. উভয় সংজ্ঞাতেই জিহাদ ও যুদ্ধকে সাধারণ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তার

www.pathagar.com

জন্য বিশেষ আইন রয়েছে এবং তা বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তা দুইটি বা ততোধিক সশস্ত্র শক্তির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার দরুণ সংঘটিত হয়ে থাকে।

তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিগণিত হয়। আইনবিদদের মতে যুদ্ধ নিতান্ত বস্তুগত উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়। কোন রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তার যে কল্যাণকর কার্যসূচী ঘোষণা করে, তারই কারণে যুদ্ধ সূচিত হয়ে থাকে। নিজ ইচ্ছামত যে নিজস্ব সুবিধা অর্জন লক্ষ্যে পরিণত হয়, তা উদ্ধার করাই হয় তার উদ্দেশ্য। এছাড়া আধিপত্য ও কর্তৃত্ব লাভ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ-উৎস দখল করে নেয়ার ইচ্ছা এই যুদ্ধের মূলে প্রবল হয়ে থাকে।

জনৈক আইনবিদের কথা হচ্ছে, যুদ্ধ একটি কঠোর ও নির্মম পন্থা। রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার লক্ষ্যে এই যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে। অথবা কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা, কোন রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা হিসেবে এই পন্থাটি অবলম্বিত হয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যটি প্রকট না হলে নিছক শক্তি প্রয়োগকে যুদ্ধ বলা যায় না।

ইসলামের জিহাদ শত্রুর সাথে পারস্পরিক সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। মুসলিম সমাজ সংরক্ষণ কিংবা বিদ্রোহ দমন তার উদ্ভাবক। অথবা ইসলামী দাওয়াতী কার্য ও ইসলামী জীবন ধারা পরিচালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় যে-সব শাসক-প্রশাসক, তাদের যুলুম-নির্যাতন এবং দীনের পথে আরোপিত প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এই জিহাদ পরিচালিত হয়ে থাকে। কেননা উক্তরূপ অবস্থা দীন-ইসলামের দৃষ্টিতে ফিত্না। আর ফিত্না বলতে বোঝায় এমন একটা সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, যেখানে মুসলমান পূর্ণাংগভাবে ইসলামী জীবন যাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। যেখানে ন্যায় বিচার, সামষ্টিক কল্যাণ ও মান-মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। ইসলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার দিকে ইংগিত করে। কেননা প্রকৃত পক্ষে দীন-ইসলাম হচ্ছে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য বিরাট মহান কল্যাণের প্রতিষ্ঠাতা। তার পথে কোন বাধাকেই বাধারূপে বরদাশ্‌ত করা যেতে পারে না।

www.pathagar.com

এ আলোচনার সার কথা হচ্ছে, প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধের তাৎপর্যে ক্রমবিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইসলামের জিহাদ তার শরীয়তসম্মত সংগঠনে একটা বিশেষ কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী হয়ে বসেছে। কেননা আইন ও দীন অভিন্ন। আইনও দীনী লক্ষ্য অর্জনের পন্থা নির্ধারণ করে। আর দীনও গণ-সম্মতি গ্রহণের সাহায্যে আইনকে সমর্থন দেয়। কিন্তু যুদ্ধ আজকের দিনে যে বিবর্তিত সংজ্ঞা ও রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তাতে এমন নির্মম-নিষ্করুণ, লোমহর্ষক, অ-মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে—যার বর্ণনা দেয়াও সম্ভবপর নয়, যদিও তা বাহ্যত শত্রুর প্রবর্তিত বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই করা হয়। ইসলাম তার সাথে আদৌ পরিচিত নয়।[১]

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়া রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত আজকের রাষ্ট্র সংস্থা—জাতিসংঘ—একটা অভিনব সংগঠন! ইসলামী যুগে এই ধরনের সংঘ বা সংগঠনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামী ফিকাহ্‌বিদদের প্রদত্ত জিহাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যুদ্ধ একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া জরুরী নয়; আইনবিদরা যেমন মনে করেন। ইসলামী খিলাফতী রাষ্ট্র এবং মুসাইলামাতুল কায্‌যাব, তুলাইহা আল-আসাদী, আসওয়াদ আল-আনসী ও হারিস ইবনে আফ্‌ফানের কন্যা সাজাহ্‌র মধ্যে যে-সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল —আমি বলব, এ সব যুদ্ধকে যুদ্ধের আধুনিক তাৎপর্যানুযায়ী আভ্যন্তরীণ (Domestic) যুদ্ধও যেমন বলা যায় না, তেমনি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নামেও অভিহিত করা যায় না।

অথচ এ কথা স্পষ্ট যে, এখানে এমন এমন যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়, যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের তাৎপর্য অনুযায়ী আভ্যন্তরীন যুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবীয়া ইবনে আবু-সুফিয়ান (রাঃ)-এর মধ্যে খিলাফত নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা এই পর্যায়েরই যুদ্ধ বলতে হবে। ইসলামের ফিকাহবিদদের নিকট তা 'বিদ্রোহী দমনের যুদ্ধ' অভিধায় পরিচিত। মুর্তাদ হয়ে যাওয়া গাত্‌ফান ও বনু সুলাইম প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুদ্ধও অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٩ - ٣٨

www.pathagar.com

যুদ্ধ নামে অভিহিত হতে পারে। কেননা এ সব আরব গোত্র মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল, 'এটা একটা ট্যাক্স ছাড়া কিছু নয় এবং এটা কুরাইশদের জন্য একটা অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতীক। অতএব আমরা তা কখনই দেব না।' তাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করা হয়, তা মদীনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অনুগত বানানোর লক্ষ্যে যতটা না-পরিচালিত হয়েছিল, তার তুলনায় অধিক পরিচালিত হয়েছিল দীন-ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে, সমগ্র আরবের উপর দীনী রাজনীতির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দীনী বিধানের অবাধ্যতার প্রবণতা নস্যাৎ করার লক্ষ্যে।

এই কারণে ইসলামের সব ফিকাহ্ পারদর্শী ইমাম এবং ইমামীয়া, যায়দীয়া, আবাজীয়া ও যাহিরীয়া প্রভৃতি শীয়া সম্প্রদায় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যে মুসলিম মুর্তাদ—ইসলাম ত্যাগকারী হয়ে যাবে, তাকে প্রথমে তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাতে হবে এবং তা গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। এই হত্যা করা সর্ব সাধারণ ইসলামবিদদের মতে ওয়াজিব। রসূলে করীম (স.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ—'যে মুসলিম তার দীন বদলিয়েছে—ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে হত্যাকর।'

আর কোন অঞ্চল বা দেশের জনগণ মুর্তাদ হয়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে একবিন্দু দ্বিমত দেখা দেয়নি। রসূলে করীম (স.)-এর স্পষ্ট ঘোষণা থেকে এ কথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

এক কথায় বলা যায়, জিহাদ ও যুদ্ধ কোন দিকদিয়েই এক ও অভিন্ন নয়। পূর্ববর্তী তুলনামূলক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই দুইটির সাথে পারস্পরিক কোন মিল বা সাদৃশ্য নেই। এ দুইটি শব্দ সর্বতোভাবে এক নয়। শরীয়তী ও আইনগত পরিভাষার দিকদিয়েই এ কথা বলা হচ্ছে, যদিও ব্যবহারিক অর্থে দু'টির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য করা হয় না।

### এক অপরিহার্য দুষ্কৃতি

সন্দেহ নেই, যুদ্ধ একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বীভৎস কর্মকাণ্ড। তাতে যেমন নির্মমভাবে নিরীহ জনগণকে হত্যা ও ব্যাপকভাবে রক্তপাত

www.pathagar.com

করা হয়, তেমনি শহর-নগর ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যাবতীয় পাদপীঠ ও মহামূল্য নিদর্শনাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ, ধ্বংস ও বিলুপ্তি সাধিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ স্বীকার করেছেন যে, মানবীয় সমাজ সমষ্টির এটা একটা চিরন্তন ধারা ও রীতিও বটে। সৃষ্টি-লোকের জীবন্ত সত্তাসমূহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকার যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অব্যাহতভাবে কার্যকর হয়ে আছে, যুদ্ধ তার একটা সার্থক বাহ্য-প্রকাশ। মানব সমাজে তা এক শাশ্বত সত্য হয়েই চলে এসেছে অনাদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। মানবেতিহাসের কোন একটি মুহূর্তও যুদ্ধশূন্য অবস্থায় অতিবাহিত হয়নি। মানবেতিহাসের কোন একটি পৃষ্ঠা, একটি পংক্তিও তা থেকে মুক্ত বা রিক্ত নয়। আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদেও এই সত্যের স্বপক্ষে শাশ্বত ঘোষণা বিধৃত। আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ...

মানুষকে তাদের পরস্পরের দ্বারা দমন করার আল্লাহ্‌র চালু করা স্থায়ী রীতি সদা কার্যকর না থাকলে পৃথিবী চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত --- —সূরা বাকারা ঃ ২৫১

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا...

লোকদেরকে পরস্পরের দ্বারা দমন রাখা আল্লাহ্‌র চালু করা স্থায়ী নিয়ম যদি সদা কার্যকর না থাকত, তা হলে খানকাহ, গীর্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহ্‌র খুব বেশী বেশী যিক্‌র করা হয়---চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হত।[১] —সূরা হজ্জ ঃ ৪০

১. صوامع বহুবচনের শব্দ, একবচনে صومعه বলা হয় পাদ্রী-পুরোহিত-সন্ন্যাসী-দুনিয়া-ত্যাগী লোকদের থাকার স্থানকে। بيع একবচন بيعه বলা হয় খৃস্টানদের ইবাদতের স্থানকে। আর صلوات বলতে বুঝায় ইয়াহূদীদের নামায পড়ার স্থানকে। সম্ভবত ইংরেজী ভাষায় salute ও salutation এ থেকেই এসেছে। الجهاد طريق النصر ص ١٩ - تفهيم القرآن لعلامة المودودى المرحوم

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটির তাফসীর প্রসংগে লিখেছেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা যদি মানুষের পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা দমন করাতে না থাকতেন, তা হলে মানুষের জীবন পুতিগন্ধময় ও আবর্জনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তাদের বাহ্যিক লক্ষ্য, স্বার্থ ও ঝোঁক প্রবণতা পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই কারণে তারা আলস্য ও কর্মহীনতা ভংগ করে তাদের মধ্যে নিহিত কর্মক্ষমতাকে সদা সক্রিয় রাখতে বাধ্য হয়। তারা সবসময় জাগ্রত ও কর্মনিরত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে তারা দুনিয়ার সম্পদ আহরণে মগ্ন রাখে। আর শেষ পর্যন্ত গোটা মানুষের সামষ্টিক কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। এভাবে কল্যাণের ধারক ও হিদায়াতপ্রাপ্ত একটি জনসমষ্টি গড়ে উঠে। তারা আল্লাহ্‌র বলে দেয়া সত্যকে জানতে ও চিনতে পারে, তার নির্দেশিত পথের সন্ধানও তারা পেয়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, বাতিলের প্রতিরোধ ও দমন এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পিত। আর এই মহান দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ না করলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। সেজন্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পন্থা তাদের অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।'[১]

এই কথাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন এ আয়াতটিতে ঃ

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ...

তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে স্থিতি গ্রহণের স্থান এবং একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ... ... ...

—আল-আ'রাফ-২৪

ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

জেনে রাখবে, মানব সমাজে প্রথম মানব সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ, সংঘর্ষ—পারস্পরিক যুদ্ধ ও রক্তপাত প্রচণ্ডভাবে কার্যকর হয়ে

১. في ظلال القرآن ج ١ ص ٢٣٢ - ٢٣٣

www.pathagar.com

আছে। তার মূল কারণ হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা, একদল অপর দলের উপর দিয়ে প্রতিশোধের আক্রোশ চরিতার্থ করতে সদা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাবধারাসম্পন্ন প্রতিটি পক্ষ স্বীয় স্বাভাবিক ভাবধারার ধারক হয়ে থাকে। দুইটি শক্তি যখন পারস্পরিক সম্মুখবর্তী হয়, তখন একটা প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহার বশবর্তী হয়েই হামলা চালায়। আর অপর পক্ষ প্রতিরক্ষামূলক ভাবধারা গ্রহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তখনই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মোটকথা, যুদ্ধ মানব সমাজে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কোন জাতি বা গোত্র তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। যুদ্ধের প্রথম উদ্বোধক যে প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা, মূলত তা চার ধরনের যেমন ; আত্মমর্যাদা চেতনা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা, শত্রুতার আক্রোশ, আল্লাহ্র জন্য ও তাঁর দীনের প্রতিরক্ষামূলক উত্তেজনা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এবং দেশীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রতি-পত্তি কর্তৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে আক্রোশ প্রচণ্ড হয়ে ওঠা।[১]

মনস্তত্ত্ববিদদের ঘোষণাও উপরিউক্ত অভিমতকে সমর্থন জানায়। তাদের মতে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের প্রবণতা তীব্রভাবে বর্তমান। তার বাহ্যিক আচরণও তারই অনুকূল হয়ে থাকে। ফলে সামষ্টিক জীবনে সামষ্টিক বিবাদ ও বিসম্বাদের রূপে আত্মপ্রকাশ করে এজন্য যে, এই সামষ্টিক জীবনে কোনরূপ সহযোগিতা-সহমর্মিতার অস্তিত্ব ছিল না ; অতঃপর যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়।

আত্মপ্রেম ও অহংজ্ঞান—আমিত্ববোধের তীব্রতা মানব মনের গভীর গহনে শিকড় গেড়ে আছে। সমাজ ক্ষেত্রে কল্যাণ ও মংগল চিন্তার দ্বন্দ্বের কারণে তা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ কারণে একটি সামষ্টিক আইন-বিধানের প্রয়োজন। তা এই কল্যাণ-চিন্তাকে সুসংগঠিত করবে এবং অপমান ও সীমালংঘন থেকে তাকে রক্ষা করবে। --- এই কারণেই দুনিয়ায় আইন-বিধান-শাসনতন্ত্র এবং যুদ্ধ-আইন প্রণয়নের প্রচলন সূচিত হয়েছে সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই।

যুদ্ধসংক্রান্ত চিন্তায় দার্শনিকগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

এক ভাগের দার্শনিকদের মত হচ্ছে, যুদ্ধ অপরিহার্য প্রয়োজন, তা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। আর অপর ভাগের দার্শনিকগণ

---

১. مقدمة ابن خلدون اردو ص ٢٧٧

www.pathagar.com

যুদ্ধকে মানুষের চরম পাগলামি বা মানবীয় পাগলামির মারাত্মক আঘাত বলে অভিহিত করেছেন। তা মানুষকে পশুর স্তরে অবনত করে।-- আর খৃস্টানদের মতে, মানুষ ও ধর্ম যে ন্যায় পরায়ণ শরীয়তী বিচারাদি নিয়ে শান্তি লাভ করতে পারে, যুদ্ধ সেই পর্যায়েরই জিনিস।

আর সত্য কথা হচ্ছে, যুদ্ধ মনুষ্যত্বের সাথে জড়িত, অবিচ্ছিন্ন ব্যাপার। তার সূচনাকাল থেকেই তা চলে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর অনেক সময় সত্যকে রক্ষা করার জন্য তা একমাত্র উপায় ও পন্থা হয়ে দেখা দেয়। সাহায্য প্রার্থনাকারী বিপদগ্রস্থ লোকদের উদ্ধার করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে যুদ্ধ নিরুপায়ের উপায়ে পরিণত হয়ে থাকে। কেননা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার সম্মুখে কোন জিনিসই স্থায়ীভাবে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

## সামষ্টিক প্রকাশমানতা

কিন্তু উপরিউক্ত বিশ্লেষণসমূহ দেখেও এ কথা বলা যায় যে, যুদ্ধ যে মানব-প্রকৃতি-নিহিত একটি স্বভাবগত ব্যাপার, উপরিউক্ত কোন কথাই তার অকাট্য দলীল নয়। আসলে তা সামষ্টিক জীবনের আরও হাজারও প্রকাশমানতার মতই একটি প্রকাশমানতা ( Phenomenon ) মাত্র। এর উপর প্রতিবন্ধক দাঁড় করানো অসম্ভব কিছু নয়।

কুরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এই প্রকাশমানতারই স্বীকৃতি মাত্র। তা সংঘটিত হতেই হবে, এমন চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কোন কথা নয়। কেননা যুদ্ধ-সংঘর্ষ যদি মানুষের জন্মগত ও স্বভাব-নিহিত কোন ব্যাপার হতো, তা হলে মানব মনে শুভ ও কল্যাণের বীজ বপন ও সেখান থেকে কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতির ভাবধারার মূলোৎপাটন লক্ষ্যে নবী-রসূলগণের আগমন হতো না এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেত না।

আর এ কথা সর্বজন জ্ঞাত ও পরিচিত যে, মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিধান নিয়ে আল্লাহ্‌র শরীয়ত অবতীর্ণ হয়নি। তবে মানব মনে দুষ্কৃতি ও রক্তপাতের ভাবধারার অবস্থিতি সম্পর্কে মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌দের অভিমত তাকে সংশোধন, বিশুদ্ধকরণ ও কল্যাণমুখী বানানোর



www.pathagar.com

চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুমাত্র নিরাশ করছে না। কেননা প্রকৃতিগত আচার-আচরণ বাহ্যিক অবস্থানগত ভূমিকা ও সামষ্টিক পরিবেশগত অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। একালের আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণও তাই মনে করেন। তাঁরা বলেন, 'যুদ্ধ একটি প্রাচীনতম সামষ্টিক প্রকাশমানতা, তা রাজনৈতিক সমাজ-সংস্থার স্থিতি ও প্রতিষ্ঠার সাথে ওতোপ্রোত জড়িত। বিশ্ব তার কার্য-কারণসমূহের মূলোৎপাটন করতে পারেনি. আজ পর্যন্ত তার ফলাফল থেকেও বাঁচতে সক্ষম হয়নি। যদিও এই পর্যায়ে ব্যাপক চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন অন্ত নেই।'

এই কারণে ইসলামের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ

যুদ্ধ মূলত একটা অত্যন্ত বীভৎস ব্যাপার। কেননা নরহত্যা, ধ্বংস ও ব্যাপক বিপর্যয় তার অনিবার্য ফলশ্রুতি। কিন্তু সত্যের পথের জিহাদ অন্য কারণে উত্তম। সে কারণ হল আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, দীনী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং ফিত্‌না—ইসলামী জীবন যাপনে অক্ষমতাজনিত বিপর্যস্ত অবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উৎপাটন সাধন।[১] আল্লাহ্ তায়ালাও তাই ঘোষণা করেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ٥

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥

যুদ্ধ করা তোমাদের প্রতি ফরয করে দেয়া হয়েছে, যদিও তা স্বভাবতই তোমাদের নিকট ঘৃণ্য ও কষ্টসাধ্য। আর অসম্ভব নয় যে, তোমরা স্বাভাবিকভাবে কোন জিনিসকে অপসন্দ করবে ; কিন্তু তা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য কল্যাণময় এবং এটাও সম্ভব যে, কোন জিনিস তোমরা পসন্দ করবে ; কিন্তু পরিণতির দিকদিয়ে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আসলে প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌ই জানেন, তোমরা জানো না। —সূরা বাকারা ঃ ২১৬

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٦

www.pathagar.com

অর্থাৎ মানুষ কোন জিনিসকে খারাপ মনে করলে প্রকৃতপক্ষেও তা খারাপই হবে এবং কোন জিনিসকে ভালো ও মংগলময় মনে করলেই তা আসলেও মংগলময় হয়ে যাবে, এমন কথা যুক্তিযুক্ত ও চূড়ান্ত নয়; বরং তার বিপরীতটা হওয়াই সম্ভব। কেননা মানুষের দৃষ্টি-চিন্তা-বিবেচনা প্রচ্ছন্ন মহাসত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তার কার্যক্রম বাহ্যিকতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই এই স্বাভাবিক পসন্দ-অপসন্দের ঊর্ধ্বে থেকে কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী স্বীয় কার্যধারা পরিচালনা করা মানুষের কর্তব্য। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য প্রকৃত পক্ষে ও পরিণতির দিকদিয়ে শুভ কাজেরই আদেশ করেন, অশুভ ও অকল্যাণকর কাজের বিধান প্রয়োগ করেন না। কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই নির্দেশও এই পর্যায়েরই বিধান।[১]

বস্তুত 'শক্তি' মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান। অতীতে তা মানুষকে অশেষ কল্যাণ দিয়েছে, বহু সামষ্টিক সমস্যার সমাধান করেছে। অত্যাচারী নিপীড়ক শক্তি যখন সীমালংঘন করেছে, নিরীহ মানবতার জীবনে এনে দিয়েছে দুঃখ-দুর্দশার সর্বপ্লাবী বন্যা, দীন-ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনকে সর্বশক্তি দিয়ে অংকুরেই বিনষ্ট করতে ও তার ধারক-বাহকদের নির্মূল করতে উদ্যত হয়েছে, তখন এই শক্তিই পরম আশ্রয় ও অবলম্বন হয়ে দেখা দিয়েছে। তা প্রয়োগ করেই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা হয়েছে নিরুপায়ের উপায় হিসেবে। দীনের অবরুদ্ধ পথ উন্মুক্ত ও নিষ্কণ্টক করা হয়েছে। ইসলামে যুদ্ধের মৌল কথা এ থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।

কিন্তু তাই বলে মিথ্যা দাবীকারীদের এ মন্তব্য আদৌ সত্য নয় যে, মানুষের মন-মগজের উপর বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার জন্যই বুঝি ইসলাম অস্ত্র ধারণ করেছে এবং শক্তি প্রয়োগ করেছে। না, তাদের এই দাবী বা উক্তি কিছুমাত্র সত্য নয়। দীনের রচয়িতা মহান আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ--'ইসলাম ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।'[২] অর্থাৎ দীন-ইসলাম গ্রহণ করা--তার প্রতি ঈমান আনার জন্য কোন লোকের উপরই শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না, ও কাউকে ঠেকায় ফেলে সেজন্য বাধ্য করা হবে না।—আলবাকারা ২৫৬

১. تفسير المروغى ج ٢ ص ١٣٥ و تفسيرابو السعود ج ا
২. সূরা বাকারাঃ ২৫৬

www.pathagar.com

অঞ্চলের পর অঞ্চল, রাজ্যের পর রাজ্য বিজয়, সাম্রাজ্য বিস্তার ও গনীমতের মাল লুণ্ঠনের লক্ষ্যেই মুসলিমগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, এইরূপ কথা নিতান্ত প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের স্বর্ণ যুগে মুসলমানরা কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থে কখনই প্রলুব্ধ হয়নি। আল্লাহ্‌র এই সবকই ছিল তাদের একমাত্র প্রেরণা ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا

فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

এই পরকালীন ঘর তাদের জন্যই নির্দিষ্ট আছে, যারা দুনিয়ায় বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের লোভে পরিচালিত নয়, যারা বিপর্যয়েরও পক্ষপাতী নয়।

—সূরা কাসাস ঃ ৮৩

বস্তুত নবী করীম (স.)-এর দাওয়াত ও নেতৃত্বে গড়ে উঠা মুসলমানগণ ছিলেন তাক্‌ওয়ার মূর্ত প্রতীক। তাঁরা কখনই ফিরাউনের ন্যায় নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যার ফলে দুনিয়ায় ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। যারা দুনিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছে, মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত।

## যুদ্ধের প্রভুরা

এমনটাই হয়েছে চিরকাল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন বহু কাফেলা, বহু মিছিল চলে গেছে, যারা বল্লম ও তরবারি নির্মাণ করেছে, যুদ্ধ ও অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে জনতার কাতার সুসজ্জিত করেছে। যুদ্ধ ও সংঘর্ষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। প্রত্যেকটি জাতি বা জনসমষ্টি-রই তরবারি শূন্যে চকমক করে উঠেছে, প্রতিটি জনগোষ্ঠী তাদের বল্লম আকাশের কলিজার উপর বিদ্ধ করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রীক ও রোমানরা রক্তের পিপাসুদের প্রতিনিধিরূপে। অন্ধ জাতিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষাত্মক আত্মচেতনার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে।

www.pathagar.com

গ্রীকরা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট জাতি হওয়ার দাবী নিয়ে এসেছিল। সব সম্পদ-সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হওয়ার, সকলের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটানোর এবং বিশ্বের উপর নিরংকুশ শাসক হয়ে বসার একচেটিয়া অধিকারী হওয়ার আহমিকায় তাদের বক্ষদেশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথোনিয়া ও স্পার্টার প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও সর্বাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এটাই ছিল মূলীভূত কারণ। এসব অভ্যান্তরীন যুদ্ধের দাবানলে কয়েক লক্ষ গ্রীকের জীবন নির্মমভাবে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। গ্রীকরা যখন সমকালীন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কবি হোমীরোম অগ্নুদ্দীপক কবিতা পাঠ করে তাদের উত্তেজনা চরম মাত্রায় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ইল্‌ইয়াতা ও উদীস্তা তথায় রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছে। এগুলো ছিল ফিলিপ ও তার পুত্র আলেকজাণ্ডার সৃষ্ট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এক সময় তিনি গোটা পৃথিবীকে স্বীয় কর্তৃত্বের অধীন বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রীকদের নিকট যুদ্ধ চিরকাল নিরতিশয় আকর্ষণীয়, বীরত্ব প্রকাশ ক্ষেত্র ও লোভনীয়, পূজনীয় ছিল। এই কারণে তারা 'জাবুস' যুদ্ধ দেবতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছিল। তার চতুর্দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদক্ষিণ করত, তার হজ্জ করত, তার চারিপার্শ্ব স্পর্শ করে মুখমণ্ডলে লেপণ করত ঠিক ভক্ত পূজারীদের মতই।

যুদ্ধের ব্যাপারটি গ্রীকদের নিকট যতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূজার ব্যাপার ছিল, রোমানদের নিকট তার তুলনায় তা কিছুমাত্র কম ছিল না। তার রকম, প্রকার, তার কার্যকারণ ও উদ্বোধক-উত্তেজনা ছিল উভয়ের নিকট অভিন্ন।

যুদ্ধের সাথে রোমানদের ছিল দীর্ঘকালের গভীর সম্পর্ক। এই যুদ্ধের সাহায্যে গোটা বিশ্বের উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার রাজনীতি চালু করেছিল তারা। এই উপায়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল তারা বহু অঞ্চল ও বহু রাজ্য। সেই প্রাচীন সভ্য জগতের উপর রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল শক্তি ও তরবারির জোরে। এই সম্প্রসারণবাদী নীতিতে তাদের সাম্রাজ্য বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। উত্তরে তা ইউরোপ পর্যন্ত এবং পূর্বাঞ্চলের সব শহর, নগর, দেশ সে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা যেমন যুদ্ধদেবতা 'জাবুস'-এর নিকট আত্মসমর্পিত হয়েছিল, অনুরূপভাবে

www.pathagar.com

রোমানরা তাদের যুদ্ধ দেবতা 'মারিস'-এর সমীপে আত্মাহুতি দিয়েছিল। মানুষের দেহ ও মাথার খুলি পুড়িয়ে তারা দেবতার জন্য ধুম্রের অর্ঘ রচনা করেছিল। প্রাচীন মিসরীয়রাও এক্ষেত্রে কিছুমাত্র কম যায়নি। তারা তাদের 'হু-রস' দেবতার প্রতিও অনুরূপ আচরণ অবলম্বন করেছিল। এই 'হু-রস' ছিল 'আউজুরীস' দেবতার পুত্র। কালের অব্যাহত স্রোত-ধারায় গতিশীল ইতিহাসের পাতায় পাওয়া এ রকম বহু জাতি ও রক্ত-পিপাসু মানবগোষ্ঠীর মানুষের রক্তে হোলী খেলার রঙ্গীন ইতিকথা রক্তের আখরে লিখিত পাওয়া যায়। আজকের দিনেও আমরা চতুর্দিকে মানুষের রক্তের পিপাসায় লেলিহান জিহ্বাকে লক্লক করতে এবং মানবতাকে সর্বশক্তি দিকে চেটে নিতে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, বহু জাতি ও জনগোষ্ঠীর ব্যাদান করা মুখ গহ্বর মানুষের লাল উত্তপ্ত লোহিতে ভরপুর হয়ে আছে। অতীতের দিনগুলোর মতই আজকের দিনেও নিরীহ মানুষের জীবন-সম্ভ্রম-সম্পদ এবং সভ্যতার পাদপীঠ, মানবীয় সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ যুদ্ধের মারাত্মক আঘাতে চরমভাবে বিপর্যস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানবতার মুক্তি আজও সুদূর পরাহতই মনে হচ্ছে।[১]

হ্যাঁ, সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্র ইচ্ছা (প্রাকৃতিক আইন) সদা সক্রিয় হয়ে আছে; তিনিই তো আহ্কামুল হাকিমীন।

## আদিকাল থেকে যুদ্ধ

আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীবন্ত সত্তাসমূহ জীবনের নানাদিকে ও ক্ষেত্রে যুদ্ধে ও সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে বাঁচার সংগ্রাম ও যোগ্যতমের স্থিতির স্বভাবগত তাকীদকে চরিতার্থ করে তুলছে।

বস্তুত যেদিন থেকে হযরত আদম (আ.) পৃথিবীর বুকে উত্তরিত হয়েছেন ও বসবাস শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই অব্যাহত ধারায় ও গতিতে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনাবলী উপর্যুপরি সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন, এ যুদ্ধ অনিবার্য, এ রক্তপাত অব্যাহত। দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ মানব-সভ্যতার এক শাশ্বত সত্য হয়ে আমাদের মাথার উপর নগ্ন-তরবারির মত ঝুলছে। এ থেকে মুক্তি নেই, নিষ্কৃতি সুকঠিন।

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٣

www.pathagar.com

ইতিহাসে এমন উম্মত বা জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া ভার, যারা প্রতিবেশী শক্তির সাথে কোন না-কোনভাবে ও রূপে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি—তা যে-কোন কারণেই হোক। অতএব যুদ্ধের ইতিহাস যে অনেক আদিম, অনেক প্রাচীন, মানবতার প্রথম সূচনাকাল থেকেই তা মানব সমাজে চালু ও সুপরিচিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মানুষের আদি পিতা, পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ—হযরত আদমের দুই পুত্র সন্তান হাবীল ও কাবীলের মধ্যে সর্বপ্রথম এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে দেখতে পাওয়া যায়। কাবীল ছিল হত্যাকারী, আর হাবীল তারই হস্তে হয়েছিল নিহত। সেইদিন থেকে দুনিয়ায় নরহত্যার ধারা অব্যাহত-ভাবে চলতে থাকে। তা যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে দুইটি বংশ, দুইটি কবীলা বা গোত্র, দুইটি দেশের বাসিন্দা, দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক বা দুইটি রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে। কোন এক মুহূর্তেও তার একবিন্দু বিরতি ঘটেছে, এমন সোনালী মুহূর্তের উল্লেখ পাওয়া যায়নি ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে।

এ সব যুদ্ধে বিভিন্ন সময় যেমন বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ও যন্ত্রপাতি। প্রাচীনকালে যানবাহন হিসেবে অশ্বের ব্যবহার হয়েছে ব্যাপকভাবে। প্রত্যেক সৈনিকের জন্য রণ-সজ্জায় সুসজ্জিত এক-একটি অশ্ব পরিবেশিত হতো। ভারতীয়রা হাতী ও অন্যান্য বিচরণশীল জন্তু ব্যবহারে খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রাচীন আমলের দেশ, রাজ্য ও সাম্রাজ্যে এমনিভাবেই যুদ্ধের দাবানল জ্বলেছে এবং জ্বালিয়ে ভস্ম করেছে অসংখ্য শহর, নগর, সভ্যতা ও বহু কোটি মানুষ। প্রাচীন মিসরীয়, হিক্‌সুস্‌, হিসীয়, আসুরীয়, বাবিলনীয়, ফনিশীয়, পারসীয়, গ্রীক ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ সকলেই এই ব্যাপারে সমান অংশীদার। মৃত্যু ও মানব-ধ্বংসের এই কলা ( Art ) এশীয়দের নিকট থেকে গ্রীক ও রোমান-দের নিকট পৌঁছে গেছে। মধ্যযুগে তা পুরামাত্রায় কার্যকর ছিল বর্বরদের নিকট। ইউরোপীয়-আমেরিকানরাও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানব ধ্বংসের এই কর্মধারায় যথোপযুক্ত অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষণে রুশীয়রা আফগানিস্তানে ( ১৯৭৯—৮৪ সনে ) এই বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। কবে যে তার অবসান হবে, তা কেউ বলতে

www.pathagar.com

পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র ইরান ও ইরাকের নুসাইরী-বায়াস দলীয় সরকার এবং ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলের ইয়াহুদীদের মধ্যে বর্তমানে এই যুদ্ধেরই পরাকাষ্ঠা দেখানো হচ্ছে।

অবস্থা যখন এই, তখন রহমতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আমরা প্রতি মুহূর্ত চতুর্দিক থেকেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধাগ্নিতে পরিবেষ্টিত। তার কারণ বিভিন্ন হতে পারে, বিচিত্র হতে পারে তার রূপ, ধরন ও ব্যাপ্তি, কিন্তু তাতে মূল ব্যাপারে কোন তারতম্য হয় না।

আমরা মুসলমানরা ইসলামের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা করছি যে, হ্যাঁ, ইসলামেও যুদ্ধ বিধিবদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। তবে তা সব ধরনের যুদ্ধ নয়। তা এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধ। এক হিসেবে তা নিছক প্রতিরক্ষামূলক ( Defencive ) যুদ্ধও বটে ।

ইসলামে কথিত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধেরই স্বীকৃতি ও অবকাশ রয়েছে, তা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

এ প্রেক্ষিতে এ-ও বলা যায় যে, প্রতিরক্ষা কথাটিতে দুই পর্যায়ের যুদ্ধ শামিল রয়েছে। কুরআন মজীদে এই উভয় ধরনের যুদ্ধের প্রতিই সমর্থন ধ্বনিত হয়েছে ঃ

১. আত্মরক্ষামূলক। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ط وَإِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُنِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ط

(যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে—কেননা তারা নির্যাতিত-নিপীতিত, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা সেই লোক, যাদের নিতান্ত অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে তাদের ঘরবাড়ী থেকে শুধু এই অপরাধের দরুণ যে, তারা বলে, আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ্। —সূরা হজ্জ ঃ ৩৯-৪০

www.pathagar.com

মক্কী জীবনে রসূলে করীম (স.)-কে যুদ্ধ করার কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। মদীনায় যাওয়া ও তথায় রসূলে করীম (স.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবার অত্যাচারী কাফির শক্তির উপর প্রত্যাঘাত হানার অনুমতি দেয়া হল এবং তা যে নিতান্ত প্রতিরক্ষামূলক, তা উদ্ধৃত আয়াত ও তার পূর্বাপর থেকেই প্রমাণিত হয়। উদ্ধৃত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটি এই ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদার লোকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা তিনি বিশ্বাসঘাতক কাফিরদের আদৌ পসন্দ করেন না।
—সূরা হজ্জ ঃ ৩৮

অর্থাৎ ঈমানদার লোকদের প্রতিরক্ষা আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই করবেন। অনন্তকাল পর্যন্ত তাদের মক্কার কাফিরদের নির্মম অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হওয়ার জন্য অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবেন না, নিশ্চয়ই।

আর তার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালার চিরন্তন প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির ঘোষণা বিধৃত।[১]

২. নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার আর্তনাদ উত্থিত হলে তাদের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করা, প্রতিরক্ষায় অক্ষম কোন আক্রান্ত বন্ধু রাষ্ট্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া---এটাও মুসলিমদের একটা বড় কর্তব্য। এ পর্যায়ে কুরআনই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

১. زاد المعاد ج ٣ ص ٧٠ ، فتح القدير فى التفسير للشوكانى ج ٣ ص ٣٣٢

www.pathagar.com

أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ○

তোমাদের কি হয়েছে ; তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল-অক্ষম পুরুষ-নারী শিশুরা চিৎকার করে বলছে, 'হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এই দেশ থেকে আমাদের বের করে নাও, আমাদের জন্য তোমার নিকট থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক-অভিভাবক নিয়োজিত কর, আমাদের জন্য তোমার নিকট থেকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।' —সূরা নিসা : ৭৫

এ আয়াতে মুসলিম মিল্লাতকে আল্লাহ্‌ তায়ালা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নির্যাতিত-নিষ্পেষিত ও অত্যাচারীদের কবলে আটকে পড়া অসহায় জনতাকে মুক্ত করার জন্য। কেন তারা যুদ্ধ করছে না, তা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন। এক হিসেবে এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুমকি-ধমকি রয়েছে এবং ঘোষণা রয়েছে এ পর্যায়ে যে, দুনিয়ার কোন অংশের মানুষের এইরূপ অবস্থা দেখা দিলে তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করার কোন যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না ; বরং তখনও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করাই একটা অতি বড় অপরাধ।[১]

এ থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ অত্যন্ত ঘৃণ্য, খারাপ এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য। তবে তাছাড়া যদি শেষ পর্যন্ত মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোন উপায়ই না থাকে, তা হলে নিরুপায়ের উপায় হিসেবে সে যুদ্ধ অবশ্যই করতে হবে।

তবে মুসলমানদের পারস্পরিক চেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যদি এমন কোন সন্ধি-সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়, তা হলে সেজন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে, যার ফলে পক্ষদ্বয়ের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত হবে ; কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও শত্রুর রক্তপাত করা সে ধরনের বিজয়ের তুলনায় অনেক উত্তম, যার ফলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে মুসলিম জনগণের রক্ত ঝরতে থাকবে মূল্যহীন পানির মত।

---

১. تفسير كبير للرازى ' تفسير القاسمى ج ٣ ص ١٣٩٤

www.pathagar.com

## উত্তম নিদর্শন

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠানে নবী করীম (স.) যে ক্ষমা-সহিষ্ণুতার তুলনাহীন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আমাদের জন্য উত্তম নিদর্শন রয়েছে। শক্তিমানের পক্ষ থেকে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হল, নবী করীম (স.) যেখান থেকে এসেছিলেন, তাঁর সৈন্য-সামন্তসহ সেখানেই প্রত্যাবর্তন করতে এবং উম্‌রা পালনের সংকল্প থাকাসত্ত্বেও তা পালন না করেই ফিরে যেতে রাজী হয়েছিলেন। এমন কি স্বাক্ষরিত সন্ধি পত্রে তাঁর নিজের নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্‌' পরিচিতিটুকুও প্রতিপক্ষের দাবী অনুযায়ী নিজ হস্তে মুছে ফেলতেও দ্বিধা করলেন না। সর্বোপরি, সে সন্ধির শর্তাবলীতে উভয় পক্ষের পূর্ণ সমতাও রক্ষিত হয়নি; বরং তার মাধ্যমে শত্রু পক্ষ এমন সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে গেল, যা মুসলমানদের পাওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও তা থেকে তাঁরা বঞ্চিতই থেকে গেলেন।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান নেতার দৃষ্টিতে যুদ্ধের দিকটা অগ্রাধিকার পায়নি এই মুহূর্তে। যে শান্তি ও সন্ধির ফলে জনগণের রক্তপাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে, তা অবলম্বন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। সমতা-মর্যাদার স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে দিয়েও তা তিনি করেছিলেন।

এই সময় মুসলমানদের মনে তীব্র প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। লক্ষ্য-স্থলে না পৌঁছে ও ঘোষিত উম্‌রা অনুষ্ঠান না করেই ফিরে যেতে রাজী হওয়ার মূলে কি রহস্য নিহিত আছে, শুরুতে তা একজন সাহাবীরও বোধগম্য হয়নি। তখন নবী করীম (স.) তাঁদের সান্ত্বনা দানের জন্য যা বলেছিলেন, তা খুবই গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা অবশ্যক। তিনি বলেছিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَسْأَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا
حُرُمٰتِ اللّٰهِ اِلَّا اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ۔

আল্লাহ্‌র শপথ! কুরাইশরা যদি আমার নিকট সিলায়ে রিহমী বা রক্ত সম্পর্ক—আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মর্যাদা রক্ষার কোন বিষয়ের প্রতি

www.pathagar.com

সম্মান দেখানোর দাবী করতো, তা হলে আমি তাদের তা অবশ্যই দিতাম ।[১]

বস্তুত হুদাইবিয়ার এই সন্ধিই ছিল প্রথমে মক্কা বিজয় এবং পরে গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের বিজয় পতাকার পত পত করে উড়ার মৌল কারণ এবং ভূমিকা। এই চুক্তিপত্রই ছিল বিজয়ের দ্বার বা কুঞ্চিকা। আল্লাহ্ তায়ালার রীতিই হচ্ছে এই যে, তিনি যখন কোন কার্য সম্পাদন করার ইচ্ছা করেন, তখন তার পূর্বে এমন সব ঘটনা সংঘটিত করান, যা বাহ্যত নৈরাশ্যপূর্ণ হলেও পরিণতিতে অত্যন্ত শুভ হয়ে দাঁড়ায়।[২]

কুরআন মজীদ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধকে শরীয়তসম্মত বলে ঘোষণা করেছে। এই কারণে যুদ্ধে শরীক ও যুদ্ধে শরীক নয়, এই দুইশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নীতি প্রবর্তন করেছে। স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে যে, যুদ্ধকালে কেবল যুদ্ধে কার্যত অংশগ্রহণকারী লোকদেরই হত্যা করা যাবে, যারা তা নয়, তাদের হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আর যুদ্ধে শরীক গণ্য হবে সেই সব লোকই, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধসংক্রান্ত বহু প্রকারের কাজে-কর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। যারা এই কাজে কোন না-কোন প্রকারের সহায়তা-সহযোগিতায় লিপ্ত, তারাও এই পর্যায়ে গণ্য হবে।

ইসলামী শরীয়ত এই পর্যায়ে নবী করীম (স.)-এর উপস্থাপিত যে মহান শিক্ষা ও আদর্শ উপস্থাপন করেছে, তা সর্ব প্রকারের অস্পষ্টতা ও শোবাহ-সন্দেহ নিঃশেষে দূর করে দিয়েছে। সকল পর্যায়ের দুর্বল ও অক্ষম লোকদেরকে যুদ্ধের অশুভ পরিণতি ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তাই শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, রোগাক্রান্ত, নির্বোধ, অবোধ লোকদের উপর যুদ্ধের আঘাত হানতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি, ক্ষেতে-খামারে চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন কাজে ব্যস্ত, বিভিন্ন ধর্মের উপাসানাগারে পূজা-উপাসনারত পাদ্রী-পুরোহিত-ধার্মিক লোকদের এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষালাভের কাজে রত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত ইসলামের

১. نور اليقين ص ١٨١ - فقه السيرة ٣٤٢ - زاد المعاد ج ٣ ص ٢٨٩

২. فقه السيرة - للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ٣٤٧

www.pathagar.com

ও সাধারণ আইনের সংরক্ষণে এরা সকলেই যুদ্ধের তীব্র আঘাত ও মর্মান্তিক ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার পূর্ণ অধিকারী বলে বিবেচিত।

এই পর্যায়ে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ইসলাম উপরিউক্ত লোক-দের কেবল বৈষয়িক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতেই ইচ্ছুক নয়; তাদের কোনরূপ মানসিক ও স্নায়ুবিক দ্বন্দ্ব-কষ্টে জর্জরিত করতেও সম্পূর্ণ নারাজ। কেননা ইসলামের সর্বপ্রথম লক্ষ্য হচ্ছে, সমগ্র মানব সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও উত্তম আন্তরিক মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ পর্যায়ে ইসলামের বিধান চিরন্তন, উচ্চমানের, অত্যন্ত সম্ভ্রম-গুরুত্বের অধিকারী এবং সমগ্র জীবন-ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত। সকল কালের মানুষের জন্য তা স্থায়ী ও সময়োপযোগী। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ, সৌভাগ্য, শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রগতি ও সংরক্ষণই হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের পরম লক্ষ্য। আল্লাহ্ তায়ালাই ঘোষণা করেছেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ○ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আলো এবং একখানি সুস্পষ্ট-ভাষী কিতাব এসে গেছে। আল্লাহ্ তার সাহায্যে তাদেরই, যারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক, শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডলে নিয়ে আসেন। আর সত্য সঠিক পথে তাদের পরিচালিত করেন।[১]

—সূরা মায়েদা: ১৫-১৬

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٣ .

www.pathagar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# তৃতীয় অধ্যায়

# জিহাদের নির্দেশ কেন

[দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করাই জিহাদের লক্ষ্য—চাবুক ও ধ্বনি—প্রকৃত বিদ্রোহ-প্রকৃত বিপ্লব—বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রতি আচরণ—হেরার গুহা থেকে—অবর্ণনীয় কষ্ট ও প্রাণান্তকর সহিষ্ণুতা—সুবিচার ও মানবতা—ইসলামে সুবিচার—রাজনৈতিক ও সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচার—ইসলামে মানুষের মর্যাদা—ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ—মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে মানুষ—শাসক ও প্রশাসক জনগণের খাদিম—জাতীয় জীবনে সুবিচারের প্রভাব—সকলের জন্য সুযোগদান—সুবিচারের অমূল্য অবদান—শরীয়তের আওতাধীন অনুভূতি—সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত—মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব কি করে সম্ভব?—নিরাপত্তার নিজস্ব রূপ ও প্রকৃতি—সুবিচারের বিভিন্ন দিক—স্বাধীনতা উন্নতমানের সুবিচার—অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য—এটা কোন্থেকে পেয়েছে? —শয়তানের অনুপ্রবেশের পথ—জাতীয় কল্যাণে প্রশাসকদের উদ্বুদ্ধকরণ—সুবিচার ও প্রথম মানুষ—জিহাদ ও যুদ্ধ—বুঝের ভুল—মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে।]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করাই জিহাদের লক্ষ্য

ইসলামে যুদ্ধ নয়, জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ এবং জিহাদ যে এক নয়---ভিন্ন ভিন্ন, তা বরং আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত ও যুক্তি-প্রমাণ-ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত ও স্পষ্ট করে তুলতেই চেষ্টা করেছি। বস্তুত ইসলাম মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম ঈমান এনে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে এবং এই পথে যেদিক দিয়েই যে-কোন বাধা আসুক না কেন, তাকে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এজন্য তাকে তার নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, জিহাদ করতে হবে ইসলামী জীবন ধারার পথে প্রতিবন্ধক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে। জিহাদ করতে হবে সেই সব শক্তির বিরুদ্ধেও, যারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ মনে করে অত্যাচার-নির্যাতনে জন-জীবনকে জর্জরিত ও দুর্বিসহ করে তোলে।

এই জিহাদের দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য দু'টি শর্ত অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হবে। একটি, জিহাদ করতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ ও ও অকৃত্রিম ঈমান সহকারে, জিহাদ করতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র অনুসরণের মাধ্যমে। ইসলামে এই জিহাদেরই অনুমতি এবং আদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যদিও এই জিহাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা. এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কোন ধারণাই নেই। বিশেষ করে এই জিহাদেরই শেষ পর্যায় সশস্ত্র জিহাদ বাহ্যত যুদ্ধই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জিহাদ সশস্ত্র পর্যায়ে পৌঁছেও গুণগত ও অন্তর্নিহিত ভাব-ধারা উভয় দিকদিয়ে জিহাদই থাকে, তা কখনই 'যুদ্ধ' হয়ে যায় না।



www.pathagar.com

বস্তুত ইসলামে কেবল সেই জিহাদই সমর্থিত ও অনুমতিপ্রাপ্ত, যার কথা স্বয়ং রসূলে করীম (স.) ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۝

যে লোক সশস্ত্র জিহাদ করলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কালেমা দীন-ইসলামকে বিজয়ী করে তোলার লক্ষ্যে, তার এই অস্ত্র প্রয়োগই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র পথে অনুষ্ঠিত।[১] —খামসাহ্

রসূলে করীম (স.)-এর এই উক্তিটুকু নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটির উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

এবং আল্লাহ্ তাঁকে [ রসূলে করীম (স.)-কে ] শক্তিশালী করে দিয়েছেন এ সব বাহিনীর সাহায্যে, যাদের তোমরা দেখতে পাও না এবং তিনিই কাফিরদের আদর্শকে পরাজিত ও নীচ করে দেবেন এবং আল্লাহ্‌র কালেমাকে সর্বোচ্চ ও বিজয়ী করে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞানী। —সূরা তওবা ঃ ৪০

আয়াতে আল্লাহ্‌র কালেমা—বাণী বা দীনকে সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অনুসৃত বানানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়েছে। এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সর্বশেষ ও চরম পর্যায়ে অস্ত্রের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা 'জিহাদ' পরিচিতি কিছুমাত্র হারায় না।

আল্লাহ্‌র কালেমাকে সর্বোচ্চে—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, উপরিউক্ত হাদীস ও কুরআন উভয়ই ঘোষণা করছে যে, কেবল তা-ই হবে আল্লাহ্‌র পথের

---

১. হাদীসটি হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ও বুখারী ব্যতীত অপর পাঁচখানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

জিহাদ। আর ইসলামে কেবলমাত্র এই যুদ্ধই শরীয়তসম্মত এবং কেবল সেই যুদ্ধেরই অনুমতি আছে ইসলামে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামে তাকে 'যুদ্ধ' ( حرب ) নামে অভিহিত করা হয়নি। বলা হয়েছে 'জিহাদ'।

আল্লাহ্র কালেমা অর্থ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মরযীর বাস্তবায়ন, আল্লাহ্র দীনের প্রতিষ্ঠা। আর মানুষের নিকট আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মরযী তা-ই, যা তিনি তাঁর কালাম এবং রসূলের সুন্নতের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের নিকট উপস্থাপিত করেছেন এবং যা বিশ্ব প্রাকৃতিক বিধানের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে আমরা এ-ও বলতে পারি যে, বিশ্ব প্রকৃতি নিহিত সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য, শৃংখলা, সুসংবদ্ধতা এবং মানবজীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা-পরিপূরকতা এই দুইটিই হচ্ছে মানব জীবনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার বরাদ্দকৃত বিধান, যা তাঁর নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

কোন সন্দেহ নেই, এই শৃংখলা-সুসংবদ্ধতাই বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও সর্ব প্রকার অশান্তির প্রতিরোধ করে। মানব-জীবনে নিয়ে আসে চিরন্তন শান্তি, সমৃদ্ধি, অব্যাহত প্রগতি ও সার্বিক কল্যাণ।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতা কর সকল প্রকার কল্যাণকর, পুণ্যময় ও আল্লাহ্র ভয়সম্পন্ন কার্যাবলীতে এবং কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবে না পাপ, আল্লাহ্দ্রোহিতা ও সীমালংঘনমূলক কাজে। —সূরা মায়েদা ঃ ২

ইসলামের এই বিধান নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য, এই নির্দেশ সকলের প্রতি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ফলেই দিশেহারা মানুষ পথের সন্ধান পেতে পারে, ভ্রান্ত পেতে পারে প্রকৃত সত্যপথের সন্ধান এবং এভাবেই আল্লাহ্র কালেমা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে; মানব জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে কল্যাণের যথার্থ তাৎপর্য।

www.pathagar.com

ইসলামের এই বিধান অনুযায়ী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের নিকট কল্যাণ পৌঁছে দেয়া এবং তার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব না থাকাতেই আল্লাহ্র কালেমার বাস্তবায়ন নিহিত রয়েছে।

তাই নির্বেশেষে সমস্ত মানুষের নিকট এই কল্যাণ পৌঁছার পথ যদি কেউ রোধ করে. শক্তির বলে কেউ সৃষ্টি করে কোনরূপ প্রতি-বন্ধকতা, তা'হলে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালেমার পরিপন্থী. সে যালিম, সে আল্লাহ্দ্রোহী, স্বাভাবিকতার সীমালংঘনকারী। এরূপ অব-স্থায় এ প্রতিবন্ধকতার অবসান ও প্রতিবন্ধকের অপসারণ আল্লাহ্র কালেমা বাস্তবায়নের পক্ষে একান্তই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের কোন কর্তব্য জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়; বরং সেই সার্বিক কল্যাণ ব্যবস্থার সাথে সমস্ত মানুষের পরিচিতি লাভের যে স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে; যে দাবী রয়েছে চূড়ান্ত কল্যাণ পথের সন্ধান লাভ করার, তাদেরকে সেই অধিকার দেয়ার জন্য—সেই দাবী পূরণার্থেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তই কর্তব্য।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য ইসলামের কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার পথে কেউ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কেউ ইসলাম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের কেউ জ্বালা-যন্ত্রণা দেবে, তাদের উপর অত্যাচার-যুলুমের স্টীম রোলার চালাবে, ইসলাম তা-ও বরদাস্ত করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। ইসলামের অকাট্য দলীল ও নিদর্শনাদি থেকে কেউ জন-গণকে বঞ্চিত করবে, ইসলাম তা মুখ বুজে থেকে, নীরব-নিষ্ক্রিয় থেকে সহ্য করবে, এমন কথাও হতে পারে না। কুরআনেরই নির্দেশ:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ -

তোমরা সকলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যেন ফিত্না অবশিষ্ট না থাকে এবং আধিপত্য-কর্তৃত্ব, আইন-শাসন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। —সূরা আনফাল: ৩৯

বস্তুত ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্যই মহান আল্লাহ্র নাযিল করা দীন। গোটা পৃথিবীর বুকে সামগ্রিকভাবে ও সমগ্র মানুষের মধ্যে নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সুবিচার, ন্যায়পরতা ও পূর্ণমাত্রার ভারসাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এটাই ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য। 'সুবিচার ও ন্যায়পরতা' বলতে বিশেষ ধরনের জিনিস বোঝানো হয় না। তার সমগ্র দিক ও বিভাগ এবং সামগ্রিক তাৎপর্যই ইসলামের লক্ষ্য। একটি পূর্ণাংগ সামাজিক, সামষ্টিক সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠাই ইসলামে কাম্য। আইনের শাসনের, মানবিক মর্যাদার, মৌলিক অধিকারের এবং রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণের ন্যায়পরতা নিরপেক্ষতা ও অবিমিশ্র সুবিচার ভারসাম্যতাই ইসলামের মৌল ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

অতএব যে লোক এই ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সীমা লংঘন করবে, মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, সে-ই আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধীতা ও লংঘন করল। আল্লাহ্‌র কালেমার সাথে সেই করল চরম শত্রুতা। সে শত্রুতা মুসলিম জনগণের সাথে। তাই আল্লাহ্‌র কালেমা প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠাকামীদের সংগ্রাম করতে হবে, প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করতে হবে তাদেরকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। আল্লাহ্‌দ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকারী ও নিরীহ জনগণের উপর নির্যাতন চালনাকারীদের হস্ত ভেংগে দিতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ্‌র পূর্ণাংগ দীন। এমনকি মুসলিম নামধারী লোকেরাও যদি এই বিধান লংঘন করে, তবে তাদেরকেও ক্ষমা করা যেতে পারে না।

ইসলামের এই সুবিচার নিরংকুশ, সম্পূর্ণ শর্তহীন এবং অন্য-নিরপেক্ষ। আল্লাহ্‌দ্রোহী, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকারী এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার স্বাভাবিক সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত-কারীদের দমন করাই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র কালেমা। সকল অবস্থা-তেই আল্লাহ্‌র এই কালেমা কার্যকর হতে হবে, সকল কালে, সকল স্থানেই এই কালেমার কার্যকরতা এই কালেমারই মৌলিক দাবী। কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا

www.pathagar.com

اَلَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

মু'মিনদের মধ্য থেকেই দুইটি জনগোষ্ঠীও যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তা'হলে তোমরা যারা তাদের বাইরে রয়েছ, সে গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। তারপরও যদি একটি অপরটির উপর আক্রমণ চালায় তা হলে সেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তোমরা সম্মিলিত হয়ে লড়াই করবে যতক্ষণ না সে গোষ্ঠী আল্লাহ্‌র বিধান মান্য কারার দিকে ফিরে আসছে। যদি সে গোষ্ঠীটি শেষপর্যন্ত ফিরে আসে, তা'হলে তাদের দুইটির মধ্যে ন্যায়পরতা সহকারে সন্ধি স্থাপন কর। - -তোমরা সুবিচার কর - - -আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

—সূরা হুজুরাত ঃ ৯

আয়াতটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা, সীমালংঘন ও একের উপর অপরের অকারণ যুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ এবং সর্বস্তরে ও সর্বাংগীনভাবে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের কোন গোষ্ঠী এই অপরাধ করলে তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার কায়েম করতে হবে। এ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হলে তা থেকেও পিছপা হওয়া চলবে না। সর্বাত্মকভাবে যুলুম রোধ করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজটিও জিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই যুলুম রোধ করতে হবে তাদের নিজেদের উপর থেকে, যে মযলুম-নিপীড়িত মানুষ নিজেরা তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাদের রক্ষা করার জন্যও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্যও এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কার্যকর হতে হবে যেন তারা নিজেরাও সীমালংঘন না করে, এই প্রতিরোধ-কাজেও যেন কোনরূপ সীমালংঘন করা না হয়, যুলুম রোধ করতে গিয়ে যেন যুলুম করা না হয় সে ব্যাপারেও পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

www.pathagar.com

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তোমরা সকলে যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে তা করতে গিয়েও তোমরা যেন সীমালংঘন না কর। কেননা সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ তায়ালা ভালোবাসেন না।

—সূরা বাকারা ঃ ১৯০

রবী' ভাবেয়ী বলেছেন, 'রসূলে করীম (স.)-এর মক্কায় অবস্থানকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করার কোন নির্দেশ নাযিল হয়নি। হিজরতের পর সর্বপ্রথম এই আয়াতটিই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার নির্দেশসহ অবতীর্ণ হয়।'

সানাউল্লাহ পানিপত্তি লিখেছেন, 'আয়াতের 'সীমালংঘন কর না' অর্থ তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আগে-ভাগেই যুদ্ধ শুরু করে দেবে না।'[১]

## চাবুক ও ধ্বনি

ঠিক এই মহান ও উচ্চতর লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখেই ইসলাম তরবারি ধারণ করার ও যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আগেই বলেছি, ইসলামের পরিভাষায় তা 'যুদ্ধ' (War এবং আরবী حرب) নয়, তা 'জিহাদ'। আর 'যুদ্ধ' ও 'জিহাদ' কোনক্রমেই অভিন্ন নয়। জিহাদে যাঁরা জীবন দেবেন, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পরকালীন জীবনে উচ্চতর মর্যাদা ও অসীম, অশেষ শুভ প্রতিফল দানের ব্যবস্থা রেখেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ

---

১. التفسير المظهرى ج ١ ص ٢١٢

فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ

اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ

اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদের মৃত মনে করো না ; বরং তারা জীবিত, তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রিযক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌ তাঁর যে অনুগ্রহ তাদের দেন, তাতেই তারা আনন্দিত-উৎফুল্ল। পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে এখনও মিলিত হয়নি, তাদের এই বলে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই, দুঃখ-অনুতাপেরও কোন কারণ নেই। তারা সুসংবাদ দেয় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া নিয়ামত ও অনুগ্রহের। --- আর আল্লাহ্‌ মু'মিনদের শুভ কর্মফল কখনও নষ্ট করে দেন না।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৯-৭১

ঠিক এই মহান উদ্দেশ্যেই ইসলাম মুসলিম জনগণকে জিহাদের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। শক্তি সংগ্রহ ও সুসংবদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে। নিজ নিজ মাথা নিজের নিজের হাতের তালুতে নিয়ে সদা প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলেছে। উপদেশ দিয়েছে, তারা যেন কখনই এবং কোন কারণেই ভীত-সন্ত্রস্ত বা নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ে। যেমন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج

لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ -

এবং তোমরা শত্রুদের (মুকাবিলা করার) জন্য যতদূর সাধ্য কুলায় শক্তি সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর, অশ্ব ইত্যাদি যানবাহনও। তার দ্বারা তোমরা

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রু—এবং তাদের ছাড়া আরও যারা আছে—যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ্ যালিমদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করবেন।

—সূরা আনফাল : ৬০

প্রাচীন তাফসীরসমূহে القوة শব্দের অর্থে সাধারণভাবে তীর (الرمى)-এর উল্লেখ করা হয়েছে রসূলে করীম (স.)-এর তীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে। কিন্তু আমাদের এই যুগে আমরা যে-কোন ক্ষেপণাস্ত্র—শত্রুকে ঘায়েল করার যে-কোন দূর পাল্লার অস্ত্র মনে করতে পারি এবং অশ্ব পালনের কথা থেকে বুঝতে পারি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী যে-কোন যানবাহন। আর একালে তারই পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ হয়েছে মুসলমানদের প্রতি।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ० وَاللّٰهُ

مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ -

অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না এবং সন্ধির আবেদন করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে. আল্লাহ্ তোমাদের সংগে রয়েছেন এবং তোমাদের কার্যাবলী তিনি কখনই বিনষ্ট করবেন না।

—সূরা মুহম্মদ : ৩৫

উপরের আয়াত দু'টির মর্মানুযায়ী যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সেজন্য সাধ্যানুযায়ী শক্তি সংগ্রহ করার এ আদেশ প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। ইসলামী চিন্তা-ভাবনার দিকদিয়ে তা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

এ প্রয়োজন ইসলামের জন্য। কেননা তা-ই হচ্ছে দুনিয়াবাসী-দের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নাযিল করা সর্ব শেষ দীন। আল্লাহ্ বিশ্ব-মানবতার জন্য যে-বিধান নাযিল করেছেন, তার বুনিয়াদী আকীদাসমূহের সমন্বয় সাধনকারী জীবন-বিধান হচ্ছে এই দীন-ইসলাম।

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দুনিয়ায় যত নবী ও রসূলের আগমণ হয়েছে, তাঁদের সকলেরই প্রচারিত সুদৃঢ় মৌলনীতিসমূহ এই দীন-ইসলা-মেই সমন্বিত।

www.pathagar.com

ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝

আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় জীবন-বিধান হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯

প্রত্যেক নবী-রসূলই এসেছেন মানুষের প্রতি কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ নিয়ে। ইসলামই হচ্ছে তার বাস্তব অনুসরণীয় পূর্ণাংগ ব্যবস্থা।

সর্বশেষে এসেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। কুরআন মজীদেই তাঁর পরিচিতি দেয়া হয়েছে এই ভাষায় ঃ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ আল্লাহ্র কিতাবের সত্যতা প্রতিষ্ঠাকারী এবং তার সংরক্ষক, অতন্দ্র প্রহরী। —সূরা মায়েদা ঃ ৪৮

বস্তুত ইসলাম কোন যুলুম বা জোর-জবরদস্তির বিধান নিয়ে আসেনি, তার উপস্থাপিত প্রতিটি আইন ও বিধানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভংগীর উপর। ইসলাম মুসলমানদের উপর এই দায়িত্ব এ জন্য চাপিয়ে দেয়নি যে, তারা জোর-জবরদস্তি চালিয়ে লোকদের মুসলমান বানাবার জন্য চেষ্টা করবে, লোকদের দীন-ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করবে। শক্তিপ্রয়োগ করে লোকদেরে মুসলমান বানানোর কোন শিক্ষা বা পদ্ধতিই ইসলাম পেশ করেনি। ইসলামের উদাত্ত ঘোষণা হচ্ছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

দীন-ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গুমরাহী থেকে স্বতন্ত্র এবং সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে গেছে।

—সূরা বাকারা ঃ ২৫৬

www.pathagar.com

কেননা কুরআন প্রথমেই তাদেরকে মু'মিন জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য দায়িত্বশীল বানিয়েছে, যেন দীনের ব্যাপারে তাদেরকে কোন বিপদে ফেলা না হয় এবং শক্তির প্রতিরোধ শক্তির দ্বারা করার জন্য বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে মহান সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা করার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণকে এই সুবিচার মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করে তোলার—তা সমষ্টির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য হোক. কি জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ জনসমষ্টির জন্যে হোক, অথবা এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সাধারণ জাতিসমূহের জন্যেই হোক—যাদের মধ্যথেকে বিরাট মনুষ্য সমাজ গড়ে উঠেছে। এই দায়িত্ব অর্পণই যুলুম ও বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে বাধ্য করে—তা যেখানেই হোক-না-কেন। ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম করলে, সমষ্টি আত্মনিপীড়নকারী হলে, অথবা প্রজা সাধারণের উপর কোন রাষ্ট্র-সরকারের যুলুম অনুষ্ঠিত হতে থাকলেও তার প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বুকে যেখানেই যুলুম হোক, মুসলিম উম্মত তার প্রতিরোধের জন্য—তার কারণসমূহ নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে; এজন্য জিহাদ করবে। জিহাদ করবে ভূখণ্ড দখল করার মতলবে নয়, দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করার লক্ষ্যে নয়, মানুষকে কঠিন দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করার উদ্দেশ্যেও নয়। জিহাদ করবে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র কালেমাকে সকল প্রকার স্বার্থকলুষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে প্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যে। এই জিহাদকেই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌'—'আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ' বলা হয়েছে। এই জিহাদ দ্বারাই আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করা—তথা আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করা সম্ভব। লোকদেরকে মুসলমান বানাবার জন্য শক্তি প্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তি করার মাধ্যমে নয়। জনগণকে যুলুম ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দুঃসহ পীড়ন থেকে মুক্তিদান, সীমালংঘনকারী, বিভ্রান্তকারী শক্তির হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীন সুযোগ-সুবিধা তাদের সর্ব প্রথম দিতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সুবিচার ও ন্যায়-পরতার সুমহান কল্যাণে ভূষিত করতে ইচ্ছুক, সেই সুবিচার দিয়ে তাদের ধন্য করতে হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

www.pathagar.com

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

যারা ঈমান এনেছে, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে এবং যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির পক্ষে। —সূরা নিসা : ৭৬

বস্তুত আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির পক্ষের জিহাদ—যা আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ নয়—এই দুইটির মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ডই হচ্ছে এই। প্রথমটির পিছনে চালিকাশক্তি হিসেবে থাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা। আর দ্বিতীয়টির মূলে থাকে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা, আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ-করণ।

## প্রকৃত বিদ্রোহ : প্রকৃত বিপ্লব

ইসলামের মৌল আদর্শই প্রকৃত ও পূর্ণাংগ বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে এবং তার মৌলনীতিসমূহ উপস্থাপিত করেছে। ইসলামে প্রাথমিক ঈমানী-কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্'-র মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই বিদ্রোহ-বিপ্লবের জীবন্ত প্রাণবন্ত বীজ। দুনিয়ার মানুষ আজ পর্যন্ত যত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সাথে পরিচিত হয়েছে, তার তুলনায় এই বিদ্রোহ ও বিপ্লব সম্পূর্ণ অভিনব, সবকিছু থেকে ভিন্নতর এবং বৃহত্তর ও মহত্তর। এ বিদ্রোহ যুলুমের বিরুদ্ধে, রূপ ও প্রকৃতি তার যত বিচিত্রই হোক-না কেন! এ বিদ্রোহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল পরিস্থিতিতে। এ বিদ্রোহ যালিমের বিরুদ্ধে, যালিম শাসন-বিধান, যালিম প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও যালিম সরকারের বিরুদ্ধে, যুলুমের পৃষ্ঠপোষকতাকারী সকল আইন ও কার্য-কারণের বিরুদ্ধে। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির যুলুম, ব্যক্তির উপর সমষ্টির যুলুম, শ্রেণীর উপর শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের উপর সম্প্রদায়ের যুলুম, সমষ্টির উপর সমষ্টির যুলুম, জাতির উপর জাতির যুলুম, রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রসমূহের যুলুম, আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হোক, কি বিদেশী দখলদার বাহিনীর পক্ষ থেকেই হোক, সব যুলুমের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ চালিত হবে।

এই যুলুমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিদের মাথা তুলতে হবে, শ্রেণীকে মাথা তুলতে হবে, রাষ্ট্রকে মাথা তুলতে ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

এছাড়া কোন উপায় নেই। এই প্রতিরোধে ইসলাম তার পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই বিদ্রোহের সমর্থন ও সাহায্যের জন্যই ইসলাম মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করে দিয়েছে। এছাড়া কোন গতি ছিল না। কেননা যুলুম নির্মূল করে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও জীবন বিধান বাস্তবায়িত করা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিকে ব্যক্তি ও সমষ্টির সরকার, সংস্থা ও শক্তির যুলুম থেকে নিষ্কৃতি দানই এই বিদ্রোহের চরম লক্ষ্য। এই বিদ্রোহের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে বিপ্লব। এ বিপ্লব সর্বাত্মক, সর্ব ব্যাপক। এরই ফলে মহান বিশ্ব শান্তি তার আসল ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে। সে শান্তি কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয়, প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও এই শান্তি কাম্য, অপরিহার্য। অতএব কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যুলুম হতে থাকলে তা-ও বরদাশ্‌ত্‌ করা যেতে পারে না যেমন, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রের উপর যুলুম হলে তা-ও নিঃশব্দে সহ্য করা এবং এই মূল্যের বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বস্তুত বিশ্বচিন্তাই ইসলামের চিন্তা-বিন্দু। কোন রাষ্ট্রের নিকট থেকে মিথ্যা শান্তি ক্রয় করা তার নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই কোন রাষ্ট্রকেই তার নাগরিকদের উপর অব্যাহতভাবে যুলুম চালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। বিচার বিভাগীয় সুবিচার ও সামষ্টিক ন্যায়পরতা থেকে নিরীহ অক্ষম জনগণকে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত করার অধিকার বা সুযোগ কোন রাষ্ট্রকেই দেয়া যেতে পারে না। এই যালিম রাষ্ট্র যে সব দুর্বল-অক্ষম প্রজা-সাধারণের উপর যুলুম করে যাচ্ছে— তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোক, হোক যে বর্ণেরই, তারা তো মানুষ। মানবিকতার এই উদার দৃষ্টিকোণেই তাদের উপর থেকে যুলুমের শয়তানী চক্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার এবং ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সুশীতল আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবনকে ধন্য করে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম উম্মতকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই মৌল চিন্তাবিন্দুকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিপ্লবের চিন্তা দানা বেঁধে উঠে। আধিপত্য বিস্তার, প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ধনমাল লুণ্ঠনের দিকে এই বিপ্লব-চিন্তার কোন আকর্ষণ নেই। এই বিপ্লবের ফলেই সর্বস্তরে ও সকল পর্যায়ে সার্বিক শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব। মনের শান্তি, অন্তরের নিঃসীম প্রশান্তি, ঘরের শান্তি-শৃংখলা, সমাজ ও সমষ্টির শান্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মানবতার শান্তি একমাত্র এই পথেই

www.pathagar.com

আসতে পারে। এই শান্তি হবে মানুষের প্রাপ্ত সর্বাত্মক সুবিচারের শীতল ছায়ায়, শুধু এই কারণে যে, সে একজন মানুষ। আর মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে এই শান্তি লাভের।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ -

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা সুবিচারের ধারক হয়ে এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে মযবুতভাবে দাঁড়াও, তা তোমার নিজের বিরুদ্ধে হলেও ; কিংবা তোমার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও।
—সূরা নিসা ঃ ১৩৫

এই অর্থেরই আর একটি আয়াত ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ...

হে ঈমানদার লোকগণ। তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সুবিচারের সাক্ষ্যদাতা হয়ে দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়াও। —সূরা মায়েদা ঃ ৮

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ط اعْدِلُوا قف هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ -

কোন বিশেষ লোকসমষ্টির প্রতি শত্রুতার মনোভাব যেন তোমাদেরকে সুবিচার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা অবশ্যই সুবিচার করবে। এই নীতিই আল্লাহ্-ভীরুতার নিকটবর্তী।
—সূরা মায়েদা ঃ ৮

উপরিউক্ত নির্দেশাবলীই ইসলামে বিশ্বশান্তিসংক্রান্ত চিন্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এটা কোন সংকীর্ণ অর্থের শান্তি নয়। যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা যে-কোন কারণের ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিহার করার কোন চিন্তা বা প্রবণতা এখানে উপস্থিত

www.pathagar.com

নেই। এ শান্তি অত্যন্ত কোমল, সকলেরই নিকটবর্তী, সকলেরই প্রাপ্য। এ শান্তি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য অর্জিত হয়, মানবতার সর্বোচ্চ মহান মূল্যমান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তা অর্জন করা হয়। কেননা মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর বুকে গোটা বনী আদমের জন্য তা-ই নির্ধারিত করেছেন। এই শান্তি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে ঃ

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ —

তোমরা বিমর্ষ ও সাহসহীন হবে না -- শান্তির দিকে তোমরা আহ্বান জানাতেই থাকবে। তোমরাই সর্বোচ্চ স্থানীয়, আল্লাহ্ তোমাদের সংগে রয়েছেন। —সূরা মুহম্মদ ঃ ৩৫

তোমরা সর্বোচ্চ স্থানীয় এজন্য যে, তোমরাই জীবনের উন্নততম মূল্যবোধের ধারক ও প্রতিনিধিত্বকারী। মানুষ যখন এই চিন্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করে তখন তাদের জন্য যে সাহায্য অপরিহার্য, তা এই চিন্তারই ফলশ্রুতি। কেননা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ -

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য কর, তা'হলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন। —সূরা মুহম্মদ ঃ ৭

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ
إِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

www.pathagar.com

যে লোক আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, আল্লাহ্‌ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ শক্তিসম্পন্ন ও সর্বজয়ী। এই সাহায্যকারী তারাই, যাদের আমরা পৃথিবীর বুকে ক্ষমতাসীন করে দিলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে। আর সকল ব্যাপারের সর্বশেষ পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ।

—সূরা হজ্জ : ৪১

**জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে**

অতএব জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলবে—চলতে থাকবে। চিরদিনই জিহাদ হতে থাকবে; কোনদিনই তা বন্ধ হবে না। এই জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র কালেমা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করা। এমন এক সুষ্ঠু, কল্যাণময় ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যা ব্যক্তি জীবনে, সামষ্টিক ক্ষেত্রে—বিশ্বমানবতার জন্য উচ্চ মানবিক মূল্যবোধ সমন্বিত হবে। এই ব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে কোন যালিম শক্তিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না, তা বহু সংখ্যক ব্যক্তি ও লোক সমষ্টির উপর অত্যাচারীরূপে আত্মপ্রকাশ করুক, কি শ্রেণী-সমূহকে শোষণকারী শ্রেণীরূপে; অথবা বহু জাতি ও বহু রাষ্ট্রের উপর অত্যাচার চালনাকারী রাষ্ট্ররূপে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই সব রূপই অভিন্ন, মৌলিকভাবেই ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী রূপ। তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ইসলামের কর্তব্য—যতটাই তার সাধ্যে কুলায়। তার সাথে কখনই সহযোগিতা করা যেতে পারে না; বরং যখনই সম্ভব, তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। কোন অবস্থায়ই তার জন্য নম্র ভূমিকা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

পাপ, নাফরমানী ও সীমালংঘনমূলক কাজে কখনই সহযোগিতা করবে না।

—সূরা মায়েদা : ২

ইসলামের শক্তি মুক্ত, স্বাধীন। যুলুম, মানুষকে দাস বা শোষণের শিকার বানানোর যে-কোন চেষ্টা বা পদক্ষেপের উপর তার নিয়ম-

www.pathagar.com

পন্থা, কার্যক্রম ও কারণসমূহের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্যই তা প্রতিমুহূর্ত ও সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই সমান, সর্বোতভাবে অভিন্ন। সকলেই মানুষ—আদম সন্তান। জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ, কৃশ, দুর্বল চিন্তা ইসলামের নয়; ইসলামের নিকট তা গ্রহণ-যোগ্যও নয়। তা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও সমাজ-চিন্তার ফসল। মুসলিম জাহানেও তা অনুপ্রবেশ লাভ করেছে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের সংগে সংগে। এটা মূলত ভৌগোলিক ভাষা বা বর্ণভিত্তিক —মতাদর্শভিত্তিক জাতীয়তার বিদ্বেষ মাত্র। এই বিদ্বেষ গোটা পৃথিবীর মানব সমষ্টিকে বিভ্রান্ত ও বিভেদের বিষে বিষাক্ত ও জর্জরিত করে তুলেছে। ইসলামের নিকট তা সমর্থনীয় নয়। শুধু তা-ই নয়; তা সম্পূর্ণরূপেই ইসলামের পরিপন্থী ( Negation )। এই বিদ্বেষ ও বিভেদ চিন্তাই বর্তমান দুনিয়ার মানবিক একত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। অভিন্ন মানব সত্তাকে শত-সহস্রভাবে বিভক্ত ও টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

যুলুম যে-রূপে, যে মাত্রায়, যেখানেই এবং যখনই হোক, তাকে প্রতিরোধ ও উৎখাত করার জন্য ইসলাম—ইসলামী শক্তি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। যুলুম মুসলিম জনগণের উপর হোক, মুসলমানরা যাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে (যিম্মী) তাদের উপর হোক, অথবা মুসলমানদের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক, সন্ধি, ঐক্য বা যোগা-যোগও নেই, তাদের উপর হোক, তা দমনের জন্য স্বীয় দায়িত্ব পালনে ইসলাম সদা সক্রিয় থাকবে। ইসলামী শক্তি যখন যালিম ব্যক্তি বা যালিম শ্রেণী অথবা যালিম রাষ্ট্রের মুখোমুখী দাঁড়াবে, তখন কেবলমাত্র যালিম শক্তির মুকাবিলা করার ভাবধারা নিয়েই দাঁড়াবে। তাকে কালো, ধলো, লাল বা হরিৎ বর্ণের লোক হিসেবে নয়। এজন্যও নয় যে, তারা খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী। আর এই মুকাবিলা করা হবে শুধু এই কারণে যে, যালিম শক্তি আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র কালেমা প্রচারিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বনী আদমের প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের সাথে চরম শত্রুতায় নিয়োজিত রয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক প্রতিবন্ধক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা অনুপাতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই যালিম ও সত্যদীনের প্রতি-



www.pathagar.com

বন্ধক শক্তি যদি মাথানত করে দেয়, আনুগত্য স্বীকার করে এবং প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে, তা হলে অতঃপর সব মানুষই সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। আল্লাহ্‌র নিকট আনুগত্য স্বীকারের পর তারা যে কোন আকীদা গ্রহণের অধিকারী হবে।

**বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রতি আচরণ**

উপরে বর্ণিত তত্ত্বের দৃষ্টিতে কাফির-মুশরিক এবং আহ্‌লি কিতাব-এর সাথে ইসলামের আচরণ ও অবলম্বিত নীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের ভিত্তিকেই অস্বীকার করে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তারা সৃষ্টিসংক্রান্ত মৌলনীতি ও শালীনতা-সংস্কৃতির মৌল তাৎপর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণায় বিশ্বাসী। তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতিই আল্লাহ্‌র সেই কালেমার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যা ইসলাম দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক ও সদাসচেষ্ট।

তা সত্ত্বেও ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শুধু তখনই, যখন তারা নিজেরাই ইসলামের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, ইসলামের মৌল চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে শত্রুতা করতে শুরু করে এবং সেই চিন্তা ও বিশ্বাসের ধারকদের উপর নানাভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। অথচ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ভূমিকা গ্রহণ না করলে তাদের সাথে শুভ আচরণের সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামের কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا

اِلَيْهِمْ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ

عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ

www.pathagar.com

دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি তোমরা সুবিচার করবে, তা করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। আল্লাহ্ তায়ালা কেবল সেই লোক-দের ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার জন্য দ্বিধাহীনতা প্রদর্শন করেছে যে, তোমরা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। এই লোকদের সাথে যারাই বন্ধুত্ব করবে তারাই যালিম।

—সূরা মুমতাহানা ঃ ৮-৯

আহলি কিতাব লোকদের সম্পর্কে ভিন্ন কথা। তারা হয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে অথবা মুসলমানদের মধ্যে বসবাসকারী জনমণ্ডলী হবে। যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে হয়, তা হলে তাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি বা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি থাকবে ; কিংবা তা কিছুই থাকবে না। যদি চুক্তি বা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি কিছু থাকে, তা হলে তাদের সহিত সেই চুক্তি বা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি অনুরূপ আচরণ গ্রহণ করতে হবে। সে চুক্তি ভংগ করা হবে না, সে ওয়াদা প্রতিশ্রুতির পরিপন্থীও কিছু করা হবে না (পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)। আর যদি তাদের সাথে কোন চুক্তি না থাকে, তা হলে তারা পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের উপর যুলুম-নিপীড়ন না চালালে—কিংবা তা থেকে বিরত থাকলে, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ালে, তাদের সাথে পূর্ণ ভালো আচরণ এবং সুবিচারের নীতি গ্রহণ করা হবে। আর তারা তা থেকে বিরত না থাকলে ইসলাম তাদের জন্য তিনটি প্রস্তাবের যে-কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানাবে ঃ

www.pathagar.com

—হয় ইসলাম কবুল কর,
—না হয় জিযিয়া দিতে রাজী হও,
—আর তাও না হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

বস্তুত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র শাশ্বত দীনের বিবর্তিত রূপ. দীন-ইসলামের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ রূপ। তা গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়তের একমাত্র বিধান। আর নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্য মানবিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ উপায়।

ইসলাম কবুলের দাওয়াত এই কারণে সর্বাবস্থায় উপস্থাপনীয়। আর জিযিয়া দিবার আহ্বান জানানো হবে এই কারণে যে, তদ্দারা ইসলাম ও মুসলমানের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার কথা প্রমাণিত হবে, ইসলামী দাওয়াতের স্বাধীনতা, নিরংকুশতা স্বীকৃত এবং তার পথ রুদ্ধকারী বস্তুগত শক্তির অবসান বুঝা যাবে।

আর সর্বশেষে নিরুপায়ের উপায় হিসেবে যুদ্ধকেই অবলম্বন করতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র কালেমা শ্রবণের মানুষের স্বাভাবিক অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত রাখার প্রচেষ্টার, তার সাথে পরম হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করার এবং বার বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত অমানবিক কার্যক্রমের এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত প্রতিষেধক। তারা যদি তা না করত, তা'হলে এই কালেমা অজ্ঞতা-মূর্খতার নিঃছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত, পরম নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরতার কোমল হিল্লোলের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত মানুষকে দুনিয়ার বুকে স্বচ্ছ স্পষ্ট আলোকধারা এবং মানবিক সুবিচার ও ন্যায়পরতা দিয়ে ধন্য করে দিতে পারত।

তবে মুসলমানদের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম জনগণ যদি যিম্মী হয়—মুসলিমগণ যদি তাদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে এবং তাদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে,[১] তা'হলে ইসলামের সুস্পষ্ট অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে

১. এই চুক্তি দুই পক্ষের মধ্যে যেমন আলাপ আলোচনার পর লিখিত হয়ে থাকে তেমনি-ই হতে হবে এমন কথা নয়। অবস্থা ও অনুসৃত আচার-আচরণের মাধ্যমে অলিখিতভাবেও হতে পারে। তবে কেউ তা লংঘন বা বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের সাধারণ আইনের ভিত্তিতেই তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

কোনরূপ পার্থক্যসূচক আচরণ গ্রহণ করা হবে না। তাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে, তা মুসলিম ধনী লোকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নেয়া যাকাতের সমতুল্য রাজস্ব বিশেষ। বিশেষ করে তাদের রক্ষণবেক্ষণের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তাতেই ব্যয়িত হবে এই জিযিয়া বাবদ পাওয়া অর্থ। কেননা তাদের জন্য মুসলিম জনগণের ন্যায় সমান মানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। কোনরূপ পার্থক্য বা তারতম্য ছাড়াই তাদের জন্যও থাকবে নিরপেক্ষ সুবিচার ব্যবস্থা। রোগ, অক্ষমতা ও বার্দ্ধক্যাবস্থায় তাদের জন্যও পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। ইসলাম তাদেরকে যাকাত দিতে বাধ্য করবে না। কেননা যাকাত একটা বিশেষ ইসলামী ইবাদতের বিধান। ইসলাম ব্যক্তিদের জন্য ধর্মমত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাই তাদেরকে কোন ইসলামী ইবাদত পালনে বাধ্য করা ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতেই অশোভন, অবাঞ্ছনীয়। এই কারণেই তাদের নিকট থেকে কর হিসেবে জিযিয়া আদায় করা হবে।

অবশ্য তারা নিজেরাই যদি জিযিয়ার পরিবর্তে মুসলিমদের ন্যায় যাকাত কর হিসেবে দিতে প্রস্তুত হয়, তা হলে তা গ্রহণ করতে ইস-লামের দিকদিয়ে কোন আপত্তি নেই। ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তও রয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে বনু তাগ্‌লিব গোত্র জিযি-য়ার পরিবর্তে যাকাত দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের নিকট থেকে তা-ই দ্বিগুণ করে গ্রহণ করা হয়।[১]

ইসলামী শাসনে অমুসলিম জনগণের চরম দুরবস্থার আশংকা প্রকাশ করে অনেক প্রাচ্যবিদ (Orientalist) পণ্ডিত ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বিশেষ করে শয়তানী ও বিদ্বেষী মনোভাবসম্পন্ন লোকেরা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ইসলামের প্রতি ক্রুদ্ধ করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তার বাস্তব কোন কারণের জন্য নয়; শুধু এইজন্য যে, শাসনটা চলছে ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে। আসলে এ বিদ্বেষ কেবল ইসলামের প্রতি, মুসলমানদের প্রতি। অবশ্য বহু মুসলিম নামধারী ব্যক্তিও ইসলামের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ইসলাম

---

১ كتاب الاموال لابى عبيد ص ١١٧ ، فتوح البلدان للبلاذرى ص ١٨٦

www.pathagar.com

সম্পর্কে—বিশেষ করে এই সংখ্যালঘুদের দোহাই দিয়ে বহু ভুল ধারণার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে। বিনিময়ে তারা ইসলামের দুশমন খৃস্টান মিশনারীদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং তাদের নিকট অনেক সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। অবশ্য এই কাজ ইসলাম-অভিজ্ঞ কোন ভদ্র ব্যক্তিই করতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষ করে ইসলামের বিপর্যয়ের এই সময়ে উক্ত শ্রেণীর লোকদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী সমাজে অমুসলিম বা অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের আচরণ পর্যায়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য, শুরু থেকেই ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিম জনগণকে নিম্নোক্ত-ভাবে চার বিভাগে বিভক্ত করা হতোঃ

১. মুশরিক, ২. আহলি কিতাব, ৩. মুনাফিক ও ৪. চুক্তিবদ্ধ।

মুশরিক জনতা যখনই দীন-ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই যুদ্ধ কেবল ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার লক্ষ্যে, ইসলামী জীবন বিধানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপ এবং ইসলামের অগ্রগমন ও সম্প্রসারণের পথ থেকে এই তাগূতী শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের উদ্দেশ্যে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছেঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ○
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُو
هُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ○ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط كَذَلِكَ

www.pathagar.com

جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ○
فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ○ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۔
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

এবং আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কিন্তু সীমালংঘন করবে না। কেননা আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। তাদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বহিষ্কৃত কর, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে। আর ফিত্‌না হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও কঠিনতর। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ না তারা সেখানে তা করছে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; তা হলে তোমরা তাদের হত্যা কর। কাফিরদের এটাই হচ্ছে কর্মফল। তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তা'হলে আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান। আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা উৎখাত হয়ে যায় এবং আনুগত্য-কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে তারা যদি পুনরায় বিরত হয়, তা হলে যালিম ছাড়া কারুর উপর বাড়াবাড়ি করা হবে না। মনে রেখো, হারাম মাসের বিকল্প হারাম মাসই হতে পারে। আর সব হারামত্বের মর্যাদা অভিন্ন। অতএব তোমাদের উপর যে বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও অনুরূপভাবে তার উপর বাড়াবাড়ি কর। অবশ্য

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তাদের সংগেই রয়েছেন যারা তাঁর সীমাসমূহ ভংগ করা থেকে বিরত থাকে।

—সূরা বাকারা ঃ ১৯০-৯৪

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যারা ভয় করছ যে, কাফিররা তাদের আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা ও সেখানে 'উমরাহ' পালন করা থেকে তোমাদেরকে বাধা দেবে ওয়াদা ভংগ করেই। তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে ওদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ওরা দীন-ইসলামকে অচল করে দিতে বদ্ধপরিকর। যারা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় নিজেদের প্রতিরক্ষাস্বরূপ যুদ্ধে অংশ নেয়া পসন্দ করে না, তাদের জানা উচিত যে, তাদের এ যুদ্ধ করাতে দীনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্‌র কালেমার ব্যাপক প্রচারের সুযোগ হবে। এটা কারুর নফ্‌সের খাহেশ পূরণার্থে নয়, রক্তপাত পসন্দ করার ব্যাপারও নয় এটা। তোমরা নিজেরা যুদ্ধ শুরু করে সীমালংঘন করো না, যুদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করবে না। তাই বেসামরিক লোকদের,---স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের হত্যা করবে না, তাকেও নয়, যে তোমাদের নিকট সালাম দিয়ে উপস্থিত হবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। কেননা সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি এতই খারাপ জিনিস যে, আল্লাহ্‌ তা পসন্দ করেন না। বিশেষ করে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়, পবিত্র ভূমিতে এবং নিষিদ্ধ মাসে----

হ্যাঁ, তাদের যেখানেই পাবে তোমরা তাদের হত্যা করবে যখন তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘনীভূত হবে ও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করবে। তারা পবিত্র ভূমিতে আছে বলে তাদের প্রতি একটুও খাতির করা চলবে না। যেখানেই পাবে তাদের হত্যা করবে এবং তোমাদেরকে তারা যেখান থেকেই বহিষ্কৃত করেছে--(মক্কা নগরী) তোমরাও তাদের সেখান থেকেই বহিষ্কৃত কর। মুশরিকরা যে নবী করীম (স.) এবং সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করেছিল তা তো ঐতিহাসিক সত্য। তাদের বের হয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, তখন মক্কায় ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভবপর ছিল না, তার বিরুদ্ধে তারা কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে মেনে নেয়া হয়েছিল যে, এ বছর তাঁরা ফিরে যাবেন, পরবর্তী বছর আসবেন উমরাহ্‌ অনুষ্ঠান পালন করতে পারবেন

www.pathagar.com

এবং তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন। কিন্তু পরে তারা চুক্তি ভংগ করে। পরে আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও রহমত নাযিল করেন। তিনি তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু পরে তাঁরা মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন ও উমরা অনুষ্ঠান নিরাপদে পালন করতে সক্ষম হন। আর চুক্তি ভংগ করে যে সব মুশরিক তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সাথে মুকাবিলা করতেও তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের অনুমতি দানের কারণের উল্লেখ প্রসংগে আল্লাহ্ বলেছেন, ফিত্না হত্যার তুলনায় অতি কঠিন।

অর্থাৎ ওরা যে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, দীন পালনে কঠিনভাবে বাঁধা দিচ্ছে, দীন পালনের জন্য মুসলিমদের নানাভাবে নিপীড়নে জর্জরিত করে তুলেছে, দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট চালাচ্ছে, এটা হত্যা ও রক্তপাতের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন, দুঃসহ ও বীভৎস ব্যাপার। কেননা মানুষের আকীদা-বিশ্বাস রক্ষা ও তদনুযায়ী জীবন যাপনের পথে বাঁধাদানের মত কঠিন পীড়ন ও যন্ত্রণাদান আর কিছুই হতে পারে না, এজন্য যে, তারা তো একে নিজেদের ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণের একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তা-ই তাদের করতে দেয়া হচ্ছে না!

এই যুদ্ধ কার্যের ক্ষেত্ররূপে মসজিদে হারামকে গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তার অর্থ, যে লোকই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে-ই সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হবে। কিন্তু সে-ই যদি তথায় হত্যাকার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং তার পবিত্র মর্যাদা বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়, তা'হলে তাকে নিরাপত্তাও দেয়া যেতে পারে না, তার সাথে তখন আর কোন চুক্তিরই প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। সে-ই যখন সূচনা করেছে, সে নিজেই নিজেকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

'মসজিদে হারামে' যুদ্ধ বা হত্যাকাণ্ড—রক্তপাত অত্যন্ত বীভৎস ও জঘণ্য কাজ। সেখানে তা করার অনুমতি আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন একটি শর্তের ভিত্তিতে। সে শর্ত হচ্ছে, কাফির-মুশরিকরা যদি সেখানেই তোমদের উপর আক্রমণ চালায়, তা'হলে তোমরাও তাদের ছেড়ে দেবে না; তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, প্রতিআক্রমণ চালাবে। কোনক্রমেই তাদের নিকট নতি স্বীকার করবে না। এক্ষেত্রে সূচনাকারীই

www.pathagar.com

যালিম সাব্যস্ত হবে, প্রতিরক্ষাকারী নয়। আর কাফিরদের জন্য এটাই শাস্তি। মুসলমানদের আঘাতে কাফির ও কাফিরী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই মহান আল্লাহ্‌র চিরন্তন নীতি। কেননা তারাই প্রথমে সীমা-লংঘন করেছে, তারা যালিম যেমন মুসলমানদের প্রতি, মসজিদে হারামের উপরও এবং তাদের নিজেদের উপরও। অতএব তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

অবশ্য তারা যদি এই অপকর্ম থেকে ফিরে যায়, বিরত থাকে এবং কুফরী পরিহার করে, তা হলে আল্লাহ্ যেমন তাদের ক্ষমা করে দেবেন, তেমনি তাদের প্রতি রহমতও নাযিল করবেন। তাদের অতীত গুনাহ্-খাতা মা'ফ করে দেবেন।

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর প্রতি ঐকান্তিকভাবে আনুগত্যসম্পন্ন লোকদের অতীব নিকটে।

কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে, এ লড়াই চলতে থাকবে যতক্ষণ না কুফরী শক্তিটিই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেননা এই শক্তিই মুসলমানদেরকে নানাভাবে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করে, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। দীন-ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও দীনের প্রতিষ্ঠার পথে তা প্রচণ্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই তা অপসারণ করা একান্তই কর্তব্য।

তারই পরিণামে 'দীন' সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাবে। লোকেরা খালেসভাবে আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে দীন পালন করার সুযোগ পাবে। এপথে তাদের কোন ভয়-ভীতি বা সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হবে না। তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান কোন কঠিন জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে পড়বে না।

মুসলমানরা প্রথমদিকে মক্কী পর্যায়ে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় যেমন অতি অল্প ছিলেন, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়েও তেমনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। মুশরিক-কাফিররাই ছিল সমাজের প্রধান হর্তাকর্তা। মক্কা ছিল শিরক ও কুফরীর

www.pathagar.com

লীলাকেন্দ্র। কা'বা ঘরের অভ্যন্তর ছিল অসংখ্য মূর্তির স্থিতিস্থল। এই সময় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দীনের পূর্ণত্ব বিধান করতে চাইলেন, ইচ্ছা করলেন তাঁর আলো সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হোক, তিনি মু'মিনদের সেইভাবেই তৈরী হওয়ার সুযোগ দিলেন। মদীনা হ'ল তাঁদের প্রতিষ্ঠা লাভের কেন্দ্রভূমি। মক্কা তাঁদের হাতে বিজিত হ'ল। তাঁরা কা'বা ঘরের মূর্তি চিরদিনের জন্য অপসারিত করলেন। লাত-মানাত-উজ্জা চূর্ণ করে দিলেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ -

তোমার আল্লাহ্‌র বাণী সত্যতা ও ন্যায়পরতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করল। আল্লাহ্‌র কালেমা পরিবর্তনকারী কেউ থাকল না।

—সূরা আনয়াম ঃ ১১৬

তাই আল্লাহ্ বলেছেন, কাফির-মুশরিকরা যদি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন তৎপরতা পরিহার করে, দুষ্কৃতি থেকে বিরত হয়, তা হলে তাদের উপরও কোন বাড়াবাড়ি করা হবে না। তবে যালিমদের ব্যাপারে এই নীতি অপরিবর্তিত থাকবে, কার্যকর থাকবে চিরকাল। ওরা যদি ইসলাম কবুল করে, তা'হলে তারা হবে মুসলমানদের সমান মর্যাদা, সমান অধিকারসম্পন্ন ভাই, কোনরূপ আযাব-যন্ত্রণার সম্মুখীন তারা হবে না। যালিমদের ব্যাপারে ইসলামের উক্ত নীতি তো তাদের যুলুমের শাস্তি ও প্রতিবিধান স্বরূপ শিক্ষামূলক, যেন তারা যুলুম থেকে বিরত থাকে।

হারাম মাস হারাম মাসের বিকল্প। তার মর্যাদা বিনষ্ট করার জওয়াব হচ্ছে অনুরূপ হারাম মাসের মর্যাদা বিনষ্ট করা। অতএব এই মাসসমূহে যুদ্ধ করতে ভয় পেও না—যদি তোমাদের দীন প্রতিরক্ষা ও আল্লাহ্‌র কালেমার প্রচারের জন্য তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কাফিররা যে হারাম মাসের মর্যাদা বিনষ্ট করেছে, তার প্রতিকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই অনুরূপ হারাম মাসেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের মস্তক চূর্ণ করে দিতে একটুও দ্বিধা করা হবে না। ওরা যদি তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এই হারাম মাসে, তা'হলে তারাই এই মাসের মর্যাদা বিনষ্ট করলো, তারাই

www.pathagar.com

হলো হারাম মাসের মর্যাদা নষ্ট করার প্রথম অপরাধী। তা হলে এই মাসেই তাদের উপর আক্রমণ করতে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মক্কা জয় করে নিতে কোন কিছুরই পরোয়া করা চলবে না। ওরা যদি চুক্তি অনুযায়ী এ বৎসর উমরার 'কাযা' আদায় করতে না দেয় ও তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তা হলে তোমরা ওদের হত্যা করবে। কেননা সীমালংঘন-কারীদের উপর অনুরূপ মাত্রায় সীমালংঘন করা ইসলামের শাশ্বত বিধান। আর 'কিসাস' স্বরূপ যা কিছু করা হবে, তা সীমালংঘন নামে অভিহিত হতে পারে না, সে সীমালংঘন সমর্থিত।

বস্তুত শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনরূপ মন্থরতা বা কুণ্ঠিত মনোভাব ছাড়াই প্রবল শক্তিতে লড়াই করতে হবে, উপরোদ্ধৃত গোটা আয়াতসমূহের এটাই নির্দেশ। কাজেই যে শত্রুপক্ষ অগ্নি গোলা, বিমান বিধ্বংসী কামান বা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে যুদ্ধ করবে, তার সাথে অনুরূপ শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় যুলুম, সীমালংঘন ও ফিত্না থেকে তাদের বিরত রাখা এবং জনমনে নিরাপত্তা বোধ ও শান্তি-স্বস্তি জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হবে না।

তাই তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে যারা বিরত থাকবে ও দীনের দুশমনদের মুকাবিলায় প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তারা প্রকৃত মুত্তাকী এবং এই মুত্তাকীদের সংগেই রয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা তিনি এদের সাহায্য করবেন উদার ভাবে, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ তাদের পক্ষেই সম্ভবপর হবে। শত্রুরা পরাজিত হবে এদেরই হস্তে, দীনের প্রতিষ্ঠা হবে এদের দ্বারাই এবং দীনের বিজয় পতাকা মহাজয়ে পতপত করে উড়তে থাকবে এদেরই বলিষ্ঠ বাহুতে।

ইসলাম রক্তের পিপাসু নয়। শান্তি ও নিরাপত্তাই মুসলিমদের চরম লক্ষ্য। যে-কোন সুযোগে শান্তি স্থাপনে ইসলাম কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। এজন্য আল্লাহ্র ফরমান নাযিল হয়েছে এ ভাষায়ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ

www.pathagar.com

مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا

سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ ۝

হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেলে মুশরিকদের তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, তাদের পরিবেষ্টিত করবে এবং তাদের ধরবার বা হত্যা করার জন্য প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তা হলে তোমরা তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাক্ষমাকারী, অতিশয় দয়াবান।

—সূরা তওবা ঃ ৫

যে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালার এই ফরমান, এক কথায় তাকে বলা যায় যুদ্ধাবস্থা। আর যুদ্ধাবস্থায় কাফির-মুশরিকদের মস্তক চূর্ণ ও নিঃশেষে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো মুসলমানদের দীনী কর্তব্য—এটাই স্বাভাবিক। তখন কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে তাদের একবিন্দু রেহাই দেয়া বা কোনরূপ বিনম্রনীতি গ্রহণ করা চলবে না। যুদ্ধের যত পন্থা, পদ্ধতি ও শত্রু নিধনের যে-কোন উপায় অবলম্বন সম্ভব, তা অবশ্যই করতে হবে। তন্মধ্যে তিনটি কাজের প্রতি আয়াতটিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ঃ

প্রথম, কাফির-মুশরিকদের লাঞ্ছনার বন্ধনে বন্দী করতে হবে।

দ্বিতীয়, শত্রুদের অবরুদ্ধ, পরিবেষ্টিত করে ফেলতে হবে। তারা যে-কোন দুর্গ বা প্রতিরক্ষা ব্যূহে আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, তা ঘেরাও করে তাদের বের হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে আত্মসমর্পণে তাদের বাধ্য করতে হবে। অথবা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধ্বংস করা সম্ভব হলে তাই করতে হবে।

তৃতীয়, শত্রু ধরা বা ঘায়েল করার জন্য প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে বলে মনে করা যাবে, সেখানেই পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে ওঁৎপেতে থাকতে হবে, এজন্য দূর থেকে তাদের অলক্ষ্যে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে।

www.pathagar.com

'তারা যদি তওবা করে' অর্থ, তারা যদি শির্‌ক পরিহার করে তাওহীদী আকীদা গ্রহণ করে। কেননা তাদের শির্‌ক ও কুফরী আকিদাই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও যুদ্ধবতরণের মূলীভূত কারণ ছিল।[১]

এই তওবা করা, অর্থ শিরক ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ। আর ইসলাম গ্রহণের বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে নিয়মিত সালাত ও যাকাত আদায় করা। এ দুইটি ইসলামী জীবন বিধানের ভিত্তি। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে ইসলাম কবুল করায় তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের আর কিছুই করণীয় থাকে না, তখন তারা পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ্‌ও তাদের শির্‌কের গুনাহ্‌ মা'ফ করে দেবেন। তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।

বস্তুত ইসলাম অকারণ রক্তপাতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং মানুষের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দানকারী। আর তা বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ
كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে অবতরণ করবে, তখন তোমরা প্রত্যেকটি বিষয়ে স্পষ্ট জানতে সচেষ্ট হবে এবং

---

১. احكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ١٠١ ، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج ٨ ص ٧٣

www.pathagar.com

যে-লোক তোমাদের সাথে সালাম দিয়ে সাক্ষাত করবে, তাকে বলবে না যে, 'তুমি মু'মিন নও।' তোমরা হয়ত দুনিয়ার জীবনের স্বার্থটাই বড় করে চাইবে। অথচ আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল। তোমরা পূর্বে এমনিই তো ছিলে। পরে আল্লাহ্ তোমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। অতএব সব বিষয়ে বিস্তারিত ও প্রকৃত ব্যাপার জানতে চেষ্টিত হবে। তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সব সময়ই সু-অবহিত। —সূরা নিসাঃ ৯৪

হযরত ইমরান ইবনে হুচাইন (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী[১] আয়াতটির অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ও পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে, রসূলে করীম (স.) মুসলমানদের একটা বাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তখন তথায় কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাহিনীর এক সৈনিক এক ব্যক্তির উপর বল্লমের আঘাত হানে। তখনই লোকটি বলে উঠেঃ 'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আমি একজন মুসলমান···কিন্তু তার এই কালেমা উচ্চারণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না; তাকে হত্যা করা হয়। পরে আক্রমণকারী ব্যক্তি রসূলে করীম (স.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেঃ 'হে রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি', জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি কি করেছ?' তখন সে পূর্ণ কাহিনীর বিবরণ পেশ করে। রসূলে করীম (স.) সব শুনে বললেনঃ

فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ -

'তুমি কেন তার পেট ছিন্ন করে দেখলে না? তা'হলে তার দিলে কি ছিল তা তুমি জানতে পারতে? অন্তত সে মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করেছিল তা-ও তুমি গ্রাহ্য করলে না! তার মনের কথাও তুমি জানলে না!'

---

১. এ বর্ণনাটি ইবনে মাজা গ্রন্থে উদ্ধৃত। বুখারীতে আতা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছেঃ কতিপয় মুসলমান সফরে বের হলে এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যার সংগে বহু উট ও ছাগল রয়েছে যা সে বিক্রয় করবে। লোকটি মুসলমান দেখে সালাম জানায় ও কালেমা উচ্চৈস্বরে পাঠ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের একজন লোকটিকে হত্যা করে ও তার সংগের পশুগুলি কেড়ে নেয়। ইবনে ইসহাক, মুসনদে আবু দাউদ ও আবদুল বা'র রচিত আল-ইস্তিয়াব গ্রন্থের বর্ণনা মতে হত্যাকারীর নাম মুহাল্লাম ইবনে সালামাতা ও নিহত ব্যক্তির নাম আমের আজরাত।
—الجامع لاحكام القرآن ج ٥ ص ٣٣٨ -

www.pathagar.com

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

এ আয়াতে হত্যাকার্যের পূর্বে লোকটিকে হত্যা করা যায়—এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা যে একান্তই কর্তব্য তা সফরকালে হোক, কি নিজের বাড়ীতে উপস্থিত থাকা অবস্থায়, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। ঘটনাটি সফরকালে সংঘটিত হয়েছিল বলেই আয়াতে সফরের উল্লেখ করা হয়েছে। যে লোক সালাম দিল এবং আত্মসমর্পণ করল, ঈমান প্রকাশ করল—কালেমা উচ্চারণ করল, তাকে 'তুমি মু'মিন নও' বলার কোন অধিকার কারুর নেই।

পরে বলা হয়েছে, মুসলমান যুদ্ধাবস্থায় যে-কোন কাফিরকে যেখানেই এবং যে অবস্থায়ই পাবে, হত্যা করতে পারবে যদি তার সাথে কোন চুক্তি না থাকে। আর যদি লোকটি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ পড়ে, তা হলে তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা সে ইসলামের রক্ষা ব্যূহের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যা তার রক্ত প্রবাহিত করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনও যদি সেই লোকটিকে হত্যা করা হয়, তা হলে সে হত্যার কিসাস হবে এবং হত্যাকারীকে মৃতুদণ্ড দেয়া হবে। উপরিউক্ত ঘটনায় হত্যাকারী সৈনিককে অবশ্য এই দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি। কেননা তখন ছিল ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা, কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সূচনাকাল। সৈনিকটি নিহত লোকটির কালেমা পাঠকে প্রকৃত ঈমানের প্রমাণ মনে করতে পারেনি—ভয় পেয়ে সে তা করেছে বলে মনে করেছে, আর এই কারণেই নবী করীম (স.) তাকে উক্ত কথা বলেছিলেন।[১]

নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا

---

১. অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই হত্যাকারীকে এই হত্যার জন্য দিয়ত দিতে নবী করীম (স.) বাধ্য করেছিলেন। الجامع لأحكام القرآن القرطبى ج ٥ ص ٣٣٦

الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ○

আমি আদিষ্ট হয়েছি, লোকেরা যতক্ষণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্য না দেবে, সালাত কায়েম না করবে, যাকাত না দেবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকব। যদি তারা এইসব করে, তা হলে তারা, তাদের রক্ত ও ধন-মাল আমার আঘাত থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের যা প্রাপ্য হবে তা অবশ্য আদায় করা হবে এবং তাদের হিসাব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে।[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ

রসূলে করীম (স.) হারাম মাসে যুদ্ধ করতেন না। তবে এই মাসে তাঁর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে অন্য কথা। সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে সশস্ত্র হতেন। এই কারণে ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলকাদ মাসে তিনি যখন উমরা করার নিয়্যাতে মক্কা যাত্রা করলেন এবং হুদাইবিয়ায় তাঁবু গেড়ে বসলেন, হযরত উসমান (রাঃ) নিহত হয়েছেন বলে খবর এলো—তিনি মুশরিকদের নিকট প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন—রসূলে করীম (স.) সংগী-সাহাবিগণের বায়'আত গ্রহণ করলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। একটি গাছের তলায় এই বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে বায়'আত ছিল কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। পরে যখন জানা গেল যে, হযরত উসমানের শহীদ হওয়ার খবর মিথ্যা ছিল, তখন তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেন এবং শান্তি ও সন্ধিতে প্রস্তুত হলেন।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) যখন তাঁর সৈন্য বাহিনী যুদ্ধে প্রেরণ করতেন, তখন বলতেন ঃ

---

১. হাদীসটি বুখারীসহ সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে।

২. বুখারী, মুসনাদে আহমদ



www.pathagar.com

তোমরা আল্লাহ্‌র নামে বের হও, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে, সীমালংঘন করো না, বাড়াবাড়ি করো না, নিহত ব্যক্তির হাত-পা কেটে বিকৃত করো না। শিশু এবং গীর্জাবাসীদের হত্যা করো না।[৩]

**দ্বিতীয় পর্যায়ে আহলি কিতাব খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের প্রতি ইসলামের আচরণ—ইসলামের ভূমিকা**

যে-সব মুশরিক মুসলমানদের তাদের ঘর-বাড়ী ও মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তাদের দীন থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেয়া—দীন পালন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে প্রাণ-পণে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবিশ্রান্ত ও অমানুষিকভাবে চালিয়েছে, তাদের ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকার কথা পূর্বে বলা হ'ল। এ প্রেক্ষিতে আহ্‌লি কিতাব লোকদের প্রতি ইসলামের ভূমিকা হচ্ছে, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে জোরপূর্বক বাধ্য না করা বা তাদের মুসলমান বানাবার লক্ষ্যে বলপ্রয়োগ না করা। তবে তারাও যদি মুসলমান-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা'হলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা; যেন শেষ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পরিহার করে এবং বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صٰغِرُونَ -

তোমরা যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে

৩. আবু দাউদ, মুসলিম, ২য় খণ্ড

www.pathagar.com

হারাম মানে না এবং সত্য দীন অবলম্বন করে না---আহলি কিতাব লোকদের মধ্য থেকে ; যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের হস্তে জিযিয়া দিতে বাধ্য হচ্ছে। —সূরা তওবা : ২৯

তাফসীরে আল-মানার-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে :

আহলি কিতাবের লোকেরা যখন এমন ঘটনা ঘটাবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য হয়ে পড়বে। যেমন : মুসলমানদের উপর যখন তারা বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনমূলক কাজ করবে বা তাদের শহর-নগরের উপর আক্রমণ চালাবে ; কিংবা তাদের দীন পালনে বাধা দেবে, তাদের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হবে। সে যুদ্ধ চালাতে হবে যতক্ষণ না দু'টি ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হবে। তার একটি ব্যবস্থা হচ্ছে, তারা জিযিয়া দিতে রাজী হবে এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে, তারা নীচতা ও বশ্যতা স্বীকার করবে। তাদের জন্য প্রথম শর্ত হ'ল, তারা জিযিয়া দেবে তাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুপাতে। সাধ্য ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ জিযিয়া দিতে তাদের বাধ্য করা যাবে না, এজন্য তাদের উপর যুলুম করা হবে না। আর দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য যে, মুসলমানদের তুলনায় তারা ছোট হবে। তাদের দাপট ও প্রতাপ হ্রাস পাবে, তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেবে, মুসলমানদের শাসনাধীন থাকার জন্য আনুগত্য স্বীকার করবে। তখন তাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার এটাই হচ্ছে একমাত্র সহজ পথ। কেননা তারা যখন মুসলমানদের শাসনাধীন জীবন যাপন করবে তখন তারা একদিকে প্রকৃত হিদায়াতের বিধানের সাথে---দীন-ইসলামের বাস্তব রূপের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাবে। তারা খুব নিকটে থেকে মুসলমানদের উন্নত আদর্শ চরিত্র ও বাস্তব জীবনধারা এবং তাদের প্রতি শুভ আচার-আচরণ, ন্যায়পরতা ও সুবিচার এবং হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতামুক্ত পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করবে, তাদের বংশধররা তখন ইসলাম ও মুসলমান-দের প্রতি কোন শত্রুতা পোষণ করবে না এবং তার ফলে তাদের পক্ষে ইসলাম কবুল করার পথে আর কোন বাধাই অবশিষ্ট থাকবে না। আর তারাই যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে দীন-ইসলামের হিদায়াত ব্যাপক

www.pathagar.com

হয়ে পড়বে, সুবিচার নির্বিশেষ ও নিরপেক্ষ হবে, সকলেই একাত্ম হয়ে উঠবে। তখন তারা যদি ইসলাম কবুল না-ও করে, তবুও তোমাদের ও তাদের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠবে বিচারে সাম্য ও তারতম্যহীনতার ভিত্তিতে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবেশে ইসলাম গ্রহণের পথে তাদের সম্মুখে আর কোন প্রতিবন্ধকতাই অবশিষ্ট থাকবে না।

উপরিউক্ত কার্যকারণ ব্যতিরেকে যুদ্ধ করা প্রত্যক্ষভাবে কর্তব্য হওয়ার তুলনায় তাদের 'জিযিয়া' দিতে রাজী হওয়া অধিকতর উত্তম। আর তারা জিযিয়া দিতে রাজী হলে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সমর্থন ও সংরক্ষণ এবং তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং জিযিয়া দানের চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান—-মুসলমানদের সাথে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতেই তাদের প্রতি সুবিচার করা কর্তব্য হবে। তাদের উপর যুলুম করা এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া তখন সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে কোনরূপ ভিন্নতর ও পার্থক্যসূচক আচরণ গ্রহণ করা চলবে না। তখন তারা হবে 'যিম্মী'। তাদের যাবতীয় অধিকার সঠিকভাবে দেয়া হবে আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব, রসূলের অর্পিত দায়িত্ব এবং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের গৃহীত দায়িত্ব হিসেবে। এ দায়িত্ব যথাযথ পালনে কোনরূপ উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন করা চলবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মুনাফিকদের ব্যাপার। মুনাফিকী অত্যন্ত হীন ও মারাত্মক। ইসলামী সমাজের পক্ষে তা ভয়াবহ। ইসলাম মুসলিমদের এই ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছে এবং তাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান হচ্ছে ঃ

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ط

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ০

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ۝

ওরা কামনা করে তারা যেমন কুফরী অবলম্বন করেছে তোমরাও যদি অনুরূপ কাফির হতে তা' হলে তোমরা ও তারা সমান হয়ে যেত। অতএব এরূপ অবস্থায় তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক-রূপে গ্রহণ করবে না--যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করছে। যদি তারা এই নীতি গ্রহণ না করে, তা হলে তোমরা তাদের পাকড়াও কর এবং তাদের হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদের পাবে। আর তাদের মধ্য থেকে কোন লোককে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে না, কাউকে সাহায্যকারীরূপেও নয়। —সূরা নিসা ঃ ৮৯

সন্দেহ নেই, আয়াতটিতে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করার পর তা ত্যাগ করেছে ও ইসলামী রাজ্যসীমা থেকে বাইরে চলে গেছে এবং সেখানে থেকে তারা মুসলমানদের উপর নানাভাবে বাড়াবাড়িও করতে শুরু করেছে। কুফরী কাজে নিজেরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে এবং অন্য লোকদেরও গুমরাহ্ করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরাই কামনা করে যে, তারা যেমন ইসলাম ত্যাগ করেছে, ঈমানের পর কুফরী অবলম্বন করেছে, তোমরাও অনুরূপ-ভাবে কুফরী অবলম্বন কর। তাহলে তোমাদের ও তাদের মধ্যে নীতি, আদর্শ ও ঈমানগত কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না। কুফরী ও গুমরাহীতে পরম অভিন্নতা বিরাজ করবে। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে ; 'তাদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে তোমরা তাদের কোনরূপ সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করবে না।' কেননা তা হলে তোমাদেরও কুফরীর মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে। তারা যদি ঈমান জাহির করে তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক হয়-ও, তবু তোমরা তাদের উপর একবিন্দু আস্থা স্থাপন করতে পারবে না—যতক্ষণ না তারা হিজরত করে পুনরায় ইসলামী রাজ্যে বসবাস শুরু করে। তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করতে হবে। অর্থাৎ কাফিরী রাজ্যে বসবাস ত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে, আর তা করতে রাজী না হলে--না করলে, হিজরত করার সাধ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হিজরত করা থেকে বিরত থাকলে তাদের মুখে ইসলামের স্বীকৃতি

www.pathagar.com

ও প্রকাশ সত্ত্বেও তারা মুরতাদরূপে গণ্য হবে। তখন তাদের সাথে সেই অবচরণই গ্রহণ করতে হবে, যা করা হয় যুদ্ধমাসে কাফিরদের সাথে। কেননা তারা কুফরী রাজ্যে বসবাস শুরু করায় তারা আর মুনাফিক থাকেনি, তারা স্পষ্টভাবে কাফির হয়ে গেছে। অতএব এখন তাদের পাকড়াও করতে হবে—যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে এবং ইহ্‌রাম ও অ-ইহ্‌রাম উভয় অবস্থায়ই তাদের হত্যা করা কর্তব্য হবে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের সবাইকে মুসলমানদের বন্ধু মনে করা যাবে না, কারুর সাথে বন্ধুত্বও করা যাবে না। এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার জন্যও তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না, তাদের সাহায্য গ্রহণ করা চলবে না। তাদের প্রতি এই আচরণ রক্ষা করতে হবে যতদিন তারা সেই অবস্থায় থাকবে। সে অবস্থার পরিবর্তন হলে তাদের সাথে আচরণও পরিবর্তিত হবে।

এরপর আসে চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে আচরণের ব্যাপার।

এ কথা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে. ইসলাম চুক্তি ও ওয়াদার সম্মানকারী দীন। ইসলাম পালনকারীদের প্রতি কড়া নির্দেশ রয়েছে, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার এবং তাতে একবিন্দু ব্যতিক্রম না করার। তবে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ নিজেরাই যদি চুক্তিভংগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চুক্তিবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে, তা'হলে স্পষ্ট ভাষায় সে চুক্তির অবসান ঘোষণা করতে হবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ط

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ○

কোন চুক্তিবদ্ধ জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগের ভয় পেলে তুমি তাদের প্রতি সে চুক্তি নিক্ষেপ কর, তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর সমান আচরণ গ্রহণ স্বরূপ। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই চুক্তিভংগকারী বিশ্বাস-ঘাতক লোকদের পসন্দ করেন না। —সূরা আনফাল ঃ ৫৮

এই নির্দেশটি স্পষ্টভাবে রসূলে করীম (স.)-এর প্রতি। তার সার-কথা হচ্ছে, কোন চুক্তিবদ্ধ জনগোষ্ঠী যদি চুক্তি-বিরোধী কার্যকলাপে

www.pathagar.com

লিপ্ত হয়, তখন তোমরাও তাদের মত চুক্তিবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হবে না; বরং তখন তোমাদের নীতি হবে, তোমরা অপর পক্ষের চুক্তিবিরোধী কার্য-কলাপের দরুণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দেবে যে, 'যেহেতু তোমরা চুক্তির বিরোধিতা শুরু করেছ, অতএব আমরা আর সেই চুক্তি পালন করে চলার বাধ্য-বাধকতার মধ্যে থাকলাম না। এখন আমরা তা পালন করতে বাধ্য নই। চুক্তি তো পারস্পরিক হয়ে থাকে এবং উভয় পক্ষ সমানভাবে তা পালন ও রক্ষা করে চলতে বাধ্য থাকে। কিন্তু তোমরা যখন তা লংঘন করেছ আমরা সে কারণে সে বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছি। অতঃপর তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন সন্ধিচুক্তি নেই। এখন তোমাদের ও আমাদের মাঝে যুদ্ধই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হবে।' উভয় পক্ষ এক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে অভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বাস-ঘাতকদের ভালোবাসেন না এমন কি সে মুসলমানরা হলেও; এবং কাফিরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হলেও তা ঘৃণ্য ও পরিহারযোগ্য। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা স্বতঃই একটা অপরাধ। তা যারাই করুক না কেন, অপরাধী তারা হবেই। কাফিরদের সাথেও তা করা হলে তার অপরাধ হওয়ার মাত্রা একটুও কম হবে না, তা ক্ষমাও করা হবে না।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রোমানদের রাজ্যভুক্ত এলাকায় পরিভ্রমণ করছিলেন। রোমানদের সাথে ছিল অনাক্রমণের চুক্তি। হযরত মুয়াবিয়া পরিকল্পনা করেছিলেন যে, রোমানদের কাছাকাছি এলাকায় পরিভ্রমণ করাকালে চুক্তির মেয়াদ নিঃশেষ হওয়ার সংগে সংগে হঠাৎ করে আক্রমণ করে দেবেন। কিন্তু এই সময় দেখা গেল; এক বৃদ্ধ ব্যক্তি জন্তুযানে সওয়ার হয়ে ধ্বনি তুললেন, 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়াদা পূরণ করতে হবে, চুক্তি ভংগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। কেননা রসূলে করীম (স.) বলেছেন, যাদের অন্য জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি থাকবে, তার কোন ধারা লংঘন করবে না, তা বন্ধও করবে না— যতক্ষণ না তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথবা সে চুক্তি তাদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার করবে; জানিয়ে দেবে যে, অতঃপর চুক্তি বহাল নেই।' মুয়াবিয়া (রাঃ) এ কথা শুনে স্থানত্যাগ করে চলে গেলেন। দেখা গেল, এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন হযরত আমর ইবনে উনাইসা (রাঃ); রসূলে করীম (স.)-এর একজন সাহাবী।[১]

১. মুসনাদে আহমদ, সলীম ইবনে আমের বর্ণিত হাদীস, আবু দাউদ, তিরমিযী।

www.pathagar.com

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বিপুল সংখ্যক বাহিনী সংগে নিয়ে কোন শত্রুপক্ষীয় দুর্গ বা নগরের নিকটে উপস্থিত হলেন। বললেনঃ 'তোমরা থাম, আমি এখানকার লোকদেরে তেমনি দাওয়াত দেব, যেমন রসূলে করীম (স.)-কে দাওয়াত দিতে আমি দেখেছি।'

পরে তিনি সেখানকার লোকদেরে ডেকে বললেনঃ 'দেখো, আমি তোমাদের মতই একজন লোক ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম কবুল করার তাওফীক দিয়েছেন। এক্ষণে তোমরাও যদি ইসলাম কবুল কর, তা'হলে তোমাদের ও আমাদের অবস্থা অভিন্ন হবে। তোমরা সেইসব অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে, যা আমাদের মুসলমানদের রয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও তা-ই হবে যা আমাদের রয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার কর, তা হলে তোমরা আমাদের প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে জিযিয়া দিতে রাজী হও। তোমরা যদি চুক্তির এই শর্ত মেনে চলতে অস্বীকার কর বা তা লংঘন কর তা'হলে আমরাও সে চুক্তি তোমাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করে দিয়ে তোমাদের অবস্থায় ফিরে যাব—তখন তোমরা ও আমরা অভিন্ন হয়ে দাঁড়াব। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা চুক্তি ভংগকারী বিশ্বাসঘাতকদের পসন্দ করেন না।

তিনি এই কথা নিয়ে তিনটি দিন অতিবাহিত ও ফয়সালা চূড়ান্ত করার অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার মধ্যেও যখন প্রতিপক্ষ এই আহ্বানে সাড়া দিল না--কোনরূপ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী হ'ল না, তখন চতুর্থদিন আসামাত্রই তিনি তাদের উপর আক্রমণ করলেন এবং আল্লাহ্র মদদে তা জয় করে নিলেন।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কারুর উপর সীমালংঘনের পক্ষপাতী নয়; কাউকে ইসলাম কবুল করার জন্য বল প্রয়োগে বাধ্য করাও ইসলামী নীতির পরিপন্থী। কোন পক্ষ যদি সীমালংঘনমূলক বাড়াবাড়ি করে, তা হলে তার উপযুক্ত জওয়াব দেয়া হবে, আঘাতের উত্তরে সমমানের প্রত্যাঘাত করা হবে। আর কেউ যদি যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাযী হয়, তা হলে ইসলাম সে শান্তির জন্য দুই বাহু প্রসারিত করতেও প্রস্তুত। আল্লাহ্র পথ নির্দেশ হচ্ছেঃ

www.pathagar.com

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

শান্তির জন্য তারা যদি বাহু বিছিয়ে দেয়, তা হলে তোমরাও তার জন্য প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরতা গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১] —সূরা আনফাল ঃ ৬১

**হেরার গুহা থেকে**

ইসলামের সর্বাত্মক কল্যাণময়ী দীনী দাওয়াতের উন্মেষ ঘটেছে হেরা পর্বতের গুহায়। ইসলামের আদর্শাবলী মহান জীবনের জন্য মৌলনীতি বিশেষ। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকেই তা গ্রহণ করার আহ্‌বান জানানো হয়েছে। এ দাওয়াত যেমন প্রত্যেকটি মানুষের মন ও মগজ-দিলকে বাতিল আকীদাসমূহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে, তেমনি উন্নতমানের নির্ভুল চিন্তা ও বিশ্বাসে ভরপুর ও বলিষ্ঠ করে তোলে। মানব সমষ্টিকে সর্ব-প্রকার চৈন্তিক-সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে মুক্ত করে, বীভৎস, জঘন্য আদত-অভ্যাস-চরিত্র এবং যালিম শাসকের অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দান করে, উন্নত আদর্শ সমাজের নাগরিক হওয়ার পথনির্দেশ এবং সুযোগ করে দেয়।

দীন-ইসলাম নাযিল হয়েছে আল্লাহ্‌র মনোনীত মহান ও শ্রেষ্ঠ নবীর নিকট কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের মাধ্যমে। ইসলাম উপস্থাপিত করেছে অতীব উচ্চমানের মহান রীতি-নীতি ও আদর্শ। তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তাঁরই উপর অর্পণ করা হয়েছিল। সেই নির্দেশ পেয়ে মুহম্মদ (স.) হিদায়েতের মশাল ধারণ করে হেরার গুহা থেকে বের হয়ে এলেন চতুর্দিক হিদায়েতের নির্মল আলোক-ছটায় শুভ্র সমুজ্জ্বল করে দিতে। সকলকে আকুল আহ্‌বান জানালেন সে মহান আদর্শের প্রতি ঈমান আনার জন্য, তা গ্রহণ করে উন্নত মানবিক জীবন যাপন করার জন্য। তাঁর প্রতি নির্দেশ হয়েছিল ঃ

---

১. রসূলে করীম (স.) এই অনুযায়ী বহুক্ষেত্রেই আমল করেছেন।
الجامع لاحكام القران ج ٨ ص ٤٠-٤١

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -

যে কাজের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে তুমি তা উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করে ঘোষণা করে দাও --- এবং মুশরিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করো না। —সূরা হিজর : ৯৪

নবী করীম (স.) দীনী দাওয়াতী কার্যে সর্বাধিক অবলম্বন করেছেন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের পন্থা, গভীর বুদ্ধিমত্তা ও প্রাঞ্জল, চিত্তহারী উন্নত-উত্তম উপদেশদানের প্রক্রিয়া এবং জনগণকে সুস্থে-ধীরে বুঝিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পথ। দীন-ইসলামের দাওয়াত এমনিভাবে দেয়ার নির্দেশই তাঁকে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ তায়ালা :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

তোমার রব-এর পথের দিকে আহ্বান জানাও বুদ্ধিমত্তাসম্মত যুক্তি-প্রমাণ ও উত্তম মর্মস্পর্শী উপদেশদানের সাহায্যে এবং প্রতিপক্ষের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কে উপনীত হও। —সূরা নাহল : ১২৫

দীনী দাওয়াতী কাজের এ একটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর নবীকে এই পন্থার নির্দেশ করেছেন দীনী দাওয়াতের স্থায়ী ও সঠিক কর্মনীতি হিসেবে। কেননা সহজ, স্বভাবসম্মত যুক্তি-প্রমাণ ও প্রাঞ্জল উপদেশমালা দিয়ে যদি দীনের দাওয়াত পেশ করা হয় এবং তাতে অপরিসীম ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ধীরতা-সহজতা অবলম্বিত হয়, দাওয়াতকালে অন্তরের দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়, তা হলে আল্লাহ্র বন্দেগী কবূলের এই দাওয়াত গ্রহণের জন্য জন-মানস আগ্রহী হয়ে উঠবে। তারা ডাকে সাড়া দেবে, দীন কবূল করবে। এ নবতর দাওয়াত গ্রহণ করে জনতার পক্ষে একত্রিত হওয়া খুবই সহজ ও সম্ভবপর হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু দীন-ইসলামের মৌল আকীদা আরব মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ও জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহমান। তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সত্যের এ আওয়াজ যাতে তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে মর্মকে স্পর্শ করতে না পারে, সেজন্য তারা কান বন্ধ করে থাকত, এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ধারে কাছে না এসে দূরে দূরে সরে থাকত ও চলত। তাদের মনে জেগে উঠেছিল তীব্র অহংকারজনিত শত্রুতা ও বিরোধিতা। তারা রসূলে করীম (স.)-এর উপস্থাপিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না, যদিও কোন যুক্তিকে কেটে ফেলার কোন ক্ষমতাই তাদের ছিল না। এই দীনী দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে রসূল (স.) কর্তৃক কয়েকটি মু'জিযা---অস্বাভাবিক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল। এ সবের দ্বারা তাঁর নুবুওয়্যাত-রিসালাতের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছিল। কিন্তু তাদের উপেক্ষা চলতেই থাকল।

মুশরিকরা কেবল এ দাওয়াত কবুল না করেই ক্ষান্ত থাকল না, তারা রসূলের সাথে প্রকাশ্যে ও ইতিবাচকভাবে চরম শত্রুতা শুরু করে দিল, তারা রসূলে করীম (স.)-এর একটা যুক্তিও কাটতে পারেনি, একটা প্রমাণও মিথ্যা বলতে সক্ষম হয়নি, মু'জিযাকে পারেনি অমূলক বলতে । আর এসব ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও---বরং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা চরম শত্রুতা এবং নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড় বইয়ে দিল।

কাফির-মুশরিকরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে শুধু দীন গ্রহণে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকত, তা হলেও ব্যাপারটা সহজই থাকত। মুসলমানরা তাদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ও যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, হওয়ার কোন প্রয়োজনও দেখা দিত না।

কিন্তু ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রসূলে করীম (স.)-এর দীনী দাওয়াতী তৎপরতা যতই ব্যাপক হতে লাগল, তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা, শত্রুতা এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিষ্পেষণের মাত্রা ততই বৃদ্ধি করে দিল।

দীন-ইসলামের এ তওহীদী দাওয়াত ছিল আরবের মুশরিক সমাজের নিকটে একান্তই অভিনব। তা সহসা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা যেমন বিচিত্র কিছু নয়, অস্বাভাবিকও নয়। তা করার অধিকার তাদের থাকতে পারে এবং

www.pathagar.com

পিতৃপুরুষ থেকে আবহমান কালধরে চলে আসা ধর্ম পালনে অবিচল হয়ে থাকার অধিকারও অস্বীকার করা যায় না। সে অধিকার সত্যভিত্তিক না-ই হোক—নিতান্ত বাতিলভিত্তিকই হোক, তাতেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেউ নতুন কোন দীনের দাওয়াত পেশ করছে বলে তার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করতে হবে, শক্তিপ্রয়োগে তা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করা হবে, তার ও তার সংগী-সাথীদের অত্যাচার-নিপীড়নের স্টীম রোলার চালানো হবে, তা আদৌ যুক্তিসংগত হতে পারে না। সে অধিকার কারুর আছে বলে স্বীকার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

কিন্তু মুশরিক আরবরা তা-ই শুরু করে দিয়েছিল। ইসলামের বৃক্ষ অংকু-রেই বিনষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছিল তারা। ইসলাম কবুলকারী নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে ধ্বংস করে ফেলতে তাদের চেষ্টা ও তৎপরতার অন্ত ছিল না; যদিও তা করার অধিকার তাদের ছিল না। সত্য দীনের বিরুদ্ধে তাদের নিকট কোন যুক্তি ছিল না, সত্য দীনের পক্ষে পেশ করা রসূলে করীম (স.)-এর একটা যুক্তিকেও তারা খণ্ডন করতে পারেনি এবং তাদের ধর্মমতের সমর্থনে কোন যুক্তিই তারা উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়নি। ফলে তাদের মনে জেগে উঠেছিল পরাজিতের তীব্র হিংস্র ক্ষোভ। আক্রোশে তাদের কলিজা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। তারা চরম প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছিল। তাই সর্বশক্তি দিয়ে দীন-ইসলামের সাথে তারা শুরু করে দিয়েছিল মারাত্মক ধরনের শত্রুতা।

তাদের অত্যাচার-নিপীড়নের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ, কাহিনীগুলো খুবই মর্মন্তুদ। বুখারী উদ্ধৃত ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

> আমরা মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিলাম, রসূলে করীম (স.) নামায পড়ছিলেন। তখন আবু জেহেল ডাক দিয়ে বলল ঃ 'কেউ আছ, যে অমুক গোত্রের যবাই করা উটের ছিন্ন-ভিন্ন নাড়ি-ভুড়ি নিয়ে এসে সিজ-দায় থাকা অবস্থায় মুহম্মদের উপর ফেলবে?' এই ডাক শুনে উক্‌বা ইবনে আবু মুয়ীত উঠে দাঁড়াল এবং সেই নাড়ি-ভূড়ি নিয়ে এসে নবী করীমের উপর সিজদায় থাকা অবস্থায় ফেলে দিল। এই সময় যে কয়জন মুসলিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজনও তাঁর উপর থেকে তা সরিয়ে দিতে পারল না। কেননা তাঁরা তাঁদের শত্রুদের প্রতিরোধ

www.pathagar.com

করতে সক্ষম ছিলেন না। রসূলে করীম (স.) সিজদাতেই পড়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা এসে নিজ হাতে সেই ময়লা ধরে দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন। অতঃপর রসূলে করীম (স.) উঠে এই বীভৎস কাজটি যে করেছে, তার নামে বদদোয়া করলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِالْمَلَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ -

হে আল্লাহ্! তুমিই এই কুরাইশ সরদারদের সাথে বোঝাপড়া কর।

এবং কিছু লোকের নাম উচ্চারণ করলেন।[১] হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি, বদর যুদ্ধে সেই কয়জন লোকই নিহত হয়েছিল।'

অনুরূপ কষ্টদানের আর একটি ঘটনা এই ঃ

রসূল করীম কা'বার পার্শে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সহসা উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত এসে রসূলে করীম (স.)-এর গলায় তার কাপড় জড়িয়ে শক্ত করে কষে দিল। তাতে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। হযরত আবুবকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাঁর কাঁধ ধরে কাপড়টা সরিয়ে দিলেন এবং খুবই জড়িত দ্রবীভূত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যার অপরাধ শুধু এতটুকু যে, তিনি বলছেন, আমার রব হচ্ছেন মহান আল্লাহ্? অথচ তিনি তোমাদের আল্লাহ্র নিকট থেকে তাঁর এই দাবির সমর্থনে বহু অকাট্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন?'[২]

মক্কার কাফির-মুশরিকরা কেবল নবী করীম (স.)-এর উপর প্রাণান্তকর কষ্ট ও জ্বালাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর সাহাবিগণের উপর ও তাঁর তাওহীদী দাওয়াত কবুলকারী বহুলোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও যুলুম চালাতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি।

হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ্ (রাঃ)-এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। তিনি উমাইয়া ইবনে খাল্ফের ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়া তাঁর গলায় রশি বেঁধে বালকদের হাতে ছেড়ে দিত, তারা তাঁকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠত।

১. বুখারী শরীফ
২. বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

আর বিলালের মুখে সার্বক্ষণিক ধ্বনি উচ্চারিত হ'ত 'আহাদ,' 'আহাদ'— 'আল্লাহ্ এক,' 'আল্লাহ্ এক'……

এত অত্যাচার-যুলুমেও তাঁর তাওহীদী আকীদায় একবিন্দু দুর্বলতা দেখা দেয়নি।[১]

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার, তাঁর ভাই, তাঁর পিতা এবং তাঁর মা (রাঃ)-কে আগুন জ্বালিয়ে আযাব দেয়া হ'ত। রসূলে করীম (স.) তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন ঃ

صَبْرًا يَاآلِ يَاسِرُ فَانَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ-

হে ইয়াসার বংশের লোকেরা! ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।[২]

মোট কথা, বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবিগণের উপর মক্কার কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার-যুলুমের কোন সীমা-সংখ্যা-পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তা বর্ণনা করে শেষ করাও অসম্ভব।

কিন্তু বার বার ও ক্রমাগতভাবে করা এই দুঃসহ অত্যাচার-যুলুম সত্ত্বেও নবী করীম (স.) বা সাহাবিগণের ঈমানী দৃঢ়তায় একবিন্দু কমতির সৃষ্টি হয়নি; বরং ক্রমশ তাঁদের ঈমান অধিকতর শক্তিশালী ও বজ্রকঠিন হয়ে উঠেছে। দীনকে তাঁরা শক্তভাবেই ধারণ করেছিলেন এবং এই পর্যায়ে যত বাধা, যত অত্যাচার-নিপীড়নই এসেছে, তাঁরা তা অকাতরে সহ্য করেছেন।

তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা বরং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈমানের উপর অধিকতর ঈমান অর্জিত হয়েছে। দীনের দাওয়াতের ধারককে এই ধরনের যুলুম-পীড়ন সহ্য করতে হয়, এতেই তাদের ঈমানের সত্যতা আগুনে পোড়া স্বর্ণের ন্যায় অধিকতর খাঁটিত্ব লাভ করতে পারে। বিশেষ করে নবী-রসূলগণের জীবনে এই অবস্থা দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে, কাজটি কিছুমাত্র সহজসাধ্য নয়। সকল প্রকার দীনী দাওয়াত ও ইসলামী

---

১. سيرة ابن هشام - ق ١- ص ٣١٧-٣١٨

২. السيرة النبويه لابى الحسن على, ص ٩٠ - ٩١,

سيرة ابن هشام - ق ١ - ص ٣١٩ - ٣٢٠

www.pathagar.com

আন্দোলনে ত্যাগ-তিতীক্ষা, দুঃসহ কণ্ট সহ্য করা এবং প্রতিপক্ষের অন্যায় যুলুম-পীড়নের মুকাবিলা করা একান্তই অপরিহার্য। এই ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া এ কাজ কখনই সম্পাদিত হতে পারে না। যাঁরাই এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েই অগ্রসর হন যে, এ পথে তাঁদের এমন অনেক কিছুই সইতে হবে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তার কল্পনাও তাদের পক্ষে ভয়াবহভাবে লোমহর্ষক।

আর এই কারণেই জিহাদ তার উচ্চতর তাৎপর্য, পবিত্রতম ভাবধারা ও আত্মদানের চূড়ান্ত নিদর্শন সহকারে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য। তা এড়িয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এড়িয়ে যেতে চাওয়াই বরং ঈমানের পরিপন্থী।

## অবর্ণনীয় কণ্ট ও প্রাণান্তকর সহিষ্ণুতা

তাই আমরা দেখতে পাই, নবী করীম (স.) এবং তাঁর আত্মোৎসর্গীকৃত সাহাবিগণ কাফির-মুশরিকদের সব অত্যাচার-যুলুম ও বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে লংঘন করে দীনী দাওয়াতী আন্দোলন অবলীলাক্রমে ও অকুতোভয়ে, অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেছেন। পথের কাঁটা তাদের পদযুগলে বিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু চলার গতি ব্যাহত করতে পারে নি। পতাকা ধারণকারী হস্ত কর্তিত হয়েছে, কিন্তু পতাকা সমুন্নত রয়েছে, ধূল্যাবলুণ্ঠিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে এক অর্থনৈতিক বয়কটের চুক্তি করে। এই বয়কটের চাপে তাঁদেরকে তাঁদের দীনী দাওয়াত ও ঈমানী জীবন থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের চরম লক্ষ্য। মুসলিমদের সাথে সর্বপ্রকারের লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এই চুক্তির একটা প্রধান শর্ত।

প্রায় দুই কিংবা তিন বৎসর পর্যন্ত এই বয়কট চুক্তি বলবৎ ও কার্যকর থাকে। এই সময়টিতে নবী করীম (স.) এবং তাঁর সংগী-সাথিগণ অবর্ণনীয় দুঃখ ও কণ্ট ভোগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ইসলামী দাওয়াতী তৎপরতা ক্রমবর্ধমান ছিল। মুসলিমদের দীনী শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার দরুন কাফিরদের মানসিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত মুহম্মদ (স.)-কে চিরতরে

www.pathagar.com

খতম করে দিয়ে তাঁর এই তাওহীদী আন্দোলনের ক্ষতি (?) থেকে আত্ম-রক্ষার পন্থা গ্রহণে সম্পূর্ণ ঐকমত্য অর্জন করে।

এরূপ অবস্থায় তাঁর করণীয় কি হতে পারে? মক্কার গোটা জনসমষ্টি তাঁকে শেষ করে দেবার জন্য সংকল্পবদ্ধ। মুসলমানরা সংখ্যায় যেমন নগণ্য, শক্তি ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকদিয়ে প্রায় তেমনি শূন্যের কোঠায়। প্রতিরোধ করার কোন সামর্থ্যই ছিল না তাঁদের। তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে।

কাফিররা সেজন্য বাইরে থেকে কোন সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেনি। তারা গোপনে কঠিন ও দুরূহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তাদের দিন-রাতের চিন্তা ও ভাবনাই ছিল. কি করে হযরত মুহম্মদের এই তাওহীদী দাওয়াতকে প্রতিরুদ্ধ করা যায়, যাঁরা এ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ইসলামের পথ থেকে তাঁদের কি করে ফেরানো যায়, এক-একজন করে; কিংবা দলবদ্ধভাবে কি করে তাঁদের ইসলাম ত্যাগকারীতে পরিণত করা যায়।

এরূপ অবস্থায় শত্রুতার জবাবে শত্রুতার নীতি গ্রহণ, তাদের আঘা-তের পরে তাদের উপর প্রত্যাঘাত দেয়া কোনক্রমেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতে পারে না।

এইরূপ অবস্থায় ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের একমাত্র প্রতি-রোধক স্তম্ভ হতে পারে ধৈর্য—অপরিসীম সহিষ্ণুতাবলম্বন। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁদের এই ধৈর্য ধারণেরই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم -

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন করে ধৈর্যধারণ করেছে সব উচ্চতর সংকল্পসম্পন্ন রসূলগণ এবং তাদের ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করো না।
—সূরা আহকাফ ঃ ৩৫

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك

في ضيق مما يمكرون -

www.pathagar.com

এবং ধৈর্যধারণ কর, আর তোমার এই ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। আর তুমি ওদের জন্য দুঃখবোধ করো না এবং ওরা যে সব ষড়যন্ত্র তোমার বিরুদ্ধে করছে; সেজন্য মনে কুণ্ঠিতও হয়ো না।

—সূরা নাহ্‌ল : ১২৭

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

নিঃসন্দেহে আমরা জানি, তোমার অন্তর কুণ্ঠিত হচ্ছে ওদের (কষ্ট-দায়ক) কথাবার্তার দরুন। এক্ষণে তুমি তোমার রব্-এর প্রশংসা সহকারে তস্‌বীহ (তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা) পাঠ কর এবং সিজদাকারী লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর তোমার রব্-এর দাসত্ব কর, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করেছে। —সূরা হিজর : ৯৭-৯৯

এমনিভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী এবং তাঁর (রসূলের) সাহাবি-গণকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য। এ ধৈর্য কিছুক্ষণের জন্য বা বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নয়। নবীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে চিরকালের জন্য--মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহ্‌র সবর বা ধৈর্যধারণের এই নির্দেশও তাঁর পক্ষ থেকে এক প্রকারের সাহায্যদান। শত্রুর মুকাবিলা করার এ-ও একটা পদ্ধতি বা পন্থা। সর্বোপরি আল্লাহ্ তাঁর নবী-রসূলকে যে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধৈর্যধারণ এক বিশেষ ধরনের জিহাদও বটে।

তবে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত জিহাদেরও একটা স্তর রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কেননা ধৈর্যধারণেরও একটা সীমা আছে। মক্কী জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই স্তরেরও পরিসমাপ্তি হয়ে গিয়েছে। অতঃপর কার্যত সশস্ত্র জিহাদের পর্যায় অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়েছে।

৯—

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালার কুদ্‌রত ও রহমত তাঁর প্রিয় নবী (স.)-কে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। তিনি তাঁর জন্য কার্যত জিহাদ করার পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তাঁকে যুদ্ধের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। যুদ্ধের টেক্‌নিক তিনি পুরামাত্রায় আয়ত্ত করে নিলেন এবং অবিলম্বে তার উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হ'ল।

আল্লাহ্ তায়ালা রসূলে করীম (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণকে হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মদীনাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্ররূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। দুশমনদের প্রত্যাহিক ও সার্বক্ষণিক শত্রুতা থেকে তাঁদের মুক্ত করলেন। মদীনা নগরের প্রাচীন অধিবাসীদের সাথে তিনি একটি শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। সে চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা চলবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে।

এ পর্যন্ত মক্কা ও অন্যান্য স্থানসমূহে যাঁরাই ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁদের সকলের জন্যই এই হিজরত 'ফরযে আইন' করে দিয়েছিলেন। ফলে এ পর্যন্ত সংগৃহীত শক্তি মদীনায় কেন্দ্রীভূত হ'ল।

মদীনায় ইসলামী জীবনাদর্শ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশ হ'ল। অতঃপর এই কেন্দ্র থেকে ব্যাপকভাবে ইসলামী আদর্শের প্রচার শুরু হ'ল। পূর্বের সংকীর্ণ ও নির্মম পরিবেশ আর অবশিষ্ট থাকল না। মুসলমানগণ এই নতুন পরিবেশে এসে বুকভরে নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ পেলেন। ডাঙ্গায় তোলা মাছ অগাধ পানিতে ছেড়ে দিলে যেমন হয়, এখানেও ঠিক সেই অবস্থাই দেখা দিল। মুসলমানরা এখানে দিন দিন শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হলেন। সর্বপ্রকারের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষের উপযুক্ত জবাব দেবার সামর্থ্য তাঁদের করায়ত্ত হ'ল। কিন্তু তা সবই নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ রক্ষার জন্যে নিয়োজিত। সে জীবনাদর্শ যেমন বিবেকসম্মত, তেমনি জনগণের হৃদয়-মনের সাথে পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল। মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির সাথে তার পূর্ণ মিল রয়েছে, মানুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার ভারসাম্য কেবল তার দ্বারাই সংরক্ষিত হতে পারে। আর এই কারণেই মদীনার নতুন ভূমিতে আগমনের পর ইসলাম তীব্রগতিতে চারিদিকে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে দিল।

আর এই মদীনাতেই জিহাদের হুকুম নাযিল হ'ল। এ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ -

তোমরা ওদের মুকাবিলা করার লক্ষ্যে যতটা সম্ভব শক্তি ও যানবাহন সংগ্রহ কর, যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের। —সূরা আনফাল ঃ ৬০

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ط وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে এই কারণে যে, তারা মযলুম, আর আল্লাহ্‌ তাদের সাহায্য করতে খুবই সক্ষম। এরা সেই লোক, যাদের কোন কারণ ছাড়াই তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু এতটুকু যে,

www.pathagar.com

তারা বলে, 'আমাদের রব্ আল্লাহ্,' আর আল্লাহ্ যদি কতক লোকদের দ্বারা অপর কতক লোকদের দমন করার নীতি কার্যকর না রাখতেন, তা'হলে সমস্ত উপাসনালয়, গীর্জা-গুর্দাওয়ারা এবং উপাসনাসমূহ, মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব বেশী বেশী করা হয়—ধ্বংস হয়ে যেত - - - —সূরা হজ্জ ঃ ৩৯-৪০

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। আর তাদের হত্যা কর, যেখানেই তাদের পাও এবং তাদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত কর, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে। কেননা, অশান্তিকর অবস্থা হত্যার তুলনায় অনেক কঠিন। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০-৯১

এভাবে আমরা বহু সংখ্যক আয়াতেই যুদ্ধের নির্দেশের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হয়েছে, তা-ও তা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। তাদের পরিচিতি এত স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, তারা হচ্ছে সে সব লোক, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, মুসলমানদের তাঁদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত করেছে তাঁদের দুঃসহ অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জরিত করেছে, তাঁদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে, তাঁদের দীন থেকে বিমুখ করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করেছে, কুটিল ষড়যন্ত্রজাল চতুর্দিকে বিস্তার করেছে।

www.pathagar.com

এ আয়াতসমূহে এ যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে, যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি থেকে মুশরিকদের বিরত রাখা, যেন দীন খালেস হয়ে একান্তভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য বর্তমান থাকে। আয়াতসমূহ সেইসাথে এ কথাও বলেছে যে, মুসলমানদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ী ও জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত বীভৎস ধরনের অপরাধ। এর মত বড় পাপ আর কিছু হতে পারে না, এই অপরাধের ফলশ্রুতিতে জনজীবনে যে মহাবিপর্যয় নেমে আসে তা হত্যাকাণ্ড থেকেও অনেক গুরুতর এবং সুদূর প্রসারী।

**প্রতিআক্রমণ শুধু যালিমদের উপর**

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে মুসলমানদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার সাথে শর্তেরও উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে, মুসলমানরা আগেভাগেই যুদ্ধ শুরু করে দেবে না, কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হলে তবেই তারা প্রতিআক্রমণ চালাবে। কিন্তু তা করতে গিয়েও কোনরূপ সীমালংঘন করতে পারবে না, কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা চলবে না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের একবিন্দু পসন্দ করেন না।

প্রথম আক্রমণকারী যতটা অপরাধ করেছে তার প্রতিবিধান হিসেবে তার বিরুদ্ধে ততটাই করা যেতে পারে। তার অধিক কিছু করা আল্লাহ্ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। এ হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিরোধে অন্যায়ের প্রয়োগ। সূচনাকারীই হচ্ছে অধিকতর যালিম। উপরিউক্ত আয়াতসমূহে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে যাঁরা ধারণা করেছেন, তাঁরা খুব বড় রকমের ভুল করে বসেছেন। তাঁরা حَتّٰى يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ 'যতক্ষণ না সমগ্র দীন আল্লাহ্‌র হয়ে যায়',—আয়াতাংশের ভিত্তিতে উক্ত রূপ ধারণা গড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী অংশ পাঠ করলে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ - كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

...فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

ওরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তা হলে তোমরা তাদের হত্যা কর ---- পরে ওরা যদি বিরত থাকে, তা হলে বাড়াবাড়ি করা যাবে কেবল যালিমদের উপর। —সূরা বাকারা ঃ ১৯১,৯৩

মুশরিকদের অত্যাচার-যুলুম কিংবা যুদ্ধের জওয়াবে নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উপর যে প্রতিআক্রমণ হবে, কুরআনে তাকে عدوان 'সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি' বলা হয়েছে। তার কারণ, মুসলমানদের এই কার্যক্রম মূলত কাফিরদের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের জওয়াবে পরিচালিত ; আসলে তা বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন নয়। এই কথাটি কুরআনের এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

وَجَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -

খারাপের প্রতিফল স্বরূপ অনুরূপ খারাপ কাজ।[১] —সূরা শূরা ঃ ৪০

উপরিউক্ত আয়াতটি পাঠ করলে সহসাই মনে হয়, আয়াতে যে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে মুসলমানদের কষ্টদান ও উৎপীড়ন থেকে. তাদের দীন থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র থেকে মুশরিকদের বিরত থাকা।

অনুরূপভাবে খোদ্ নবী করীম (স.)-এর বাস্তব জীবনের কর্মধারা অনুধাবন করলেও এ ব্যাপারের সকল সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নবী করীম (স.) যুদ্ধকে কখনই লোকদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর লক্ষ্যে প্রয়োগ বা পরিচালিত করেন নি।

একে তো নবী করীম (স.) প্রায় সময়ই বেশীর ভাগ সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেছেন। মুশরিক গোত্রসমূহের মনে যখনই আত্মসমর্পণ বা সন্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তখনই আরব্ধ যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছেন। আর যুদ্ধের পরে কোন গোত্রকে পরাজিত ও অধীন করে নেয়া হলে তিনি তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পরে তাই

১. الجامع لا حكام القران للقرطبى ج ١ ص ٣٥٨

www.pathagar.com

ঘটেছিল। তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেছিলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى ... وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ... ...

হে জনগণ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে······এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর সম্মানার্হ, যে তোমাদের মধ্যে আধকতর তাক্ওয়া অবলম্বনকারী।

অতঃপর তিনি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেনঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ - قَالُوا خَيْرًا - أَخٌ كَرِيمٌ وَّابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ...

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর? - - - তারা বলল ঃ উত্তম ও কল্যাণময় আচরণ পাব বলেই আশা করি। কেননা তুমি দয়াশীল ভাই - - দয়াশীল ভ্রাতুষ্পুত্র।[১]

জওয়াবে নবী করীম (স.) বললেনঃ

لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ

১. زاد المعاد ج - ٣ ص - ٣٠٤

www.pathagar.com

اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء ... ...

আমি তোমাদের সেই কথাটিই বলব যা হযরত ইউসুফ (আ.) রাজ্যাধিপতি হওয়ার পর তাঁর ভাইদের বলেছিলেন। আর তা হ'ল ; 'তোমরা যাও, তোমরা সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন।[১]

এমনিভাবে আমরা আরও লক্ষ্য করছি, ইসলাম শত্রুদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার নীতি কখনই অবলম্বন করেনি। শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের উপর বিজয় প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ধর্মান্তরিত করতে কখনই চেষ্টা চালায় নি ; বরং এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঘনীভূত বিপদ এড়িয়ে যাওয়া এবং এই লক্ষ্য যখনই অর্জিত হয়েছে, তখন শত্রুপক্ষের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার পক্ষে অতঃপর আর কোন যুক্তি থাকেনি। কেননা নির্বিশেষে সমস্ত জনগণের সাথে সাধারণ ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনই ছিল তার চরমতম লক্ষ্য।

বস্তুত মুসলমানরা কাফিরদের বিরুদ্ধে নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ কখনই সূচনা করেনি. প্রতিপক্ষের উপর অকারণ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কেবল বিজয় লাভ, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং লোকদের অধীন বানিয়ে নেয়াই ইসলামের লক্ষ্য ছিল না কখনও। ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে, যে , চতুর্দিকের অমুসলিম জনগণের মধ্যে ব্যবসায় বিস্তার করা বা তাদের উপর সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করা আরব মুসলমানদের কখনই লক্ষ্য ছিল না। আরবরা যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সমস্ত মানুষের নিকট তাওহীদী দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই ছিল তাদের একটা অতিবড় দীনী কর্তব্য। এই দাওয়াতেরও লক্ষ্য ছিল, জনগণকে এমন এক সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শামিল করা, যা আধ্যাত্মভিত্তিক, যেখানে সমস্ত মানুষ নির্বিশেষে ও সর্বতোভাবে সমতাসম্পন্ন, মানুষে মানুষে কোন কৃত্রিম ধরনের পার্থক্য নেই, যেখানে জনগণ স্বাধীন মানুষের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার সুযোগ পাবে—সে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানের উপর।

এই সময় গোটা বিশ্ব মূর্খতা, অজ্ঞতা ও ভাঙন-বিপর্যয়ের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। আর ধনী ও সমাজপতিরা জনগণের উপর

---

১. ابوداؤد' مسند احمد' ابن هشام ج - ٢ ص - ٤١٢ و ٤١٣

www.pathagar.com

নিজস্ব ইচ্ছা-বাসনার ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনা করত। এই কারণে এ সময় খুবই উত্তমরূপে এই দীন কবুল করা জনগণের জন্য একান্ত জরুরী ছিল, সেরূপ সুযোগ সুবিধা করে দেয়াও ছিল একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হলে হয় সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হবে, নতুবা তরবারির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। এই পর্যায়ে দীন-ইসলাম এমন একটা বিধান হয়ে দাঁড়াবে, যার ভিত্তিতে গোটা জনসমষ্টি স্বতঃই গড়ে উঠবে। তা থেকে এমন এক জবরদস্ত বাধ্যকারী ( Coercive ) শক্তি মাধ্যম অর্জিত হবে, যা প্রকৃত সত্য ও কল্যাণের অনুসরণ করতে লোকদের বাধ্য করবে। সমাজ-সমষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিধানের ধারক হয়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও অকল্যাণ কখনি একত্রিত ও অভিন্ন হতে পারবে না।

মানুষ স্বভাবতই এমন সব বাঁধা ও বন্ধন থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেতে বদ্ধ পরিকর, যা তার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনা-কামনাকে বাধা-গ্রস্থ করে কিংবা হরণ করে নেয়। যদিও এই ইচ্ছা-বাসনা অনেক সময় দুষ্কৃতি, অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।

অমুসলিম জনতা যখনই ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাদের ও পূর্ব থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক মুসলমানদের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য থাকে না। এদের অধিকার তা-ই, যা ওদের রয়েছে। এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই, যা ওদের জন্য স্বীকৃত। ইসলামী সমাজে শাসক ও শাসিত, আরব ও অনারবের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য নেই, থাকতে পারে না। কর্মের ও উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা, স্থানান্তর হওয়া ও সভা-সম্মেলন-সমিতি করার স্বাধীনতাও তাদের নিরংকুশ। ইসলামে জিহাদের তাৎপর্যে এই মতাদর্শের সত্যতা ও বাস্তবতা পুরাপুরিভাবে বর্তমান। যারাই ইসলাম কবুল করেছে, তারাই ইসলামের মৌল বিধানকে শক্তভাবে ধারণ করেছে। দীনের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও আনুগত্য সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে তারা আরবদেরও অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামের সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত মহাসত্য আরবদের তুলনায় তারাই বেশী অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আর তারাই দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে অধিক তৎপরতা ও তিতীক্ষা অবলম্বন করেছে। কেননা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও সকলকে সমান অধিকার দানের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এই দীন।

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষিতে জিহাদের ব্যাপারটি বিবেচ্য। জিহাদ হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের পুরাপুরি সংরক্ষণ ও ধীরগতিতে সম্মুখে অগ্রসরকরণের একমাত্র উপায়। ইসলামী দাওয়াতের এই সংরক্ষণ ও সম্মুখে অগ্রসরকরণই বিপর্যস্ত ও চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্থ সমাজ-সমষ্টির সংশোধনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার এক চিরন্তন ও সদাকার্যকর পন্থা। যে সমাজ-সমষ্টিকে দাম্ভিকতা, আত্ম-অহংকার, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের প্রবণতা এবং লোভ ও শোষণের প্রচণ্ড অভিশাপ গ্রাস করে নিয়েছে, জনগণের নৈতিক চরিত্র চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, মূল্যমান ও মূল্যবোধের (Values) অবক্ষয় ঘটেছে, মন-মানসিকতা, দায়িত্ববোধ ও চিত্তের স্বাধীনতা নির্মূল হয়ে গেছে, শক্তি প্রয়োগ ছাড়া যে সমাজকে সংশোধন করা ও সঠিকপথে নিয়ে আসা আদৌ সম্ভবপর নয়, যে সমাজের উপর জঙ্গলের বন্যতা ও পাশবিকতা প্রধান হয়ে বসেছে, শোষক ও লুণ্ঠনকারীরা নিরীহ্ জনতার অর্থ, রক্ত, গোশ্‌ত নিঃশেষে শুঁষে নিচ্ছে ও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যেখানে দুর্বল, অক্ষম, দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ লোকদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই, যে সমাজের লোকদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কটুকুও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, লোকদের হৃদয়-মন হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ নির্দয় ও অনুকম্পাশূন্য, এই সমাজের উপর কঠিন আঘাত হানা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এবং আঘাত হেনে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে নবতর মানবোপযোগী কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই জিহাদ।

ইসলাম মানবতার আদর্শ, ধর্ম। মানুষের সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সকল প্রকারের—সকল পর্যায়ের সমস্যার সমাধান কেবল এই ইসলাম দ্বারাই সম্ভবপর। তাই উক্তরূপ অবস্থায় ইসলামেরই কর্তব্য হয়ে পড়ে শক্ত হাতে তরবারি ধারণ করা। সে সব অত্যাচারী, শোষক ও দাম্ভিক শাসক-প্রশাসকের পৃষ্ঠদেশে দোর্দণ্ড প্রতাপে কঠিন চাবুক মারার প্রয়োজন রয়েছে। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মর্মভেদ ফরিয়াদ বন্ধ করার এছাড়া আর কোন উপায়ই থাকতে পারে না। বস্তুত ইসলামী মুজাহিদগণ কেবল এই মহান লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখেই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁদের অস্ত্রধারণ, শক্তি প্রয়োগ ও শত্রু হত্যার মূলে একমাত্র এই কারণ ও লক্ষ্যই নিহিত। বিশ্বমানবতাকে সকল প্রকারের নির্যাতন, অপদস্থতা ও শোষণ-নিগ্রহের হাত থেকে মুক্ত করে

www.pathagar.com

সঠিক মানবীয় মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের একমাত্র সাধনা। আর এই সাধনার যথার্থ কার্যকরতা ও সাফল্য আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও সৌভাগ্য এতেই নিহিত। এরই ফলে এই জীবনেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরতাপূর্ণ সামাজিক সুবিচার পাওয়া সম্ভব।

আর কেবল এই কারণেই আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। মানবতার ফরিয়াদ উৎকর্ণ হয়ে শুনবার আদেশ দিয়েছেন এবং সে ফরিয়াদের কারণ দূর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। --হ্যাঁ, এই কারণেই মহান আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র কালামে অত্যন্ত প্রচণ্ড ও হৃদয় কাঁপানো ধ্বনিতে প্রশ্ন তুলেছেন :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ○

তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কেন যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র পথে ? অথচ দুর্বল-দুর্দশাগ্রস্থ পুরুষ-নারী-শিশুরা চিৎকার করে বলছে. 'হে আমাদের আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এই দেশ থেকে বের করে নাও, যেখানকার অধিবাসী ও কর্তৃত্বশালীরা যালিম। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদের জন্য তোমার নিজের নিকট থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক—সাহায্যকারী বানিয়ে পাঠাও।'
—সূরা নিসা : ৭৫

আল্লাহ্‌র উত্থাপিত এই প্রশ্নের বাস্তব জবাব স্বরূপই মহান আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি জিহাদের বিধান নাযিল করেছেন। তাঁর এই বিধানে 'জিহাদ' শুধু যুদ্ধ নয়, তা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ', পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ। এই জিহাদের সমস্ত তৎপরতা, সমস্ত কষ্ট-দুঃখ সহ্য-

www.pathagar.com

করণ, শত্রু নিধন ও আত্মদান বা মৃত্যুবরণ— সবকিছুই আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র দেখানো পথে, জারী করা নিয়ম-বিধান অনুসারে এবং ঘোষিত লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে। সমস্ত মানুষই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, আল্লাহ্‌র পরিবার। তাদের মধ্যে বিপদগ্রস্থ মানুষ পুরুষ, নারী, শিশু সবই আল্লাহ্‌র অধিকতর সংরক্ষণ পাওয়ার হক্‌দার। এ যুদ্ধ তাদের জন্য, তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির লক্ষ্যে। তাই এটা নিছক যুদ্ধ নয়, এটা পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ।

এই জিহাদ আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও, বিপর্যস্ত অবস্থার নিরসনের জন্যও, আল্লাহ্‌র দীন পালনের পথের সব বাধা-প্রতিবন্ধকতা নিঃশেষে দূর করার জন্যও। মানবতার অধিকার ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও এই যুদ্ধের কাম্য। মানুষকে তার স্বাভাবিক স্বাধীনতা দেয়াও এর একটি মহান উদ্দেশ্য। মানুষের উপরে নিত্য অনুষ্ঠিত অমানুষিক যুলুম-নিপীড়ন বন্ধ করা, মানুষের খারাপ আদত-অভ্যাসসমূহ দূর করা, মানুষের গোলামী করতে বাধ্য মানুষকে মুক্ত করে কেবল আল্লাহ্‌র গোলামী—আল্লাহ্‌র আইন পালনে বাধ্য করা ও তার অবাধ নির্বিরোধ সুযোগদানও এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মানুষ পুরুষ হতে পারে, নারী হতে পারে, হতে পারে নিষ্পাপ অবোধ শিশু ও বালক।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তায়ালা যুদ্ধ করার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ থেকেই আমরা নিঃসন্দেহে অনুধাবন করতে পারি যে, আসলে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক অক্ষম, দুর্বল, নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পার্শ্বে দাঁড়াতে। এই সব লোক যে দেশে ও যে সমাজেই থাকুক না কেন, তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির লক্ষ্যে আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে, অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এরা যে দেশের, যে বংশের ও যে সময় বা কালের লোকই হোক না কেন, তাতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না। তারা আমাদের দেশী লোক হোক, কি অন্য কোন দেশের নাগরিক, উভয় অবস্থাতেই আমাদের জিহাদের এই দায়িত্ব অভিন্ন ও ব্যতিক্রমহীন।

শুধু তা-ই নয়; উপরিউক্ত আয়াতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা কথার তাৎপর্য হচ্ছে, মু'মিনরাই হবে দুনিয়ার সব দুর্বল, নিপীড়িত ও

www.pathagar.com

শোষিত-বঞ্চিত মানবতার দুর্জয় পাহারাদার, সত্যের প্রবল পরাক্রান্ত সাক্ষী, নিরপেক্ষ, ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠাতা। তারা হবে ঈমানদার সেনাবাহিনীর এক-একজন বীর সৈনিক। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে বিশাল, বিস্তীর্ণ বিশ্বমানবতা। তাদের উপর এই কর্তব্য অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। তারা অগ্রসর হয়ে বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করবে এবং হক্‌কে করবে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। দুষ্কৃতির নীতি-স্বভাব উৎপাটন করবে, রোপণ করবে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের বৃক্ষ। অত্যাচারীর হস্তকে তারা শক্তভাবে ধরে ফেলবে, অন্যায়-কারীকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। শোষক ও বঞ্চনাকারীর সমস্ত বিস্তীর্ণ ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

উন্নত নীতি ও আদর্শের পথকে তারা উদার, উন্মুক্ত ও নিষ্কণ্টক করবে, নৈতিক মূল্যমান ও মূল্যবোধকে উচ্চে তুলে ধরবে এবং মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য ত্যাগ-তিতীক্ষার দৃষ্টান্তকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করে তুলবে বিশ্বমানবতার সম্মুখে। আর এজন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রও ধারণ করবে। অত্যাচারী-নিপীড়কদের মস্তক চূর্ণ করে দেবে।

আল্লাহ্‌র বান্দারা যদ্দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকারের আপদমুক্ত না হচ্ছে, মানবতার যথার্থ মর্যাদায় অভিষিক্ত ও প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, তদ্দিন পর্যন্ত এ অস্ত্র তারা সংবরণ করবে না। আর তা হতে পারে কেবল তখন, যখন ইসলামী সামাজিক ন্যায়পরতা ও সুবিচার পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবে। নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ তার সুশীতল ছায়াতলে নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করতে থাকবে। আর তা হলেই আল্লাহ্‌র উপরিউক্ত মহান সম্বোধনের উপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারবে ঈমানদার মুসলমানরা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, সমগ্র মানুষের জন্য সামাজিক সুবিচার ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবভাবে কার্যকর করাই ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আরও সত্যকথা এই যে, ইসলামে সকল প্রকার, সকল পর্যায়ের জিহাদের লক্ষ্য হচ্ছে এটাই।

তাই ইসলামের দিকের দাওয়াত গোটা মানব সমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের দাওয়াত। তাদের শ্রেণী, বংশ, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, স্থান ও কাল যতই পার্থক্যপূর্ণ হোক না কেন।

অন্যায় ও যুলুমকারীর হস্ত ধারণ করা এবং ঈমানের দিকে তাদের নিয়ে আসা, সঠিক সুদৃঢ় পথে তাদের পরিচালিত করা এই সবই

www.pathagar.com

নিপীড়ত মানবতার কল্যাণের পন্থা। যুলুম এভাবেই নির্মূল করা সম্ভব। নিপীড়িত, শোষিত মানবতার মুক্তি এতেই নিহিত। এভাবেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সামষ্টিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে; অপহৃত অধিকার ফিরিয়ে আনার কার্যকর পন্থাও হতে পারে এটাই।

আর এ কারণেই বলতে হয়, এই সামষ্টিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও তার সংরক্ষণের জন্যই ইসলামে জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এ রক্তপাত আল্লাহ্‌র পথের রক্তপাত। আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োজিত এই রক্তপাত।[১]

এদিক দিয়ে বর্তমান মুসলমানই সর্বশেষ নবী-রসূল হযরত মুহম্মদ (স.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদে এই মুসলিমদেরই আল্লাহ্ তায়ালা 'খায়রা উম্মাত—সর্বোত্তম জন-সমষ্টি' নামে অভিহিত করেছেন এবং কেবল মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যেই তাদের উৎসর্গীকৃত হওয়ার কথা বলেছেন। তাদের নিকট আল্লাহ্‌র যে শরীয়ত, তা-ই মানবতার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার নাযিল করা সর্বশেষ জীবন বিধান। পূর্ববর্তী সব আসমানী শরীয়তের সার নির্যাস এই কুরআনেই সমন্বিত। এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষনা হচ্ছে:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধানই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নূহ্‌কে এবং যা তোমার নিকট ওহী করে পাঠিয়েছি, আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। আর তা হচ্ছে তোমরা সকলে দীন কায়েম কর এবং এই কাজে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়ো না। —সূরা শূরা : ১৩

---

১. فلسفة الجهاد في الاسلام ص ٨٥-٨٦

www.pathagar.com

এই সব দিক দিয়েই—এইসব আদেশ-বিধান কার্যকরণ ও দাবি-দাওয়া সহকারে মুসলিমরাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাযিল করা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও দীনের একমাত্র ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তার কার্যত বাস্তবায়নের দায়িত্বও নিরংকুশভাবে তাদের উপরই অর্পিত। এজন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ-তিতীক্ষা তাদেরই করতে হবে অকাতরে ও অকুন্ঠিত চিত্তে।

এই দুনিয়ায় আগত সর্বশেষ রিসালতের, সর্ব শেষ নবী-রসূলের অনুসারী এবং তাঁর পৌঁছে দেয়া আমানতের সর্বশেষ ধারক, সংরক্ষক ও বাহক হচ্ছে এই মুসলমানরা। তাদের উপরই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণময় দায়িত্ব অর্পিত। অতএব তারাই বর্তমানের বিশ্বজাতিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জাতি।

**কেবল মুসলমানরাই কেন?**

উপরে বিবৃত আকীদা বিবর্তনশীল, স্বাধীন ও বিমুক্ত। এ আকীদা সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী। এ শরীয়ত চিরন্তন ও শাশ্বত। আল্লাহ্‌র বিধানের এ এক অনির্বচনীয় উত্তরাধিকার. এ এক কল্যাণময় প্রতিনিধিত্ব। এ সবের অধিকারী মুসলিমদেরই আল্লাহ্ বানিয়েছেন 'খায়রা উম্মাত—সর্বোত্তম জাতি।' যেমন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

তোমরাই সর্বোত্তম—সর্বাধিক কল্যাণময় জাতি। তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার থাক। —সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

অতএব এই সবকিছু সহ মুসলমানরাই জীবনের সংরক্ষক, জীবন্ত লোকদের জন্য দায়িত্বশীল। জীবন্ত লোকদের সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য তোমাদের প্রতিই দাবি উপস্থাপিত। তাই কেবল মুসলমানরাই ইসলাম কবুল ও ধারণ করে ক্ষান্ত হয়ে থাকবে তাই নয়, কেবল মুসলমানদের দ্বারাই ইসলাম অনুসৃত হলে ইসলামের দাবি পূরণ হয়ে যায় না এবং কেবল মুসলমানরাই মুসলিম হয়ে থাকবে, এমন কথাও নয়।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুসলিম ওতোপ্রোত জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হতে পারে না। ইসলামকে বাদ দিয়ে যেমন মুসলিম হতে পারে না, তেমনি মুসলিমকে বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ধারণাও করা যায় না। যেখানে ইসলাম হবে, সেখানেই হবে মুসলিম। আর মুস-লিমরা নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী জীবনধারা রক্ষা করে চলবে জনগণ ও জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, তা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি তা মহান আল্লাহ্‌র কাম্যও নয়। মুসলিমরা যে শক্তির প্রতিভূ, তা কোন সংকীর্ণ পটভূমিতে আটকে থাকবে, অন্যান্য মানুষের নিকট তা সংক্রমিত হবে না, আল্লাহ্ তায়ালা তা আদৌ পসন্দ করতে পারেন না। আল্লাহ্ তো চান, মুসলমানদের কর্মক্ষেত্র হবে উদার-উন্মুক্ত জীবন, বিশাল, বিস্তীর্ণ, জীবন্ত মানুষের সমাজ। আল্লাহ্‌র দেয়া ইসলামী শক্তি-সামর্থ্য আবর্তিত হবে, তৎপর ও গতিশীল হবে সমগ্র সৃষ্টিলোকের সকল কেন্দ্রে ও দিকে। এই গোটা জগতই হচ্ছে মুসলমানদের আবর্তন-স্থল। সমগ্র জীবনই মুসলমানদের স্বদেশ, জন্মভূমি। সর্বত্রই কুরআনের আদর্শ বাস্তায়িত করা মুসলিম জাতির লক্ষ্য ও কর্তব্য।

এই কারণেই জীবন সংরক্ষণ—গোটা জীবনের প্রতিরক্ষাই মুসল-মানদের দায়িত্ব। জীবন জীবনের বিদ্রোহী হবে না, কোন সৃষ্টি অপর সৃষ্টিকে পদানত করবে না, কোন জনসমষ্টি অপর জনসমষ্টিকে দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে রাখবে না, কারুর বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্র ধারণ করবে না; শক্তিমান দুর্বলকে পরাস্ত ও পরাজিত করবে না। আণবিক, পরমাণুবিক, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, এই ধরনের মারণাস্ত্র নিয়ে খেলা করে এক-শ্রেণীর বর্বর হিংস্র মানুষ শহর, নগর, দেশ ও জনপদ নিমেষে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে, আর মুসলমানরা নিষ্ক্রিয় নীরব-নিস্তব্ধ থেকে নিজেরা তাতে আত্মাহুতি দেবে ও অন্যান্য লক্ষ-কোটি মানুষকে অকাতরে মরতে দেবে, আল্লাহ্‌র নিকট তা আদৌ সমর্থিত নয়। কেননা তাতে মানুষ ও সভ্যতা উভয়েরই চরম ধ্বংস নিশ্চিত ও অবধারিত।

### জিহাদই উত্তম

তাই বলতে হবে, মুসলমানদের দায়িত্ব অত্যন্ত বড়, কঠিন ও কষ্টসাধ্য। তাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে জীবনের এ ধারে,—উপরি-ভাগে। এ এক সুকঠিন দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য

www.pathagar.com

তাদেরকে কোন এক মুহূর্তেই অস্ত্র সংবরণ করার সুযোগ দেয় না। পৃথিবীর পরতে পরতে চলাচল করে মানবতার সদাসতর্ক পাহারাদারী করা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। তাদের উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করতে হবে নিপীড়িত মানুষের মর্মবিদারী ফরিয়াদ, তাদের দুইটি চক্ষু উন্মীলিত করে দেখতে চেষ্টা করতে হবে, কোথায় কোন্ মানুষ অত্যাচারিত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সংগে সংগেই সে নিপীড়ন ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা যেখানেই এবং যে দেশেই হোক না-কেন। পৃথিবীর গোটা মানচিত্রই তার সম্মুখে ভাসমান থাকবে। কোন ভৌগোলিক সীমারেখা তার যুলুম বন্ধের অভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন:

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

জিহাদ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলতে থাকবে। অনুরূপভাবে উত্তম জিহাদ কি, জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বলেছিলেন:

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য বলা উত্তম জিহাদ।

মুসলিমরা যেন সত্য কথা বলতে কক্ষণই ভয় না পায়, দ্বিধান্বিত না হয়, সত্যের প্রতিরক্ষায় তারা যেন অক্ষম ও কাতর হয়ে না পড়ে; বরং সেজন্য যেন তারা প্রতিমুহূর্ত সজাগ ও সক্রিয় থাকে; বিশ্বনেতা ও মানবতার একমাত্র পথ প্রদর্শক হযরত মুহম্মদ (স.) তা-ই চেয়েছেন। এই কারণেই তিনি বলেছেন:

اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ اَلشَّيْطَانُ اَخْرَسُ -

সত্য কথা বলতে নির্বাক ব্যক্তি বোবা শয়তান সমতুল্য।



www.pathagar.com

এক্ষণে মুসলমানরা যেখানে অন্যায়, অসত্য ও মিথ্যা এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলবে--আওয়াজ তুলবে, তা যেমন জিহাদ হবে, তেমনি কার্যত যালিমের, শোষকের, নিপীড়কের মস্তক চূর্ণ করে দেয়ার জন্য যদি অস্ত্র ধারণ করে, তা'হলে তা-ও হবে জিহাদ।- - -জিহাদ আল্লাহ্র পথে।

মুসলমানরা যদি কোন নিপীড়িত জনগোষ্ঠী বা জাতির ফরিয়াদ শুনতে পেয়ে তাদের উপর কৃত সে নিপীড়িন বন্ধ করার জন্য কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা'হলে তা অবশ্যই আল্লাহ্র পথের জিহাদ হবে। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যালিম-শোষক শ্রেণীর যুলুম-শোষণ বন্ধ করার জন্য দেশের যালিম-কাফির শাসকের বিরুদ্ধে যদি আওয়াজ তোলে, তবে তা-ও নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পথের জিহাদ হবে। এই কাজ তো মুসলমানদের জন্য একান্ত কর্তব্য। তা না করলে মুসলমানরা গুণাহ্গার হবে। এটা হবে একটা মানবিক অপরাধ। এই ধরনের জিহাদ ও যুদ্ধ তো বর্তমানে সর্বত্রই চালু হয়ে আছে। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। এ ধরনের যুদ্ধের ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরি করা এবং তাতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ মুসলমানদের কর্তব্যভুক্ত। মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে কেবল সত্যের জন্য লড়াই করবে, সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা শক্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। মযলুমের প্রতি দয়া-সহনুভূতি প্রদর্শন, দুর্বলকে শক্তিমানের মুকাবিলায় সাহায্য করা এবং সর্বোপরি সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তো মুসলমানদের যিন্দেগীর মিশন। এ মিশন যেমন ব্যক্তি মুসলিমের, তেমনি মুসলিম সমষ্টিরও। উপরে উদ্ধৃত আয়াতটির মর্ম এ ব্যাপারে স্পষ্ট ও প্রকট।

'সামাজিক সুবিচার' বলতে কি বোঝায়? - - কি তার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য? তার গতিবিধি ও কার্যক্রমই বা কি? ইসলাম কেন এর উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে? ইসলামী শরীয়ত কার্যকরকরণ এবং জিহাদ বিধিবদ্ধকরণে তার ভূমিকা কি? - - - মানব জীবনের বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচারের অবদান কতখানি?

এই সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জওয়াব আমাদের অবশ্যই জানতে হবে।

www.pathagar.com

**ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সামাজিক সুবিচার**

প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের অনেকেরই নিকট সুবিচার-এর যথার্থ তাৎপর্য সুস্পষ্ট নয়। অনেকে একে বিরাট কিছু মনে করেন, আবার অনেকে এ সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করেন।

সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন অনেক জাতির নিকট এ সম্পর্কিত উচ্চতর ধারণা হচ্ছে, জাতির বিশেষ কল্যাণ ও নির্বিশেষে বা সর্বসাধারণ মানবতার সার্বিক কল্যাণের মাঝে সমন্বয় সাধন করাই সুবিচার।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তার নিরংকুশ পূর্ণত্বের উচ্চতর প্রতীক হওয়ার পথে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি।

উন্নতিশীল জাতিসমূহ সভ্যতার যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাদের পক্ষে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কেননা মানুষ তার বর্তমান মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থায় কেবল সে সব আইন-বিধানের সাথেই পরিচিত, যার চেতনা জাগিয়ে দেয় তাদের নিতান্ত বস্তুগত প্রয়োজন-সমূহ। এজন্য মানুষ তার আপন ভাইকে হত্যা করতেও কুন্ঠিত হচ্ছে না, আপন ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করে না। ---মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করছে, ভাই ভাই-য়ের গোশ্‌ত টুক্‌রো-টুকরো করে ভক্ষণ করছে--এ দৃশ্য কি আজ বিরল?

এই মানুষই যখন সামাজিকতার স্বভাবগত তাকীদে তারই মত অন্যান্য মানুষের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন তার মধ্যে সর্ব প্রথম সুবিচার চিন্তার উন্মেষ ঘটে, তখন তার বস্তুগত প্রয়োজনবোধকে চাপা দিয়ে রাখে তার মানবতা বোধ, ভ্রাতৃপ্রেম। কিন্তু তখনও সে সুবিচার ও যুলুমের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষমই থেকে যায়। অন্য লোকদের অধিকারের ব্যাপারে তখনও তার অন্ধত্ব ও মূর্খতা বিলীন হয়ে যায় না।

এই জাহিলিয়ত—এই মূর্খতা-অজ্ঞতার অন্ধত্বের গভীর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে মানব সমষ্টিসমূহ বহুকাল পর্যন্ত নিমজ্জিত ছিল। তখন নির্মম-ভাবে চলছিল একের দ্বারা অপরের শোষণ, একের গোশ্‌ত অপরের ভক্ষণ। এই ব্যাপারে কোন সীমাই তাদের অগ্রগমন প্রতিরুদ্ধ করতে পারত না। দীর্ঘকাল পরে মানবতার একাংশে মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ ঘটে। সভ্যতা সূর্যের উদয় ঘটে বেশ কয়টি জাতির মধ্যে। জন্ম নেয় দর্শন এবং

www.pathagar.com

সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ। এ পর্যায়ে প্রাচীন ভারত, চীন, গ্রীক, মিসর ও বেবিলন উল্লেখ্য। কিন্তু এসব দেশের বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা চিরন্তনতার যে স্তরেই উন্নীত হোন না কেন, সুবিচার ও ন্যায়পরতার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবনে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

আর ঘটেও ছিল তা-ই। তার কারণ নির্ধারণও কঠিন নয়। মানবীয় হৃদয়-মনের গভীর সংবেদনশীলতা সহকারে বিবেক-বুদ্ধি যতটা গভীরে পেঁছিতে পারে, ততটা গভীরে গিয়ে তাঁরা তন্নতন্ন করে তদন্ত কার্য পরিচালনা করেছেন। ফলে তাঁরা জ্ঞানের এতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যে, এ পন্থায় এর অধিক দূরে ও উচ্চতায় পেঁছা আর সম্ভবপরই নয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা মানব সমষ্টির জন্য অবশ্য দেয় অধিকার সম্পর্কে কিছু-মাত্র পাঠ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁদের যুদ্ধে সমাজতত্ত্ব বিদ্যা অস্তিত্বই লাভ করেনি। তাই তাঁরা ওসব অধিকার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানতে সক্ষম হন নি।

এই কারণে সুবিচারের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি, পূর্ণত্ব লাভ করতে পারেনি। তাদের উত্তরাধিকারী রোমানদের নিকটও তা অপূর্ণই থেকে যায়। তাই বলা যায়, সুবিচারের তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপারটি উনবিংশ শতকেরই ভাগ্যাংশ। ব্যাপারটি এতটা বিলম্বিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তার ভিত্তি যেসব সামাজিক সামষ্টিক তত্ত্বের উপর স্থাপিত, তা নিকট-অতীত সময়ের পূর্বে কিছুমাত্র পরিপক্কতা লাভ করেনি।

**বিচার ও মানবতা**

সুবিচারের তাৎপর্য গড়ে তোলায় মনুষ্যত্বের উপাদান-উপকরণ প্রবিষ্ট হওয়ার পর আধুনিক আইনে শাস্তি বা দণ্ডের ব্যাপারটি প্রতিশোধ গ্রহণের দিক থেকে সংশোধনের দিকে ফিরে গেল। আইন প্রণয়নকারী লোকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসল যে, সমাজ-সমষ্টির পূর্ণত্ব লাভের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা বা প্রত্যাঘাতের দিকে নয়। অতঃপর বিচারক যখন সংকলিত কোন আইনের ভিত্তিতে কথা বলতে যান, তখন তিনি সর্বপ্রকার প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাসক্ত হয়েই রায় প্রকাশ করেন। তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে সামাজিক সংস্থাকে স্থিতিশীল বানানোর দিকে, আসল অপরাধকারীর

www.pathagar.com

চারিত্রিক ও মানসিক সংশোধনের দিকে, অপরাধসমূহকে তার নিকট ঘৃণ্য বানিয়ে তোলার দিকে। ফলে একালের অর্ধেক দণ্ডই সংশোধন-সংস্কারের উপকরণে পরিণত হয়েছে। এ একটা নৈতিক দার্শনিক গুণ-বিশেষ।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা প্রাচীনদের সমালোচনা নম্রতা ও বিনয় সহকারেই করতে চাই। কেননা কারাগারের অভ্যন্তরে অপরাধীদের আযাব দেয়ার রীতি সম্ভবত এখনও পরিত্যাক্ত বা প্রত্যাহৃত হয়নি।

কিন্তু সুবিচার ও রোমান 'সানাতু'র সিদ্ধান্তাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন কেমন করে সম্ভব হবে, - - কার পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে! কেননা রূঢ়তা, নির্দয়তা ও প্রতারণা উভয়ই সাধারণ রোমান আইনে সমর্থিত ছিল।

'ফাবিউস' 'সিবিউন, কাসুন এবং 'ব্রোতোস' প্রমুখ উত্তম রোমান ব্যক্তিগণ তাদের স্বদেশের মর্যাদা রক্ষার্থে অর্ধেক পৃথিবীকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হত না। অথচ তারা কত বড় অপরাধ করছে সে বিষয়ে কোন অনুতাপ-চেতনাই তাদের ছিল না।

বস্তুত তাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক আইনে সুবিচার ছিল নিতান্ত কাল্পনিক। তার বাস্তবতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না।

সাধারণভাবে রোমানদের দৃষ্টিতে যুদ্ধে জড়িত ব্যক্তি, পরিবারের প্রধান ব্যক্তি এবং অধিকার ও মালিকানাধিকারী ব্যক্তির ব্যাপারে সুবিচার ছিল পূর্ণাংগ মাত্রার। কিন্তু যাদের হাতে কোন ধন-মাল ছিল না, যারা ছিল নিঃস্ব-নিরবলম্ব, আর তারাই ছিল জাতির সংখ্যাগুরু ও প্রধান অংশ, তাদের ব্যাপারে সুবিচার ছিল নিতান্ত হাস্যকর।

'ব্রোদোন' ঠিক-ই বলেছেনঃ

রোমান সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সামাজিকতার দিক দিয়ে এবং তার গণঅধিকারের দিক দিয়ে 'সুবিচার' ছিল 'শক্তিই সত্য' বা might is right —এই তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল।

এভাবে আমরা মনে করতে পারি, বহুকাল যুগ ও শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুবিচার ঊনবিংশ শতকের ফসল।

অনেকেই মনে করেন, সুবিচার দার্শনিকতার দিকদিয়ে এতটা তুংগে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতার দিকদিয়ে সে পর্যন্ত উন্নতি লাভ করতে পারেনি। কেননা দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার তারতম্যের ব্যবধান সুবিচার

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি সর্বোন্নত সংস্কৃতিমনা জাতির ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

অতএব সুবিচার নীতির পূর্ণত্বে সমাজ-বিজ্ঞানের শর্ত হচ্ছে, জাতি-সমূহ নিজ-স্বভাবে যে সব আইন-বিধান অনুসরণ করে তাতে সামগ্রিক-ভাবে মানবিক অধিকারের দিকদিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আর সমাজ বিদ্যাই এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন জাতিই এই পর্যায় পর্যন্ত পেঁছিতে পারেনি।

### ইসলামে সুবিচার

ইসলামের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে, তা তার অনুসারী লোক-দেরকে জনগণের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠাতা ও সংরক্ষক হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্ব সহকারে তাকীদ করেছে এবং এক্ষেত্রে তার আধিপত্যের সীমার পার্থক্যের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করতে উপদেশ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۚ ... وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا ... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, সাক্ষ্য-দাতা হও একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য—তা তোমাদের নিজেদের,

www.pathagar.com

পিতামাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেই হোক না কেন। পক্ষদ্বয় ধনী হোক, কিংবা দরিদ্র, তাদের তুলনায় আল্লাহ্ই উত্তম। এজন্য যে, তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজ করবে।…অতএব তোমরা মনের খেয়াল ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না সুবিচার করার পরিবর্তে। তোমরা যদি পক্ষপাতদুষ্ট কথা বল কিংবা সত্য বলা থেকে বিরত থাক, তা'হলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। —সূরা নিসা ঃ ১৩৫

বলেছেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ج اعْدِلُوا ... هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

কোন জনগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের এতটা অন্ধ উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরা সুবিচার হতে বিরত থাকবে। না, তোমরা অবশ্যই সুবিচার করবে, এই নীতি আল্লাহ্-ভীরুতার খুবই নিকটবর্তী ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। ---সূরা মায়েদা ঃ ৮

বলেছেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এই কারণে তোমাদের ক্রোধ ও আক্রোশ যেন তোমাদের এতটা উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে অসংগতভাবে বাড়াবাড়ি করতে শুরু করে দেবে। না, যে কাজ কল্যাণময় ও আল্লাহ্-

www.pathagar.com

ভীরুতাসম্পন্ন, তাতে তোমরা সকলেই পরস্পরের সহযোগিতা কর, আর যা গুণাহের কাজ, তাতে কারুর সাথে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাঁর শাস্তি কিন্তু খুবই কঠিন ও তীব্র।

—সূরা মায়েদা : ২

ইসলাম মুসলমানদের সর্বাবস্থায়ই সুবিচার ও ন্যায়-নীতির আদর্শকে সমুন্নত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি পরম শত্রুর সাথেও এই-রূপ আচরণই গ্রহণ করতে বলেছে। অতএব এই নির্দেশ লংঘন করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥

তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ; কিন্তু সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। —সূরা বাকারা : ১৯০

আত্মসমর্পণকারী বা শান্তি-নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীকে—তারা নিজেদের জীবন রক্ষার্থে তা করে থাকলেও হত্যা করা সীমালংঘনমূলক কাজ। যুদ্ধমান জাতির বেসামরিক নার-শিশু, অকর্মণ্য বৃদ্ধ, দুর্বল পংগু এবং শত্রু-পক্ষের সেবাকাজে নিযুক্ত লোকদের হত্যা করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ ধরনের হত্যাকে সীমালংঘনমূলক কাজ গণ্য করা এবং তা করতে নিষেধ করা সমসাময়িক সকল ধর্মমত ও রণবিদ্যার তুলনায় ইসলামের একটা বিশেষ অবদান। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও নিরপেক্ষ ন্যায়-পরতার পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট ও দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ। জাতীয়তা বোধ, স্বজাত্যা-ভিমান ও খামখেয়ালীর দরুণ এই সংকল্প কখনই ব্যাহত হতে পারে না।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِتَقْوَى

اللهِ أَوْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ٥

কোন আরবের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোন অনারবের উপর, শ্বেতাংগের নেই কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব কৃষ্ণাংগের উপর. তাকওয়া বা নেক আমল ব্যতীত অন্যকিছু শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হতে পারে না। তোমাদের সকলেই আদম সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

ইসলামে সুবিচার ও ন্যায়পরতা সম্পূর্ণ নিরংকুশ, শর্তহীন, তার তাৎপর্য সাধারণ এবং নিরপেক্ষ। প্রত্যেকটি মুসলিমই তার অধিকার আদায় করতে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য। এমনকি যে সব অমুসলিম তাদের অধীন হবে, সেইসব দাস ও গোলামদের প্রতিও, এমনকি জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি ইতর প্রাণীকুলের প্রতিও তাদের সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের মহানত্ব এতই উজ্জ্বল যে, দুনিয়ার অপর কোন আদর্শ বা শিক্ষাই তার সমতুল্য গণ্য হতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতির আইনের দৃষ্টিতে উচ্চবংশ ও নীচবংশজাত, ধনী ও দরিদ্র, মনিব ও ক্রীতদাস, মুসলিম ও কাফির সম্পূর্ণ সমান ও সর্বতোভাবে অভিন্ন? —এ শুধু দীন-ইসলাম, যা মহান বিশ্বস্রষ্টা নাযিল করেছেন সমস্ত মানুষের জন্য। এই বৈশিষ্ট্য দীন-ইসলাম ছাড়া আর কারুর বা কিছুরই নেই। জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি ইতর প্রাণীকুলেরও কোন অধিকার আছে এবং সে অধিকার অবশ্যই দিতে হবে, সেগুলোর প্রতিও একবিন্দু অন্যায় আচরণ বা অবিচার করা চলবে না, এ বিধান দীন-ইসলামেরই বিশেষ অবদান। অন্য কোথাও তার নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যারা পশুপালন করে, ইসলাম তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে পশুগুলোকে সময়মত খাদ্য-পানীয় দিতে। তা দিতে অসমর্থ হলে সেগুলোকে উম্মুক্ত করে ছেড়ে দিতে হবে, যেন ওরা নিজেরাই পেটপুরে খাবার ও পানীয় খেয়ে ফিরে আসতে পারে। ওযুর জন্য রক্ষিত স্বল্প পানি দিয়েও যদি কারুর

www.pathagar.com

পশুর পিপাসা নিবৃত্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে তা-ও করতে হবে। এ ব্যাপারে কেউ যদি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় তা হলে বিচারপতি তাকে তা বিক্রয় করে দিতে বাধ্য করবেন। এরূপ অবস্থায় পশুটির বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বস্তুত সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ সুবিচারের উচ্চতর আদর্শ স্থাপন নির্বিশেষে গোটা মানবতার জন্য একান্তই কর্তব্য। ইউরোপের সুসভ্য জাতিসমূহ এবং প্রাচীনকালের উন্নত জাতিসমূহও ইসলামের এই উচ্চতর আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ শ বৎসর পূর্বে এই উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ আদর্শ মানুষকে ছাড়িয়ে পশুপক্ষীকুল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নিম্নোদ্ধৃত কথাটি কোন মানুষই ভুলতে পারে না ঃ

> একটি মেয়েলোক শুধু এই কারণে জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে, যে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল, সে তাকে খাবার দিত না, ছেড়েও দিত না যে নিজেই পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচবে।

**রাজনৈতিক ও সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচার**

পাশ্চাত্য দেশসমূহের প্রাচীনকালীন বিধানে শুধু নেতিবাচক নির্দেশ অর্থাৎ 'এটা করবে না', 'ওটা করবে না'--ইত্যাদিই রয়েছে। ব্যক্তির অধিকার হরণ না করতে বলা হয়েছে তাতে। আর আধুনিক পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যক্তির অধিকার লাভের সুযোগ করে ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে দেয়ার নির্দেশটুকুই হয়ত পাওয়া যায়।

জাতি সংঘের সর্বশেষে প্রকাশিত মানবাধিকারের সনদের ২১--২৪ ধারাসমূহেও তা-ই স্পষ্ট ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে মাত্র।

কিন্তু ইসলাম এরূপ নেতিবাচক সুবিচার নীতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নিছক নেতিবাচক ফরমান নিতান্তই অর্থহীন এবং অকার্যকর। ইসলাম রাজনৈতিক সুবিচারের মৌলনীতিসমূহের শুধু উপস্থাপনাকেই যথেষ্ট মনে করেনি। ইসলাম সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচারের মৌলনীতিসমূহের বাস্তবায়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ

www.pathagar.com

করেছে। তার কারণ এই যে. নিছক রাজনৈতিক সুবিচার ও ন্যায়পরতা মানুষকে তাদের ক্ষুধা ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা শুধু বলা কিংবা সমাজের উপর ব্যক্তিকে প্রভাবশালী বানিয়ে দেয়া নিরর্থক হবে, যদি সে কোন সম্পদেরই মালিক না হয়।[১] সম্পদের মালিকানাহীন স্বাধীনতা না খেয়ে থাকার--অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকার স্বাধীনতা। যারা পেটপুরে সুখাদ্য খেতে পায় না, কঠিন শ্রমের চাপে যারা কাতর, তারা সামান্য নগদ পয়সা পেলে সাময়িক আনন্দে উড়িয়ে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। এর প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ থাকতে পারে না, সে স্বাদ আস্বাদনের প্রতি ও থাকবে না তাদের কোন আগ্রহ। কেননা তাদের প্রয়োজন পেটভরে খাবার খাওয়ার। এরূপ খাবার না পেলে তাদের মুখও খুলবে না, কণ্ঠেও কথা উচ্চারিত হবে না। আর স্বচ্ছল-সুখী ও বঞ্চিতদের পরস্পরে কোন সৌভ্রাতৃত্বও গড়ে উঠতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোকের হস্তে সম্পদ ও মর্যাদা কুক্ষিগত হয়ে গেলে আইনের সম্মুখে সাম্য ও নিরংকুশ সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে না। সেজন্য দলীল ও যুক্তি পেশ করা, নিজেদের অধিকার রক্ষা করা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দুনিয়ায় একালেও সভ্য হওয়ার দাবিদার এমন অনেক জাতিই রয়েছে, যারা বিশেষ বিশেষ কাজ, পেশা বা জীবিকা গ্রহণের অধিকার বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণী বিভক্তিতে ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধির দরুণ দরিদ্রজনের জন্য উচ্চতর শিক্ষালাভের দুয়ার অতীব কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন দেশে বিশেষ একটা পরিমাণের করদানকে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য পদ লাভের জন্য শর্ত করে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ, সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের কম করদাতাদের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাজেই কেবল রাজনৈতিক সাম্যই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু-মাত্র যথেষ্ট নয়। সেইসাথে সামাজিক সাম্যও অপরিহার্য।

---

১. বলা বাহুল্য, ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-মালিকানা পুঁজিবাদী ব্যক্তি -মালিকানা নয়। এ মালিকানা আল্লাহর দেয়া সম্পদের আমানতদারী মাত্র।

www.pathagar.com

পরন্তু নিছক সামাজিক-সামষ্টিক সাম্যও যথেষ্ট হতে পারে না যদি তা ইতিবাচক না হয় এবং রাষ্ট্র চিন্তা ও বিশ্বাস হিসেবে তা গ্রহণ না করে, আইন হিসেবে তা কার্যকর না করে এবং রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে তা সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত না হয়।

এই কারণে ইসলামে রাজনৈতিক সুবিচার একটি সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভবিশেষ। ইসলামী শরীয়ত শাসক নির্বাচনের অধিকার ও দায়িত্ব জনগণের উপর ন্যাস্ত করেছে। আর রাষ্ট্র পরিচালনার গোটা ব্যাপারটি-কেই 'শূরা' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তার যাবতীয় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খিলাফতী নীতি নির্ধারণী ভাষণে বলেছিলেনঃ

> আমি ভালো করলে তোমরা আমার কাজে সাহায্য করবে। আর আমি বাঁকা পথে চলতে লাগলে তোমরা আমাকে সোজা পথে চালাবে।

ইমাম মালিক (রঃ) এই ভাষণকে ভিত্তি করে ঘোষণা করেছেনঃ এই শর্তের ভিত্তি ব্যতীত ইসলামে কোন লোকই নেতা বা রাষ্ট্রশাসক হতে পারবে না।

তাই সর্বোচ্চ প্রশাসককে অবশ্যই আইনগতভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতে হবে। সামাজিক, তামাদ্দুনিক এবং অপরাধমূলক কাজ-কর্মের জন্যও দায়ী হতে হবে। ইসলামের আইনে রাষ্ট্র প্রধান অর্থনৈতিক বা হত্যামূলক কাজে দায়ী হলে তাকে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য থাকতে হবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ দণ্ড কার্যকর করার দায়িত্বও তাঁকেই পালন করতে হবে। কেননা কুরআন মজীদে উল্লিখিত দণ্ডসমূহ কার্যকর করার নির্দেশ গোটা মুসলিম সমাজের প্রতি। আর নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধান সমাজ-সমষ্টিরই প্রতিনিধি যাবতীয় আইন-বিধান কার্যকর করার জন্য; দণ্ড দেয়ার জন্য। যদিও এ অধিকার ও দায়িত্ব মূলত ও প্রথমত গোটা জাতির জন্যই নির্দিষ্ট।

ইসলামী সুবিচার নীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ সুবিচার নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য সহজলভ্য হতে হবে। কেননা এই সুবিচারের

www.pathagar.com

অবতারণাকারী হচ্ছে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নুবুওয়্যাত ও রিসালাত। আর এই নুবুওয়্যাত ও রিসালত সমস্ত মানুষের জন্য নির্বিশেষ। মানুষ জাতি, ধর্ম ও রাজ্যের বিভিন্নতার দরুণ যতই বিভক্ত হোক না-কেন।

এই সুবিচার জনগণের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এই বিশ্বাসের তাকীদেই মানুষ এ ধরনের সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। এখানে ইসলামের বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান-গবেষণায় রত থাকেন শাসক ও প্রশাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, বিচারকরা কার্যত বিচার কার্য সম্পন্ন করেন, বিবদমান পক্ষরা বিচার প্রার্থনা ও বিচার গ্রহণ করে। এইসব কাজই সুসম্পন্ন হয় সেই ঐকান্তিক বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে---যার ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এরই দাবি হচ্ছে, সুবিচারকে তার যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আইনসমূহ যেন তার যথাযথ মর্যাদায় কার্যকর হয়ে গোটা সমাজের উপর আইনের শাসন চালু করতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুবিচারের চিন্তা নৈতিকতার চিন্তা থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এটা ইসলামের দৃষ্টিকোণ—অমুসলিম সমাজ যদিও এই নৈতিকতার ধার ধারে না। উজফিল্ড্ কোলিহ্ বলেছেন :

> শুরুতে আইন-দর্শন নীতি-দর্শনের অংশ ছিল। উত্তরকালে সুবিচারের চিন্তা নৈতিকতার চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানে সুবিচারের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ আইনের রূপ নিয়ে প্রকাশমান হয়। রাষ্ট্রই এই আইন প্রচার ও চালু করে। জনসাধারণ তা মানতে বাধ্য হয়। অতঃপর আইন ও নৈতিকতা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে পরিণত হয় এবং ক্রমশ দুইটি বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।[১]

দার্শনিক কান্ট কর্মের আইনসম্মত হওয়া এবং তার নৈতিকতাসম্মত হওয়ার মধ্যে পার্থক্যকারী প্রাচীর দাঁড় করে দিয়েছেন। তাঁর মতে বাহ্যত আইন অনুযায়ী কাজ করাই নৈতিকতা। নৈতিকতার দৃষ্টিতে সে কাজ যতই খারাপ হোক না কেন।[২]

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٧٠-٧٨

২. ঐ

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলামে সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচার উপরিউক্ত ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সেখানে ইতিবাচকভাবেই মানুষের অধিকার স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্র মহান কীর্তির সৌন্দর্যের এমন দিক উদ্ঘাটিত, যা বহুলোকের নিকটই অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থেকে যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও আইন প্রণয়নকারীদের নিকট থেকে তা জানবার জন্য আকুতি জানায়। কিন্তু ইসলাম যে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ও অকাট্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সে কথা তাদের মনে জাগে না।

বর্তমান আলোচনায় আমরা ইসলামের এই অবদানের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে চাই। ইসলামের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় লাভের জন্য এ আলোচনা একান্তই জরুরী।

আল্লাহ্ তায়ালা জনগণকে তাঁর দাসত্ব কবুল করার আহ্বান জানিয়েছেন' তার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। কেননা মানুষের সার্বিক কল্যাণ কেবল তাঁর আইন ও বিধান পালন করে চলাতেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর বন্দেগী করার জন্য আমাদের প্রতি যে আদেশ করেছেন শুধু আমাদের মন ও অন্তঃকরণের প্রশান্তি ও স্বস্তিলাভের জন্য নয়, খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান লাভ করে আমাদের বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভও তাঁরই উপর নির্ভরশীল। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে আমরা এই দুনিয়ায় সুখী জীবন লাভ করব এটাও আল্লাহ্র ইচ্ছা। তা হলেই পরকালীন জীবনে সে সব জিনিস লাভ করা সম্ভব হবে, যা চক্ষু কোন দিন দেখেনি, শ্রবণেন্দ্রিয় কখনো শুনতে পায়নি এবং মানুষের হৃদয়ে যার কোন প্রতিচ্ছায়া কোনদিনই প্রতিফলিত হয়নি।

আল্লাহ্ তাঁর কিতাবেই কয়েকটি দণ্ডের কথা স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন। যেমন হত্যার দণ্ড হিসেবে কিসাস, চুরি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হাতকাটা প্রভৃতি।

ইসলাম চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের নির্ভুল ও সহীহ্ আকীদা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে সর্বপ্রথম, সেইসাথে ইবাদতের অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বাস্তব কর্মের ধারা সৃষ্টি করেছে। তার পরে আইন প্রয়োগের পদ্ধতি বাস্তবায়িত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এত এক স্বভাবসম্মত কর্মনীতি। কিন্তু বিগত শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যের ইসলাম-দুশমন শক্তিসমূহ ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক ভুল ধারণার ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে যে,

www.pathagar.com

আজ ইসলামী আইনের কথা বললেই লোকদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে কর্তিত হাত ও প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহাংগের বীভৎস ছবি!

সত্যি কথা, বিশ্ব মানবের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র রহমত শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি দণ্ডের বিধান জারী করেই ক্ষান্ত রয়েছেন; বরং অপরাধ এড়িয়ে চলার সুষ্ঠু পথ প্রদর্শনের পরই এবং সে পথে চলার আকুল আহ্‌বান জানানোর পরই তিনি দণ্ডের কার্যকরতার সুযোগ দিয়েছেন, তার পূর্বে নয়। ফ্রান্সিস আইস্কলন্‌জ বলেছেন ঃ

> সমাজ-সমষ্টির কল্যাণই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তা হলে দণ্ডবিধানের মাধ্যমে অপরাধ থেকে লোকদের বিরত রাখাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। আর যে উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে তাকে সামষ্টিকতার দৃষ্টিতে কল্যাণকর গণ্য করা আমাদের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।[১]

এ দৃষ্টিতেও অপরাধের কারণ ও পরিবেশ দূরে রাখা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়—সে কারণসমূহ পরিস্থিতি-সংশ্লিষ্ট হোক, কি ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, তা হলে তাই হবে আদর্শস্থানীয় উপায় এবং তা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

এই পথে কার্যত কয়েকটি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোও হয়েছে। তা সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজরূপে গণ্য। কিন্তু পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট গোটাক্ষেত্রই যদি উত্তমভাবে সুগঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তার বিরোধিতা করার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ পর্যায়ে আমাদের অবশ্যই খুব বেশী ভাবনা-চিন্তা চালাতে হবে। বস্তুত ইসলাম হত্যার দণ্ড হিসেবে যেমন কিসাস কার্যকর করার পক্ষপাতী; অনুরূপভাবে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রোধ উদ্রেকের কারণসমূহ দূর করে হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে ও ইসলাম শুরু থেকেই সচেষ্ট। এ কারণে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদজনিত শত্রুতা হিংসা-বিদ্বেষ ও আক্রোশ দমনের পন্থা নির্দেশ করেছে, দলগতভাবে গোষ্ঠী মতবিরোধ এবং শ্রেণীগত পার্থক্য তীব্র ও মারাত্মক হয়ে না দাঁড়াতে পারে, তার জন্যও কার্যকর পন্থা প্রয়োগ করেছে। সকল মানুষকে একই পিতামাতার সন্তান গণ্য করে সকলকে পরস্পরের ভাই বানাবার চেষ্টা চালিয়েছে।

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص - ٩٨

অনুরূপভাবে ইসলাম চোরের দণ্ড হাতকাটা নির্দিষ্ট করেছে বটে ; কিন্তু তার পূর্বে চৌর্যবৃত্তির কারণ দূর করার ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন-জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারীর জন্য ইসলাম দণ্ড নির্দিষ্ট করেছে দোর্‌রা, অথবা প্রস্তর নিক্ষেপণে হত্যা বা 'রজম'। কিন্তু তার পূর্বে সকলের জন্য বিবাহকে সহজ করেছে, নারীর জন্য পর্দার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে পরস্পরের প্রতি উন্মুক্ত দৃষ্টিতে না তাকানোর বিধান দিয়েছে, অমুহাররম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নির্জনতার একাকীত্বে সংগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।[১]

এভাবেই ইসলাম তার ফৌজদারী আইনসমূহ কার্যকর করার জন্য পূর্বথেকেই তার অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

## ইসলামে মানুষের মর্যাদা

বস্তুত ইসলামে মানুষের মর্যাদা যথার্থ, অত্যধিক। মানুষের সে মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলামের সব চেষ্টাই নিয়োজিত। সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপদস্থতা থেকে মানুষকে রক্ষা করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধু জীবন ও মর্যাদা রক্ষাই নয়, মানুষ যাতে করে স্বাভাবিক কাজের মাধ্যমে স্বীয় যোগ্যতা-প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে, তার জীবন, শক্তি ও প্রতিভা যাতে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে না যায়, সে জন্য ইসলামের ব্যবস্থাপনা তুলনাহীন।

ইসলামী সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সম্মান-মর্যাদা-শক্তি সব আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর রসূলের জন্য এবং ঈমানদার লোকদের জন্য। তবে মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না (বলে তারা প্রকৃত ঈমানদার হয় না)। —সূরা মুনাফিকুন : ৮

---

১. এই পর্যায়ে বিস্তারিত জানা ও বোঝার জন্য এই গ্রন্থকার লিখিত 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' গ্রন্থ পঠনীয়।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সমাজই সম্মানার্হ হতে পারে না যতক্ষণ না যে সব ব্যক্তি সমন্বয়ে এই সমাজ গঠিত, সেই ব্যক্তিদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্যক্তিরা মানবীয় মর্যাদায় যথাযথভাবে অভিষিক্ত হবে। মানুষের এই মর্যাদা যেমন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতব্য, তেমনি সামষ্টিকভাবেও। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁর কর্মচারী ও রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ فَتُذِلُّوْهُمْ وَلَا تُجَمِّرُوْهُمْ فَتَفْتِنُوْهُمْ

وَلَا تَمْنَعُوْهُمْ حُقُوْقَهُمْ فَتُكَفِّرُوْهُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهُمْ

الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوْهُمْ -

তোমরা মুসলমানদের মার-ধর করবে না, তা হলে তোমরা তাদের অপমানিত করবে। তোমরা তাদের পরিবেষ্টিত করবে না, তা হলে তোমরা তাদের কঠিন বিপদে ফেলে দেবে। তোমরা তাদের হক্ বা ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করবে না, তা করলে তোমরা তাদের দরিদ্র বানিয়ে দেবে। তোমরা তাদেরকে কাদায় ফেলে দেবে না, তা'হলে তোমরা তাদের ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেবে।[১]

অপর একটি বর্ণনানুযায়ী তিনি এ-ও বলেছিলেন :

وَاللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحَقَّ بِهٰذَا الْمَالِ مِنْ اَحَدٍ ... وَاللّٰهِ لَئِنْ

عِشْتُ لَهُمْ لَيَصِلَنَّ الرَّاعِيَ فِيْ صَنْعَا حَظُّهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ

وَهُوَ يَرْعٰى مَكَانَهُ -

আল্লাহ্র শপথ! বায়তুল মালের সম্পদে কোন লোকই অপর কারুর তুলনায় বেশী অধিকারী নয় (সকলেরই অধিকার সমান)। আল্লাহ্র

১. كتاب الخراج لابى يوسف ص ١١٥



www.pathagar.com

কসম! আমি বেঁচে থাকলে মরুর রাখালের দূর 'সানা'তে অবস্থান-কালেও এই সম্পদে যে অধিকার রয়েছে, তা তার নিকট পেঁৗছে যাবে।[২]

সন্দেহ নেই, আমীরুল মু'মিনীনের উক্ত উক্তিদ্বয় ইসলামের সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ধারাবিশেষ। তা জাতিসমূহের অধিকার সংরক্ষণের সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, যার বলে সামষ্টিক যুলুম, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্রের নির্মম আঘাত থেকে সকলেই রক্ষা পেতে পারে। তাই উপরিউক্ত উক্তিদ্বয়ের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা আমাদের জন্য একান্তই প্রয়োজন।

বিগত কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত আমরা এই কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার ফলেই সাম্রাজ্যবাদীদের থাবা আমাদের কণ্ঠকে শক্ত করে চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে চূড়ান্ত মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। আমরা নির্বোধ শিকারে পরিণত হয়েছিলাম।

সাম্রাজ্যবাদীরা লোকদের নিছক ধর্মীয় আরাধনা-উপাসনার নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানিকতাকে কিছুটা বরদাশ্ত করলেও কোন পূর্ণাংগ জীবন বিধান-ভিত্তিক আন্দোলনকে আদৌ বরদাশ্ত করতে রাজী হয় না। নিতান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাদের জন্য কোন বিপদের আশংকা থাকে না বলেই তাদের আচরণ এইরূপ হয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মান-মর্যাদাবোধ ও ব্যবস্থাকে ধর্মবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে বদ্ধ পরিকর। মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। তার দৃষ্টিতে ধর্মের কর্তব্য হচ্ছে এ সব স্বভাব-সম্মত অধিকারের সাথে শত্রুতা করা এবং এসব অধিকার হরণ-কারীর সাহায্য করা। অন্তত সাম্রাজ্যবাদী ও স্বাভাবিক অধিকারসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বে ধর্মের উচিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা। এসব অধিকারের সমর্থন, এসব অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা ইন্ধন

---

২. زاد المعاد ج ۲ ص ۸۵ - مسند احمد فی سنده - فلسفة الجهاد فی الاسلام ص ۹۹

www.pathagar.com

জোগানো এবং এই আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত প্রাণকে 'শহীদ' বলা ধর্মের জন্য মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

**ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদ**

প্রাচ্যে অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্র এই অপরাধই করেছে। ফলে জাতিসমূহ অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। ইউরোপীয় যোদ্ধা ও সাম্রাজ্য বিস্তারকারীরা তাদের সব কিছু গ্রাস করে নিয়েছে।

অতঃপর স্বাধীনতার যুগ এসেছে। এখন সময় এসেছে অতীতের সব হারানো বা অপহৃত অধিকার ও মর্যাদার পুনরুদ্ধার করার। অতীতের শিক্ষা ভুলে যাওয়া বা তা থেকে সবক গ্রহণ না করাই হবে চরম গাফলতি। রসূলে করীম (স.)-এর ঘোষণা ঃ

فَالْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

ঈমানদার লোক একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না—হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। —বুখারী, মুসলিম

আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অভন্তরীণ স্বৈরাচারের নির্যাতনে পিষ্ট-নিষ্পেষিত হয়েছি। আমাদের রক্তও এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে। শক্তি আমাদের তিরোহিত, বহুবারের ব্যর্থতা আমাদের সাহস-হিম্মতকে নির্বীর্য করে দিয়েছে। তাই এক্ষণে পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না।

আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা ঃ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ — وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ـ

সাবধান! খুব সতর্কতার সহিত কাজ করবে কিন্তু। কেউ যদি এখানে আমাদের অবস্থানের কথা জানতে পারে তা'হলে তোমাদেরকে পাথর মেরেই শেষ করে দেবে। অথবা জোর পূর্বক তোমাদেরকে তাদের

www.pathagar.com

আদর্শে ফিরিয়ে নেবে। আর তা-ই যদি ঘটে, তা'হলে তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। —সূরা কাহাফ ঃ ২০

সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত কথা হচ্ছে, দীন-ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিরোধী। উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রকাশ্য শত্রুতা ও সুস্পষ্ট বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

দীন-ইসলাম মানুষের পরস্পরের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী। এই সৌভ্রাতৃত্বই হওয়া উচিত জাতিসমূহের মধ্যকার সম্পর্কও। ইসলাম বনী আদমের মর্যাদা অনেক উন্নত করে তুলে ধরেছে। এই মর্যাদার সংরক্ষণ ইসলামী জীবন বিধানের প্রধানতম লক্ষ্য। সেজন্য মানুষের আদি ইতিহাস বর্ণনায় এই সত্যকে উপস্থাপিত করেছে যে, মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ সৃষ্টি-কুদরতেরই ফসল হচ্ছে মানুষ। মানব দেহে যে রূহ জীবনের সঞ্চার করেছে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই অবদান। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশ্‌তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথম মানুষ হযরত আদমের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করার জন্য। অতঃপর মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান ও মনীষা। গোটা সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য অবিসংবাদিত। আল্লাহ্ সেই কথারই ঘোষণা দিয়েছেন এ আয়াতে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ○

নিঃসন্দেহে আমরা সম্মানিত করেছি আদম সন্তানদের এবং তাদের বহন করে নিয়ে গিয়েছি স্থল ও জলভাগের সর্বত্র। পবিত্র পরিপুষ্ট দ্রব্যাদি তাদের জন্য রিযক হিসেবে নির্ধারিত করেছি, আমার বিপুল সৃষ্টিলোকের অনেকের উপরই তাদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান বানিয়েছি।

—সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৭০

www.pathagar.com

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষত্ব সম্পর্কে লোকদের বিভিন্ন রকমের ধারণা আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তদ্দরুণ মানুষের পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও গলা কাটাকাটি হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়; বরং তা-ই হওয়া উচিত পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, বন্ধুত্ব-ভালোবাসা এবং ঐক্য ও একাত্মতার সুদৃঢ় ভিত্তি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছি, শক্তিমান দুর্বলকে জাপটে ধরে, বিজ্ঞ মূর্খের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে এবং ধনী দরিদ্রকে দাসানুদাসে পরিণত করে রাখে। আসলে এ এক মহাবিপর্যয়, মানবতার চরম দুর্গতি। মানুষকে বন্যতার দিকে—পাশবিক স্বভাবের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে—অতি প্রাচীনকাল থেকেই গোটা বিশ্বে এই কালো পশু-স্বভাবেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। অধীনস্থ লোকদের খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে দুর্বলতর ও শক্তিহীন বানিয়ে দিয়েছে, পুরুষ ছেলেদের নির্মমভাবে যবাহ্ করেছে, আর নারীদের বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেদের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

সাম্রাজ্যবাদীদের হত্যাকাণ্ডে চারিদিক রক্ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। তাদের সভ্যতার চরম উন্নতি সত্ত্বেও তারা পাশবিকতার বেড়াজাল ডিঙাতে এখনও পারেনি। স্বাধীনতার জন্য চেষ্টাকারী জাতিসমূহের লোকদেরকে তারা পাইকারী হারে হত্যা করছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য ও উত্থানপ্রচেষ্টা থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এমনিভাবেই অগ্রগতি লাভ করেছে। অধীন মানুষের সবকিছুই তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। ক্রমাগত যুদ্ধ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এসব শক্তি আত্মহননে লিপ্ত হয়েছে। অতীতের এসব সভ্যতার ধারকরা উত্তরকালে এমনভাবে তিল তিল করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, আজ হয়ত তাদের অবস্থান স্থলও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ -

আল্লাহ্ এমনিভাবেই অপরাধী জাতিসমূহকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

—সূরা ইউনূস ঃ ১৩

www.pathagar.com

ইসলাম প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে এবং তার উপযুক্ত ও কার্যকর প্রতিবিধান অবলম্বন করেছে। ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীদের শঠতা ও কুকীর্তি সম্পর্কে লোকদের শুধু সতর্কই করে দেয়নি, তার বিরুদ্ধে ইসলাম অনুসারীদের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে।

## মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে মানুষ

সমগ্র মানবতাকে সৌভাগ্যবান বানানো এবং তার জন্য বিধিবদ্ধ অধিকারসমূহ পুরামাত্রায় বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দীন-ইসলাম সর্ব প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিসমূহের জন্য পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা। এইরূপ পরিবেশ গঠনের জন্য ইসলাম নিম্নোদ্ধৃত মৌল বিষয়াদির নিশ্চয়তা বিধান করেছে ঃ

১. ব্যক্তির মর্যাদা
২. সামষ্টিকতার মর্যাদা
৩. রাজনৈতিক মর্যাদা

ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। তার জান-প্রাণ-রক্ত, ধন-মাল ও ইজ্জত-আবরু পবিত্র, তা বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ হারাম। অকারণে বা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তার কোন একটির উপর সামান্যতম হস্তক্ষেপ করাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন কি, সারা দুনিয়ার মুসলমান যে কা'বার প্রতি মুখ করে নামায আদায় করে, নবী করীম (স.)-এর ঘোষণানুযায়ী মু'মিন ব্যক্তির জান-প্রাণ, ধন-মাল ও ইজ্জত-আবরুর মর্যাদা সেই কা'বা অপেক্ষাও অনেক বেশী পবিত্র এবং সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারী।

ইসলামে ব্যক্তির বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য ও ভাবমূর্তির সংরক্ষণের সাথে সাথে তার তাৎপর্যগত ভাব-মূর্তির পূর্ণ সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তা হচ্ছে তার মন-মানসিকতার স্বাধীনতা ও মর্যাদা। তা রক্ষার জন্য পূর্ণ তাকীদ করা হয়েছে এবং সেজন্য অনুকূল আকীদা-বিশ্বাস ও নীতিগত শিক্ষা এবং আদর্শও স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। উপরন্তু বস্তুগত বৈভবের শূন্যতা বা পরিমাণে স্বল্পতাকে মানবীয় মর্যাদার হীনতা

www.pathagar.com

ও অমর্যাদার ভিত্তি বানাতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। মানবেতিহাসে যে সব জাতি এই পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ...
وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى
الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط ... وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

এরা তো সেই লোক, যারা বলে যে, রসূলের সংগী লোকদের জন্য ব্যয় করা বন্ধ কর, যেন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের ধন ভাণ্ডারসমূহের মালিক তো আল্লাহ্ই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। তারা বলে, আমরা মদীনায় পৌঁছে যাওয়ার পর যারা সম্মানের অধিকারী, তারা সম্মানহীন লাঞ্ছিতদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবে। অথচ সম্মান মর্যাদা তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিন লোকদের জন্য; কিন্তু এই মুনাফিকরা তা জানে না।

—সূরা মুনাফিকুন ঃ ৭-৮

বস্তুত ইসলাম এই ব্যক্তিগত মর্যাদার কারণসমূহ আয়ত্ত করেছে। এজন্য মু'মিন ব্যক্তিকে নিজেকে কোন হীনতা ও লজ্জাষ্কর অবস্থায় নিক্ষেপ না করার উপদেশ দিয়েছে। কেননা তা হলে সে এমন ব্যাপারের কার্যকরতাকে নিজের উপর চাপিয়ে নেবে যা বহনের সামর্থ্য তার নেই। ফলে তার অক্ষমতা প্রকট হয়ে দেখা দেবে। এই কারণেই নবী করীম (স.) নসীহত করেছেন ঃ

www.pathagar.com

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا كَيْفَ يُذِلُّ الْمُؤْمِنُ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ -

মু'মিনের উচিত নয় নিজেকে লাঞ্ছিত করা। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, মু'মিন ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছিত করে কিভাবে? বললেনঃ সে যদি তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হলেই সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে। —মুসনাদে আহ্‌মদ

এই কথাটি ব্যক্তিগত মর্যাদার তীব্র অনুভূতিপ্রসূত। তাই নিজেকে সুদৃঢ় আচরণ বিধি অনুযায়ী পরিচালিত করাই বাঞ্ছনীয়। আর তার সার কথা হচ্ছে, যে কাজ করা কঠিন বা অসম্ভব, তা থেকে দূরে সরে থাকবে।

আর সামষ্টিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রেণীসমূহের মধ্যে পূর্ণ সমতা বিধানের মাধ্যমে, তাদের পরস্পরে পূর্ণ সুবিচারের মানদণ্ড দাঁড় করানোর মাধ্যমে। বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মানুষগুলোকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করা যায়; শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। তাহলে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ কোন একটি বিন্দুতে বা কেন্দ্রে একীভূত ও আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। ফলে অন্যান্য-দের বঞ্চিত হওয়ারও কোন কারণ ঘটবে না। কেননা এই দুঃখজনক অবস্থাই সাধারণ দুর্বলতা ও প্রচ্ছন্ন ক্ষোভের উৎস। তা একই দেশের অধি-বাসীদের মনে দেশরক্ষার কঠিন কাজের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহের সৃষ্টি করে না। কেননা তারা প্রত্যক্ষ করেছে যে, তারা সকলে দেশের কল্যাণ নির্বিশেষে ও পার্থক্যহীনভাবে উপভোগ করতে পারছে না। যে সব লোক নিজেদের দেশের অভ্যন্তরেই হতভাগ্য, তারা নিজেদের অবস্থার প্যাঁচের মধ্যে এমন-ভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, বৃহত্তর কোন কল্যাণের প্রতিরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন সুযোগই তারা পেতে পারে না। আর সাম্রাজ্যবাদ জর্জরিত জাতিসমূহের সাধারণ মানুষের নিস্তেজ নির্বীর্য হয়ে থাকার মূলে এই নিগূঢ় তত্ত্বই নিহিত রয়েছে।

এই কারণে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চেপে বসা সাম্রাজ্যবাদ তথা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক, যেন কোনরূপ বৈদেশিক

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের আশংকা দেখা দিতে না পারে। গোটা জাতির মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিরও অস্তিত্ব যেন না থাকে, যে শত্রুপক্ষের ইশারা-ইংগিতে কাজ করবে; অথবা কোনরূপ প্রলোভনে পড়ে আত্মবিক্রয়ে বা আত্মবিধ্বংসী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।

দীন-ইসলাম জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীসমূহের মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষার এবং কারুর দাসত্বের নিগড়ে কারুর বন্দী হওয়ার অবস্থার সৃষ্টি না হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই পন্থা হচ্ছে প্রকৃত ঈমান—কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করা এবং এই ভাবধারায় গোটা জাতিকে গড়ে তোলা। আল্লাহ্ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতিই আহ্বান জানাবার ভাষা ও কথাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন কুরআন মজীদের এই আয়াতটিতে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

বল, হে কিতাবধারী লোকেরা! এস এমন একটি মত বা বাণীর দিকে, যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুরই দাসত্ব গ্রহণ করব না, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক বানাবো না এবং আমরা পরস্পর পরস্পরকে ও রব্ব বানাবো না আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৪

তদানীন্তন সমাজে একশ্রেণীর লোক নিজেদেরকে মিছেমিছিভাবে ধর্মের অনন্য ধারকরূপে জনগণের সম্মুখে পেশ করত। তারা একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ তারা আয়ত্তাধীন করে নিয়েছিল। বিলাসিতা, জাঁকজমক ও সুখ-সম্ভোগ ছিল তাদের নিত্যকার সহচর। এজন্য তারা সাধারণ জনগণের উপর দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জনগণের শক্তি ও সামর্থ্য

www.pathagar.com

নির্মমভাবে শুষে নিচ্ছিল। ধর্মের ধারক হওয়ার এমন একটা ভাবমূর্তি তারা জনসমক্ষে স্থাপিত করে নিয়েছিল যে, জনগণ কার্যত তাদেরই দাসানু-দাস হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই তাদের সম্পর্কে বলেছেন :

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ -

বিপুল সংখ্যক পাদ্রী, পুরোহিত, পণ্ডিত ও সমাজত্যাগী বৈষ্ণবপন্থী মানুষ অত্যন্ত বাতিল পন্থায় জনগণের ধনমাল ভক্ষণ করছে এবং তারা আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরে থাকছে ও বিরত রাখছে। (আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার ও আল্লাহ্র আনুগত্য গ্রহণের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

—সূরা তওবা : ৩৪

ব্যক্তির রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যুক্তিসংগতভাবে সাম্যপূর্ণ ও সুবিচারক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সরকার গঠন করা হলে। এইরূপ একটি সরকারই তার অধীন ব্যক্তিবর্গের এই চেতনা জাগ্রত করতে পারে যে, তারা গোটা জাতির অবিচ্ছিন্ন অংশ, দেশ ও জাতির সেবক। জাতি তার মনিবও নয়, তার জল্লাদও নয়।

স্বৈরতন্ত্রী শাসক ও প্রশাসক কর্তৃক অবলম্বিত রাষ্ট্র পরিচালন-নীতির দরুনই জাতি লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়ে থাকে। জনমতের এক কড়াক্রান্তি মূল্যও তার নিকট স্বীকৃতব্য হয় না। এই ব্যবস্থা জন-গণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও দাবি-অভিমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে—তার সামান্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত হয় না। প্রকৃত পক্ষে এই শাসক ও প্রশাসকই মুখে হয়ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে; কিন্তু কার্যত স্থানীয় ও অভ্যন্তরীন দিকদিয়ে সে নিজেই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে এবং চোখের অন্তরালে বহিঃশত্রুদের হস্তক্ষেপের জন্য নিজ দেশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শাসন প্রাচীরকে এতই দুর্বল করে রেখেছে যে, বৈদেশিক শত্রুর পক্ষে তা দীর্ণ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং সবকিছু দখল করে নেয়া খুবই সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র চলতে থাকলে বা চলতে দিলে তা স্বতঃই বৈদেশিক স্বৈরতন্ত্রের অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে দেয়।

অপরাধী সীমালংঘনকারী শাসকদের সম্মুখে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি-বর্গ ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীসমূহ একবার মস্তক অবনত করে দিলে বিদ্রোহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সম্মুখে তা বার বার মস্তক অবনত করে দিতে কোনই কুণ্ঠাবোধ করবে না। ফলে সে জাতির পক্ষে বিদেশী শক্তির পদানত হয়ে পড়া কিছুমাত্র কঠিন হয়ে থাকে না।

এই কারণে শাসক প্রশাসক এ অপরাধ করলে দীন-ইসলামে তারও দণ্ড ও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেন সুযোগ পেলেই সে জন-গণের উপর আঘাত হানার দুঃসাহস না করে। স্বয়ং নবী করীম (স.) তাঁর নিজের উপরই এই আদর্শ বাস্তবায়িত করে তুলনাহীন ও দৃষ্টান্তহীন মানবিক আচরণের অবতারণা করেছেন। আর তা-ই সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য চিরন্তন অনুসরণীয় আদর্শ। নবী করীম (স.) একবার বাইতুল মালের কিছু জিনিস লোকদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। একটি লোক এই সময় সেই জিনিসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তখন নবী করীম (স.) তাঁর হস্তস্থিত খেজুর ছড়ার গোড়ালী দিয়ে তাকে গুতো দিলেন। লোকটি তাতে ব্যথা পেল। তখন নবী করীম (স.) সাথে সাথেই বলে উঠলেনঃ এস, আমাকেও তুমি অনুরূপ আঘাত দাও। লোকটি বললেনঃ না, হে রসূল! আমি বরং আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১]

## শাসক ও প্রশাসক জনগণের খাদিম

শাসক ও প্রশাসকের যুলুম এবং প্রজা সাধারণকে শোষণ-নির্যাতনের ফল একটি জাতির জীবনে খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে এবং পরিণামে তাই গোটা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার উপর কঠিন হুমকি হয়ে দেখা দেয়। জাতি সত্তাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে দেয়। আগ্রাসনকারীদের সত্যিকার-ভাবে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সর্বসাধারণ মুসলিম জনগণকে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন বানাবার লক্ষ্যে ভাষণদান প্রসংগে বলেছিলেনঃ

---

১. كتاب الشفا بحوالة السيرة النبويه لابن الحسن على الندوى ص ٣٢٨

www.pathagar.com

إِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ إِلَيْكُمْ عُمَّالاً لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ

وَلاَ لِيَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنِّي أَبْعَثُهُمْ إِلَيْكُمْ

لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذٰلِكَ

فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ -

আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তোমাদের উপর আমার কর্মচারী নিয়োগ করে এজন্য পাঠাইনি যে, তারা তোমাদের মুখে চপেটাঘাত বা থাপ্পড় লাগাবে। এজন্যও নয় যে, তারা তোমাদের ধন-মালের অংশ নিয়ে নেবে। বরঞ্চ আমি তাদের পাঠিয়েছি এই জন্য যে, তারা তোমাদের দীন ও তোমাদের নবীর সুন্নত শিক্ষা দেবে। কাজেই কারুর সাথে এর বিপরীত কোন আচরণ হয়ে থাকলে তা অবশ্যই আমার নিকট পেশ করা চাই। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি তার সে অপরাধের বিচার অবশ্যই করব।[১]

মিসরের গবর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) সংগে সংগেই প্রশ্ন করে বসলেন ঃ কোন প্রশাসক যদি তার অধীন লোককে শাসন বা সুনীতি শিক্ষাদানের লক্ষ্যে অনুরূপ কিছু করে, তা হলেও কি আপনি তার সাথে কথিত রূপ আচরণ গ্রহণ করবেন ? আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আমি তারও প্রতিকার করব। আমি নিজে রসূলে করীম (স)-কে তাঁর নিজের কাজের উপরও দণ্ড কার্যকর করতে দেখেছি।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উপরিউক্ত কথাটি একটি মৌখিক নীতিকথাই শুধু ছিল না, মিসরের প্রশাসক আমর ইবনুল আস একজন মিসরীয় ব্যক্তিকে মারধর করেছিলেন বলে তাঁর উপরও উক্ত নীতি প্রয়োগ ও

১. كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١١٥ - مسند احمد

www.pathagar.com

কার্যকর করেছিলেন। এই সময় তিনি যে উক্তি করেছিলেন, তা এক চিরন্তন মূল্যের অধিকারী নীতিকথা। মানবেতিহাস এই কথার জন্য চিরদিন গৌরব করতে পারে এবং তার দরুণ সামাজিক সুবিচার সর্বকালেই স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে। তাঁর উক্তিটি ছিল ঃ

مَتَى اِسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ اَحْرَارًا -

> তোমরা মানুষকে দাস বানিয়ে নিয়েছ কবে থেকে? - - অথচ তাদের মায়েরা তাদের স্বাধীনরূপেই প্রসব করেছিল ?

আদী ইবনে আরতাত ছিলেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিয়োগকৃত প্রশাসক। তিনি খলীফাকে লিখেছিলেন ঃ

> আমাদের পূর্বে লোকেরা কোনরূপ শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব—খারাজ দিত না।

জওয়াবে খলীফাতুল মুসলিমীন লিখলেন ঃ

> তুমি লোকদেরকে আযাব দেয়ার অনুমতি চাইছ আমার নিকট, এটা খুবই বিস্ময়কর। মনে হয়, আমাকে তুমি আল্লাহ্‌র আযাবের মুখে ঢালরূপে গ্রহণ করতে চাইছ। আর আমার সন্তুষ্টিই যেন তোমাকে আল্লাহ্‌র রোষ ও ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে বলে ধারণা করেছ---
>
> তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছার পর তোমার নীতি এই হবে যে, যে লোক খারাজ দেবে, তা গ্রহণ করবে। যদি কেউ না দেয় তা হলে তাকে হলপ করে তা দিতে না পারার কথা বলতে বলবে। কেননা লোকেরা তাদের অপরাধসহ আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে তা তাদের আযাব দেয়ার অপরাধ নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আমার উপস্থিত হওয়ার তুলনায় আমার অনেক পসন্দ।[১] হেদায়েত প্রাপ্তদের প্রতি সালাম - -

বর্ণিত হয়েছে, কৃষিজীবিদের একটি গোষ্ঠীর কিছু মাল-মাত্তা চুরি গিয়েছিল। তারা নিম্নশ্রেণীর কিছু লোকের প্রতি এজন্য সন্দেহ করল এবং তাদের ধরে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ)-এর নিকট

---

১. كتاب الخراج لابى يوسف ص ١١٩

উপস্থিত করল। তিনি কিছুদিন তাদের আটক রেখে পরে ছেড়ে দেন। পরে সেই লোকেরা হযরত নু'মানের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল ঃ "আপনি ওদের ছেড়ে দিলেন অথচ ওদের মারধরও করলেন না, কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করা হল না?" তিনি বললেন ঃ "তোমরা কি চাও?--- তোমরা চাইলে আমি ওদের মারধর করব কিন্তু ওদের নিকট থেকে তোমাদের মাল পাওয়া গেলে তো ভালই, তোমাদের মাল তোমরা নিয়ে নেবে। কিন্তু যদি তা পাওয়া না যায়, তা'হলে যে মারধরটা ওদের উপর করা হ'ল অনুরূপ মার-ধর তোমাদের উপরও চালানো হবে।" ওরা বললে ঃ এটাই আপনার চূড়ান্ত রায়? তিনি বললেন ঃ আমার নয়, আল্লাহ্ ও রসূলের।[১]

বস্তুত মানুষের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মর্যাদার এই উজ্জ্বল আদর্শই ইসলাম উপস্থাপিত করেছে। নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং সেজন্য তাকে শাস্তি দান আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আধুনিককালের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় কত মানুষকেই যে নিছক সন্দেহের দরুণ অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তদ্দরুণ কঠিন আযাব ও উৎপীড়নের তিক্ত স্বাদ গ্রহণে তাদের বাধ্য করা হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সে ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনি মর্মান্তিক। একশ্রেণীর ক্ষমতাধর নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর এমনি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করেছে, নিজেরাও তলিয়ে গেছে নিশ্চিত ধ্বংসের অতল গহ্বরে। নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিল তারা, তারা অন্যদেরও পথভ্রষ্টই করেছে।

**জাতীয় জীবনে সুবিচারের প্রভাব**

সামাজিক সুবিচার এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে গণ-অধিকারসম্পন্ন ব্যবস্থাই স্বাধীন পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সম্ভাবনা সমধিক। ব্যক্তিগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই পরিবেশেই দানা বেঁধে উঠতে সক্ষম হয়। ব্যক্তিহৃদয়ে নিহিত পূর্ণমাত্রার স্বাধীনতা স্পৃহা এবং গোটা সৃষ্টিলোকের অধিকর্তা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ছাড়া অন্য সবকিছুর দাসত্ব ও গোলামীকে অস্বীকার করে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদার পতাকা উড্ডীন করা কেবলমাত্র এই ধরনের পরিমণ্ডলেই সম্ভব হতে পারে।

---

১. فلسفة الجهاد في الاسلام ص ١٠٤

www.pathagar.com

দীন-ইসলামের দৃষ্টিতে এইরূপ স্বাধীন পরিমণ্ডল একান্তই জরুরী। ব্যক্তির প্রকৃত মানসিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা লাভের জন্য এই পরিমণ্ডল অপরিহার্য। ঠিক যেমন জৈবিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন মুক্ত নির্মল বায়ুর ; জলীয় প্রাণীর পক্ষে যেমন পানির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কোন জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাজনৈতিক মর্যাদা যখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখনও দীন-ইসলামের অস্তিত্ব বজায় থাকে বলে মনে করা হলে বলতে হবে, সে অস্তিত্ব প্রাণহীন দেহের পচনমুখী অস্তিত্ব থেকে ভিন্নতর কিছু হবে না। বিশ্বাস ঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাস বানাবার অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শ্রম-জীবিদের প্রাপ্য মজুরী শোষণ করার সদাসক্রিয় কার্যধারা কোন জাতির সামষ্টিক জীবনে চলতে থাকলে অতঃপর আল্লাহ্র কঠোর রোষ ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করতে হবে না।

হাদীসে কুদসীর একটি বর্ণনায় আল্লাহ্র উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ - رَجُلٌ اَعْطَى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا اَوْ اَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنَ الْعَمَلِ وَلَمْ يُوَفِّهِ اَجْرَهُ -

কিয়ামতের দিন আমি তিনজন লোকের বিরুদ্ধে থাকব। আর আমি যার বিরুদ্ধে থাকব তার বিরোধিতা করবই—এক, যে ব্যক্তি আমার কারণে দিতে গিয়ে পরে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। দুই, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছে, কিংবা তাকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণ করেছে এবং তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার কাজ পূর্ণমাত্রায় করিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেয়নি।[১]

১. বুখারী শরীফ, কিতাবুল ইজারা : মুসনাদে আহমাদ

www.pathagar.com

বস্তুত যে সমাজে এইরূপ অবস্থা অব্যাহতভাবে বিরাজ করে এবং তার বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে না, সেই সমাজের দেশ বৈদেশিক শক্তি'র বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধ শক্তি'র অধিকারী থাকে না, শত্রুর মুকাবিলায় সম্পূর্ণ নিঃশক্তি হওয়া ছাড়া তার অন্য কোন অবস্থার আশা করা যায় না। এ হচ্ছে মন ও দেহ উভয়েরই চরম বিপর্যয়, সামাজিক সুবিচারের চূড়ান্ত ধ্বংসের ক্ষেত্র হয় তা। তথায় অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের লোকেরা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার অধিকাংশই ধ্বংসের মুখে চিরতরে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিছু সংখ্যক লোক হয়ত সেখানে যাবতীয় সুখ-সম্ভোগ আয়ত্ত করার মহাসুযোগ লাভ করে বসে।

এই ধরনের দেশের দ্বারপথে যে কোন মুহূর্তে বৈদেশিক আক্রমণের করাঘাত শুনতে পাওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত তার দ্বার বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সম্মুখে উন্মুক্ত হওয়াই হতে পারে স্বাভাবিক পরিণতি।

আর তা-ই যদি সংঘটিত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, তাদের সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম এবং তাদের নিজেদের অবস্থা সুসংগঠিত না করাই এর কারণ।

কুরআনের জাতীয় উত্থান-পতন দর্শনের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলীরা তাদের শত্রুশক্তি দ্বারা বিজিত হয়েছিল এবং তাদের দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের কবলিত হয়েছিল শুধু এই কারণেই। বলা হয়েছে :

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا
بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

www.pathagar.com

পরে (মূসার প্রতি অবতীর্ণ) কিতাবে বনী ইসরাঈলীদের এ বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুই-দুইবার পৃথিবীতে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং খুব বেশী বিদ্রোহ প্রদর্শন করবে। শেষ পর্যন্ত যখন তম্মধ্যে প্রথম বিদ্রোহের অবস্থা দেখা দিল, তখন—হে বনী ইসরাঈলীরা ! আমরা তোমাদের প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের এমন সব বান্দাকে সুসংগঠিত করে পাঠালাম, যারা খুব বেশী শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্ন ছিল। তারা তোমা-দের দেশে অনুপ্রবেশ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুত এ এমন একটা ওয়াদা ছিল যার পূরণ হওয়া ছিল অবধারিত।

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪-৫

বস্তুত আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিণামে আল্লাহ্‌র গযব অবশ্যম্ভাবী। অপরাধী ও পাপপন্থী সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন প্রত্যেকটি দেশের উপরই পরাধীনতার অভিশাপ আসবেই। তারই কারণে এক-একটি জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হতে বাধ্য। যা রোধ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

বনী ইসরাঈলীদের দেশ অতঃপর শত্রুর কবলিত হয়ে পড়ল। তাদের উপর কঠিন যুদ্ধ ও গোলামীর লা'নত চাপিয়ে দেয়া হল। কুরআনের বর্ণনা ঃ

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۔

পরে দ্বিতীয় ওয়াদা পূরণের সময় যখন উপস্থিত হল, তখন আমরা অন্যান্য দুশমনদেরে তোমাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম, যেন তারা তোমাদের মুখাবয়ব বিকৃত করে এবং মসজিদে (বাইতুল মাক্‌দেসে) ঠিক তেমনি প্রবেশ করে যেমন করে প্রথম শত্রুরা প্রবেশ করেছিল এবং যে জিনিসের উপরই তাদের হাত পড়বে, তাকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। —সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭-৮



www.pathagar.com

এ ছিল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সাবধান বাণী—ভীত-সন্ত্রস্তকরণ। যে সব জাতি আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে, তাদের উপরই এই পরিণতি দেখা দিয়েছে। তারা শত্রু কর্তৃক বিজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। ফলে শত্রুর যুলুম তাদের উপর আসমান ভেঙে পড়ার মত আপতিত হয়েছে।

আসলে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘনকারী এসব জাতি বিশ্বজাতি সংস্থায় রোগ জর্জরিত অংগ। তার চিকিৎসা একান্তই জরুরী। অন্যথায় বিশ্ব জাতির গোটা দেহ সংস্থায় সেই রোগ সংক্রমিত হয়ে গোটা মানব জাতিকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই এই প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

কতক লোকদের দ্বারা অপর কতক লোকদের প্রতিরোধ করার আল্লাহ্‌র স্থায়ী নীতি কার্যকর না থাকলে পৃথিবী চরম বিপর্যয়ে পড়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সমগ্র জগতজনের প্রতি বড়ই অনুগ্রহসম্পন্ন (বলেই এই ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন)। —সূরা বাকারা ঃ ২৫১

**সকলের জন্য সুযোগদান**

সমস্ত উম্মতের জন্য সামষ্টিক মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতারক্ষণ। সকল মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জন ও কর্মে বিনিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য-হীন অধিকার দান—সমান মাত্রায় এবং সকলের জন্য নির্বিশেষে।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য যে সুবিচার ও ন্যায়পরতার ব্যবস্থা রেখেছেন, এটা তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটা দিক।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁর সন্তানদের প্রতি এই মৌলনীতি পুরোপুরি কার্যকর করেছেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের পুত্রদের অন্যান্য

www.pathagar.com

মু'মিনদের অপেক্ষা কোন বিশেষ মর্যাদা, অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা দিতে স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করেছেন।

হযরত আবু মূসা আল-আশ্‌য়ারী (রাঃ) একজন মহাসম্মানিত সাহাবী। তিনি যখন কূফার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি কিছু পরিমাণ সরকারী সম্পদ খিলাফতের রাজধানী মদীনায় স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। হযরত উমরের দু'জন পুত্রও এই সময় কূফা থেকে ব্যবসায়ী কাফেলা হিসেবে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। আবু মূসা চেয়েছিলেন, এই দুইজন পুত্র অত্র সরকারী মূলধন দিয়ে ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে গেলে ও তথায় তা বিক্রয় করলে তাঁরা লাভবান হতে পারবেন এবং সরকারী মূলধনও সহজেই রাজধানীতে স্থানান্তরিত হতে পারবে।

তাঁরা তা নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন কিন্তু সুবিচারক ও ন্যায়বাদী খলীফা এই মুনাফা তাঁর পুত্রদ্বয়কেই নিয়ে নেবার সুযোগ দিলেন না। তিনি অতিরিক্ত মুনাফা পরিমাণ সম্পদ ভাগ করে সরকারী অংশের মুনাফা বাইতুলমালে জমা করে দিলেন। কেননা এই সুযোগটি এককভাবে গ্রহণ করার তাঁদের কোন অধিকার ছিল না। যদিও তা তাঁরা পেয়েছিলেন খলীফার পুত্র হওয়ার কারণে মাত্র। কিন্তু এই কারণে এই সুযোগ মত মুনাফা লাভ অথবা মুনাফা লাভের এই সুযোগ গ্রহণ কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

মানব সমাজে এমন অনেক সময় ও কাল অতিবাহিত হয়েছে যখন মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে। মানুষের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাধারণ জনজীবনের মানদণ্ডের উপর স্বৈরতন্ত্রীদের আধিপত্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে চেপে বসেছে। ফলে তারা মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ভীতি-বিহ্‌বলতা জগদ্দল পাথর হয়ে মানুষের মনের আশা-আকাঙক্ষা ও সাহস-হিম্মতকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

সন্দেহ নেই, তা গোটা জীবনের উপর সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থারই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

কেননা স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসন একটা বিষাক্ত ধূম্রের ন্যায় জনগণের দেহসত্তাকে গ্রাস করে নেয়। হৃদয়ের উদারতা ও মনের প্রশস্ততাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। এই কারণে মূর্তি পূজারীদের রাজনীতি ছিল একই সাথে

www.pathagar.com

আল্লাহ্র ও মানুষের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। তাই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ একান্তভাবে নিহিত ছিল মূর্তি পূজারীদের প্রভুত্বমূলক রাজনীতি থেকে মুক্তিলাভের মধ্যে।

স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের পদতলে ইসলামী জীবনাদর্শ বহুবার নিষ্পেষিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। তার ফলে গোটা মুসলিম উন্মতের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অতঃপর তারা সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। কেননা খলীফা নামধারী প্রশাসক ও সমাজপতিরাই প্রকৃত পক্ষে জাতির শত্রু হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ সব স্বৈরতন্ত্রী শাসক তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ করার লক্ষ্যে এবং তাদের উপর তাদের প্রশাসনকে চিরস্থায়ী বানাবার উদ্দেশ্যে যে কঠোর নীতি প্রয়োগ করত, তা ইসলামে আদৌ সমর্থনীয় নয়। কেননা তা সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কোন মানুষকে অকারণ ও অন্যায়ভাবে প্রহার করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। হারাম মানুষকে অপমান ও লাঞ্ছিত করা, কঠিন নির্যাতন ও নিষ্পেষণে জর্জরিত করা। কোন একব্যক্তির জীবনের মূল্যহীনতা গোটা জাতীয় জীবনের মূল্যহীনতা ও অপদস্থতার সমান।

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ -

একজন মু'মিন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে ও অকারণে হত্যা করা অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংসও আল্লাহ্র নিকট তুলনামূলকভাবে কম দুঃসহ।

অতএব কোন যালিমের যুলুম স্থিতিশীল করা, কোন প্রশাসকের কর্তৃত্ব কিংবা কোন স্বৈরাচারীর শক্তিকে অধিক দৃঢ় করার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা সবচাইতে বেশী ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মস্ঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনা; রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

يَجِيْئُ الْمَقْتُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰخِذًا قَاتِلَهُ وَاَوْدَاجُهُ

تَشْخَبُ دَمًا - عِنْدَ ذِى الْعِزَّةِ جَلَّ شَانُهُ - فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ - سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِى، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَ قَتَلْتَهُ، قَالَ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ : قِيْلَ وَالْعِزَّةُ لِلّٰهِ...وَيَذْهَبُ بِهٖ اِلَى النَّارِ -

কিয়ামতের দিন (দুনিয়ায়) নিহত হওয়া ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে নিয়ে আসবে---তখনও তার ক্ষতস্থান ও শিরাসমূহ থেকে রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে। বলবে হে আল্লাহ্! আপনি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কোন্ কারণে আমাকে হত্যা করেছিল? তখন আল্লাহ্ তাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করবেন, কোন্ কারণে তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? সে বলবে: অমুক ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং তার শক্তি ও দাপটকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। তখন বলা হবে; সমস্ত মর্যাদা ও শক্তি তো একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ -

যে লোক অন্যায়ভাবে ও যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলিমের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত করবে, সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হবেন।

তিনি আরও বলেছেন:

ظَهْرُ مُسْلِمٍ حِمًى اِلَّا بِحَقِّهٖ -

www.pathagar.com

মুসলিম ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ সুরক্ষিত। তবে কোন যুক্তিসংগত কারণ ও বিচারের দরুণ তা দণ্ডনীয় হতে পারে।

কিন্তু একালে দুনিয়ায় এমন সব শাসক ক্ষমতাশালী হয়ে বসেছে, যারা মনে করে, মানুষ নিতান্তই জন্তু-জানোয়ার এবং জন্তু-জানোয়ারকে প্রহার করায় যেমন কোন কুন্ঠা বা ন্যায়-নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না, কারুর নিকট জবাবদিহি করারও ভয় থাকে না, মানুষের বেলাও তাদের মনে এই ধারণাই দানা বেঁধে রয়েছে। মুসলমানদের জন্য তাদের হাতে চাবুক, ছুরি বা পিস্তল-বন্দুক ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য গোচর হয় না। জনসাধারণ তাদের নিকট থেকে ভীতি-সন্ত্রাস ও নির্যাতন ছাড়া আর কিছুরই আশা করে না। বস্তুত আজকের মানুষ মানুষের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী হওয়ার এটাই মূলীভূত কারণ। সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়ে অনন্তকাল ধরে লাঞ্ছিত ও অবমানিত জীবন যাপনে বাধ্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয় এরই দরুণ।

কেননা স্বৈরতন্ত্রী কখনই কাউকে বিশ্বাস করে না। তবে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পূর্বে হয়ত বা সে নিজেকে বিশ্বাস করে। জাতির ও জনগণের কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে সে চিরদিন নিজের কল্যাণের জন্যই কাজ করে। এইরূপ অবস্থায়ই চাটুকার অনুসারীরা তার চতুর্দিকে ভীড় জমাতে থাকে এবং নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। ফলে গোটা দেশ ও দেশবাসীও যদি সম্পূর্ণরূপে অধিকার-বঞ্চিত হয়, তা হলেও তারা একবিন্দু কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না।

এর ফলে গোটা দেশ ও সমগ্র জাতি কঠিন ও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চাটুকাররা অযোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ সর্বপ্রকারের দায়িত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসলে জাতীয় জটিল সমস্যাদির সমাধান কখনই সম্ভবপর হয় না। তদ্দরুণ জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট হয়, গোটা জাতি ও দেশ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

আর হাদীসের দৃষ্টিতে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিকট জাতীয় আমানত-সমূহ কুক্ষিগত হয়ে পড়া কিয়ামতের অন্যতম বড় নিদর্শন। এর অপর দিক হচ্ছে, যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তা থেকে বঞ্চিতকরণ।

মানবীয় উচ্চতর প্রতিভাসমূহ উত্তম মূল্যবান খনিজ সম্পদের মতই দুর্লভ। তা বিনষ্ট করা হলে--বা তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া না হলে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়া অবধারিত, এর বিকল্প কল্পনাতীত।

www.pathagar.com

বর্তমান সময় মুসলিমগণের মেরুদণ্ড শাসক শ্রেণীর নীতিহীনতা ও চরিত্রহীনতার প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জোর-পূর্বক শাসন দণ্ড ধারণকারী প্রশাসকেরা আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ও স্বৈরতন্ত্রের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে পূর্ণ দাপট সহকারেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

আর তাদের পদতলে পড়ে ধূলায় লুণ্ঠিত ও পর্যুদস্ত হচ্ছে সামষ্টিক সুবিচারের মহামূল্য কুসুমকলি। স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসকরা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের সমস্ত মূল্যমান।

## সুবিচারের অমূল্য অবদান

বস্তুত সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচার ন্যায়বাদী-নিরপেক্ষ মানদণ্ড। প্রতিটি জিনিস তারই উপর ভর করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি জাতির জীবন ও সজীবতার তা-ই হচ্ছে জীবন্ত লক্ষণ। মহাসত্য উদ্ঘাটনে তার অবদান তুলনাহীন; তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত। মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার অকুণ্ঠ প্রকাশের জন্য তা অপরিহার্য।

শুধু তা-ই নয়, স্বাধীনতা ও মর্যাদার মূল উৎসই হচ্ছে এই সামষ্টিক সুবিচার। সুবিচার ও ন্যায়পরতাকে বাদ দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অকল্পনীয়।

কেননা ন্যায় বিচার ব্যতিরেকে মানুষের স্বাধীনতা অচিন্ত্যনীয়, যেমন মানবীয় মর্যাদার কোন ধারণা করা যায় না যুলুমের অব্যাহত নিষ্পেষণে। তার ফলে বিপর্যয় ব্যাপক হয়ে দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই। আর তখনই একটি জাতিকে কঠিন অক্টোপাশে বেঁধে ফেলে স্বৈরতন্ত্রী শক্তি।

যুলুমে স্বাধীনতার প্রাণ ওষ্ঠাগত, মানবীয় মর্যাদা অস্বীকৃত। সুবিচার মানুষকে আধিপত্যবাদ ও জবরদস্তির শাসন থেকে চিরদিন মুক্ত রাখে। শান্তি ও নিরাপত্তার অমীয়ধারা প্রবাহিত হয় জীবনের উষর ধূষর মরু-প্রান্তরে। কেননা সামাজিক ন্যায় বিচার সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ে তার অবদান চির ভাস্বর ঃ

১—নিরংকুশ চিন্তা ও অনুভূতির মুক্তি,
২—সাম্য ও পূর্ণাংগ মানবতার প্রতিষ্ঠা,
৩—সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা।

www.pathagar.com

ব্যক্তির অধিকারসংক্রান্ত মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক চেতনাবোধের আনুকূল্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে কোনরূপ সামাজিক সুবিচার কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। সমাজ-সমষ্টি চিরকাল তার মুখাপেক্ষী। মানবীয় উচ্চতর লক্ষ্যপানে তা মানুষকে পরিচালিত করে, এই বিশ্বাস অনির্বান দীপশিখার মত চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

সেইসাথে বস্তুগত প্রতিষ্ঠাও অপরিহার্য। তা ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে তাকে ধারণ করার জন্য। তার অর্পিত দায়িত্ব বোঝা বহন করতে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে এবং তার অধিকারের উপর সর্বপ্রকারের আঘাতকে প্রতিরোধ করে, ব্যক্তির অন্তরে সামাজিক সুবিচারের চেতনা জাগ্রত না হলে কেবল আইনের বলে তা পেতে পারে না কখনই। এই চেতনাকে চিরকাল সক্রিয় রাখার জন্যও প্রয়োজন বাস্তব কর্ম শক্তির উদ্বোধন।

সমাজ-সমষ্টির দৃঢ় প্রত্যয় অভ্যন্তর থেকে সমর্থন দিতে না থাকলে এবং কর্মীয় সম্ভাবনা বাইর থেকে সব সময় তাকীদ দিতে না থাকলে সমাজ-সমষ্টি আইনের রক্ষণাবেক্ষণেও সক্ষম হতে পারবে না কখনই।

এই কারণে সব কয়টি আসমানী শরীয়তই সমস্ত অ-খোদার দাসত্বের নিগড় থেকে মানবীয় চেতনাকে মুক্ত রাখার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর সম্মুখেই একবিন্দু নতি স্বীকার করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে।

—তা' হলে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুরই একবিন্দু কর্তৃত্ব থাকবে না।

—আল্লাহ্ ছাড়া মানুষকে কেউই বাঁচাতে পারে না, মারতেও পারে না।

—আল্লাহ্ ছাড়া মানুষের একবিন্দু ক্ষতি বা উপকার করতেও পারে না কেউই।

—মানুষকে রিয্ক দেন কেবলমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া রিয্ক দিতে সক্ষম আসমান-যমীনে আর কেউই কোথাও নেই।

আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী কেউ নেই, শাফায়াত করে (আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে) তরিয়ে দিতে পারে এমনও কেউ নেই,

www.pathagar.com

কক্ষণই হবে না। আল্লাহ্ একাই সর্ব বিষয়ে সক্ষম, সমর্থ। তিনি ছাড়া আসমান-যমীনের আর সবকিছু কেবলমাত্র তাঁরই দাসানুদাস। তারা নিজেদের জন্যও কিছু করতে সক্ষম নয়, সক্ষম নয় অন্যদের জন্য কিছু করতেও।

## শরীয়তের আওতাধীন অনুভূতি

সমস্ত আসমানী শরীয়ত একটি ব্যাপারে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ একমত। তা হচ্ছে, খোদায়ী ও লোকাতীত পবিত্রতায় শিরকের সর্ব-প্রকারের শোবাহ্-সন্দেহ থেকে মানবীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের চির মুক্তি। আল্লাহ্‌র কোন বান্দা—সে যে-বান্দাই হোক—নবী বা রসূল হলেও এই অনুভূতি সংকীর্ণ বা বিনয়াবনত হয় না। কেননা সেও একজন বান্দাই বটে, সে পূর্ণ ইলাহ্ও নয়, নয় অর্ধ-ইলাহ্ও। তাই আল্লাহ্‌র কোন বান্দাই বান্দা হওয়ার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। ফলে আল্লাহ্ ও বান্দা-গণের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলতে কেউ থাকে না; বরং প্রত্যেকটি বান্দাই সরাসরি তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্কশীল। ব্যক্তি তার নিজস্ব শক্তি-বলেই চিরদিন আল্লাহ্‌র সম্মুখবর্তী। তার নিকট থেকেই সে শক্তি, সম্মান ও সাহসিকতা লাভ করে। তাঁর অবদানের চেতনা চির জাগরূক থাকে তার হৃদয়-মনে, প্রতি রক্তবিন্দুতে। ফলে তার ঈমান সুদৃঢ়, তার প্রত্যয় হয় অবিচল, দুর্জয় এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবধারাও হয় শক্তিশালী।

সমস্ত আসমানী শরীয়ত ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার এই সম্পর্কের দৃঢ়তা গভীরতা ও স্থায়িত্ব কামনা করে। ব্যক্তির হৃদয়ে এই অনু-ভূতি তীব্র ও দুর্জয় করে তোলে যে, সে স্রষ্টার মহাশক্তি থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে শক্তিলাভ করতে ও সাহায্য অর্জন করতে সক্ষম।

এভাবেই তার ঈমান হয় অধিকতর শক্তিশালী, তার অনুভূতি হয় চিরমুক্ত, অনাসক্ত, অপ্রভাবিত ও অকুণ্ঠ।

আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন সরাসরি আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার চেতনা লাভ করে, তার হৃদয় যখন এই চেতনায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় যে, আল্লাহ্‌র সাথে তার পূর্ণমাত্রার সম্পর্ক বিদ্যমান, তখন জীবনের কোন ভয় বা আশংকার চেতনায় সে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না।

www.pathagar.com

রিয্‌কের ব্যাপারে সে একবিন্দু ভয় পায় না। স্বীয় মর্যাদা বা ভবিষ্যতের আশংকায় সে হয় না ভীত, সন্ত্রস্ত বা কাতর।

এই তিন প্রকারের ভীতি বা আশংকাই মানুষের আত্ম-সচেনতাকে দুর্বল করে দেয়, লাঞ্ছনা মেনে নিতে প্রস্তুত করে। মানুষ নিজের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়া জলাঞ্জলী দিতেও রাজী হয়ে যায় অনেক সময়। স্বীয় অধিকার ও মানবিকতা হারাতেও তার মনে জাগে না কোন বঞ্চনার বেদনা।

মানুষের আত্মা অনেক সময় পবিত্রতার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে, জীবন, রিয্‌ক বা মর্যাদা হারানোর ভয় থেকে মুক্ত হয়েও সামাজিক-সামষ্টিক নিয়ম ও মূল্যমানের দাসত্ব শৃংখলে বন্দী হয়ে পড়ে। ধন-মাল, মান-সন্মান, ও বংশ মর্যাদার চেতনাও মানুষকে কাতর করে তোলে—যদিও এসব থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন কল্যাণও পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না কোন অকল্যাণও।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যখন উপরিউক্ত মূল্যমানসমূহের কোন একটির তাৎপর্যগত দাসত্বের অনুভূতি-সচেতন হয়ে পড়ে, তখন সে তার পূর্ণমাত্রার মুক্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী থাকে না। সে দাসানুদাসে পরিণত হয় এসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মূল্যমানের। এ সব ক্ষয়িষ্ণু মূল্যমানের ধারকদের সাথে সমতা-স্বাধীনতার চেতনাও হারিয়ে ফেলে।

আসমানী শরীয়ত এসব মূল্যমানের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং কোনরূপ বাড়াবাড়ি বা উপেক্ষা ছাড়াই সে সবকে যথার্থ স্থানে সংস্থাপিত করেছে। প্রকৃত মূল্যমানকে ব্যক্তির অভ্যন্তরে নিহিত ব্যক্তিগত তাৎপর্যের দৃষ্টিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু তা-ই নয়, মানবতার সমগ্র দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে তাতে কোন একটি দিকের প্রতিও বিন্দুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। আল্লাহ্‌র বিধান পূর্ণশক্তিতে মানব মনের অভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বদিকের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পূর্ণ শক্তিতে। ফলে তার বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় ব্যাপার সুসংবদ্ধ হয়েছে, যেমন সুসংবদ্ধ হয়েছে তার পরকালীন বিষয়াদি এবং এ দু'টি দিকের মধ্যে পূর্ণ সংগতি ও সাযুজ্য সংস্থাপিত হয়েছে। ফলে সমগ্র দিকই সুগঠিত হতে পেরেছে। আর তার ফলে আনুভূতিক মুক্তি নিরংকুশ হয়ে উঠেছে। তাতে শুধু ভাবগত দিক-

www.pathagar.com

গুলোই সংরক্ষিত হয়নি, নিছক অর্থনৈতিক দিকগুলোও নয়; বরং এই উভয় দিক দিয়েই তার মুক্তি সুসম্পন্ন হয়েছে। তদ্দরুণ জীবন তার বাস্তবতা লাভ করেছে, মন পেয়েছে তার পূর্ণশক্তি। মানব প্রকৃতিতে তার সমস্ত আশা-আকাঙক্ষা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, উচ্চতর শক্তি অর্জিত হয়েছে। আর তদ্দরুণ আনুভূতিক মুক্তি পূর্ণত্ব পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে মানুষ খুবই মহান সম্মানজনক জীবন লাভে ধন্য হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়াতলে জীবন পরমমাত্রার মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন ও ভোগ করতে সমর্থ হয়েছে, মানুষের উপর থেকে মানবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব দূরীভূত হয়ে গেছে। পূর্ণমাত্রার আনুভূতিক মুক্তি সামাজিক সুবিচারের মহামূল্য বিধান মানবীয় সাম্য-এর সাথে সমান তালে চলতে পেরেছে।

কেননা মানব মন যখন পূর্ণ আনুভূতিক মুক্তি-সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তা সর্বপ্রকারের দাসত্ব শৃংখল থেকে নিষ্কৃতি পায়, মৃত্যু, নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার ভয় ও আতংক দূর হয়ে যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যমানের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে পরম উদারতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। মানুষ প্রয়োজন ও ভিক্ষাবৃত্তির লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। লালসা ও লোভের উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। ফলে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পিত হতে পারে, যার প্রতি আত্মসমর্পিত হয় না, এমন কিছুই নেই। অতঃপর আইন ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পরিপূরণের পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে যায়।

বস্তুত মানুষের মন যখন এইসব উচ্চমানের তাৎপর্যপূর্ণ ভাবাধারার অধিকারী হয়ে যায়, তখন সেখানে মৌখিকভাবে সাম্যের ধ্বনি তোলার কোন আবশ্যকতা থাকে না, কেননা তার গভীর অন্তর্দেশে এই সাম্য নিবিড় হয়ে দানা বেঁধেছে, তার বাস্তব জীবনে পূরামাত্রায় কার্যকর হয়ে বসেছে। ওসব মূল্যমানের মাঝে আদৌ কোন তারতম্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হবে না। সাম্য ও সমতার অধিকার প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে, এ অধিকার বাস্তবায়নে প্রত্যেকেই সচেষ্ট হবে। আর যখন তা পাবে, তার পূর্ণ সংরক্ষণ করবে, তার বিকল্প কিছু গ্রহণে কেউ রাজী হবে না। তার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে কেউই পশ্চাদপদ হবে না, সেজন্য যে-কোন

www.pathagar.com

প্রকারের আত্মত্যাগের প্রয়োজন হবে, তা-ও স্বীকার করতে সকলেই প্রস্তুত হবে।[১]

## সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত

মানবীয় সাম্য ও অভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে ও পূর্ণশক্তিতে এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করে যে, সমস্ত মানুষ ইহকাল ও পরকালে, জীবনে ও মরণে, অধিকারে ও দায়িত্ব-কর্তব্যে, লালন-পালন ও পরিণতিতে সম্পূর্ণরূপে সমান। কারুর উপর কারুর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য নেই। কেউ অপরের তুলনায় অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী নয়। হ্যাঁ, কেবল-মাত্র তাক্ওয়া ও নেক আমলের পার্থক্যের দিক দিয়েই মানুষে মানুষে পার্থক্য বিবেচিত হতে পারে। আর এই কারণেই কোন বংশ বা পরিবার অপর বংশ বা পরিবার অপেক্ষা, কোন গোষ্ঠী বা গোত্র অপর গোষ্ঠী বা গোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আল্লাহ্‌র বিধান সর্বপ্রকারের পরিবার বা গোষ্ঠী-গোত্রগত পার্থক্য বা তারতম্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। ফলে ইসলামী সমাজে এমন একটি সাম্য রচিত ও বাস্তবায়িত হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যার কল্পনাও করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, আজ পর্যন্তকার মানব রচিত মতবাদ ও আইন-কানুনও তার সমতুল্য কোন মত বা আইন উপস্থাপিত করতে পারেনি।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মানব রচিত আইনই তো আমেরিকানদের অধিকার দেয় রেড-ইণ্ডিয়ান বা নিগ্রোদের সর্বপ্রকারের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার, তিল তিল করে আযাব দিয়ে দিয়ে তাদের ধ্বংস করার---নিতান্তই অমানুষিকভাবে, সকল লোকচক্ষুর সামনে।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণ বিদ্বেষমূলক আইন রচনা করার অবাধ সুযোগ দিয়েছে, যা মানুষে মানুষে পার্থক্য করে নিছক বর্ণের পার্থক্যের ভিত্তিতে।

কিন্তু ইসলাম উপস্থাপিত ও পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর করেছে মহান মানবীয় সাম্যের বিধান। এ মানবীয় সাম্য সর্বপ্রকারের সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ উদার ও প্রতিবন্ধকতারহিত। ফলে এখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যেও মৌলিক মানবিকতার দিক দিয়ে কোন

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ١١٢-١١٣

www.pathagar.com

পার্থক্য নেই। মানুষ মানুষকে দাস বানাবার কোন অধিকার বা সুযোগ পেতে পারে না ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা অখণ্ড, অবিভাজ্য, পূর্ণাংগ, গোত্র-গোষ্ঠীর সংকীর্ণতায় তা নয় একবিন্দু সীমিত বা সীমাবদ্ধ। এই সাম্য নিছক মানবিকতার দৃষ্টিতেই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়েও পূরা মাত্রায় কার্যকর।

আর এই অকুণ্ঠ, অকলংক ও অ-সংকীর্ণ সাম্যই হচ্ছে সামাজিক সুবিচারের ভিত্তি। --যদিও মানুষ সাম্যের নির্ভুল তাৎপর্য অনুধাবণে মারাত্মক ভুল করেছে এবং নানা বিভ্রান্তিকর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

অনেকের ধারণা, সাম্য একটি অকল্পনীয় অবাস্তব ও অসম্ভব ভাবধারা। কেননা মানুষ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে কিছুমাত্র সমান নয়। কেউ প্রতিভাবান, কেউ কম বুদ্ধির লোক, কেউ প্রসিদ্ধ সুপরিচিত. কেউ অজ্ঞাতনামা, কেউ অধিক কর্মক্ষম, কেউ অলস—অকর্মণ্য। দৈহিকতা ও আংগিকতার দিকদিয়ে— শক্তি ও দুর্বলতার বিচারেও কোনই মিল বা সমতা নেই লোকদের মধ্যে। এভাবে যোগ্যতা-প্রতিভা কিংবা স্বাভাবিক আংগিক সংগঠনে যখন কোন সাম্য বা সমতা নেই, তখন সামাজিক-সামষ্টিক জীবনে কোনরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক হবে। কেননা মনে হচ্ছে, মানুষ সাম্যের কল্পনা করে, স্বপ্ন দেখে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বা স্বভাবই তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র দান-অনুদান সমতাভিত্তিক না হলেও এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষ জীবন লাভে সমান, অনুরূপভাবে সমান হচ্ছে সব মানুষের বৈষয়িক জীবনের মৌলিক প্রয়োজনাবলীও।

মানুষ একই নিয়মে জন্মগ্রহণ করে, ক্রমশ বেড়ে ওঠে। প্রত্যেকেরই বসবাস-স্থানের প্রয়োজন, প্রয়োজন রয়েছে খাদ্যের, পানীয়ের। সেইসব জিনিসেরও—যার দরুণ এই জীবনটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজেই কোন কোন দিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও তার ভিত্তিতে মৌলিক বেঁচে থাকার অধিকার ও বৈষয়িক প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার অধিকার থাকতে পারে না কারুর। যদি কেউ তা করতে চায়, তা হলে বুঝতে

www.pathagar.com

হবে, সে বাহ্যিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যজনিত পার্থক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে ; অন্তর্নিহিত গভীর সত্যতার সাম্য ও অভিন্নতা তার গোচরীভূত হয়নি। সে বাইরের চর্মের বর্ণের পার্থক্যটাই শুধু দেখেছে, কিন্তু তার তলায় রক্ত ও গোশ্‌তের অভিন্নতা দেখার মত কোন চক্ষুই তার নেই।

আমরা যতদিন পর্যন্ত একই নিয়মে জীবনে প্রবেশ করব এবং অভিন্ন নিয়মে জীবন থেকে বের হয়ে যাব, জীবনের বোঝা বহন করতে থাকব একই নিয়মে ও ধরনে পদ্ধতিতে, ততদিন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অভিন্ন হওয়া একান্তই কর্তব্য। তা'হলেই আমরা জীবনটা সঠিকভাবে যাপন করতে পারব, আমাদের প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। আমাদের যার পক্ষে যা এবং যতটা উৎপাদন করা সম্ভব, তা কার্যত উৎপাদন করা হবে একটা নিরাপত্তামূলক সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে। তাতে অধিকারে যেমন পূর্ণ সমতা থাকবে, তেমনি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনেও থাকবে পূর্ণ সাম্য ও অভিন্নতা।

আমরা এখানে অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলছি খুব ব্যাপক সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যের দৃষ্টিতেই। কেবল বাছাই করা ধনীর সাম্য কিংবা নারীর বঞ্চিত থাকা অধিকারসমূহের পুনঃ প্রাপ্তি অথবা আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান হওয়ার সাম্যের কথাই নয়। আরও সাম্যের দিক রয়েছে, সম্ভবত তা অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী। তা হচ্ছে, দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্যের সাম্য, জীবনের স্বাদ আস্বাদনের ক্ষমতার সাম্য। লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রেও আমাদের সমান হতে হবে ; দুর্ভাগ্য এড়ানো অসম্ভব হলে তাতে যেন আমরা সকলেই সমান ভাগীদার হই। আর সৌভাগ্য ও সুযোগ-সুবিধা লাভের ক্ষেত্রেও যেন আমাদের এই সাম্য পুরোপুরি অটুট থাকে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেন ভয়-ভীতি, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার শিকার হয়ে না পড়ে।

আর এইরূপ ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বাত্মক সমতা কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যদি সামাজিক সুবিচার তার উজ্জ্বলতর অর্থে ও সূক্ষ্মতর তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়। তা হলে কিছু সংখ্যক লোকের উদর পূর্তি করে খাওয়ার জন্য অপর কিছু লোককে না খেয়ে থাকতে হবে না।

www.pathagar.com

সমাজ-সমষ্টির কতিপয় লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য অপর লোকদের বঞ্চিত করার প্রচলিত পার্থক্যের নীতি যতদিন পর্যন্ত তিরোহিত না হবে, সাম্যের চেতনায় যদ্দিন পার্থক্য থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত সামাজিক সাম্য বাস্তবায়িত হতে পারবে না। আর প্রকৃত ও অনাসক্ত মানবাধিকার পদ্ধতি অনুসৃত হওয়াও ততদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হবে না। ততদিন পর্যন্ত মানুষ সাম্যের উচ্চতর আদর্শের জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে বটে ; কিন্তু সাম্যের সুধা তাদের কণ্ঠের শুষ্কতা কখনই দূর করতে পারবে না।

মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যজনিত পার্থক্য প্রকৃতিগতভাবেই বিদ্যমান, তা দূরীভূত করা আমাদের ঈপ্সিত সাম্যের লক্ষ্য নয়। কেননা তা দূর করতে চাওয়া প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ সমতুল্য। আমরা সেই সাম্য-কেই লক্ষ্য হিসেবে সম্মুখে রেখেছি, যাতে মর্যাদা ও অধিকারে কোন পার্থক্য থাকবে না, যাতে কিছু লোককে দুর্ভাগ্যের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে অপর কিছু বা বিপুল সংখ্যক লোকের জীবনে সৌভাগ্য সূর্যকে ভাস্মর করে তুলতে হবে না।

কিছু সংখ্যক লোক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে সর্ব-প্রকারের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং অপর কিছু বা বিপুল সংখ্যক লোক তা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে এমন সাম্য আমাদের কাম্য নয়। সে উত্তরাধিকার সমাজ-সমষ্টির ব্যক্তিদের মনে পূর্ণ প্রভায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সকল মানুষ একই পরিবেশে জীবন যাপন করবে, সাধারণ-ভাবে সকলেই মৌলিক শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাবে এবং প্রত্যেকেই যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হবে, এই সাম্যই আমাদের কাম্য।

কেননা কারুর উপার্জন পরিমাণ অপর কিছু লোকের উপার্জন অপেক্ষা বেশী হওয়াটা কিছুমাত্র অসাম্য নয়। প্রত্যেকের হাতে একই সংখ্যার টাকা থাকতে হবে, সাম্য বলতে কখনই এমনটা বুঝায় না। কেননা তা কখনই বাস্তব হতে পারে না।

মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়ে কোন কোন শ্রেণীকে জীবনের উদার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই প্রকৃত অসাম্য। তার ফলে মানব প্রকৃতিতে নিহিত পরম সাম্যের কামনা ও পরম সুবিচারের সাধনা অবাস্তব স্বপ্ন হয়ে থেকে যায়, কোন

www.pathagar.com

দিনই তা বাস্তবের মুখ দেখতে পারে না। জীবনের সম্মিলিত চলার পথে অগ্রসর হওয়ার সমান অধিকার ও সুযোগলাভ করতে পারাই হচ্ছে প্রকৃত সাম্য ও সমতা। তখন সকলের সম্মুখেই ভাস্বর হয়ে থাকে মানবতার উচ্চতর আদর্শ। সকলেই সামষ্টিক সুবিচারের পূর্ণ বাস্তবায়নের পথে সমান তালে ও গতিতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

## মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব কি করে সম্ভব

বস্তুত মানসিক ও আনুভূতিক মুক্তি ও স্বাধীনতা এবং মানবিক সাম্য ও অভিন্নতা—এই দুইটিই হচ্ছে ইসলামের সামাজিক সুবিচার ব্যবস্থার দুটি বাহু। আর এই দুইটি বাহুর সংমিলনে সামষ্টিক সুবিচারের তৃতীয় স্তম্ভটি গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে সামাজিক-সামষ্টিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

অতএব ব্যক্তির অনুভূতি যখন মুক্ত ও স্বাধীন হবে, তখনই যে-কোন প্রতিমূর্তির সম্মুখে বিনয় ও নতি স্বীকার থেকে তার ঈমান বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

ব্যক্তির হৃদয়-মন যখন কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন সৃষ্টিলোককে ভয় করার একবিন্দু ভাবধারাও থাকবে না তার মনের দূরতম একটি কোণেও।

ব্যক্তির এই বিশ্বাস যখন দৃঢ়তর হবে যে, মৃত্যু কেবল আল্লাহ্‌র হাতে, রিয্‌ক শুধু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই পাওয়া যায় এবং মাটির তলেও মাটি আছে, তখনই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে, তার মনুষ্যত্ব দৃঢ় ও দুর্জয় হবে, একটা আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের চেতনা তীব্র হয়ে উঠবে।

আর যখনই ব্যক্তি এই সব সুকুমার ও সুকোমল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন তার মন এক প্রবল শক্তির অধিকারী হবে। শৃংখলসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হবে, বন্ধনসমূহ টুটে খান খান হয়ে যাবে, তাগূতি শক্তিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হবে, প্রতিমূর্তিসমূহ টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যাবে, দেবদেবীগুলো উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

আর এই অবস্থা যখন হবে, তখন এই পৃথিবীর কোন শক্তিই তার বিরুদ্ধে মুহূর্তের তরেও দাঁড়াতে পারবে না।

www.pathagar.com

আর তখনই এই ব্যক্তিসত্তা পূর্ণাংগ রূপ লাভ করবে, তার মনুষ্যত্ব সঠিক মানে সংস্থাপিত হবে, পরিপক্ক হবে। তখন এই মানুষটি সেইরূপই গড়ে উঠবে যেমনটা মহান আল্লাহ্ পসন্দ করেন। তখনই তার দ্বারা আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়িত হবে। সে হবে বিরাট ও তুলনাহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ -

দুর্জয় শক্তি ও সম্মান কেবল আল্লাহ্র জন্য, তাঁর রসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য --।

তখনই মুখাবয়ব তার পূর্ণ চাকচিক্য পেয়ে যাবে, ব্যক্তিত্ব তার সঠিক ও যথার্থ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে, ব্যক্তি তার মস্তক উন্নত ও বক্ষ স্ফীত করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে, পূর্ণাংগ মনুষ্যত্ব গঠিত পরিমণ্ডলে সে বসবাস করতে শুরু করবে, তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা আকাশ মণ্ডলের পথ উজ্জ্বল করে দেবে।

তখন তার গণনা হবে সামষ্টিক পর্যায়ে, সামাজিক দৃষ্টিকোণে। উচ্চতর লক্ষ্যপানে নিবদ্ধ হবে তার কর্মের তৎপরতা। এজন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপরীতে ব্যক্তিগত জীবন অনুসরণ সুনিশ্চিত হবে। আর এ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে ব্যক্তি ও সমষ্টির যথাযথ মর্যাদা।

## নিরাপত্তার নিজস্ব রূপ ও প্রতিকৃতি

আসমানী কিতাব নিরাপত্তার নিজস্ব রূপ ও প্রতিকৃতির মৌলনীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এখানে ঃ

—ব্যক্তি ও তার সত্তার নিরাপত্তা,

—ব্যক্তি ও তার নিকটবর্তী পরিবারবর্গের নিরাপত্তা,

—ব্যক্তি ও সমষ্টির নিরাপত্তা,

—জাতি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তা—পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ,

—এক সময়ের লোকদের ও পরে আগমনকারী লোকদের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ।

১৩—

www.pathagar.com

ব্যক্তি নিজেই নিজেকে সর্ব প্রকারের অবৈধ লালসা-কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দায়িত্বশীল। নিজেকে সর্বদিক দিয়ে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ রাখার জন্য দায়িত্বশীল। নিজেকে নির্ভুল, সঠিক কল্যাণ ও মুক্তির পথে পরিচালিত করার জন্য স্বতঃই দায়িত্বশীল। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়ার জন্য সে নিজেই দায়িত্বশীল।

ব্যক্তিগত দায়িত্বের এই কথা পূর্ণাংগ ধারণা সম্বলিত। ব্যক্তিগত জবাবদিহি সুস্পষ্ট ও পূরামাত্রাসম্পন্ন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে তার স্বীয় কার্যকলাপের জন্য দায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ভাল বা মন্দ উপার্জ-নের ফলাফল সে নিজেই ভোগ করতে বাধ্য।

এই প্রেক্ষিতে এ কথাও অকাট্য যে, প্রত্যেকটি মানুষকেই,—সে যেখানেই অবস্থান করুক না-কেন---অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকতে হবে। সে পথভ্রষ্ট হলে তাকে নির্ভুল ও সঠিক পথে নিয়ে আসবে ও পরি-চালিত করবে। তার শরীয়তসম্মত ও ন্যায়সংগত অধিকারসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করবে। ভুল করলে কৈফিয়ত চাইবে ও তার প্রতিবিধান করবে এবং তার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

তা'হলে এক্ষণে একই ব্যক্তির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সমুপস্থিত। এই দুইটি ব্যক্তিত্ব পরস্পরের পর্যবেক্ষক, পরস্পরের সংরক্ষক, পরিপূরক এবং ভাল ও মন্দে পরস্পরের জন্য দায়িত্বশীল। আর এই একই ব্যক্তির অন্তঃস্থিত দুই ব্যক্তিত্বের অবদান হচ্ছে পূর্ণমাত্রার আনুভূতিক স্বাধীনতা এবং পূর্ণাংগ মানবিক সাম্য।

অতএব স্বাধীনতা ও আনুগত্যশীলতা পরস্পর পরিপূরক, পরস্পরের জন্য দায়িত্বশীল। ব্যক্তি ও তার নিজ সত্তার মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার এটাই তাৎপর্য।

ব্যক্তি ও তার নিকটস্থ পরিবারের মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্ব-শীলতা এখানেই নিহিত, তার শক্তিকে ধারণ করে, তার সংস্থা দৃঢ়তর করে এবং তার ভিত্তি উচ্চতর করে।

আর সমাজ সংস্থার প্রথম ভিত্তিস্থানীয় প্রস্তর হচ্ছে পরিবার, এ কথা অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। পারিবারিক জীবনের প্রভাব মানব প্রকৃতিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি এবং প্রয়োজন ও কল্যাণবোধের দিক দিয়ে ব্যক্তিদের জন্য তা আকর বিশেষ।

www.pathagar.com

যেমন পাখীর নীড়। এই নীড়েই পাখী ডিম পাড়ে, তাতেই জন্মে ও লালিত পালিত হয় পাখীর বাচ্চা। মানব সন্তানও এই পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে জন্মগ্রহণ করে ও লালিত পালিত হয়ে নিয়ম-রীতি ও নৈতিকতা শিক্ষালাভ করে। এই পরিবেষ্টনীতেই গড়ে উঠে এমন একটা মানব সমাজ, যা পাশবিক নৈরাজ্য ও অরাজকতা থেকে মুক্ত এবং তার অনেক উর্ধ্বে স্থিত। এই কারণে আল্লাহ্‌র বিধান পরিবারের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাকে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুনের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে শক্তভাবে এবং তাকে দৃঢ় সংগঠনের মধ্যে শামিল করেছে। পারিবারিক পারস্পরিক দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহি এবং তা মেনে চলার আবশ্যকতা চাপিয়ে দিয়ে সংরক্ষিত করেছে। এভাবে পারিবারিক জীবনের গোটা পরিধিতে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা পূর্ণ-মাত্রায় বাস্তবায়িত করে তুলেছে।

উত্তরাধিকার আইন এবং ওসীয়তের বিধান এই পারস্পরিক দায়িত্ব-শীলতারই অংগ ও অংশ। এখানে বস্তুগত উত্তরাধিকারের কথাই বলা হয়নি, এই সর্বজন পরিচিত বস্তুগত মীরাস ছাড়াও ভিন্নতর এক ধরনের উত্তরাধিকার রয়েছে। আর তা' হচ্ছে, মা ও বাবা-দাদা. চাচা-ভাই তাদের সন্তান ও অধঃস্তনদের মধ্যে ধন-মালের উত্তরাধিকার ছাড়াও বিভিন্ন বংশীয় গুণ, চরিত্র এবং দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাও সংক্রমিত করে।

এই যোগ্যতা সমগ্র জীবনের তরে অধঃস্তনদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। তাদের জীবনের ভবিষ্যত গঠনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।[১]

ব্যক্তি ও সমাজ-সমষ্টির পরস্পরের মধ্যেও এই দায়িত্বশীলতা কার্যকর। তা যেমন ব্যক্তির দিক দিয়ে সমষ্টির দিকে, অনুরূপভাবে সমষ্টির দিকে থেকে ব্যক্তির দিকে সম্প্রসারিত। উভয়কেই তা প্রতি-পালনের দায়িত্ব রক্ষা করতে হয়। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের উপর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য তার বিশেষ কার্যাবলী উত্তমভাবে সম্পন্ন করা। আর উত্তম আমল হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام

www.pathagar.com

করা। কেননা ব্যক্তির কর্মতৎপরতার ফলাফল সমষ্টির উপর পরিণত, শেষ পর্যন্ত তা-ই সমষ্টির তৎপরতা।

ব্যক্তির কর্তব্য সমষ্টির কল্যাণের জন্য কাজ করা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং সর্বাবস্থায় তা রক্ষা করা। সমষ্টির জন্য তাকে হতে হবে অতন্দ্র প্রহরী। জীবন হচ্ছে মহাসমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ জাহাজের মত। তার আরোহীদের প্রত্যেকেরই নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য হলেও সে জাহাজের পূর্ণনিরাপত্তার জন্য দায়িত্ববোধ থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সে জাহাজের তলায় ছিদ্র করার অনুমতি কাউকেই দেয়া যেতে পারে না, সে অধিকারও থাকতে পারে না কারুর।

সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব পালনের কর্তব্য থেকেও কাউকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি। প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, সমাজের সংরক্ষক। এই সমাজ-সমষ্টির কল্যাণার্থে সমাজের ব্যক্তি-বর্গের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা একান্তই কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। এই কারণে 'আমর বিল্ মা'রূফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার' —'ন্যায়ের আদেশ ও বাস্তবায়ন' এবং 'অন্যায়ের নিষেধ প্রতিরোধ ও মূলোচ্ছেদন'--এর দায়িত্ব প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অর্পিত। এই সমাজে পুঁজি বা পণ্য মওজুদকরণ চলতে পারে না, আম্র বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুন্‌কার-এর কার্যাবলী কোন বিশেষ ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণীর ব্যবসায় ও অর্থলুন্ঠনের মাধ্যমও হতে পারে না। সমাজ-পরিবেশে কোন অন্যায়ের প্রচলন হতে দেখে নির্বাক নিষ্ক্রিয় থাকা কারুরই উচিত হতে পারে না কেবল তা-ই নয়, সেজন্য ইহ ও পরকাল উভয় জগতেই তাদের সকলকেই কঠিন পরিণতি ও দুঃসহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের অধঃস্তনের বিভ্রান্তি ও চরিত্রহীনতাও তাদের জন্য কঠিন পীড়া-দায়ক হয়ে দেখা দেবে এই জগতেই। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দায়িত্বশীল। আর গোটা সমাজ তার মধ্যকার দুর্বল-অক্ষম লোকদের জন্য দায়ী। তাদের সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থাকরণ এবং তার সংরক্ষণ সমাজ-সমষ্টিরই দায়িত্ব। অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করার কার্যকর ব্যবস্থা সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সমাজের ধনী লোকদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়-খাতসমূহে তা বন্টনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এই যাকাতও

www.pathagar.com

যদি কখনও যথেষ্ট না হয়, তা হলে অপূরণকে পূরণ করা কোন-রূপ পরিমাণের শর্ত ছাড়াই গোটা ধনী সমাজের কর্তব্য। সমাজের কোন এক ব্যক্তিও যদি অনাহারে রাত্রি যাপনে বাধ্য হয়, তা হলে গোটা সমাজই অপরাধী হবে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা জাতি একটি অখণ্ড নরদেহের মতই অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্পর্কশীল। রসূলে করীম (স.) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

একজন মু'মিন অপর একজন মু'মিনের জন্য শীসাঢালা প্রাচীরের মত, তার কতকাংশ অপর কতকাংশকে সুদৃঢ় করে রাখে।

বস্তুত এ-ও যে এক প্রকারের পারস্পরিক সাহায্য-সহযাগিতা এবং জীবনের নিরাপত্তা দান, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

সামাজিক ও সামষ্টিক অপরাধসমূহের দণ্ড এরই ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তাকে খুবই কঠিন বানানো হয়েছে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, ধন-মাল ও ইজ্জত-আবরুর পূর্ণ সংরক্ষণ ব্যতীত পারস্পরিক সাহায্যের কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে না।

হত্যা ও আহতকরণের অপরাধের জন্য এ কারণেই 'কিসাস' বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আর হত্যার অপরাধকে মুসলিম ব্যক্তির কাফির হয়ে যাওয়ার মত অপরাধ গণ্য করা হয়েছে।

জিনা-ব্যভিচারের শাস্তিও এই কারণেই কঠিন করা হয়েছে। কেননা তাতে অপর একজন নাগরিকের ইজ্জতের উপর আঘাত হানা হয়, সামাজিক জীবনে উচ্ছৃংখলতা ও নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দেয়া ও তাকে বিস্তার সাধন করা হয় এবং কলুষমুক্ত বংশধারা বিস্তারের পথরুদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ-ভাবে চুরির শাস্তিও কঠিন করে দেয়া হয়েছে। কেননা তাতে জনগণের ধন-মালের নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি ও পারস্পরিক বিনিময়-নির্ভরতাকে কঠিনভাবে বিঘ্নিত করা হয়।

বস্তুত ইসলাম সামষ্টিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণকে সামাজিক সুবিচার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী Factor বানিয়ে দিয়েছে। তার সকল রূপ ও আকৃতিকে, বৃহত্তর মতাদর্শকে বাস্তবায়িত

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে সুবিন্যাস্ত করেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে সামষ্টিক লক্ষ্যকে একীভূত করে দিয়েছে। জীবনের পূর্ণত্ব ও সচলতা বিধানকে কোনভাবেই ব্যাহত হতে দেয়া হয়নি।

এজন্য ব্যক্তিকে তার পরিধির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ফলে সমষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্থ করার কোন সুযোগই রাখা হয়নি। সমষ্টির অধিকারসমূহকেও সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হয়েছে একই সময়—পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা সহকারে। ফলে ইসলামী সমাজে ব্যক্তির ও সমষ্টির অধিকারের মধ্যে কোনরূপ সংঘাত বা সংঘর্ষের একবিন্দু অবকাশ রাখা হয়নি, জীবনকে তার স্বাভাবিক পথে সুষ্ঠু রূপে ও অব্যাহত গতিতে চলাতে দেয়াই তার লক্ষ্য। যেন এভাবে তার উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয়, সমানভাবে ব্যক্তিরও কল্যাণ সাধিত হয়, এবং সেইসাথে সমষ্টির কল্যাণও পুরোমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়। যেন সামষ্টিক সুবিচারের ছত্রছায়ায় প্রত্যেকটি মানুষ প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হয়ে উঠতে পারে।

## সুবিচারের বিভিন্ন দিক

মানব জীবনে সামষ্টিক সুবিচার দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্কের মতই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সংকীর্ণ অর্থনৈতিক সুবিচারের কথাই বলে নি। নিছক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান নিয়েই ইসলাম আসেনি। ইসলামে এই সুবিচার সর্বাত্মক মানবিক সুবিচাররূপে গৃহীত হয়েছে এবং তাকে দুইটি শক্তিশালী স্তম্ভের উপর দাঁড় করে দিয়েছেঃ

অভ্যান্তরীণভাবে মানুষের মন ও আত্মাকে জাগ্রত করা হয়েছে, আর কর্মের বিশাল ক্ষেত্রে আইন-বিধি প্রণয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এবং এই দুইটি শক্তির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। এভাবে মানব মনের গভীরতর অনুভূতিতে তার শক্ত ভিত্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা এবং বাহ্যিক প্রতিরোধক শক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রতি একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়নি।

এই জাগ্রত ও সচেতন মন-মানসিকতা এবং এই সুবিচারক জীবন্ত বিধি প্রণয়ন—ইসলাম এই উভয়কেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে। যেন গোটা জীবন সামষ্টিক সুবিচারের মাধ্যমে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হতে পারে, এক ভারসাম্যপূর্ণ, চলমান ও গতিশীল মানব সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তার

www.pathagar.com

ছায়াতলে প্রত্যেকটি মানুষই মানবীয় মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে। বাঁচতে পারবে এক উদার-উন্মুক্ত ও সুপ্রশস্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে। প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় সব উপায়-উপকরণ, বস্তুগত ও ভাবগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্বিঘ্নে লাভ করতে সক্ষম হবে। মন থাকবে পরম সন্তুষ্ট, আত্মা হবে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন এবং মনুষ্যত্ব হবে মহান, উদার।

তার উপর কোন সীমালংঘনকারীর আধিপত্য স্থাপিত হতে পারবে না, হুকুম চালাতে পারবে না কোন শক্তি জবরদস্তি করে। কোন স্বৈরতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী চাবুক মেরে চালাতে সাহস করবে না তাকে। সাধারণ জন-জীবনে ন্যায়পরতার ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত করবে সামষ্টিক সুবিচার।

এই সমাজে শিশুর জন্ম মুহূর্তেই তাকে ধারণ করা হবে, তার পূর্ণ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। তার জীবনের বিবর্তনের প্রতিস্তরে তাকে পার্শ্বে রাখা হবে। সমাজ-সমষ্টির ভিড়ে, জীবনের কঠিনতর অবস্থার মধ্যেও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

সাধারণভাবেই সামষ্টিক সুবিচার মানুষের স্বভাবসম্মত সমস্ত অধিকার বাস্তবায়িত করবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে ও সমস্ত ক্ষেত্রে, যেন প্রত্যেকটি মানব শিশুই মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা ও সমস্ত অধিকার সহকারে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

কেননা মানুষ তার জন্মমুহূর্ত থেকেই স্বাধীন। অপর কোন লোক তার উপর মালিকত্ব বা কর্তৃত্ব চালাতে পারবে না—এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন এক মুহূর্তেও এবং কক্ষণই। কোন মানুষই হবে না অপর কোন মানুষের দাস বা প্রভু। তার জাতি, তার সমাজ কিংবা তার রাষ্ট্রও তার মালিক নয়, নয় প্রভুস্থানীয়। কেননা সে জন্মগতভাবেই তার সমাজের—জাতির লোকদের সমান, মানবিকতার দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোন তারতম্য, কোন পার্থক্য, কোন উচ্চ-নীচ, কোন ছোট-বড়র পার্থক্য নেই।

বস্তুত রাষ্ট্র তাৎপর্যগতভাবে মানুষের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপক। সমাজের ব্যক্তিগণ তারই মাধ্যমে সমাজ-সমষ্টির কল্যাণে কর্মরত হয়, মানুষকে

www.pathagar.com

দাসানুদাস বানাবার জন্য নয়। রাষ্ট্র প্রধানও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত একজন খাদেম বই কিছু নয়।

উমাইয়া প্রশাসনে আবু হাজিম ছিলেন একজন প্রখ্যাত মনীষী। তিনি রাষ্ট্র প্রধান আমীর মুয়াবিয়ার সমুখে উপস্থিত হয়ে সম্বোধন করতেন এই ভাষায়ঃ

আস্সালামু আলাইকুম, হে শ্রমিক, হে মুয়াবিয়া!

ইসলামের দৃষ্টিতে তুমি এই জাতির একজন নিয়োজিত শ্রমিক বা মজুর মাত্র। তোমার খোদা তোমাকে এই জাতির জনগণের খেদমতের কাজে নিয়োজিত করেছেন মাত্র।[১]

একটি দেশের জনগণ অপর জাতির প্রতিকূলে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অপর কোন জাতি তাকে দাস বানাতে পারে না, তার কোন অধিকারই নেই।

কোন জাতি যদি সীমালংঘন করে অপর জাতির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে, তা হলে সে আক্রান্ত জাতির অধিকারই শুধু নয়—কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ শক্তি সহকারে আক্রমণকারী সীমালংঘনকারীকে প্রতিরোধ করা। তার আক্রমণের বিষদাঁত ও রক্তাক্ত নখর চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া। আক্রান্ত জাতি যদি এই প্রতিরোধে জান ও মাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা'হলে আল্লাহ্ও তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবেন, তাদের স্বাধীনতাকে রাখবেন সংরক্ষিত, অক্ষুন্ন। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ

فِي الْأَرْضِ -

আর আমরা এই ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমরা অনুগ্রহ দান করব সেই লোকদের প্রতি, যাদের পৃথিবীতে দুর্বল, অক্ষম ও লাঞ্ছিত করে রাখা

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام

www.pathagar.com

হয়েছিল এবং তাদের অগ্রবর্তী নেতা বানিয়ে দেব, তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানাব, আর তাদেরকেই পৃথিবীতে শক্তি ও ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেব। —সূরা কাসাস ঃ ৫—৬

এই প্রেক্ষিতে প্রত্যেক স্বাধীন জাতির কর্তব্য হচ্ছে, কোন দুর্বল জাতির স্বাধীনতার উপর আঘাত এলে তা রক্ষার জন্য পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসা। কোন স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা অপহৃত হলে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করা। কেননা একটি জাতির পক্ষে তার স্বাধীনতার চাইতে মহামূল্য ধন আর কিছু নেই— হতে পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা এ সব পরাধীন জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়েছেন এ ভাষায় ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ-

দুর্বল অক্ষম পুরুষ, নারী ও শিশুদের মুক্ত করার লক্ষ্যে তোমরা কেন যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র পথে? —সূরা নিসা ঃ ৭৫

সামাজিক সুবিচারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মত গ্রহণ ও তা পালনের স্বাধীনতা একটি অপরিহার্য দিক। এই স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সামাজিক সুবিচারের কথা চিন্তাও করা যায় না। কেননা মানুষের স্বাধীনতার যতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে, তন্মধ্যে এই স্বাধীনতাটা সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। ধর্ম বা দীন হচ্ছে একটি বিশ্বাসের ব্যাপার, তার উন্মেষ ও স্থিতি অন্তরে। ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির সন্তুষ্টি ও সামঞ্জস্যতার বোধ তার প্রধান নিয়ামক। তাই যে পরিবেশে বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতার নিরাপত্তা নেই, সেখানেই মানুষের মৌল স্বাধীনতার সাথে চরম শত্রুতার আচরণ অনিবার্য। আর মানুষের সাথে এর চাইতে বড় শত্রুতা অন্য কিছু হতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা হরণ করা হলে পরিণামে স্বয়ং মানুষের সাথেই শত্রুতা করা হয়, অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয় তার মন, দেহ ও ধন-মালের উপরও।

www.pathagar.com

কেননা সামাজিক সুবিচার সর্ব প্রকারের কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাসের জঞ্জাল থেকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে মুক্ত করতে সচেষ্ট, যেন প্রত্যেকেরই স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি উন্নত, নির্ভুল ও কল্যাণকর আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং এই পথে কোনরূপ বাধার সমুখীন হতে না হয়। অনুরূপভাবে অন্ধঅনুসরণের গোলামী থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা ও রাখাও সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্য। মানুষ তার আকীদা-বিশ্বাস, ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-আচরণ অন্ধভাবে—পিতৃপুরুষের স্বজাতির অন্ধ অনুসরণ স্বরূপ—পালন করলে তার নিজস্ব ও স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যভাবে খর্ব হয়ে যায়। এ থেকে মুক্তি একান্তই প্রয়োজন।

ইসলামের সামাজিক সুবিচার এই কারণেই প্রত্যেকটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপক প্রয়োগের পক্ষপাতী। প্রত্যেকটি মানুষকে চিন্তা করতে হবে তার নিজের সম্পর্কে, স্বীয় জীবন সম্পর্কে, তার গোটা পরিবেশ ও পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে। এই প্রেক্ষিতেই ইসলামের ঘোষণা لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'ধর্মীয় ব্যাগারে কোন জোর-জবরদস্তি করা চলবে না' —এর যথার্থতা অনুধাবনীয়।

### স্বাধীনতা উন্নতমানের সুবিচার

জীবন ও জীবনের পূর্ণ সংরক্ষণের সাথে এবং সাধারণভাবে সার্বিক স্বাধীনতার ও বিশেষভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সামাজিক সুবিচারের সম্পর্ক একান্তই ওতোপ্রোত। কেননা জ্ঞান ও বিদ্যার স্বাধীনতাও এরই সাথে সম্পর্কশীল।

গোটা বিশ্বলোক একখানি উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ গ্রন্থবিশেষ। তার দিগন্ত-সমূহ অসংখ্য নিদর্শনাদি সহকারে বিবেক-বুদ্ধির সম্মুখে সমুদ্ভাসিত। সে সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণা করা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য। তা করা হলে চিন্তা-গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা জ্ঞানগত স্বাধীনতার তাৎপর্য অনুধাবনে অধিকতর সহায়ক হবে। বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ এ পথেই সম্ভব। সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে বিচরণ ও অগ্রগতি এই পন্থাতেই লাভ করা যেতে পারে। মানুষের পক্ষে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অত্যন্ত গভীরে নিহিত প্রকৃত সত্য তত্ত্ব আয়ত্ত করা এভাবেই

www.pathagar.com

সম্ভব হতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতি ও তাতে নিত্য সংঘটিত ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবনের কার্যকর পথ এটাই। একই বিষয়ে বহু মতের পর্যালোচনা যাচাই পরখ ও তুলনা করে তন্মধ্যে অধিক সত্যনিষ্ঠ মত গ্রহণ করার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা এটাই।

বস্তুত এইসব কাজই সুষ্ঠুরূপে চলতে পারে যদি পূর্বশর্ত হিসেবে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তা হলেই মানুষের অধিকার আদায় হওয়া সম্ভব। কেননা সামাজিক সুবিচারের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে এই-সব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদির পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন। আর তার শেষ নির্যাস হচ্ছে মানুষে মর্যাদা। মানবীয় ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা। আর আল্লাহর নিকট কালো মানুষ অপেক্ষা সাদা মানুষ অধিক সম্মানিত নয়, মানুষের কোন বংশ অপর বংশের তুলনায় উচ্চ বা অভিজাত নয়, মানবতার অভিধানে পাশ্চাত্যের মানুষ প্রাচ্যের মানুষের তুলনায় বেশী মর্যাদার অধিকারী নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য করার উপরিউক্ত ভিত্তিসমূহ কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতারই উদ্ভাবন।

ইসলামে মানুষের মধ্যে অধিকার ও সাম্যের মর্যাদা যথার্থভাবে স্বীকৃত। অধিকার যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রত্যেকটি মানব গোষ্ঠীর বা সমষ্টির। সেইসাথে রয়েছে অনুরূপ মাত্রার দায়িত্ব ও কর্তব্যও। আর অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের এই সমতা ব্যতিরেকে কোন মর্যাদাবান ও শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এখানে একশ্রেণীর মানুষকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অপর শ্রেণীর মানুষকে দাসানুদাস বানাবার কোন সুযোগই দেয়া হয়নি।

বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা ইসলামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেননা মানুষের অধিকার সাম্য রক্ষা পেতে পারে না নিরপেক্ষ সুবিচার ব্যতীত। ইসলামে আইনের শাসন এই কারণেই অধিক-তর গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য ও সমতা রক্ষা করা হলেই বিচারের এই সাম্য ও নিরপেক্ষতা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর।

বিচারক্ষেত্রের এই ন্যায়পরতা বাস্তবায়ন এবং লোকদের কামনা-বাসনা-লালসার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দমনের মাধ্যমেই সামষ্টিক সুবিচারের মর্যাদা রক্ষা পেতে পারে এবং সমাজও হতে পারে মর্যাদাবান।

www.pathagar.com

অতএব চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ও আদর্শ নির্ধারণকারী হচ্ছে এই সামাজিক সুবিচার। জীবনের প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক যেরূপ গভীর। বিশ্ব প্রকৃতির জীবনের সাথেও তেমনিই গভীর। মানুষের মর্মমূলে তার স্থান সুদৃঢ়। মানবতার দুঃখ মোচনে তার কার্যকরতা যাদুর ন্যায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই মানব প্রজাতির প্রতিটি ব্যক্তি একই আদর্শের অনুসারী ও একই পথের পথিক হতে পারে। সমস্ত মানুষকে একই দুশ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব, সম্ভব একই মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যপানে পরিচালিত করা।

এই একটি জিনিসই সমস্ত মানুষের হৃদয়-মনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অনুভূতি ও চেতনার সম্মুখে চলার পথকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করা সম্ভব।

সামাজিক সুবিচার ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্তি দান করতে পারে, রোগীর রোগ নিরাময় করতে পারে, বঞ্চিতদের দিতে পারে তাদের অধিকার আদায়ের ও ভাগ্যোন্নয়নের অপূর্ব সুযোগ। ভীত-সন্ত্রস্তরা নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে সর্ব প্রকারের ভয়-ভীতি থেকে। বিপদ-গ্রস্থ লোকেরা লাভ করতে পারে সামাজিক অনুকম্পা, সহৃদয়তা ও আন্তরিক সহযোগিতা। বস্তুত সামাজিক সুবিচার হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সমাজ বিপ্লবের ধারা নির্ধারক, অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির বিশুদ্ধকারী। তা-ই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ-সৃষ্ট সর্বপ্রকারের পাপ দুরাচার, মওজুদকরণ ও পুঁজিবাদের নির্মূলতা সাধনকারী। এতদিন পর্যন্ত যাদের নিপীড়নে জর্জরিত, দারিদ্র্য যাদের পর্যুদস্ত করেছে, অভাব-অনটন ও শোষণ-নির্যাতন যাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, সামাজিক সুবিচার তাদের সম্মুখে বাঁচার পথ সুপ্রশস্ত করে, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নবীন সূর্যোদয়ের মত তাদের জীবন ক্ষেত্রে নিয়ে আসে নতুন দিনের উজ্জ্বলতা।

## অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য

কোন সন্দেহ নেই, সামাজিক সুবিচার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুফল সুষ্ঠুরূপে বন্টন করে সমাজের লোকদের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়পরতা সহকারে ও নিরপেক্ষভাবে। কোন একটি লোকও তার ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

www.pathagar.com

মানুষের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে এই স্বাধীনতার। তা স্বল্প সংখ্যক লোকদের আয়ত্তাধীন থাকতে পারে না। কেননা স্বাধীনতার কারণে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, তা কখনই কোন সীমায় পৌঁছে সীমিত হয়ে থাকেনি, থাকতে পারেনি। সুবিচার ব্যবস্থার চরমতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগণের অধিকার কর্তৃত্বসম্পন্ন শ্রেণীর লোকদের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। বহু দেশেই জনসাধারণ দীর্ঘ ও ভয়াবহ সংগ্রামের পর কার্যত এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর অধিকার প্রতিষ্ঠার পর তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা, বহু বাধ্য-বাধকতা। যে সমাজের নিকট থেকে ব্যক্তিগণ নিজেদের অধিকার লাভ করে. সেই সমাজের প্রতিই তাদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগতও বটে।

অতএব দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যতীত নিছক অধিকারের কথা স্বীকৃতব্য নয়। কেবল কাজ করা এবং কাজের আনুপাতিক মজুরীলাভের সুযোগটাই অধিকারের ব্যাপার নয়। ব্যক্তির দায়িত্ব ও জবাবদিহি এর চাইতেও অনেক বড় ও ব্যাপক। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটিও এর অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কের সুফল সমাজের মধ্যে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হতে হবে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবেও তা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়।

প্রত্যেকটি সমাজ-সমষ্টিরই কতগুলি নৈতিক মূল্যমানের বাধ্য বাধকতা থাকে। এই মূল্যমান সমাজের ব্যক্তিগণকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার যোগ্যতানুপাতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার দানই সৌভ্রাতৃত্বের একমাত্র উন্নততর আদর্শ নয়; তা যথেষ্টও নয়। সেইসাথে পরস্পরের জন্য দৃষ্টি ও হৃদয় উদার ও বিস্তীর্ণ করাও আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

www.pathagar.com

আর তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর সর্বপ্রকারের নেক, কল্যাণ ময় ও আল্লাহ্ ভীতিমূলক কাজে এবং গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা আদৌ করবে না। —সূরা মায়েদা ঃ ২

রসূলে করীম (স.) বলেছেন ঃ

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ -

সমাজবদ্ধ জীবনের উপরই আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয়ে থাকে।[১]
—তিরমিযী ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ -

বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ও তার সাহায্য করতে থাকবেন।[২]
—মুসনাদে আহমদ

অতএব ব্যক্তি যে কাজই করুক না কেন, তাকে সামাজিক ও সামষ্টিক কল্যাণে অবশ্যই ব্রতী হতে হবে। সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে তাকে পুরামাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। আর তা হলেই ব্যক্তি সমাজের প্রতি তার কর্তব্য পালনে ধন্য হতে পারে এবং এভাবে সে অর্জন করতে পারে তার প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা।

**এটা কোত্থেকে পেয়েছে**

ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা ও সর্ব প্রকার দুষ্কৃতি পরিহারকে একটি ভিত্তিস্থানীয় শর্ত হিসেবে আরোপ করেছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ রূপে গণ্য করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

---

১. مشكواة المصابيح

২. তিরমিযী

www.pathagar.com

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا

إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের ধন-মাল ভক্ষণ করো না এবং সেজন্য তোমরা প্রশাসকদের আশ্রয় নিও না—জনগণের ধন-মালের একাংশ ভক্ষণ করার লক্ষ্যে অন্যায় কাজের মাধ্যমে- -জেনে শুনে।

—সূরা বাকারা : ১৮৮

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত-সমূহ তার যোগ্য বা মালিক ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও এবং লোক-দের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করাকালে তোমরা সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারে বিচার ফয়সালা করবে। —সূরা নিসা : ৫৮

যেসব কাজে সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যে যেসব কাজ করা হয়, নবী করীম (স.) তা করতে নিষেধ করেছেন এবং কার্য সমাধা করার ব্যাপারে হাদিয়া-তোহ্‌ফা বা উপহার-উপঢৌকন কিংবা ঘুষ-রিশওয়াত দিতে ও নিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

নবী করীম (স.) 'আযদ' বংশের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সে লোক দায়িত্ব পালন করে যখন রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্তন করল, তখন বিপুল ধন-মাল নিয়ে এলো এবং তার একটি অংশ দেখিয়ে বললে, 'এই অংশ রাষ্ট্রের, আর অপর অংশ দেখিয়ে

www.pathagar.com

বললে, 'এটা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে।' তখন নবী করীম (স.) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসংগে বললেন ঃ

ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله

فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في

بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا -

এই ব্যক্তির কি অবস্থা হ'ল, আমাকে আল্লাহ্ যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব দিয়েছেন. তা পালনের জন্য তাকে আমরা একটি কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। সে ফিরে এসে বলছে, 'ধন-মালের এই অংশ তোমাদের, আর এই অংশ আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে।' তা হলে লোকটি তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে কেন দেখে না, তাকে কোন উপঢৌকন দেয়া হয়, কি হয় না?[১]

শেষে বললেন ঃ

والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به

يوم القيامة يحمله على رقبته - وإن كان بعيرا

له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر -

যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এভাবে যে জিনিসই কেউ নেবে, কিয়ামতের দিন তা তাকে তার কাঁধের উপর বহন করে নিয়ে আসতে হবে। তা যদি উট হয়, তা হলে তা ধ্বনী করবে, যদি গরু বা গাভী হয়, তা হলে তা হাম্বা রব করতে থাকবে। আর ছাগল হলে তার মিনমিনে আওয়াজ তুলবে।[২]

—আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

১. মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ।
২. ঐ

www.pathagar.com

অতঃপর নবী করীম (স.) তাঁর হাত দু'খানি এতটা ঊর্ধ্বে তুলে নিলেন যে. তাঁর বগলের শ্বেত বর্ণ দৃশ্যমান হয়ে গেল এবং তিনবার বললেন 'হে আল্লাহ্, আমি পৌঁছে দিয়েছি'

সরকারী দায়িত্বশীলদের উপঢৌকন গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের যে তীব্র ও অত্যন্ত কড়া অনুশাসন, তা এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলাম রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় ধন-মালের পবিত্রতা ও সংরক্ষণশীলতার প্রতি প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলেছে, তারা তা নিজেদের ইচ্ছা-বাসনা ও লোভের ভিত্তিতে পরস্পর ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে পারে না, ঠিক যেমন কোন সম্পদ ভাগ করে নেয় তার অংশীদাররা।

কেননা তারা প্রকৃত পক্ষে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ধন-মালের আমানত-দার, সংরক্ষক, প্রহরী। তারা ওসবের মালিক নয় কোনক্রমেই। তাই রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন।

إِنِّي وَاللهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ -

আল্লাহ্র শপথ, আমি কাউকে কিছু দেই না, কাউকে কিছু নিতেও নিষেধ করি না। আমি তো শুধু বন্টনকারী। আমাকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে আমি বন্টন করে থাকি (যার যা প্রাপ্য হয়, তা তাকে দিয়ে থাকি)।[৩]

—বুখারী ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ..... ثَلَاثًا — مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

لَهُ فِيْ هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ ... أَوْ أُمْنِعُهُ ... وَمَا

৩. বুখারী শরীফ

১৪—

www.pathagar.com

أنا فيه إلا كأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب

الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

কসম সেই আল্লাহ্‌র, যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ্‌ নয় (তিনবার বললেন)। এই জাতীয় সম্পদে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, আমি তা দেব, অথবা দিতে নিষেধ করব। এ ব্যাপারে আমি সর্বতোভাবে তোমাদেরই একজনের মত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী প্রত্যেকেরই মর্যাদানুসারে এবং রসূলে করীম (স.) যেরূপ আমাদের ভাগ করে দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ীই সম্পদ বণ্টন সম্পাদিত হবে।[১]

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পবিত্রতা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে :

প্রথম, রাষ্ট্রীয় কোষ থেকে কোন জিনিসই চুরি বা অপহরণ কিংবা আত্মসাত না হওয়া,

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, জনগণের সম্পদ ও পদমর্যাদাজনিত সুযোগ ও শক্তি এবং কর্তৃত্বের নির্মমতার দরুন অপহরণ না করা। প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত অর্থলুণ্ঠনের সুযোগ না থাকা।

ইসলাম এই দুইটি বিষয়ের উপর খব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। এবং শাসক-প্রশাসকদের মন-মানসিকতাকে এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত করতে খুব বেশী আগ্রহী। বিশেষ করে ধন-সম্পদের ব্যাপারে তাদের প্রকৃতিতে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিয়ে আসার জন্য যৎপরনাস্তি সচেষ্ট ও সংকল্পবদ্ধ। যেন প্রশাসনের অবস্থা সাধারন ভাবে উন্নত ও সুদৃঢ় হয়, সর্বপ্রকারের দুর্বলতার উর্ধ্বে থাকে এবং প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সকল প্রকারের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে। দুর্নীতির চোরাবালিতে তারা ডুবে না যায়।

---

১. فلسفة الجهاد في الاسلام, اورد ابو جعفر الطبري عن السائب ابن يزيد
১২৫ ص, বুখারী।

মানুষের গড়া সরকারসমূহ বেশ কয়টি জাতির প্রশাসনে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কার্যত চালিয়েছে। প্রশাসকদের মর্যাদা ক্ষুন্নকারী সর্বপ্রকারের আচার-আচরণ থেকে সরকারকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেছে।

এই পর্যায়ে প্রধান সংক্রামক ব্যাধি হচ্ছে ঘুষের প্রচলন, হাদিয়া-তোহফা, উপহার-উপঢৌকন অর্ঘ্য দানের সুযোগ সুবিধা।

এই উদ্দেশ্যেও বহু সরকার কড়া আইন-বিধি কার্যকর করেছে।

প্রাচীন ইতিহাসে প্রাচীন মিসরীয়দের সম্পর্কে 'আমাজিস আইন' তৈরী করার সন্ধান পাওয়া যায়। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মিসরীয় প্রতি বৎসর গ্রাম-প্রধানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা প্রমাণ করতে বাধ্য হত যে, সে তার ন্যায়সংগত আয়ের সীমার মধ্যে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করছে। কেউ তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তাকে নির্মমভাবে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হ'ত।[১]

দীন-ইসলামে এই আইনটি পরিণত ও রূপায়িত হয়েছে এই জিজ্ঞাসায় যে— 'তুমি এটা কোত্থেকে পেয়েছ'?

এই প্রশ্নটি কুরআন ও সুন্নাহতে বিধৃত। রসূলে করীম(স.)-র কার্যাবলীতে তার বিস্তারিত বিবরণ উচ্চারিত। খুলাফায়ে রাশেদুন, তাবেয়ীন ও পরবর্তী-কালের নেককার আল্লাহ্‌পরস্ত প্রশাসকদের কণ্ঠে তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

এই পর্যায়ে ইসলাম খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই কারণে শাসক প্রশাসক পদে এমন সব লোককে নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে যারা ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা, আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা, আচার-আচরণের সুষ্ঠুতা-স্বাভাবিকতা ও দীন পালনের দৃঢ়তা প্রভৃতি মৌলিক গুণাবলীতে ভূষিত হওয়ার দিক দিয়ে সুপরিচিতি অর্জন করেছে এবং আত্মীয় প্রীতি স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, প্রভৃতি দোষে দুষ্ট ও চরিত্রহীন, নির্দয় ধরনের ব্যক্তি-দেরকে প্রশাসক, ক্ষমতাধর ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ন পদসমূহে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছে, তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে।

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ١٣٦

www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ وَلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلِّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ -

যে লোক মুসলমানদের সামষ্টিক রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির দায়িত্বশীল হয়েছে, সে যদি কোন কাজে তুলনামূলকভাবে যোগ্যতর ব্যক্তি পাওয়া সত্ত্বেও নিম্নতর যোগ্যতার লোক নিযুক্ত করে, তা' হলে সে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিন সমাজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।[১]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ وَلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلِّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

যে লোক মুসলমানদের সামষ্টিক-রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের দায়িত্বশীল হ'ল সে যদি তাদের মধ্যকার বন্ধুতা ভালোবাসা বা নিকটাত্মীয়তার কারণে কোন লোককে কোন কাজে নিযুক্ত করে, তা'হলে সে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল এবং মু'মিনদের আমানতে খিয়ানত করল।[২]

---

১. বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।

২. احكام السلطانية ص ٥٣٣, السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٣

www.pathagar.com

এতএব শ্বশুর-জামাতার বা নিকটবর্তিতার সম্পর্কের ব্যাপারটিকে প্রশাসন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির উচ্চতর পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া ইসলামে এক সম্পূর্ণ অভিনব ও অপরিচিত রীতি বা প্রথা।

এই কারণে এহেন গর্তে নিপতিত হওয়া এবং বারংবার এই ভুলের আবর্তে পড়ার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত কড়া ও তীব্র সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক ধরনের সংক্রামক রোগ। এর প্রসারতা রোধে অত্যন্ত শক্তপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইসলাম গোটা মুসলিম সমাজকেই সচেতন করতে চেয়েছে। কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক প্রভাব বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধার করতে চাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য।

এই পর্যায়ে ইসলামের বাস্তব ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল। শুধুমাত্র এই কারণেই বহু যোগ্য নেক লোককে প্রশাসনিক পদ থেকে দূরে রাখা হয়েছে, যেমন ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন।[১]

অতএব কোন পদাধিকারী ব্যক্তির উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে—সে দায়িত্ব যে রকমের এবং সে পদ যে মর্যাদারই হোক, এবং রাষ্ট্র তাকে যে কর্মপন্থাই প্রদর্শন করবে, তাকে সেই কাজ ঠিক সেইভাবেই পালন করতে হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ্ অর্পিত একটা আমানত বিশেষ। তা যথাযথভাবেই সম্পন্ন করতে হবে। এই কাজের জন্য ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীর নিকট থেকে 'উপরি' হিসেবে নগদ অর্থ, উপঢৌকন বা বিশেষ পন্থার সম্মান-শ্রদ্ধা কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। না কাজের কাঠিন্য দুরূহতা দেখিয়ে বা তাড়াহুড়া করার কারণে অথবা সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে; কিংবা বিশেষ কোন স্বার্থ বা কল্যাণ লাভের দোহাই দিয়ে।

এ সবই হতে হবে জাতির কল্যাণে--সর্ব সাধারণের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

যে সব ধন-মাল সরকারী প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে গৃহীত হবে, নবী করীম (স.) তা বাজেয়াপ্ত করা ও সরকারী ভাণ্ডারে

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ١٣٨

www.pathagar.com

জমা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সব সরকারী কর্মচারী ঘুষ-রিশ্‌ওয়াত গ্রহণ করে পদমর্যাদা বিনষ্ট বা সরকারের দুর্নাম সৃষ্টির কারণ ঘটায়, তাদের অবিলম্বে পদচ্যুত করে সংশ্লিষ্ট কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়াকে ইসলাম একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। ফিকাহ্‌-বিদগণও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ফতোয়া দিয়েছেন। যেসব লোকের চরিত্র এইরূপ, তাদের নিকট ঋণ চাওয়া বা তাদেরকে ঋণ দেয়াও হারাম করা হয়েছে।

বর্ণিত হাদীস, ফিকাহ্‌বিদ্‌দের ফতোয়া এবং ইসলামের বিচারক-মণ্ডলীর কার্যাবলী এই পর্যায়ে অসংখ্য রয়েছে। তা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও যেমন, আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি।

এইসব সামষ্টিকভাবে প্রমাণ করে যে, সুবিচারকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে নির্ভরতা জাগাবার উদ্দেশ্যে প্রশাসন যন্ত্রকে নির্মল ও নির্দোষ করার উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেইসাথে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অন্যায় প্রভাব খাটানোর সুযোগ এবং সমাজ-সমষ্টির নৈতিকতার উপর তার অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়াজনিত বিপদ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[১]

মুসলমানদের রাজ্যসীমা যখন সম্প্রসারিত হচ্ছিল, দেশের পর দেশ জয় করে দখল করে নেয়া হচ্ছিল, দুনিয়া তার বাহুদ্বয় তাদের জন্য বিস্তারিত করে দিয়েছিল, আল্লাহ্‌ তায়ালা ঠিক সেই সময়ই সুবিচার পূর্ণ অনন্য বিধান প্রণয়নের কাজ করার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবকে মুসলমানদের রাষ্ট্রনায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিত্য নব সংঘটিত নতুনতর ঘটনাবলীর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও বিজ্ঞান-সম্মত আইন-বিধান প্রণয়ন করে। তা আজ পর্যন্ত মুসলিম প্রশাসকদের জন্য গৌরবের মূলধন বিশেষ এবং পৃথিবীর বড় বড় আইনজ্ঞ-দার্শনিকদের মনে বিভীষিকা জেগে উঠার কারণও বটে।

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ١٣٨

www.pathagar.com

তিনি মুসলমান ও দুনিয়ার বিপর্যয়ের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসব পর্যবেক্ষিত অবস্থাসমূহের মধ্যে তাঁর অধীন বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও যাঁচাই-পরখ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তাঁর সম্মুখে তাদের অবস্থা ছিল সমুদ্ঘাটিত। তা সব সময়ই তাঁর নখদর্পণে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। তিনি তা দৃঢ় সংকল্প ও ন্যায়-পরতা সহকারে ধারণ করতেন। ফলে তিনি অন্যদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হতেন। তাঁর ভূমিকা ছিল সকলের জন্য কল্যাণময়, প্রকৃত সত্য পথের সন্ধানদাতা। কিন্তু তাই বলে তিনি মুসলিম জনগণের উপর তাঁর দম্ভপূর্ণ আধিপত্য কখনই কার্যকর করতেন না।

### শয়তানের অনুপ্রবেশের পথ

হাদিয়া-তোহ্‌ফা বা উপহার-উপঢৌকন শয়তানী অনুপ্রবেশের পথ। স্বার্থান্ধ মানুষ এই পথেই শাসক-প্রশাসকদের নিকট পৌঁছার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এগুলো মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও সুবিচারের ন্যায়পরতাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখে, অবিচার ও অ-ন্যায়পরতার পথ উম্মুক্ত করে।

প্রশাসন যন্ত্র ও তার সাথে জড়িত বক্তিদের সম্পূর্ণ অন্যায়ের পথে পরি-চালিত করে। আর স্বার্থান্ধ লোকেরা এগুলোর সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ নিতান্ত অন্যায়ভাবে উদ্ধার করে। সর্ব প্রকারের দোষ ত্রুটির উপর একটা আবরণ চাপিয়ে দেয়।

তবে এ কথাও স্বীকার্য যে, হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেয়া মূলত যে একেবারেই না-জায়েয, তা নয়। কিন্তু তার আদান-প্রদান হতে হবে নিতান্ত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-এগানার মধ্যে সীমিতভাবে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তাতে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়, বন্ধুত্ব-ভালবাসা গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠে। এই কারণে ইসলামী শরীয়তে তা মুস্তাহাব রূপে স্বীকৃত। ইসলামে এই পর্যায়ের হাদিয়া-তোহফার আদান-প্রদান করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা স্বার্থ প্রণোদিত হবে না, বিশেষ অন্যায় স্বার্থ আদায়ের কু-মতলবে হাদিয়া তোহ্‌ফা দেওয়া ও গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর কোন্‌টি স্বার্থ প্রণোদিত এবং কোন্‌টি সর্বপ্রকার স্বার্থবিমুক্ত তা পার্থক্য করা বিবেকবান মানুষের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণের কোন কোন হাদিয়া-তোহ্‌ফা গ্রহণের যথার্থতা এই আলোকেই অনুধাবনীয়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর জীবনেই এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যার দরুণ তিনি কর্মচারীদের সতর্ক করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং সরকারী নির্দেশ হিসেবে সর্বপ্রকারের হাদিয়া-তোহ্‌ফা প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে গাজর গাছ উপঢৌকন স্বরূপ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। লোকটি আরও কয়েকবার এইরূপ কাজ করে। পরে একদিন আমীরুল মু'মিনীনের সম্মুখেই সেই লোকটি অপর একটি লোকের সাথে কঠিন ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। পরে লোকটি আমীরুল মু'মিনীন-কে লক্ষ্য করে বলে যে, 'আপনি আমাদের মধ্যকার এই ঝগড়া মীমাংসা করে দিন। ঠিক যেমন করে গাজরের শিকড় আলাদা করা হয়।' এই কথাটি বলে সে আমীরুল মু'মিনীনকে হাদিয়া দেয়ার প্রতি ইংগিত করেছিল এবং পূর্বে সে যে তাঁকে হাদিয়া দিয়ে ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিন। কথাটি শুনেই তিনি লোকটির মতলব বুঝে নিয়েছিলেন এবং এ-ও বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোকটি হাদিয়া দেয়ার কারণে তার পক্ষে মীমাংসা করার দাবী প্রকাশ করেছে। আর এ থেকেই তিনি হাদিয়া-তোহ্‌ফা গ্রহণের মারাত্মক পরিণতির কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তখনই উপরিউক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, 'তোমার হাদিয়া দেয়ার কারণে বিচার কার্যে একবিন্দু এদিক ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' অতঃপর ইসলামী খিলাফতের সকল দায়িত্বশীল কর্মচারীর প্রতি হাদিয়া-তোহ্‌ফা গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ফরমান প্রেরণ করেন। কেননা এই হাদিয়া-তোহ্‌ফা ঘুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।[১]

## জাতীয় কল্যাণে প্রশাসকদের উদ্‌বুদ্ধকরণ

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, সামষ্টিক সুবিচারের সাথে সংগতিসম্পন্ন ন্যায়-পরতাপূর্ণ বিধানটা কি? হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর সমগ্র খিলাফতের কর্মচারী-প্রশাসকগণকে কোন্ নিয়মটা মেনে চলতে বাধ্য করেছিলেন, যার দরুণ সমগ্র প্রশাসনিক অঞ্চলে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে সমস্ত নাগরিকগণ পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তিলাভে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

---

১. كنز العمال ج ٦ ص ٣٥٦

www.pathagar.com

হযরত উমর-ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যে কৃচ্ছ্রসাধন ও পরহেয-গারীর উচ্চতর মান অনুসরণ করেছিলেন এবং এই নীতিকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তাঁর গোটা প্রশাসনিক কার্যক্রমে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তিনি সমকক্ষদের মধ্যে অধিকমাত্রার কৃচ্ছ্রতা ও অপচয় রোধ করার ভাবধারা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন। ব্যাপারটিক তিনি সাধারণভাবেই গ্রহণ করেননি। এজন্য তিনি একটি পদ্ধতি কার্যকর করে নিয়েছিলেন।[১]

তিনি দায়িত্বশীল পদে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত ধন-সম্পদের হিসাব গ্রহণ করতেন। পরে নিরন্তর তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ চলতে থাকত। উত্তরকালে যদি দেখা যেত যে, কোন পদাধিকারী ব্যক্তির ধন-মাল কার্যভার গ্রহণের পূর্বকালীন ধন-মালের পরিমাণের তুলনায় অধিক পরিলক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে, তখন অতিরিক্ত অংশ ভাগ করে নিয়ে নেয়া হত। কর্মচারীদের ধন-মালের এই বৃদ্ধির সন্ধান করার কাজে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা নিযুক্ত ছিলেন।

অতিরিক্ত ধন-মাল সবটাই বাজেয়াপ্ত করা হত না এই কারণে যে. সাধারণত কর্মচারীরা বলত যে, তাদের ব্যক্তিগত ধন-মাল ব্যবসায়ে ও উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগের ফলেই এই বৃদ্ধিটা সম্ভবপর হয়েছে। অথবা বলত, তাদের গৃহপালিত পশু ইত্যাদির উৎপাদনের ফলে তা হয়েছে। এই কারণে তার সম্পূর্ণটা বাজেয়াপ্ত না করে গোটা অতিরিক্ত সম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বায়তুলমালের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে নেয়া হ'ত।

এই পর্যায়ের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

খলীফার পক্ষ থেকে মিসরের গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)। তাঁর সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, তিনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর ধন-সম্পদ বিপুলাকার ধারণ করেছে। সেই অনুপাতে তাঁর বিলাসিতা ও জাঁক-জমকের মাত্রাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী আসবাব-পত্র, দাস-দাসী ও যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার নিকট এত সব সম্পদ কোত্থেকে

---

১. كنز العمال ج ٦ ص ٣٤٦

www.pathagar.com

কেমন করে এল?' তিনি বললেন, মিসর খুবই উর্বরা, কৃষি ফসল বিপুল পরিমাণে জন্মে। ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির কারণেও এই সম্পদ বৃদ্ধি সংঘটিত হয়েছে। এক কথায় তাঁর প্রশাসনিক উচ্চ পদ তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাই তিনি যতই স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করুন না-কেন, ন্যায় বিচারক খলীফাতুল মুসলিমীনের সুবিচার দণ্ডের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমার নেতৃত্বে একদল অনুসন্ধান ও তদন্তকারী তথায় প্রেরণ করা হ'ল। তারা তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদের হিসাবে কষে দেখতে পেল যে, তাঁর বর্তমান সম্পদ পরিমাণ পদাভিষিক্ত হওয়ার পূর্বকালীন সম্পদের তুলনায় অনেক বেশী। তখন তা তাঁর ও বায়তুলমালের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়ে নেয়া হ'ল।[১]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিকটও বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি দাবি করলেন যে, এটা তাঁর অশ্বসম্পদের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের মুনাফার ফসল। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اُنْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ فَخُذْهُ وَاجْعَلِ

اَلْبَاقِيْ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ -

হে আবু হুরাইরা! তোমার প্রকৃত মূলধন এবং তোমার প্রাপ্য ভাতা নিয়ে নাও। আর তার অতিরিক্ত সব-ই বায়তুল মালে জমা করে দাও।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর প্রতি খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি তাঁকে কোথাও প্রশাসক নিযুক্ত করতেও তিনি বড়ই কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। এক সময় তিনি বললেন।

اِنَّمَا بَعَثْنَاكُمْ وُلَاةً وَلَمْ نَبْعَثْكُمْ تُجَّارًا -

১. كنز العمال ج ٦ ص ٣٥٥

www.pathagar.com

আমরা তো তোমাদের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম, ব্যবসায়ী বানিয়ে নয়।

হযরত উমর (রাঃ) পাথর ও শীসা নির্মিত একটি বাড়ী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার? জওয়াবে বহরাইনের জনৈক কর্মকর্তার নাম করা হ'ল। বললেন, 'মনে হচ্ছে, অর্থের প্রাচুর্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে!' পরে তার যাবতীয় ধন-সম্পদের অর্ধেক বায়তুলমালে ক্রোক করে নিয়ে নেয়া হ'ল।[১]

বস্তুত হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতে রাশেদার এটাই ছিল স্থায়ী নিয়ম ও নীতি। নির্বিশেষে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপরই এই নীতির যথার্থ ও যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে। কোন একজনও এই নীতির সাধারণ প্রয়োগের আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। সে লোকের যত বড় অবদানই ইসলামী জিহাদের ক্ষেত্রে থাক না কেন? সায়াদ ইবনে আবি ওক্কাস, আমর ইবনুল আ'স, খালিদ ইবনুল ওলীদ প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবী, ইসলামী জিহাদের অগ্রবর্তী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম এই পর্যায়ে উল্লেখ্য। হযরত উমর (রাঃ) এঁদের প্রত্যেকেরই ধন-মালের হিসাব নিয়ে বাড়তি পরিমাণের অর্ধেক বায়তুলমালে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিয়েছেন। ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এঁদের ঐতিহাসিক অবদানও এ আঘাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি।[২]

হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের সামাজিক সুবিচারের মানদণ্ড সর্বাবস্থায়ই সমুন্নত করে রেখেছেন। লোকদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা রক্ষার্থে তিনি অতুলনীয় কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, শাসক ও শাসিত, কর্মকর্তা ও প্রজা সাধারণের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য বা তারতম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেননি। তিনি মুসলিম জনগণ এবং বিপুল ঐশ্বর্য-বৈভবশালী লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়ের প্রতি সুবিচার কার্যকর করেছেন। ধনী লোকদের নিকট থেকে জনগণের ন্যায্য অধিকার শরীয়ত মুতাবিক আদায় করিয়ে দিয়েছেন এবং ধনী লোকদিগকে সাধারণ মানুষকে শোষণ করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। উপরন্তু তাদেরকে সেই অবস্থায় পড়ে যাওয়া থেকেও ঠেকিয়ে রেখেছেন যে, সম্পর্কে রসূলে করীম (স.) তাঁর

---

১. كنز العمال ص ٣٥٥

২. كتاب الخراج لابى يوسف, (যদিও হারাম পথে তারা এই সম্পদ সঞ্চয় করেন নি।)

www.pathagar.com

উম্মতের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডার যখন লোকদের করায়ত্ত হবে, তখন তারা হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বে ও দুইহাতে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে চরম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যাবে।

কুরাইশ সরদারগণ মদীনায় সম্পদের পাহাড় রচনা করছেন বলে যখন তিনি অভিযোগ পেয়েছিলেন তখন তিনি সম্ভবত এই কারণেই বলেছিলেন ঃ

কুরাইশ বংশের লোকেরা জনগণকে বঞ্চিত করে ধন-মাল লুটেপুটে নিতে চাচ্ছে, তোমরা সাবধান হও। তোমরা ভুলে যেওনা, উমার এখনও বেঁচে আছেন! আমি কুরাইশদের কণ্ঠনালী চেপে ধরার জন্যই জনগণের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি। আর ওদের জাহান্নামে যাওয়া থেকেও রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছি।

বস্তুত এই কারণেই হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে কোন দায়িত্ব-পূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য বেতন ধার্য করার পূর্বে তাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের হিসাব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অত্যন্ত কড়াকড়ি-ভাবে গ্রহণ করতেন। ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন ঃ

লোকদের সরকারী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করার পূর্বে তাদের ধন-মালের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় লিখে নিতেন এবং পরে তার পরিমাণ সেই তুলনায় অধিক পাওয়া গেলে তা আধা আধি ভাগ করে অথবা বাড়তি সম্পূর্ণটাই বায়তুলমালে নিয়ে নিতেন।[১]

হযরত উমর (রাঃ) উত্‌বা ইবনে আবু সুফিয়ানকে কিনানা এলাকার লোকদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরে সে যখন বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে রাজধানী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন জিজ্ঞাসা করার পর সে বললে ঃ 'আমার ধন-সম্পদ আমি সংগে নিয়ে গিয়েছিলাম, তদ্বারা আমি ব্যবসায় করেছি, তাতেই এই বিপুল সম্পদ অর্জিত হয়েছে।' হযরত উমর বললেন, 'তুমি কোন্ কারণে তোমার ধন-সম্পদ সংগে নিয়ে গিয়েছিলে?' অতঃপর তার সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে দাখিল করে দিলেন।

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সফিয়ানকে সিরিয়ার গবর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর নিকটেও অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যাওয়ায় তার অর্ধেক

১. فتوح البلدان لبلاذرى

www.pathagar.com

পরিমাণ বায়তুলমালে ক্রোক করে নিলেন। সায়াদ ইবনে আবি ওক্কাসের ধনমাল ঠিক একই কারণে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এক কথায়, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর এই নীতির ফলে মুসলিম সমাজে তখন পর্যন্ত কোন প্রকারের এ্যারিস্টোক্রাসী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। বস্তুত এটাই ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচার-পূর্ণ বণ্টননীতির অনিবার্য ফলশ্রুতি। উপরন্তু ইসলামী শাসন-প্রশাসন জোরপূর্বক অর্থ সংগ্রহকারী কোন কাঠামোও যে নয়, তারও এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক শ্রেণীর লোকদেরকে ধন-সম্পদে অন্য শ্রেণীর তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়ার অথবা অন্যদের তুলনায় আরবদের কিংবা অমুসলিমদের অপেক্ষা মুসলমানদের অধিক সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার সুযোগদানের ব্যবস্থাও তা নয়।

## সুবিচার ও প্রথম মানুষ

ইসলামের সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়পরতা পর্যায়ে স্পষ্ট ধারণা রচনায় প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের বংশে উদ্ভূত গোটা মানব সমষ্টির গড়ে উঠার কাহিনীর বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলামের মানব জাতি সংক্রান্ত এই ধারণা সমগ্র মানুষের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্বের পবিত্র ভাবধারার উন্মেষ করে। মানুষমাত্রই পরস্পরের ভাই, কেউ কারুর তুলনায় বংশীয় মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চ নয়, নীচ নয়, আশরাফ নয়, আতরাফ নয়। দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দেহে একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহিত। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, দুর্বল-শক্তিমান, কালো-ধলো, সৌভাগ্যবান-হতভাগ্য, সুদর্শন-কুশ্রী, মনিব-দাস, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কর্মক্ষম ও অকর্মণ্য নির্বিশেষ সমস্ত মানুষ এক অভিন্ন বংশের সন্তান। এদের মধ্যে কোন একটি দিক দিয়েও একবিন্দু পার্থক্য করা যেতে পারে না। কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতাদর্শ ও দৃষ্টি ভংগী মানুষে মানুষে কত প্রকারের যে পার্থক্য প্রাচীর রচনা করে নিয়েছে এবং মানুষের প্রগতির পথে কৃত্রিম-ভাবে কত যে অন্তরায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তারই ফলশ্রুতিতে মানুষ তার ভাই অপর মানুষের উপর চরম নির্মমতা দেখাচ্ছে। এক ভাই অপর এক ভাইয়ের উপর যুলুম করছে। তার মূল কারণ হচ্ছে, মানুষ এই ভ্রাতৃত্বের—আপনত্বের কথা হয় নিজেরা ভুলে

www.pathagar.com

গেছে, নয় তাদের তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের অভিশাপ, দস্যুতার আক্রমণ ও মনুষ্যত্বের চৌর্যবৃত্তি মানুষকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে মানবতা বিরোধী শক্তিগুলোর সহজ শিকারে পরিণত করে দিয়েছে। এই সব শক্তিই নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে অখণ্ড মানব সমাজের মধ্যে ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, ভাষা-বর্ণ-বংশ ও শ্রেণীভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে তাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে। তাদের শক্তি ও সম্পদ লুটে-পুটে নিয়ে তাদের নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র এই বিশাল জগতটিকে তাদের সম্মুখে সংকীর্ণতর করে দিয়েছে।

অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি অবিভাজ্য মানুষের জন্য অনন্ত বিশাল বিশ্বলোক সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌র বিধানভিত্তিক সামাজিক সুবিচারের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে এই সংকীর্ণ অনুদার হিংস্র জাতীয়তার প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে বিশ্বমানবকে অখণ্ড মানবতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। মানুষকে তারই মত মানুষের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা, একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের অধীন স্বাধীন ও উন্মুক্ত জীবন যাপনের অধিকারী বানিয়ে দেয়া। আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামতের ন্যায়-সংগত অংশলাভে ধন্য হওয়ার নির্বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি করা এবং এই বিরাট মহান মানবতা বৃক্ষটিকে ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে ও শাখায় প্রশাখায় সুশোভিত করা।

যে মানুষ এই ভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার করে, সে মানুষ নয়—অস্বাভাবিক মানুষ। ভাইয়ের রক্তপানিকরে উপার্জিত সম্পদ দিয়ে যে লোক 'শ্যাম্পেন' পান করে, সে যালিম, যে লোক মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণ করে—তা থেকে তাদের নির্মমভাবে বঞ্চিত করে স্বীয় বিলাসিতার আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করে, সে মানবতার দুশমন। যে মানুষ প্রশাসনের উচ্চতর আসনে আসীন হয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে, মানুষের সমালোচনার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়, নিপীড়িতের ফরিয়াদ শ্রবণ করে না সে স্বৈরতন্ত্রী মানুষ। যে মানুষ শহীদদের রক্তে গোসল করে নিজের বক্ষে স্বর্ণের মালিকা ঝুলায়, সে অহংকারী দাম্ভিক পশু-মানুষ। যে মানুষ লোকদের শ্রম-মেহনতের সুফল চুরি করে, বাড়তি মূল্য হরণ করে, সে দস্যু। যে মানুষ তার ভাই অপর মানুষকে হত্যা করে তার অংগ-প্রত্যংগ নিয়ে খেলা করে, সে বর্বর জিঘাংসু। যে মানুষ জীবাণুবোমা নিক্ষেপ করে কোটি

কোটি মানুষকে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে, সে মানুষের আকৃতিতে হিংস্র পাষণ্ড।

এইসব কারণে ইসলামের সামাজিক-সামষ্টিক-সুবিচার ব্যবস্থা এসব যুলুমের মুকাবিলায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক প্রাচীর খাড়া করেছে, মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তার চরম লক্ষ্য। মানুষ যেন মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারে, পেতে পারে তার সব ন্যায্য পাওনা, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

বস্তুত ইসলামে সামাজিক-সামষ্টিক সুবিচারের এটাই তাৎপর্য। এই সুবিচার ব্যবস্থাই পারে শোষক-ডাকাতদের বিষদাঁত চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তীক্ষ্ণ নখর উৎপাটিত করতে, স্বৈরাচারের সমস্ত দাসত্ব শৃংখল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে।

এই সামাজিক সুবিচার ব্যবস্থাই শাসক ও শাসিতের মাঝে স্থাপিত করে পরিপূর্ণ সাম্য ও মানবিক সমতা। এই পার্থক্যহীনতা মানুষকে অভিষিক্ত করে প্রকৃত স্বাধীনতার সুমহান মর্যাদায়।

যেন সব মানুষই তার অপর মানুষ ভাইয়ের সাথে পূর্ণ ভ্রাতৃত্বের পবিত্র ভাবধারার মধ্যে জীবন ধারণ করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। এই সুবিচার মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিচার করে, মূল্যায়ণ করে, তার সম্পদ-সম্পত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দৃষ্টিতে নয়। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের মূল্যকে বড় করে তোলে।

এই সুবিচার ব্যবস্থা যে সমাজে পুরোপুরি কার্যকর হয়, সেখানে থাকতে পারে না কোনরূপ হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও শ্রেণী সংঘর্ষ। এই ব্যবস্থার আহ্বান হচ্ছে, হে মানুষ! প্রথমে তুমি নিজেকে চেন, তারপরে চেন তোমার মর্যাদা ও অধিকারকে।

এই সুবিচার মনুষত্ব হরণকারী ঐ সব চোর-ডাকাতদের মুখে থু থু নিক্ষেপ করে। মৃত্যুর কারবারী, অস্ত্রের ব্যবসায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ সৃষ্টিকারী ওসব নরপশুদের মস্তক চূর্ণ করে। এই সুবিচার শাসকদের কৈফিয়ত চায়; কোথেকে তুমি সংগ্রহ করেছ ঐসব ব্যক্তিগত বৈভব? কেন হরণ করেছ মানুষের অধিকার? এই সুবিচার এমন এক প্রশাসনিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে যাতে জনগণ পুরোপুরি অংশ

www.pathagar.com

গ্রহণের সুযোগ পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত গণ অধিকারসম্পন্ন মানবতাবাদী ব্যবস্থা। এইরূপ সুবিচার ব্যবস্থা কেবল আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তাঁর দেয়া শরীয়তের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কার্যকর হতে পারে।

## জিহাদ ও যুদ্ধ

পাশ্চাত্য লেখকগণ ইসলামের প্রকৃত জিহাদের তাৎপর্য এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত রক্তাক্ত ঘটনাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। তাদের মতে সামষ্টিক ও রাজনৈতিক সে সব ঘটনা-দুর্ঘটনাকেই জিহাদ বলা হয়, যা ঘটনাবলীর বিবর্তনে ব্যক্তিদেরও বিবর্তিত করে। তারা জানতে ও বুঝতে পারেনি যে, ইসলামের প্রাথমিককালে ইসলামী দাওয়াত, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বাহিনীর সমাবেশ হত, তাঁরা শেষের দিকে শক্তি ও সম্পদের বিনিময়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত লোকদের মত ছিলেন না। প্রাথমিককালের সে লোকদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই ছিল প্রকৃত জিহাদ, শেষের দিকের ঘটনা-দুর্ঘটনাসমূহ নয়, এই কথা অনুধাবন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বুঝতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম রয়েছে। বস্তুত দু'টি বাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত।

প্রাথমিককালের বাহিনী ঈমান ও ইসলামী আকীদার প্রকৃত বাহক। আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর শেষোক্ত বাহিনীর কাজ ছিল শক্তি-সাম্রাজ্যলোভীদের লোলুপ জিহ্‌বাকে পরিতৃপ্ত করা। এ উভয় বাহিনীর বাহ্যিক ধরন-ধারণ 'দীনী' থাকলেও এ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য প্রকট। প্রথম বাহিনী জিহাদে প্রবৃত্ত হয়েছিল দীনী দায়িত্ব পালনের জন্য। আর শেষের দিকের বাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত বাসনা-ইচ্ছা-লোভকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। প্রথমটি ছিল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন ও কর্তব্য পালন। প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ করত শাহাদত লাভের উদ্দেশ্যে, পরকালীন চিরন্তন নিয়ামত লাভে ধন্য হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহে। এই লক্ষ্যে সে থাকত সম্পূর্ণ নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত ও পুরোপুরি আশ্বস্ত। এ ক্ষেত্রে জীবনের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ পাওয়ার তুলনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু বরণ করতে হ'ত মুজাহিদীনকে।

www.pathagar.com

জিহাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই লক্ষ্য করা যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। মানবেতিহাসে সে সব ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে দেখা গেছে। তখন জীবিত ব্যক্তিরা এই গৌরবের মৃত্যুর জন্য হিংসা করতেও কুণ্ঠিত হত না। ফলে তারাও অনুরূপ শাহাদতলাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বস্তুত এর পশ্চাতে এই যুক্তিই প্রেরণা জুগিয়েছে যে, 'মৃত্যুর সন্ধান কর, তাহলে তা-ই তোমাকে নতুন জীবনের গৌরব দান করবে।'

কিন্তু বেতন ও ভাতার বিনিময়ে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, জিহাদের আহ্বানে তাদের-ও উদ্বুদ্ধ করা হত, তারা দীনের জন্যই যুদ্ধ করত, এ কথা ঠিক ; কিন্তু এই যুদ্ধ ও সৈনিকতাকে তারা জীবনলাভের একটা অবলম্বনরূপে গ্রহণ করত ; মৃত্যুর জন্য তারা প্রস্তুত হত না। এদের দৃষ্টিতে জীবন হচ্ছে মহামূল্য সম্পদ, যদিও সে জীবনের মূলে কোন মহৎ লক্ষ্য নির্দিষ্ট নেই। অথচ শাহাদত লাভ হচ্ছে মু'মিনের বিশেষত্ব। আর যারা বেতন-ভাতার বিনিময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়, তাদের নিকট বেঁচে থাকাটাই হয় সর্বাধিক প্রিয় ও কাম্য বস্তু।

অবশ্য জিহাদের লক্ষ্যে উপরিউক্ত দুইটি চরম উদ্দেশ্যকে একীভূত পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কেননা শেষের দিকে এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংঘটিত হতে দেখা যায়, যেখানে আকীদা-বিশ্বাস প্রভুত্ব ও আধিপত্য অর্জনের লক্ষ্যে একীভূত হয়ে গেছে। মুসলমানরা অমুসলিম শত্রুদের আরব্ধ এমন অনেক যুদ্ধেরই সম্মুখীন হয়েছেন, যে সবের মূলে শুধু রাজ্য দখল ও কর্তৃত্ব স্থাপনই লক্ষ্য ছিল না, দীন-ইসলাম ও মুসলিম সমাজ-সংস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করাও তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃস্টান জগত ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি দখল করার ও তার মাধ্যমে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলমানদের উপর যে সব যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তাতে মুসলমানরা সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যই কঠিন বিপদ মনে করেছেন বলে তাঁরা এর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিরোধ গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে মুসলমানরা খালেসভাবে সকল প্রকার বৈষয়িক স্বার্থলক্ষ্য বা আধিপত্য-কর্তৃত্ব লাভের লোভের উর্ধ্বে থেকেই এই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন। কোন কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র শক্তি উসমানীয় খিলাফতের উপর যে সব যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সে সব

১৫—

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপীয় শক্তিগুলো ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি দখল করা এবং এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লালসা পরিতৃপ্ত করাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসলমানগণ তাতে গোটা মুসলিম জাহানের উপর চরম বিপদ নেমে আসার আশংকা বোধ করেছিলেন। তাই তাঁরা খালেস জিহাদী ভাবধারা নিয়েই তার প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার পশ্চাতে ব্যক্তিগত স্বার্থও যেমন কিছুই নিহিত ছিল না, তেমনি রাজ্য-সাম্রাজ্য বিস্তারও ছিল না তার কোন লক্ষ্য। উসমানীয় খিলাফতের উপর যে সব ইউরোপীয় রাষ্ট্র আক্রমণ করেছিল, মুসলমানদের ধর্মীয় নিদর্শনাদি নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর সেইসাথে ইউরোপ থেকে উসমানীয় খিলাফতকে খতম করা এবং দুই মহাদেশের মধ্যকার যুদ্ধক্ষেত্রসমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করাই ছিল তাদের চরম উদ্দেশ্য। উসমানীয় খিলাফতের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিম জাতিসমূহ তাতে ব্যাপক ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব যুদ্ধে জিহাদের বিশেষত্ব একবিন্দু ক্ষুন্ন হয়নি; বরং যুদ্ধ ও দেশজয়ের উপর একনিষ্ঠ জিহাদী ভাবধারা বিজয়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এ সময় উসমানীয় খিলাফত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল; জিহাদে যোগদানে অনিচ্ছুক লোকদের তাতে যোগদানে বাধ্য করার মত শক্তিও তার ছিল না। তা সত্ত্বেও এই জিহাদের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, দুনিয়ার মুসলমানগণ নিজেদের ঈমানী প্রেরণায়ই এই খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়েছেন। যে সব মুলসলমান এই খিলাফতের অধীনে বসবাস করতেন না; বরং উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র ও রাজ্য-সমূহের নাগরিক এবং পরাধীন ছিলেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে উসমানীয় খিলাফতের পক্ষে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এসব সৈন্যের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে তাঁরা সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও যাঁরা তাদের সহিত যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা অস্ত্রের মুখ কখনই মুসলমানদের প্রতি নিবদ্ধ করেন নি। এই সময় খ্রীস্টান বৃটিশ শাসিত ভারতের মুসলিম নাগরিকগণ উসমানীয় খিলাফত রক্ষার্থে বিপুল অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করেছিলেন কেবল এই দীনী প্রেরণার বশবর্তী হয়েই। এক্ষেত্রে দীনী ভাবধারা রাজ্য-সাম্রাজ্য ব্যবস্থা ও শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছিল।[১]

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام، ص ١٣٠-١٥١.

www.pathagar.com

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, মুসলমানরা কখনই জিহাদী প্রেরণা ও ভাবধারা হারিয়ে ফেলেন নি। তার উপর তাঁরা চিরকালই অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যখনই যে-কোনদিক দিয়েই আঘাত আসুক, মুসলমানগণ তাদের পক্ষে অকাতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ঈমানের ঐকান্তিক তাকীদে। কাজেই মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে যখনই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তখনই মুসলমানদের দিলে দীনী ভাবধারা প্রবল হয়ে জেগে উঠেছে। অমুসলমানের পরস্পরের মধ্যে যেমন বহুতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, ঠিক সেই ধরনের যুদ্ধও মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে অসংখ্য বার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে যাঁরাই প্রাচ্য ও মুসলিমদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাঁরা এই সত্যকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন। কেননা তাঁরা পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে সব কিছু বিচার-বিবেচনা করেছেন। আর পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ ইসলামকে চিরকালই খ্রীস্টবাদের বিপরীত দেখতে পেয়েছে। মধ্যযুগে বাস্তব বিচার-বুদ্ধি প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় হিংসা ও বিদ্বেষ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং লেখক, ঐতিহাসিক ও প্রশাসক-গণের মন-মগজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষী ও জনগণের ধারণা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে বিদ্বেষান্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের প্রকৃত রূপ ও তত্ত্ব তাদের সম্মুখে আদৌ উদ্ঘাটিত হতে পারেনি। এই সময় পাশ্চাত্য মনীষী ও লেখকগণ ইসলাম সম্পর্কে যে সব রচনা প্রকাশ করেছেন, তা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষাত্মক। সেইসব রচনা যখন পাশ্চাত্যের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল, তখন তারা ইসলামের চরম বিকৃত রূপই দেখতে পেল।

এক্ষণে অবশ্য অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। সমগ্র ইউরোপে এক্ষণে ইসলাম তার আসল রূপে প্রচারিত হচ্ছে। ফলে ইউরোপীয় জাতিসমূহের নিকট ইসলাম অভাবিতপূর্ব মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই ইউরোপে ইসলামের ব্যাপক প্রচার এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠা অসম্ভব মনে করার কোনই কারণ থাকতে পারে না এবং সমগ্র ইউরোপে ইসলাম একদিন বিজয়ী আদর্শরূপে গৃহীতও সংবর্ধিত হবে, সে আশা পোষন-ও নয় কিছুমাত্র ভিত্তিহীন।

**বুঝের ভুল**

পূর্বোদ্ধৃত আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বিভিন্ন বংশ ও

www.pathagar.com

গোত্রের মধ্যে খিলাফত—তথা কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও সরদারী নিয়ে, তা কখনই জিহাদ ছিল না এবং জিহাদ নামে তা অভিহিতও হতে পারে না। এইগুলোকে মুসলমানদের নিতান্ত বৈষয়িক ঘটনাই বলা যায়, এর সাথে প্রকৃত দীন-ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্কই ছিল না ; বরং আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইসলাম মুসলমানদের পরস্পরে মারামারি ও দ্বন্দ্ব কামনা করে না, পরম ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিক সৌহার্দ্যের পবিত্র ভাবধারা প্রবল হয়ে থাকাই ইসলামের কাম্য। কুরআন ও হাদীসে এই পর্যায়ে অসংখ্য মূল্যবান উপদেশ ও পথনির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছে। তা মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও ঝগড়া-ফাসাদ অত্যন্ত তাকীদ সহকারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বস্তুত দীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের মান-মর্যাদা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে যুদ্ধ মুসলমানরা করবে কেবল তা-ই জিহাদ নামে অভিহিত হতে পারে।

কিন্তু উপরিউক্ত ভুল ধারণা যে সব লেখকের মন ও মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তারা পশ্চিম আফ্রিকার ঘটনাবলী এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও জাতিসত্তার পরস্পরে যে সব দ্বন্দ্ব-ফাসাদ সংঘটিত হয়েছিল, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-লোভী লোকদের মধ্যে যেসব রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়েছিল, আন্দালুসিয়ার খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পর মুসলমানদের যে একত্ব বিনষ্ট হয়েছিল সেইগুলোর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব ঘটনাকে নিদর্শন ধরে এরূপ ভুল চিন্তা গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানেরই উচিত নয়। ফরাসী লেখকগণও এই ধারার চিন্তা গ্রহণ করে মিছামিছিভাবে ইসলামের ব্যাপারে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছেন এবং ফরাসী শাসনাধীন মুসলমানদের মন-মগজকেও ইসলামের প্রতি সন্দিহান বানাবার চেষ্টা চালিয়েছেন। আসলে এসব লেখক সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাকে ভিত্তি করে ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করেছেন।

বস্তুত ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত ধারণা ও আকীদা এবং ইসলামের অপরাপর মৌল বিধানের মধ্যে একটা অতীব সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। একজন মুসলিম নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারে, তার ফলে দীনের কোন একটি বা একাধিক আমলের প্রতি তার দুর্বল আচরণের প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এসব বিধানের উপর আমলের ব্যাপারটি ব্যক্তি ও তার আল্লাহ্‌র মধ্যকার এবং প্রধানত তাতেই সীমাবদ্ধ মনে করতে হবে। তার নিজের মন-মানসিকতা ও বিবেক ভিন্ন এইসব

www.pathagar.com

কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় বানানোর জন্য অন্য কোন শক্তি বর্তমান নেই। কিন্তু জিহাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা মুসলিম ব্যক্তি এবং তার দীন, তার মাতৃভূমি তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ইজ্জত-আবরুর সাথে পূর্ণমাত্রায় সংশ্লিষ্ট। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তির মনে যদি প্রেরণা তীব্র করা হয়, তার আকীদা ও ঈমান জাগিয়ে তোলা যায়, তা'হলে সে ইসলামের মৌল বিধানসমূহ পালনে উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে পারে। আর দেশপ্রেম, ধন-মালের মায়া ও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা তীব্র অনুভূতির ব্যাপার। এক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনা অত্যন্ত তীব্র হয়ে থাকে। মুসলিম ব্যক্তি অনেক সময় ঈমানী চেতনার অভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইসলামের মৌল বিধানসমূহ পালনের ব্যাপারে গাফিল হয়ে পড়তে পারে, সে সবের গুরুত্ব না বুঝে উৎসাহ হীন হয়ে পড়তেও পারে—অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু জিহাদের ব্যাপারটি বাস্তব অবস্থার সাথে এতই সম্পৃক্ত যে, নিত্যকার ঘটনাবলী তাকে সেজন্য সচেতন করে রাখে, তার ভিতরে তীব্র কর্তব্য পরায়ণতা সদাসর্বদা জাগিয়ে রাখে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা মানুষকে গাফিল হয়ে মুহূর্তের তরেও থাকতে দেয় না। আর এই কারণেই বোধ হয় মুসলমানরা জিহাদ ফরয হওয়ার সময় থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদে তৎপর হয়ে রয়েছে। তাকে এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিন্তু তাই বলে ইসলামে জিহাদের নিয়ম-কানুন কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয় বলে সে বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণই ছিল না এসব ইউরোপীয় লেখক ও চিন্তাবিদদের। তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে জনমনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার কুমতলবে এই ধরনের মিথ্যা দোষারোপমূলক রচনা তৈরি করেছেন, তার ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করার পরিবর্তে নিজেদেরই বিকৃত রূপটা বিশ্ব জনসমক্ষে স্পষ্ট করে তুলেছেন অনেক বেশী। কেননা প্রাচ্যের জনগণ মনে করেন না যে, তাদের দীন তাদের উপর কিছুমাত্র অন্যায় আচরণ করেছে এবং তাদের ইতিহাস তা নিয়ে তাদের সাথে খেলা করেছে। ফলে তারা পূর্ণ মাত্রার সচেতনতা অর্জন করেছে এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তার সব কিছুকেই তাঁরা সন্দেহের চক্ষে দেখতে শুরু করেছেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্ররাও তাদের শিক্ষক-

www.pathagar.com

দের প্রতি এই ব্যাপারে সকল আস্থা ও বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুত পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক যখন বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.) সম্পর্কেই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি, তখন তাদের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস থাকা ত দূরের কথা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের তীব্রতায়ই তাদের মন ও মানস ভরপুর হয়ে থাকাই স্বভাবিক হয়ে আছে।

এই প্রেক্ষিতে বলতে হয় পাশ্চাত্য লেখকগণ যখন মনে করেন, ইসলামের জিহাদ ধর্ম প্রচার ও বিশেষ আকীদা গ্রহণে বাধ্য করার লক্ষ্যে কার্যকর হয়েছে এবং তারা যখন ইসলামকে এক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত ও স্বরচিত ধর্ম বলে প্রচার চালিয়েছে, তখন তাদের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সততা রক্ষার ব্যাপারে একবিন্দু আস্থা অবশিষ্ট থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এরূপ অবস্থায় জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সৃষ্ট ভুল ধারণার পাশাপাশি প্রকৃত ও সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা এবং জিহাদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা আমাদের একটা বিশেষ কর্তব্য হয়ে পড়ে।

অমুসলিম পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচনায় ইসলামী জিহাদের যে ভুল ও বিকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে জিহাদের প্রকৃত ও সত্যিকার তাৎপর্য এবং রূপ কি, এই প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নের জওয়াব বিস্তারিতভাবে পেশ করা আমাদেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের তাৎপর্য কি, তা জানবার জন্য আমাদেরকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের প্রতি। কেননা এই কুরআনের নির্দেশেই জিহাদ মুসলিম জনগণের প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং এই কুরআন যে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ্‌র কালাম, সে ব্যাপারে কারুর কোন মতপার্থক্য নেই—থাকতে পারে না। অতএব জিহাদ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা কুরআন মজীদ থেকে জানতে চেষ্টা করায়ও কোন দ্বিমতের একবিন্দু অবকাশ নেই।

কুরআনই আমাদের সম্মুখে এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে যে, রসূলে করীম (স.) ও মুসলমানদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে যুদ্ধ করার কোন নির্দেশই পাওয়া যায়নি তার কারণ স্পষ্ট। হিজরতের পূর্বে ছিল ইসলামের সূচনা পর্ব। মুসলমানগণ সংখ্যায় এতই

www.pathagar.com

নগণ্য ছিলেন যে, তাঁরা অত্যাচারী কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলায় কোন-রূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি করার কথা চিন্তাও করতে পারেননি। চিন্তা জেগে থাকলেও এবং তার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকলেও তা সহ্য করা করার কোন সাধ্যই তাঁদের ছিল না। এই সময় রসূলে করীম (স.) দীনী দাওয়াতী কাজে যতই তৎপরতা গ্রহণ করতেন কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা ততই তীব্র ও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করত। নবী করীম (স.) ও মুসলমানদের অপরিসীম ধৈর্য সহকারের তা সহ্য করা ছাড়া করণীয় কিছুই ছিল না। এক-এক সময় সাহাবিগণ অত্যাচার-নিপীড়নে অধৈর্য হয়ে পড়ে রসূলে করীম (স.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আল্লাহ্‌র সাহায্য আসতে আর কত দেরী? --- কবে আসবে সে সাহায্য! আমরা তো আর সইতে পারছি না। আমাদের সহ্যের সীমা তো ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' জওয়াবে রসূলে করীম (স.) বলেছেন:

> ধৈর্য ধর। এত সকালে ধৈর্য হারালে চলবে কেন, অথচ আজতো তোমরা যে কাজে দীক্ষিত হয়েছ সেই কাজে পূর্বে যারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছে, করাত দ্বারা তাঁদের মাঝ বরাবর চেরা হয়েছে। মনে রেখো, এমন একদিন আসবে; যেদিন বাতহা থেকে একজন লোক ইয়মেন পর্যন্ত চলে যাবে, এই দীর্ঘ পথের মধ্যে তাকে কেউ কিছু বলবে না।

বস্তুত এই সময় মক্কাবাসীরা মুসলমানদের উপর নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন চালাত; কিন্তু তা সত্ত্বেও রসূলে করীম (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাদের এই অত্যাচারের জওয়াবে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি; অস্ত্রধারণ করেন নি। যদি তেমন কিছু করতেন, তা হলে তা নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত হত, অকারণ রক্তপাতের কথা বলা যেত না কোনমতেই; বরং এই কঠিন সময়ে তাঁরা আত্ম-গোপন করা এড়িয়ে চলা এবং হিজরত করে বিদেশে চলে যাওয়া প্রভৃতি ধরনের কার্যক্রমই গ্রহণ করেছিলেন। আর এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই রসূলে করীম (স.)-এর প্রতি নিম্নোক্ত ঘোষণাটি দেয়ার লক্ষ্যে কুরআনের সূরা নাযিল হয়েছিল:

www.pathagar.com

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا

أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ -

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ -

বল. হে কাফিরগণ! আমি 'ইবাদত করি না তার, যার 'ইবাদত তোমরা কর। আর তোমরা 'ইবাদতকারী নও তাঁর যাঁর 'ইবাদাত আমি করি। আর আমিও 'ইবাদতকারী হব না যাঁর 'ইবাদত তোমরা করছ এবং তোমরাও 'ইবাদতকারী হবে না যাঁর 'ইবাদত আমি করছি। আসলে তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্যও একটি স্বতন্ত্র দীন রয়েছে। —সূরা কাফিরুন

বস্তুত কুরআন মজীদের এই ক্ষুদ্রায়তন সূরাটি ছিল তাদের জন্য যুদ্ধের বিকল্প। কাফির-মুশরিকদের সীমালংঘনমূলক আচরণের এ-ও এক ধরনের প্রতিকার। এইভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ রসূলে করীম (স.) পাঠ করে তাঁদের শোনাতেন। এই পাঠ তাদের জন্য খুবই দুঃসহ হয়ে দাঁড়াত এবং তাদের উপর অস্ত্রের আক্রমণের পরিবর্তে তা খুবই সাংঘাতিক ও মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। ওরা তো রসূলে করীম (স.) -এর নিকট দবলদ্ধভাবে উপস্থিত হ'ত এবং নানা কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে বিপদে ফেলতে বা তাঁর প্রচারিত দীন থেকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা চালাত। তখন নবী করীম (স.) তাদেরকে এই সব আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। ফলে অনেকের গায়ে যেমন আগুন লেগে যেত, তেমনি অনেকে তা শুনে প্রভাবিতও হয়ে পড়ত এবং তাদের দিল সাক্ষ্য দিত যে, রসূলে করীম (স.)-এর দীনী দাওয়াত সম্পূর্ণ সত্য। কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ঈমানী উষ্ণতা সহকারে কুর-আন মজীদ পাঠ করতে শুনে তাদের কেউ কেউ ভক্তির আতিশয্যে সিজ্‌দায় মাথানত করে দিত এমন ঘটনা তখন কিছুমাত্র বিরল ছিল না।

সত্যকথা, মক্কীজীবনের দুঃসহ কষ্টের কঠিনতম অধ্যায়ে কুরআনের এই সব আয়াতই ছিল মুসলমানদের জন্য বড় প্রতিরোধক। তরবারি হাতে যুদ্ধ

www.pathagar.com

করার তেমন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি তখন। কুরআনের এসব আয়াত তাদের সম্মুখে তখন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও দলীল উপস্থাপিত করত যার মুকাবিলায় বলার মত কোন কথাই কাফির-মুশরিকদের নিকট থাকত না। তখন তাদের নিজেদের ধর্মমত, মূর্তিপূজা ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতেই নিতান্ত অর্থহীন ও খুবই হাস্যকর প্রমাণিত হত। রসূলে করীম (স.) এবং তাঁর এই দীনী দাওয়াতের উপর তাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার কোন যৌক্তিকতাই তাদের বোধগম্য হত না। তারা বরং বাতিল ধর্মমত পরিহার করে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ত। শক্তিধরের নিকট থেকে দুর্বলের, মনিব-মালিকের নিকট থেকে কৃতদাসের এবং পুরুষের নিকট থেকে স্ত্রীর প্রতি সুবিচার আদায় করার জন্য তারা প্রবল ও কঠোর হয়ে উঠত। কেননা তদানীন্তন আরব সমাজের কুত্রাপি সুবিচার বলতে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব ছিল না। আর সম্ভবত এই কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনী সূরাসমূহের ভাষা অত্যন্ত কঠোর গুরুগম্ভীর, ও আশ্চর্য-চূড়ান্ত হত ; যা তাদের কলিজাকে কাঁদিয়ে দিত। তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলত। এ আয়াতসমূহ সংক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্রাকার ও ঝংকারপূর্ণ হত, তা পাঠকালে মনে হত যেন প্রতিপক্ষের উপর শাণিত তরবারি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তীক্ষ্ণ তীর বর্ষিত হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের বক্ষস্থলে।

মক্কায় মুসলমানরা নিরতিশয় দুর্বল ছিলেন, যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন লোক তাদের যে কাউকে চিলের ন্যায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেত এবং নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলত। আর এমনি করুণ অবস্থার মধ্য দিয়েই তাঁদের মক্কী জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়।

কিন্তু উত্তরকালে তাঁরা হিজরত করে যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন তখন এখানে তাঁরা সংখ্যায় যেমন বিপুল হলেন, তেমনি শক্তিও তাঁদের সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল। আর তখনই তাঁদের প্রতি নির্দেশ হ'ল, অস্ত্রদ্বারা অত্যাচার-উৎপীড়নের মুকাবিলা করার, শক্তির জবাবে শক্তি প্রদর্শন করার। কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা অবতীর্ণ হ'ল :

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

عَلَيْكُمْ ... ... ...

www.pathagar.com

অতঃপর যারাই তোমাদের প্রতি সীমালংঘনমূলক আচরণ করবে, তোমরাও তাদের উপর—তারা যেমন সীমালংঘনমূলক আচরণ তোমাদের প্রতি করেছে ঠিক তেমনি সীমালংঘনমূলক আচরণ গ্রহণ কর।

—সূরা আল-বাকারা : ১৯৪

বস্তুত এ আয়াত দ্বারাই মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। প্রতিরক্ষামূলক বা আক্রমণমূলকভাবে যুদ্ধ করার এ ছিল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে স্পষ্ট নির্দেশ। আর হিজরতের পর দুইটি বৎসর অতিবাহিত হতে না-হতেই মুসলিম ও মক্কার কাফির-মুশরিকদের মধ্যে মহান বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে জয়লাভ করেন। যুদ্ধে এই প্রত্যক্ষ 'হাতে খড়ি'র ঘটনাটি ছিল মুসলিমদের জন্য বীরত্ব প্রদর্শনের প্রথম সূচনা ক্ষেত্র। তার ফলে তাদের মধ্যে যেমন গভীর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠে, তেমনি তাদের বিজয় দান সংক্রান্ত মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদার বাস্তবতার প্রতি জাগে গভীর প্রত্যয়।

**মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে**

হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান ও মক্কার অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সব বিবাদ-বিসম্বাদ। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপের উপর ইসলাম ও মুসলিমের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক ও প্রধান দুশমন কুরাইশ ও তাদের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ অন্যান্য গোত্র মুসলিম শক্তির নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করে। অতঃপর মুসলমানদের প্রতি সাধারণভাবে সমগ্র অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তাদের সকলেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেয়া হয়। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত কয়টি এই পর্যায়েই অবতীর্ণ :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

তোমরা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে। আর নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সংগে রয়েছেন।

—সূরা তওবা : ৩৬

www.pathagar.com

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ………………

তোমরা ওসব শত্রুদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি ও যুদ্ধের যানবাহন সংগ্রহ কর, যার দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদেরও—তাদের ছাড়া আরও অন্যান্য যারা আছে, যাদের তোমরা এখন জানো না, আল্লাহ্ তাদের জানেন।—সূরা আনফাল : ৬০

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী সত্য অমান্য-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সংগে রয়েছেন।
—সূরা তওবা : ১২৩

এ সব প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নির্দেশের পরই মুসলিমগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে জড়িয়ে পড়লেন। প্রথমত তাঁদের এই যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক অথবা ইসলামী দাওয়াতের কাজকে অব্যাহত রাখার মানসে। শেষ পর্যন্ত যখন রিসালতকে সর্বজনীন করার এবং গোটা মানুষের কল্যাণ বিধান—নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ইসলামের হিদায়েতের পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হ'ল, তখন প্রতিবেশী সব মানুষের নিকট তাঁরা ইসলামকে ওয়ায-নসীহত ও শান্তির বাহন হিসেবে

www.pathagar.com

উপস্থাপিত করলেন ; কিন্তু অতঃপর শক্তি প্রয়োগ ও অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় থাকল না।----

এরই পর মুসলিমগণ দিকে দিকে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে লাগলেন। যুদ্ধের বেশ কয়টি ক্ষেত্র একসাথে তাঁদের সম্মুখে উম্মুক্ত হয়ে গেল। তখন তাঁদের নিকট যুদ্ধ সম্পর্কিত ধারণা দুইটি গোত্র বা দুইটি শহরের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ থেকে দুইটি জাতি বা দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সম্প্রসারিত হয়ে গেল। এই সময়ই যুদ্ধের একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন গড়ে উঠল। আর তার মূল উৎস হ'ল আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান কুরআনুল করীমের অকাট্য আয়াতসমূহ। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য সজ্জিত ও সুবিন্যাস্তকরণ, সৈন্য সমাবেশকরণ, আক্রমণের লক্ষ্যে সৈন্য সম্মুখের দিকে অগ্রসরকরণ প্রভৃতি- এবং কিভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হবে, কি পদ্ধতিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং শত্রু পক্ষের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ কিভাবে পরিপূরণ করতে হবে এইসবই তাঁদের নিকট সুসংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সন্ধি করা, বন্দী রাখা, গনীমতের মাল বন্টন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পলায়নকারী, যুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, নিষ্ঠাবান যোগদানকারী ও মুনাফিক—বিভিন্ন অবস্থার মুসলিমদের মধ্যে আচরণের পার্থক্য নির্ধারণের নীতি স্থির করা হল এই সময়েই। উপরন্তু যুদ্ধ নীতি ও আইন-কানুন নির্ধারণের আর একটি উৎস ছিল রসূলে করীম (স.)-এর নিজের যুদ্ধ পদ্ধতি এবং তাঁর প্রেরিত বিভিন্ন যোদ্ধাবাহিনীর প্রতি প্রদত্ত উপদেশ-নসীহত।

এখানে আমরা যে সব জিনিসের উল্লেখ করলাম, তার ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামে জিহাদ কোন সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম নয় এবং যে পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়াও ইসলামী জিহাদ নয়। বস্তুত মুসলিমগণ যখন দুর্বল ছিলেন, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তির অধিকারী ছিলেন না, তখনও তাঁরা জিহাদই করেছেন। তবে তখনকার জিহাদ ছিল যুক্তির জওয়াবে যুক্তি উপস্থাপন। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-ভিত্তিক আলোচনা—কথার জওয়াবে কথা—-উত্তম কথা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল বা পরাভূত করা। পরবর্তীকালে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সর্বপ্রকার সীমালংঘনমূলক আচরণ ও পদক্ষেপের জওয়াবে অনুরূপ

www.pathagar.com

সীমালংঘনমূলক আচরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণই ছিল জিহাদের বিবর্তিত পর্যায়। যারা তাদের দেশ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করেছে তাদেরও সেখান থেকে বহিষ্কার করা এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তা উন্নতমানের মানব কল্যাণ বিধানের উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। জনসমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দীনী ও নৈতিক সংশোধন গ্রহণের দাওয়াত দান এই পর্যায়ের একটি অতীব বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেননা এই পর্যায়ে মানব সমষ্টির জন্য এটা খুবই কল্যাণকর বিবেচিত হয়েছিল। এই কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা সম্ভব হলে তা-ই করা হ'ত। অন্যথায় অস্ত্র প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিলে তাতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করা হ'ত না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী যে সব রাষ্ট্র আকীদা-আদর্শ, সমাজ ব্যবস্থা, জীবন-লক্ষ্য প্রভৃতির দিকদিয়ে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এবং যার অধীনে মুসলমানদের পক্ষে দীন ও ঈমান রক্ষা করে জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে, যেখানে মুসলমানরা হয় নির্যাতিত-নিপীড়িত, তথায় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় শুধু দাওয়াতী কার্যক্রমের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না; বরং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও তাতে কঠোরতা অবলম্বনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। তখন মুসলমানদের ঈমানী শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসার পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দীন ও ঈমানের পথের কন্টক উৎপাটিত করা ঈমানী শক্তিকে অধিকতর বলিষ্ঠও অনমনীয় করে তোলা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# চতুর্থ অধ্যায়

## তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি

[ ইসলামে শান্তি—হিংসা-বিদ্বেষ নেই, গোত্রবাদও স্বীকৃতব্য নয়—ইসলাম ও শান্তি—নিরাপত্তা দান ও প্রতিরোধ—তাঁরা যথার্থভাবে কল্যাণের সন্ধান করেছেন—প্রতিশ্রুতি ও উপদেশ—দীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই—পরিতুষ্টকরণ—শক্তি প্রয়োগ নয়—চাপের তীব্রতা বিস্ফোরণের উদ্গাতা—শুভপুণ্যদান ও শাহাদত লাভই লক্ষ্য—গনীমতের মাল ও কর্তৃত্ব লাভ নয়—বিচিত্র ধরনের মিথ্যাচার—তুলনা ও পার্থক্য—দুর্ণাম রটনাকারীদের প্রতি—ফিতনা হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক—ইসলাম ও যুদ্ধ—খৃস্টীয় ধর্ম ও ইসলাম—ছায়া-অপচ্ছায়া—শুধু এতটুকুই নয়— ]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## ইসলামে শান্তি

ইসলামে শান্তির চিন্তা অত্যন্ত মৌলিক ও গভীরে প্রোথিত। ইসলামী জীবন-বিধানের সাথে তা খুবই সংগতিসম্পন্ন। শান্তির চিন্তা ইসলামের সামগ্রিক প্রকৃতি, বিশ্বলোক, জীবন ও মানব সম্পর্কিত মৌল দৃষ্টি-কোণ থেকে উৎসারিত।

এই চিন্তার উৎস থেকেই গঠিত হয়েছে ইসলামের সমগ্র সাংগঠনিকতা। ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-বিধান, তার আইন প্রণালী ও তার কার্যকারণ-সমূহ। ইসলামের নিদর্শনাদি ও ভাবধারাসমূহ সেই মৌলচিন্তা থেকেই গৃহীত।

বস্তুত ইসলাম এই বিশাল বিশ্বলোকের পরম ও মহান একত্বের দর্শন উপস্থাপিত করেছে।

এই একত্ব তার সমগ্র অংশের মধ্যে একক বিন্দু থেকে সামষ্টিক জীবনের সর্বোন্নত শ্রেণী পর্যন্ত তা বিধৃত।

ইসলামের এককসমূহের মধ্যেও এই একত্ব বিদ্যমান। স্থির প্রস্তর খণ্ড থেকে শুরু করে ক্রমপ্রবৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ, চলমান প্রাণীকুল এবং বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষ পর্যন্ত তা বিস্তীর্ণ।

ইসলামের সমগ্র কর্মতৎপরতায় এই একত্ব বিদ্যমান। মহাশূন্যে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকা-নক্ষত্রের আবর্তন থেকে শুরু করে চিন্তা, বিশ্বাস ও প্রাণশক্তির গতিধারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

তার সমগ্র শক্তির মাঝে—দৈহিক ক্ষুধা ও আত্মার দুরন্ত পিপাসা —উভয়ের মাঝে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সমস্ত জীবন্ত সত্তা, সমস্ত জাতি সত্তা ও সমগ্র বংশ বা অধঃস্তন পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ একত্ব বিদ্যমান। শুরু ও শেষ, উর্ধ্ব ও অধঃ এবং ইহকাল ও পরকালের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য।



www.pathagar.com

বস্তুত ইসলাম উদ্ভাবিত এই মহান ও বিরাট একত্বের বাস্তবতার দরুনই এই বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবস্থিত শাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। এ সম্পর্কের ধরনটা ঠিক শাখার সাথে মূল কাণ্ডের, অংশের সাথে সমষ্টির অথবা কার্যের সাথে কারণের সম্পর্কের ন্যায়। আর এই সম্পর্কটা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তির প্রকৃতি এবং তা কিভাবে ইসলামে সমর্থিত ও শক্তিপ্রাপ্ত তা উদ্ঘাটনকালেই আমরা এই উপলব্ধি লাভ করেছি। বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার সম্পর্ক-সংহতি ও আনুকূল্য পর্যায়ে মৌলিক গবেষণা চালালেই এই সম্পর্কের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গোটা বিশ্বলোক যে অবিভাজ্য, অভিন্ন ও একক সংস্থা, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বস্তুত শান্তি এক চিরন্তন ব্যবস্থা। যুদ্ধ একটা ব্যতিক্রম মাত্র। বিদ্রোহ ও অত্যাচারের সাহায্যেই এই সংহতিটি ভংগ করা হয়। বিপর্যয়, অশান্তি ইত্যাদি তখন মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ইসলাম শুরু থেকেই যুদ্ধ সৃষ্টির কারণসমূহের মূলোৎপাটনেরই পক্ষপাতী। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ইত্যাদি বহু প্রকারের যুদ্ধকে অসম্ভব করে তোলার জন্যও ইসলামের চেষ্টা নিবদ্ধ।

## হিংসা, বিদ্বেষ, গোত্রবাদও স্বীকৃত নয়

হিংসা-বিদ্বেষ ও গোত্রবাদের দরুণ সাধারণত যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকে, ইসলামে তার কোন অবকাশই নেই। কেননা ইসলাম মৌলিকভাবেই ঘোষণা করেছে যে, সমগ্র মানবতা একই মৌল থেকে উৎসারিত। একটিমাত্র সত্তা থেকেই সমস্ত মানুষ উদ্ভূত। অবশ্য পরবর্তীকালে পরিচিতির প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন গোত্র ও জাতি-প্রজাতিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ط إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٥

www.pathagar.com

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদের রূপায়িত করেছি বিভিন্ন জাতি-প্রজাতিতে ও নানা গোত্রে—যেন তোমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পার। আর নিশ্চিত জেনো যে, তোমাদের মধ্যকার অধিক আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানার্হ। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

—সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

ক্রুশধারী ও অ-ক্রুশধারীরা যে পুঁতিগন্ধময় সংকীর্ণ ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করে নানা যুদ্ধের কারণ ঘটিয়েছে, ইসলামে তারও কোন স্থান নেই। অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের প্রতি ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে যে সব যুদ্ধ হয়ে থাকে. ইসলামে সেই পর্যায়েরও কোন যুদ্ধের আদৌ কোন সমর্থন নেই।

ইসলাম ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্‌র দীন অভিন্ন। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত। তারা সকলেই একই ইসলামের অনুসারী এই অর্থে যে, এইসব ধর্মেই আল্লাহ্‌র প্রতি কোন না-কোনভাবে বিশ্বাস রয়েছে এবং যে কোনরূপেই হোক না-কেন. আল্লাহ্‌র আরাধনা-উপাসনা ও তাঁর নিকট সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পনের ভাবধারা বিদ্যমান। আর এই কারণেই ইসলাম ঘোষণা করেছে ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ‘ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।’

জোর করে বা কোনরূপ বল প্রয়োগে বাধ্য করে কাউকেই ধর্মান্তরিত করা হবে না,—করা যেতে পারে না। ইসলামের নবীকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাঁর দীনী দাওয়াতী কাজ উপদেশ দান, আহ্বান-আমন্ত্রণ, ও সন্দেহ-সংশয় অপনোদন পর্যন্তই যেন সীমিত রাখেন এবং অপরাপর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কোনরূপ অশোভন কটাক্ষ না করেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۔

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

www.pathagar.com

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ - وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝

কিতাবধারী ও উম্মী (অক্ষর-জ্ঞান বর্জিত) লোকদের বলুন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে? —তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তা'হলে তারা হিদায়েত পেয়ে গেল। আর যদি তারা অগ্রাহ্য ও পশ্চাদপসরণ করে, তা হলে আপনার কিছুই করার নেই। আপনার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ই সব বান্দাদের উপর দৃষ্টিমান।

—সূরা আলে ইমরান : ২০

লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্কে অস্বীকার না করবে এবং আল্লাহ্ যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হালাল মনে করতে শুরু না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিই কার্যকর থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করতে শুরু করে তা হলে আল্লাহ্র বিধান সুস্পষ্ট :

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

আহ্লি কিতাব লোকদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মানে না এবং সত্য দীনকেও দীন হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক—যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের হাতেই জিযিয়া দিতে প্রস্তুত না হবে।

—সূরা তওবা : ২৯

www.pathagar.com

লোভ ও স্বার্থপরতাই যুদ্ধের মূলীভূত কারণ। সাম্রাজ্যবাদ ও বিপুল মুনাফা অর্জন তা থেকেই উৎসারিত। কাঁচামাল ও পণ্যের বাজার কোথায় পাওয়া যায়, তারই সন্ধানপ্রিয়তা তার প্রেরণা জোগায়। এভাবেই দুনিয়ায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে। লক্ষ-কোটি মানুষ মানুষের নিকৃষ্ট দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হয়। কিন্তু উপরে কুরআন মজীদের আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে, তদ্দরুণ এই পর্যায়ের যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত ইসলাম গোটা মানবতাকে এক অবিভাজ্য একক (Unit) গণ্য করে। মানুষের জীবনকে নিকট বংশ-সম্পর্কসম্পন্ন ও নিকটাত্মীয় বলে ঘোষণা করেছে। আর নিকটাত্মীয়তাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে যে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম সকল শ্রেণীর মানুষের পরস্পরের ক্ষেত্রে পরম একাত্মতা-বোধ জাগিয়ে দিতে চায়। সৃষ্টি করতে চায় সকল মানুষের মধ্যে ঐকান্তিক বন্ধুত্ব, ভালবাসা, যাবতীয় নেক ও আল্লাহ্-ভীরুতার কাজে গভীর সহযোগিতা এবং অন্যায় ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে তীব্র শাণিত অসহযোগিতা। অপহরণ, ছিনতাই ও ডাকাতি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমস্ত মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার কার্যকর করাই ইসলামের লক্ষ্য। জাতি, বর্ণ, বংশ, ধর্ম প্রভৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে জনগণের অধিকার আদায়ে, মানবিক মর্যাদাদানে এবং সুবিচারের দিকদিয়ে কোন-রূপ পার্থক্যপূর্ণ আচরণ করা হয় না। মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বীর-সাহসী ও রাজা-বাদশাহদের মিথ্যা মান-মর্যাদা রক্ষার নামে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, ইসলামে সে সব যুদ্ধেরও একবিন্দু অবকাশ নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধ ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব।

একব্যক্তি রসূলে করীম (স.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল :

ইয়া রসূল! একব্যক্তি যুদ্ধ করে গনীমতের মাল পাওয়ার জন্য, আর একব্যক্তি যুদ্ধ করে একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে, অপর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে লোকদের দেখানোর জন্য। -- এদের মধ্যে কার যুদ্ধ আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধরূপে গণ্য হবে?

জওয়াবে রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করলেন :

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কালেমা দীন-ইসলাম বিজয়ী হবে এই লক্ষ্যে, শুধু তার যুদ্ধই আল্লাহ্‌র পথের যুদ্ধরূপে গণ্য হবে।

**ইসলাম ও শান্তি**

লক্ষ্যণীয়, ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতিই হচ্ছে শান্তি। মুসলমানরা তাদের নবীর উত্তরাধিকারী, তাঁর নুবুওয়াতের ও রিসালাতের স্থলাভিষিক্ত, তার সংরক্ষক। মুসলিম উম্মত এই রিসালাতের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব পালিত হ'ল কিনা, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহি করতে সে বাধ্য। রসূলের ইন্তিকালের পর তাঁর রিসালাতের দাওয়াত সমস্ত মানবকুলের নিকট যথাযথ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত। তাদের যিন্দেগীর মিশনই এটাই। দুনিয়ার অপরাপর জাতি ও জনসমষ্টিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ তাদেরই করতে হবে। আর রসূলের জীবদ্দশায় এবং তার পরেও ইসলামের দাওয়াত খুবই শান্তিপূর্ণভাবে পৌঁছানোই হ'ল স্থায়ী নিয়ম। তাতে কোনরূপ রূঢ়তা ও কঠোরতা গ্রহণের একবিন্দু অবকাশ নেই, নেই কোন জোর-জবরদস্তির সুযোগ। কেননা ইসলাম তো অতীব সহজবোধ্য দীন। কোন দুর্বোধ্যতা নেই এতে। আর স্বভাবসম্মত নীতি ও আদর্শ সুস্থ বিবেকের নিকট সহজভাবেই গ্রহণীয় হয়ে থাকে খুবই স্বাভাবিকভাবে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ -

আমরা কুরআনকে সহজ স্মরণীয় করে বানিয়েছি। তা স্মরণে রাখার কেউ আছে কি? —সূরা কামার ঃ ১৭

বস্তুত এ ধরনের দাওয়াতের প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান আনার প্রয়োজন রয়েছে, যেন সে ঈমানের দরুন দিল পরম স্থৈর্য ও পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অন্তরের এই একনিষ্ঠতা ও পরম প্রশান্তি ব্যতীত ঈমান লাভ অসম্ভব ব্যাপার। সকল প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলকথাই তাই। ঈমান গ্রহণের জন্য অন্তরের উন্মুক্ততা অপরিহার্য। অবশ্য তা যুক্তি ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। অতএব ইসলামী

www.pathagar.com

দাওয়াতকেও সেই স্বভাবসিদ্ধ পন্থায় মানুষের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করতে হবে। আর হৃদয়ে স্থান গ্রহণের এই স্বভাবসিদ্ধ পন্থাই হচ্ছে শান্তির পথ—শান্তিপূর্ণ পন্থা এবং যুক্তি ও প্রমাণের পদ্ধতি; তা কোনদিনই যুদ্ধ—জোর-জবরদস্তি ও রূঢ়তা-নিষ্ঠুরতার পন্থা হতে পারে না।

ইসলামী দাওয়াতের সম্মুখে মানুষের বহু প্রকার রয়েছে। তাদের মধ্যে যেমন আলিম থাকে, তেমনি থাকে যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোকও।

অতএব তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পন্থা অবশ্যই ইলম-পূর্ণ, যুক্তিভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হতে হবে। সাধারণ জন-মানুষকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। তারা উদ্বুদ্ধ হয় উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে। দৃষ্টান্তমূলক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বৃত্তান্তও তাদের অনেক পসন্দ, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য আত্ম-অহংকারী ঝগড়াটে লোকও যে বহু আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকদের প্রতি তারা হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা ইসলামী দাওয়াত ও দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি উভয়কে খুব ভালোভাবেই জানে ও চেনে। তা সত্ত্বেও তারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, অকারণ তর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত হতেও কুণ্ঠিত হয় না। সত্য দীনের দাওয়াতকে প্রতিরোধ করাই হয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই শ্রেণীর লোকদের দীনের দাওয়াত দিতে হবে উত্তমমানের বিতর্ক, পেঁচানো-পাকানো কথা এবং কৌশলপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আল্লাহ্ তায়ালা রসূলে করীম (স.)-কে ইসলামী দাওয়াত দানের এই বিবিধ পন্থাই নির্দেশ করেছেন। বলেছেনঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

তোমার আল্লাহর পথের দিকে লোকদের দাওয়াত দাও উচ্চমানের যুক্তি, বুদ্ধিমত্তা (ও মর্মস্পর্শী সদুপদেশ) সহকারে এবং তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হও অতীব উত্তম পন্থায়। —সূরা নাহল : ১২৫

www.pathagar.com

বস্তুত প্রদর্শিত এইসব পন্থাই শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময়। এই পন্থা-সমূহের প্রত্যেকটিই অতীব হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী এবং বিবেকসম্মত। মানুষ এভাবেই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে ইসলামী দাওয়াতে। চিত্তে সন্তুষ্টির সৃষ্টি করা এ পথেই সম্ভব। এ সব উপায়ে মানব মনে যে ঈমানের সঞ্চার হয়, তা-ই হতে পারে স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তরবারি বা শক্তি প্রয়োগ মানব হৃদয়ে কোন দীনকেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে আসীন ও আরূঢ় করে না; তাতে সত্যিকার বিশ্বাস গড়ে উঠে না। তরবারি দেহকে পরাভূত করলেও অন্তরকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। হৃদয়ে প্রত্যয় দানা বেঁধে ওঠে আশ্বস্তি ও সন্তুষ্টির কারণে; জোর-জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়। এই কারণে সুস্থ সঠিক দীন কখনই শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় পন্থা পরিহার করে জোর-জবরদস্তির পথ অবলম্বন করে না। তাই আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

দীন প্রচারে কোন জোর-জবরদস্তি গ্রহণ করা যেতে পারে না। কেননা প্রকৃত সত্য-সঠিক পথ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে ---- —সূরা বাকারা: ২৫৬

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ -

যার ইচ্ছা ঈমান গ্রহণ করবে, আর যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করবে। —সূরা কাহাফ: ২৯

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ -

তুমি কি লোকদের উপর জোর-জবরদস্তি করবে এজন্য, যেন তারা ঈমানদার হয় ---? —সূরা ইউনুস: ৯৯

যেসব আদর্শিক দাওয়াত জোর-জবরদস্তির পন্থা গ্রহণ করেছে, তার ক্ষণভংগুরতা অভিজ্ঞতার আলোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। যে-দীন গ্রহণের জন্য জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে,

www.pathagar.com

তার পবিত্রতায় লোকদের মন কখনই সায় দেয়নি, তার প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধাবোধ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। বরঞ্চ মানব মন তাতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অতি স্বাভাবিকভাবে। কেননা শক্তি প্রয়োগই প্রমাণ করে যে, তা প্রকৃত ও যথার্থ নয়, তা অন্তঃসারশূন্য। আসলে যাতে সারবস্তু কিছু নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়। যারা মনে করে ইসলাম শক্তির বলে প্রচারিত হয়েছে, তারা ভিত্তিহীন অযৌক্তিক কথাকেই ইসলামের প্রতি আরোপ করে। তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। অমুসলিম জনগণের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে গড়ে ওঠে ইসলামের এই ঐকান্তিক যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী দাওয়াত পদ্ধতির মাধ্যমে। অবশ্য বস্তুগত অনেক জিনিসই এই পর্যায়ে অবলম্বিত হতে পারে। তা হচ্ছে উচ্চমানের গ্রন্থাবলী, চিঠি-পত্র, পত্রিকা ও প্রেরিত প্রতিনিধি। ফলে কখনও এ দাওয়াত গৃহীত হয়, কখনও তা হয় প্রত্যাখ্যাত। প্রেরিত পত্র অনেক ক্ষেত্রে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রেরিত প্রতিনিধি অনেক সময় হয়েছে উপেক্ষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। বহু স্থানে তাদের হত্যাও করা হয়েছে। আর এই ধরনের প্রতিটি অবস্থার জন্য উপযুক্ত কার্যক্রমও নির্দেশিত হয়েছে।

**নিরাপত্তা দান ও প্রতিরোধ**

আমরা দেখেছি, ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের, মত গ্রহণের, ধর্ম অবলম্বন ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক দেশের মানুষের এটা একটা অতীব স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার সর্বাবস্থায়ই স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোন সময়ই কোন মানুষের এই অধিকার হরণ করার কিংবা মুলতবী করার অধিকার কারুরই নেই—থাকতে পারে না। মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই এই অধিকার একান্তই নির্বিশেষ। ইসলাম অন্য লোকদের জন্য যখন এই অধিকার অবশ্যই পূরণীয় করেছে, তখন তা নিজেকে এবং নিজের অনুসারী লোকদের এই অধিকার থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করে না—করতে পারে না। ফলে অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার এই অধিকার অবশ্যই স্বীকৃতব্য হবে। কেননা এ দাওয়াত সত্য পথের সন্ধান দান। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পথে ও নিয়মেই তা সমাধা করা হবে অতীব স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু সেই মুসলমানকেই যদি

www.pathagar.com

তার এই স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়—আল্লাহ্‌র দেয়া এই আযাদী হরণ করে নেয়া হয়, তা হলে তখন মুসলমান কি করবে? —তখন কি মুসলমান মাথানত করে দেবে—দুর্বল ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে তার শত্রুদের সম্মুখে? কিংবা তার আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ও স্বভাবসম্মত এই অধিকার বহাল রাখার, যথাযথ ভোগ করার এবং শত্রুদের এই অমানবিক আচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টায় অবিচল হয়ে দাঁড়াবে? ----না, মাথানত করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। কেননা ইসলাম মুসলমানদের দৃঢ়তার সাথে শক্তিশালী ও দুর্জয়-সর্বজয়ী হয়ে দাঁড়াতে বলেছে। কেননা শক্তি ও মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং মু'মিন-মুসলমানের জন্যই শোভনীয়। লাঞ্ছনা, পরাজয় ও হীনতা-দীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা কোন অবস্থাতেই উচিত হতে পারে না। কেননা যে মুসলিম এই পরাজয় কবুল করে নেয়, তার দিলে আল্লাহ্‌র প্রতি একবিন্দু ঈমান আছে বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। ইসলামী দাওয়াত প্রচারের যে অধিকার প্রতিটি মুসলিমের রয়েছে, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে রাযী হওয়া নিজেকে লাঞ্ছিত, অবমানিত করতে প্রস্তুত থাকারই নামান্তর। আর মু'মিন কি করে নিজেকে লাঞ্ছিত-অবমানিত করতে প্রস্তুত হতে পারে?

অতএব ইসলামী দাওয়াতের পথ সব সময়ই সর্বপ্রকারের বাঁধা-প্রতিবন্ধকতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য-সমর্থন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা একান্তই আবশ্যক।

রসূলে করীম (স.) দীর্ঘ দিন মক্কায় অবস্থান করে আল্লাহ্‌র তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন সুষ্ঠু বুদ্ধিমত্তা ও মহৎ উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে। বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনি অকাট্য যুক্তির সাহায্যে বিতর্ক চালিয়েছেন অতীব উত্তম পন্থায়। এই সময় স্বয়ং রসূল ও মুসলমানগণ মক্কার অধিবাসীদের নিকট থেকে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করেছেন। তখন মুসলমানগণ রসূলে করীম (স.)-এর নিকট তরবারির সাহায্যে কাফির-মুশরিকদের নির্মম অত্যাচার-যুলুমের প্রতিরোধ করার জন্য বার বার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স.) প্রতিবারই জওয়াবে বলতেন: অস্ত্রপ্রয়োগে যুদ্ধ করার অনুমতি এখন পর্যন্ত আমাকে দেয়া হয়নি।[১]

---

১. فقه السيرة لعبد رمضان البوطي ص ١٤٢

www.pathagar.com

এর যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন, ইসলামী দাওয়াত ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। এই পর্যায়ে যে শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থা ও উপায়-উপকরণ আয়ত্বাধীন ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি এবং তার সব কয়টি তখন পর্যন্ত প্রয়োগও করা হয়নি। অথচ তাও আল্লাহ্রই দেয়া সুযোগ ও উপায়-উপকরণ। তা অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া বান্ছনীয়। যেন সে সবের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের উপর ইসলামের বক্তব্যকে অকাট্য করে তোলা যায়, অমান্যকারীদের ঈমান গ্রহণ না করার কোন বাহানা অবশিষ্ট না থাকে।

এই কর্মনীতি অনুসরণের ফলেই মক্কীজীবনে রক্তপাতকারী যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। যদিও কাফিরদের দিক থেকে মুসলমানদের রক্ত-পাত ঘটাতে কখনই ত্রুটি করা হয়নি। কেননা তখনো এই আশা নিঃশেষ হয়ে যায়নি যে, মক্কার লোকেরা তাওহীদী ঈমান গ্রহণের দাওয়াতের প্রতি আজ হোক, কাল হোক সাড়া দেবে।

কিন্তু সেই আশাও একদিন চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। মক্কার কাফিররা রসূলে করীম (স.)-কে দৈহিকভাবে চিরতরে শেষ করে দেয়ার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মুহূর্তেও কিন্তু কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গ্রহণের কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই—সম্ভবত এই কারণে যে, পানির গভীরে অবস্থানকালে কুমীরের সাথে লড়াই করা চলে না। এইজন্যই তখন প্রতিরোধ গ্রহণের পরিবর্তে মক্কাত্যাগ করে চলে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে এই মুহূর্তে হিজরত করারই নির্দেশ এসে যায়।

রসূলে করীম (স.) এবং সাহাবিগণ হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হন। কিন্তু মক্কার কাফিররা সেখানেও তাঁদের শান্তিতে বসবাস করতে দিতে রাজী ছিল না। তারা যেমন হিজরতকালে তাঁর পিছনে ধাওয়া করতেও দ্বিধা করেনি এবং মদীনার সদ্যগঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়ার পরিকল্পনা আঁটিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এরূপ অবস্থায় দীনী দাওয়াতের সাহায্যে কাফিরদের ইসলামের দিকে নিয়ে আসার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকল না; বরং লাঠির জওয়াব তরবারির সাহায্যে দেয়ার চরম মুহূর্ত সমুপস্থিত হয়ে যায়। এই কারণেই কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি সম্মুখে এসে যায়ঃ

www.pathagar.com

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ -

যারা নির্যাতিত হয়েছে বলে যুদ্ধ করছে, তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ যে তাদের সাহায্য দানে সক্ষম, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সূরা হজ্জ ঃ ৩৯

এ আয়াতে এ কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা বাস্তবিকই নির্যাতিত ও অন্যায়ভাবে নিজেদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁদের উপর অকারণ অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মযলুম লোকদের ফরিয়াদ জানাবার, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অধিকার এক বিশ্বজনীন স্বীকৃত মৌলিক অধিকার বিশেষ। সেজন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকারও তাদের রয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই ইসলাম সশস্ত্র যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ পদক্ষেপ ও ন্যায়সংগত কার্যক্রম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ যুদ্ধের লক্ষ্য যুলুম ও অত্যাচার প্রতিরোধ করা, শত্রুর শত্রুতামূলক কার্যক্রম বন্ধ করা, জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং জনগণের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ ও দীন পালনের আযাদীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। দীনী দাওয়াত এবং দাওয়াতকারীদের রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ

وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ

www.pathagar.com

الْقَتْلِ ج وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ
يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ○ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط كَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط
فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○ الشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ
اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ -
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু সীমালংঘন করো না। কেননা সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্‌ ভালোবাসেন না। আর হত্যা কর তাদের, যেখানেই তাদের পাও। তাদের বহিষ্কৃত কর যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে। ফিতনা, অরাজকতা হত্যাকাণ্ডের তুলনায় অনেক কষ্টদায়ক। আর তোমরা মসজিদে হারামের নিকটে যুদ্ধ করো না, যদি না তারা তোমাদের সাথে তথায় যুদ্ধ করে। তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তোমরাও কর—কাফিরদের শাস্তি এমনিভাবেই দিতে হয়। আর তারা বিরত হলে কিন্তু সীমালংঘন করা যাবে না; তবে যালিমদের ব্যাপার ভিন্নতর। যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাস যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাসের বিনিময়। সমস্ত মর্যাদাসমূহ সমানভাবে রক্ষণীয়। কাজেই

www.pathagar.com

যারাই তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করবে, তোমরাও তাদের উপর অতটা সীমালংঘন করবে, যতটা তারা করেছে। তবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে। জানবে, আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে তিনি তাদেরই সংগে রয়েছেন। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০-৯৪

লক্ষ্যণীয়, এই দীর্ঘ উদ্ধৃত আয়াতসমূহে সীমালংঘনমূলক যুদ্ধ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছে। কেননা তাতে সমগ্র মানব জীবনে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় অতি স্বাভাবিকভাবে। জনগণকে শোষণ করার অপরাধ প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাদের স্বভাবসম্মত অধিকার হরণ করা হয় এবং স্বাধীনতাকে কোণঠাঁসা করা হয়। সাধারণ মানুষ সীমালংঘনকারী-দের দাসানুদাস হয়ে পড়ে। এক কথায় এই ধরনের যুদ্ধের পরিণতি একালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পারিণতির মতই হয়ে দাঁড়ায়। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে সীমালংঘনকে হারাম করা হয়েছে, সেইসাথে সীমা লংঘন-কারীদের ভয় দেখানো হয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির।

হিজরতের পর অষ্টম বছরে রসূলে করীম (স.) কিস্‌রা, কাইসার, নাজ্জাশী, মিসরাধিপতি মুকাউকাস এবং আরবের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহের শাসক-প্রশাসকদের নিকট চিঠি ও চিঠি বহনকারী প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই চিঠিসমূহের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পারস্য সম্রাট চিঠি টুকরা-টুকরা করে ফেলে এবং প্রতিনিধিকে অপমান ও বন্দী করে। পরে তাকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত ইয়েমেনে নিযুক্ত গবর্নরের নিকট ফরমানসহ পাঠায় ; সে জানে না—এমন এক দীনের প্রতি দাওয়াত দানের দুঃসাহসকারী এই আরবকে তার দরবারে হাযির করার জন্য। এমনিভাবে নাজ্জাশী ও মুকাউকাস ব্যতীত অন্যান্যরা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে এবং কেউ চিঠি বহন-কারীকে নির্মমভাবে শাস্তি দেয়, কেউবা তাকে হত্যা করে। এক কথায় রসূলে করীম (স.) প্রেরিত চিঠি ও প্রতিনিধিকে এক বিরল পদ্ধতিতে মুকাবিলা করা হয়, ভদ্র ও সৌজন্যমণ্ডিত সমাজে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুনরায় তাদের নিকট আল্লাহ্‌র দীন কবুলের দাওয়াত দেয়া কিংবা এই অপমান ধুয়েমুছে ফেলার ব্যবস্থা করার পূর্বেই রসূলে করীম (স.) ইহজগত ত্যাগ করে চলে যান। ফলে তাঁর খলীফাগণের উপরই এই পর্যায়ে দায়িত্ব অর্পিত হয় অতি স্বাভাবিকভাবে এবং সে দায়িত্ব তাঁরা যথার্থ ও যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁরা পারস্য, রোম এবং প্রতি-বেশী জাতি-গোষ্ঠীসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এই যোগা-

www.pathagar.com

যোগে তাঁরা রসূলে করীম (স.)-এর নীতি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ পন্থারই অনুসরণ করেন। পরে অবশ্য রসূলের জীবদ্দশায় ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সামরিক কর্মপন্থাও অবলম্বিত হয়। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এই পর্যায়ের বিবরণ উপস্থাপিত করছি।

### তাঁরা যথার্থভাবে কল্যাণের সন্ধান করেছেন

দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে দীন-ইসলামকে পুরাপুরিভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব মুসলমানদের উপরই প্রবর্তিত। কেননা দীন-ইসলাম তো নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য পূর্ণাংগ দীন হিসেবেই নাযিল হয়েছে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি।

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

যারা দীন-ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা যথার্থই হিদায়তের পন্থার অবলম্বনের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। —সূরা জিন্ন ঃ ১৪

এরূপ অবস্থায় পূর্বের মুসলমান ও এই নতুন মুসলমানের অধিকার ও মর্যাদা যেমন সমান, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও ঠিক অনুরূপভাবে অভিন্ন এবং ব্যতিক্রমহীন। অতঃপর তারা অন্যদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করবে। তখন অমুসলিমরা যদি সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করে কিংবা আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত প্রচারের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তা হলে অনিবার্যরূপে ও স্বাভাবিকভাবেই এই সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা মুসলমানদেরই কর্তব্য হবে। কেননা ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক, মানবিক ও স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। এই দাওয়াত পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে এবং তা যে নিতান্তই অমানবিক, তা বলাই বাহুল্য। মুসলমানরা দুনিয়ায় সত্য ও ইনসাফের ধারক ও বাহক। তাদেরই দায়িত্ব এই অধিকার হরণের অপকর্ম থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বাহিনী ও শক্তির দাপট চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া। এই দায়িত্ব পালনের অভিযানে তারা বিজয়ী হলে পরে যদি সেই মানুষেরাই ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের আগে-থেকে রাখা বিশ্বাসের উপর অবিচল হয়ে থাকতেই দৃঢ়

www.pathagar.com

প্রতিভূ হয়, তা হলে তার অধিকারও তাদের রয়েছে। নিশ্চয়ই তাদের দীন-ইসলাম গ্রহণে জোরপূর্বক বাধ্য করা হবে না। তবে একটি শর্ত নিঃসন্দেহে যুক্তিসংগত। তা'হচ্ছে, ধর্ম হিসেবে তারা ইসলামকে গ্রহণ না করলেও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য তাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, দেশী আইন (Law of the Land) হিসেবে ইসলামী বিধান মেনে চলতে তাদের বাধ্য থাকতে হবে। অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করলে ও দেশী আইন হিসেবে ইসলামের আইন-বিধান মেনে চলতে রাযী হলে তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত চুক্তি সংঘটিত হবে। প্রথমত তারা রাষ্ট্রকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু এবং তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে। এই কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

তোমরা যুদ্ধ কর আহলি কিতাবের সেইসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে তারা হারাম মানে না এবং সত্য দীনকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে অবলম্বন ও অনুসরণ করে না—যতক্ষণ না তারা নিজেরা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে শুরু করবে (ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলবে)। —সূরা তওবা ঃ ২৯

মুসলমান যখন অন্যদের ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাবেন, তখন তারা যদি সে দাওয়াত অনুযায়ী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু না তারা বিদ্রোহ করে, না আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ

www.pathagar.com

করে, মুসলমান জনগণকে তাদের দীন থেকে বিমুখ ও বিরত রাখার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত না হয় এবং মুসলমানদের শত্রুদেরও উস্কানী না দেয়; তা'হলে তারা কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হওয়ার অধিকারী বিবেচিত হবে। মুসলমান জনগণের সাথে তাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ বা শত্রুতার কারণ ঘটবে না, ঘটাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হবে, রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতি সাধনে লিপ্ত বা সচেষ্ট তারা হবে না।

এই পর্যায়েই আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا

اليهم ط ان الله يحب المقسطين ٥

যে সব লোক তোমাদের সাথে দীনের বিষয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের প্রতি তোমরা সদাচরণ গ্রহণ করবে ও তাদের প্রতি সুবিচার করবে— এ থেকে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করছেন না। কেননা আল্লাহ্ তো সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। —সূরা মুমতাহানা : ৮

বস্তুত ইসলামের দাওয়াত ও দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এক চিরন্তন কর্তব্য ও দায়িত্ব। তা কোনদিনই পরিত্যাক্ত হতে পারে না। মুসলমানদেরই কঠিন ও কঠোর দায়িত্ব হচ্ছে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায়ই এই দায়িত্ব পালনে তৎপর ও সক্রিয় থাকা এবং কোন এক মুহূর্তেও তার প্রতি বিন্দুমাত্র উপেক্ষা বা অনীহা প্রদর্শন না করা। এই কারণে আল্লাহ্ তায়ালা এ উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকার এবং মুসলমান ও ইসলামের উপর সর্ব প্রকারের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক ও সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে, মুসলমানরা যেন আল-কুরআন অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দীনের



www.pathagar.com

পথ প্রদর্শক, আহ্বানকারী এবং সারা জীবন ধরে আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ হয়ে থাকেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ -

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য প্রাণপণ শক্তিতে ও যথোপযুক্তভাবে জিহাদ কর। তিনি তো তোমাদেরকে (এ জন্যই) বাছাই ও মনোনীত করে নিয়েছেন। —সূরা হজ্জ ঃ ৭৮

মুসলমানকে তো সর্বক্ষণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের সম্মুখে লক্ষ্য থাকবে বিশ্ব মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই হবে তাদের যাবতীয় তৎপরতার একমাত্র প্রেরণা। এ লক্ষ্যে তাদের বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিকভাবে-পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সেই নির্দেশই দিয়েছেন মহান আল্লাহ্ ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এবং শত্রুদের সহিত লড়াইয়ের লক্ষ্যে তোমরা সকলে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব (ইত্যাদি) যানবাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর, তার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।

—সূরা আনফাল ঃ ৬০

স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের জিহাদের আহ্বান জানিয়েছেন। স্থায়ীভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা শত্রুর আগ্রাসন, আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে তাদের ঘায়েল করতে পারে। তাদের স্বাধীনতা নস্যাৎ বা হরণ করতে পারে। পারে তাদের আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধাগ্রস্থ করতে। কিন্তু তারা যদি এই ধরনের কোন কাজই না করে, তা'হলে তারা কখনই তরবারি কোষমুক্ত দেখতে পাবে না। কোন সেনাবাহিনীও তাদের উপর আক্রমণ চালাবে না।

কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের চাবুক তীব্র ও অমোঘ। এই শ্রেণীর লোকেরা বহুবারই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সীমালংঘন করে মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

কঠিন ও ব্যাপক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতেও কসুর করেনি। বারে বারে এ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের দাঁতকে খাট্টা করে দিয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ, সতর্ক ও শক্তিশালী হয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা যে কোন মুহূর্তেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, জিহাদের শাশ্বত দাওয়াত দান, স্থায়ী যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং আজকের দিনের পাশ্চাত্য শক্তিধরদের সশস্ত্র শান্তি অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অস্ত্র ধারণের আকাশফাটা শ্লোগান—এই দুইটির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? - - - পার্থক্য কিছু থেকে থাকলে তা হচ্ছে, ইসলামের সশস্ত্র শান্তি দুর্বলের উপর কোনরূপ আঘাত হানার প্রশ্রয় দেয় না। আর শক্তিমানদের বিরুদ্ধে সীমালংঘনমূলক কোন কার্যক্রম পূর্বাহ্নে ও আগে-ভাগে গ্রহণ করে না। বিশ্বাসঘাতকতা বা ধোঁকা-প্রতারণার কোন অবকাশ এখানে নেই। আর আধুনিককালের সশস্ত্র শান্তি বা শান্তির জন্য অস্ত্র ধারণ মূলতই সীমালংঘনমূলক আগ্রাসন। তার প্রকৃতি অপ্রতিরোধ্য। বিশ্বাসঘাতকতাই তার প্রধান চরিত্র এবং এইসব কিছুই করা হয় প্রধানত দুর্বল-অক্ষম-দরিদ্র জাতিরসমূহের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিমানরাও তা থেকে রেহাই পায় না।

### প্রতিশ্রুতি ও উপদেশ

ইসলাম আল্লাহ্ তায়ালার দীন। মুহম্মদ মুস্তফা (স.) আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশেষ রসূল। তা সমস্ত মানবতার জন্য, মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য অবতীর্ণ।

দীন-ইসলামের বাস্তবায়ন ও পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠা শক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সে শক্তি ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা ইচ্ছা কিংবা জনমতের বিরুদ্ধে আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়, ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই তা বাস্তবায়িত করতে হবে, এটাই তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ।

মানুষ তো সকল অবস্থায় এবং সকল পর্যায়েই মানুষ। জীবনের কঠিন ও দূরধিগম্যপথে চলাকালে তাদের জন্য একজন শক্তিমান চালকের অপরিহার্য প্রয়োজন। যে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করবে, সম্মুখের দিকে এগিয়েও নিয়ে যাবে যেন নৈতিকভাবে তাদের কোন পদস্খলন না ঘটে এবং দৈহিক

www.pathagar.com

বা বৈষয়িক দিক দিয়েও তারা কোন বিপদের মধ্যে পড়ে না যায় সেদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত দৃষ্টি রাখবে।

আর সেজন্য অপরিহার্য হচ্ছে শক্তি। শক্তি না হলে বিপথগামী লোকদের সত্য পথে নিয়ে আসবে কি করে? অসত্যের আক্রমণ বা বিভ্রান্তি দূর করবে কিসের সাহায্যে?

অতএব এজন্যে শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য। এই শক্তির দৌলতেই সত্যপথবিমুখ ও দুষ্কৃতির অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আল্লাহ্দ্রোহী লোকদের আল্লাহ্দ্রোহিতার মস্তক চূর্ণ করেই নিরাপদে বসবাস-কারীদের নিরাপত্তা সংরক্ষিত করা সম্ভবপর। এই শক্তির দ্বারাই আল্লাহ্র কালেমাকে—দীন-ইসলামকে সকল প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

এই অজেয় স্বাধীনতা যখন বাস্তবিকই বাস্তবায়িত হবে, তখন কোন শক্তি দ্বারাই মানুষকে আল্লাহ্র দীন থেকে বিরত রাখা এবং তাদের পসন্দনীয় দীন পালনের ব্যাপারে তাদেরকে কোনরূপ বিপদে ফেলা কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না।

এইরূপ স্বাধীনতার দেশে নিরংকুশ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হবে। তখন কেউই অন্য কারুর উপর আক্রমণ করতে বা কারুর স্বার্থ হরণ করতে পারবে না। কেউ পারবে না অন্য কাউকে লাঞ্ছিত করতে, নিজের দাস বানিয়ে নিতে, অত্যাচার-নিপীড়নে জর্জরিত করতে।

এভাবে সমাজের অসহায়, দুর্বল ও শক্তিহীন জনগোষ্ঠী যখন প্রকৃত-পক্ষেই নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হবে, দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি বন্ধ হবে, তখন ইসলামী জীবন বিধান পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারবে। তখন রাষ্ট্রদ্রোহী ও দুষ্কৃতকারীরাও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

www.pathagar.com

আর ওরা যদি আত্মসমর্পনের জন্য বাহু বিছিয়ে দেয়, তা হলে তুমিও তার জন্য নম্রতা গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। —সূরা আনফাল ঃ ৬১

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ

فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

অতঃপর তারা যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় ও তোমাদের পরিহার করে, তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় এবং তোমাদের প্রতি শান্তি ও সন্ধির হস্ত প্রসারিত করে, তা'হলে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য তাদের উপর আক্রমণ করার কোন পথ উন্মুক্ত রাখেন নি। —সূরা নিসা ঃ ৯৫

## দীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই

কুরআন মজীদ দীন প্রচার ও দীন গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ; কিন্তু দীন কবুল করাবার জন্য কোন-রূপ জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই দীন-ইসলাম দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতি দ্রুতগতিতে প্রচার ও বিস্তার লাভ করেছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

ইসলামের ব্যাপারে কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত নীতি থাকা ও তদানুযায়ী কাজ হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ (Orientalists) ও ইসলামের শত্রুরা মিথ্যামিথ্যি এই দুর্ণাম রটিয়েছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু এই কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও একেবারেই ভিত্তিহীন, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই।

বস্তুত ইসলাম আদৌ তরবারির জোরে প্রচারিত হয়নি, প্রসার লাভ করেনি। ইসলাম এক অকাট্য সত্যভিত্তিক জীবন-বিধান। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে একমাত্র সক্ষম 'দীন' হচ্ছে ইসলাম। তার প্রচার ও প্রসার, তার অকাট্য যৌক্তিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণশীলতা

www.pathagar.com

এবং বাস্তব সাফল্যের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ইসলাম প্রচারে কখনই কোন শক্তি বা চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। মানুষকে ঠেকায় ফেলে বা প্রাণের ভয় দেখিয়ে ইসলাম কবুল করতে বলা হয়নি কোন একটি মুহূর্তেও এবং কোন একটি ক্ষেত্রেও। ইসলাম তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত বিশেষত্বের দৌলতে এবং তার জীবন-বিধানের মাধুর্যের বলেই প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম মানুষকে যথাযথ মর্যাদা ও অধিকারে ভূষিত করে, সকল মানুষের মধ্যে পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে, না-ইনসাফী ও অবিচারের নাম-গন্ধও তাতে নেই—সর্বোপরি, ইসলাম মানুষকে সর্ব-প্রকারের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার দাস হয়ে জীবন যাপন করার অনাবিল ব্যবস্থা ও সুযোগ দেয়। ইসলামের মৌল আকীদা-বিশ্বাসে কোন কুসংস্কার বা আজগুবী ধ্যান-ধারণার স্থান নেই, এসব দেখে এবং তার বাস্তব প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেই মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই কথা যেমন দূর অতীতে—আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে সত্য ছিল, আজও ঠিক তেমনিই সত্য রয়েছে। কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। তাই সব অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেই কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

তোমার আল্লাহ্‌র পথের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে অকাট্য যুক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম, মর্মস্পর্শী, উপদেশমূলক কথাবার্তার সাহায্যে। আর লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, আলাপ-আলোচনা করবে অতীব উত্তম রীতি-পদ্ধতিতে। —সূরা নাহল ঃ ১২৫

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ

مُرِيْبٍ ० فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ج

www.pathagar.com

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ج وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ
كِتٰبٍ ج وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط
اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

আর আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা এই ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়েছে পড়েছে। অতএব হে মুহম্মদ! তুমি এখন সেই দীনের দিকে লোকদের দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর দৃঢ়তার সাথে অবিচল হয়ে থাক, এই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ কর না। তাদেরকে বল, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তারই প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে সুবিচার কায়েম করব। আল্লাহ্ই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের জন্য, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ বা ঝগড়া নেই। আল্লাহ্ একদিন আমাদের সকলকেই একত্র করবেন এবং তাঁর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন অনিবার্য।

—সূরা শূরা : ১৪—১৫

বলেছেন :

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ط
فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

www.pathagar.com

কিতাবপ্রাপ্ত ও উম্মী লোকদের জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি ইসলাম কবুল করেছ? যদি তারা ইসলাম কবুল করে থাকে, তা হলে তো তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে থেকে থাকে, তা হলে তোমার পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব (ছিল, তা তুমি করেছ) আর আল্লাহ্ তো সমস্ত বান্দাদের ব্যাপারে দৃষ্টিমান।

—সূরা আলে ইমরান : ২০

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي

الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ط إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

প্রত্যেকটি জনসমষ্টির জন্য আমরা একটা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা অনুসরণ করে তারা চলে। অতএব, এই ব্যাপারে তোমার সাথে যেন কেউই ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বদ না করে। আর তুমি তোমার আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতেই থাক, নিশ্চয়ই তুমি সুদৃঢ় বাজু, হিদায়েতের উপর অবিচল। এই লোকেরা যদি তোমার সাথে যুক্তিতর্কে নেমে আসে, তা হলে তুমি তাদের বল, তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ ভালো জানেন। —সূরা হজ্জ : ৬৭-৬৮

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝

শত্রুরা যা কিছু বলে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্যধারণ করে থাক (অস্থির হয়ে পড়ো না) এবং তাদের খুব সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাও। আর আমাকে এবং এইসব ধন-সম্পদ শক্তি-স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন লোকদেরকে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করার জন্য ছেড়ে দাও, উপরন্তু ওদের কিছুটা সময় দাও। —সূরা মুযযাম্মিল : ১০-১১

www.pathagar.com

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

যারা শির্‌ক করেছে তারা বলে, আল্লাহ্‌ই যদি চাইতেন তা হ'লে আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারুর দাসত্ব করতাম না—না আমরা, না আমাদের পূর্বপুরুষেরা ; আর তিনি যা হারাম করে দিয়েছেন তা থেকে ভিন্নতর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না। এদের আগের মুশরিকরাও ঠিক এই যুক্তিই খাড়া করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ণমাত্রায় দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলের দায়িত্ব আরও কিছু আছে নাকি?

—সূরা নাহল : ৩৫।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ○

দীন-ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য কোনরূপ জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে হিদায়েত কোন্‌টি, আর গুমরাহী কোন্‌টি, তা অকাট্যভাবে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে গেছে।

—সূরা বাকারা : ২৫৬

কুরআন মজীদের এইসব ঘোষণা ইসলামের ব্যাপারে শত্রুদের সব ভিত্তিহীন প্রচারণার বাতুলতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেছে।

**পরিতুষ্টকরণ শক্তিপ্রয়োগ নয়**

এই প্রেক্ষিতে আমরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, ইসলাম কখনই শক্তি বা চাপ প্রয়োগের সাহায্যে প্রচারিত হয়নি। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদরা এই পর্যায়ে যত প্রচার-প্রোপাগাণ্ডাই করে থাকুন না-কেন,

www.pathagar.com

তার সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁরা এই পর্যায়ে যা কিছুই বলেছেন ইসলামের সাথে চরম শত্রুতা করার জন্যই তা বলেছেন। খ্রীস্ট ধর্মের অপসৃয়মান অবস্থা দেখে এবং ইসলামের দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার লাভে তাদের মনে যে হীন আক্রোশের বিষবাষ্পের সৃষ্টি হয়েছে, সেই আক্রোশ মেটাবার জন্যই তা করেছেন। আমরা শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতে চাইনে। আমরা বরং এখন তাঁদের মুখের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে চাই। কেননা তার যথেষ্ট সুযোগ আমাদের নিকট রয়েছে।

আসল অবস্থা হচ্ছে এই যে, খ্রীস্ট ধর্ম শেষ ও পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার সব যোগ্যতাই সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি যারা খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল, তারা এক দিকে গীর্জার আমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন এবং অন্যদিকে খ্রীস্টান রাজা-সম্রাট ও রাজন্যবর্গের নির্মম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে—এবং তা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ ও পরম সুখ-শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভের লক্ষ্যেই পালিয়ে এসে ইসলাম কবুল করেছে। খ্রীস্টান পাদ্রী-পুরোহিতরা একদিকে নিজেরা পরস্পর মতপার্থক্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। অপর দিকে রাজশক্তির অধিকারীদের সাথে ছিল তাদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে তাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ও ভয়াবহ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, আজও তার সমাপ্তি ঘটেনি, ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু ধর্মীয় মৌল আকীদা হিসেবে এমন কিছু কথা-বার্তা তারা জনগণের সমুখে পেশ করেছে এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা তাদের পক্ষে যেমন সম্ভব হয়নি, তা হৃদয়ংগম করাও সাধারণ খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী লোকদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেনি।

মৌল আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে তাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড মতপার্থক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তারই কারণে তারা বহু সংখ্যক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এই খণ্ডগুলো নিরন্তর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ-কোন্দলে লিপ্ত হয়ে আছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যে মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনদিনই নিঃশেষ হবে না, কোনদিনই এক ও একাত্ম হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এইরূপ অবস্থায় হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী লোক তাদের ধর্মের

www.pathagar.com

প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে দীন-ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে তা-ই যে অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বহু খৃীস্ট চিন্তাবিদ ও এই স্বাভাবিক পরিণতির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, খৃীস্ট ধর্মের সহজ-সরল-মৌল আকীদা যখন নানাভাবে বিকৃত ও জটিল রূপ পরিগ্রহ করল, তখন খৃীস্টান সমাজের লোকদের মনেই সন্দেহ- সংশয় ও চরম নৈরাশ্যের ঘনঘটা জেগে উঠে। ফলে খৃীস্টান ধর্মের মৌল আকীদার ভিত্-ই টলটলায়মান হয়ে পড়ে। আর ঠিক এই সময়ই মরু আরবের বুকে দীন-ইসলামের স্বচ্ছ, সর্বপ্রকারের কুসংস্কারমুক্তও মর্মস্পর্শী তাওহীদী আকীদা প্রচারিত হতে শুরু হ'ল। তখন অতি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের ন্যায় খৃস্টানরাও দলে দলে ইসলামী আকীদার প্রতি অবিচল ও একনিষ্ঠ ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর খৃীস্টান পণ্ডিতেরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে নানাবিধ সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেও অদ্যাবধি তাদের পক্ষের কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি।

বস্তুত এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দীন-ইসলাম এত দ্রুত প্রচারিত হতে পেরেছে, তার কারণ নির্ধারণ করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই কিছুমাত্র কঠিন থাকেনি।

এই সময় আফ্রিকা ও সিরিয়ার পাদ্রীরা খৃীস্টান ধর্মের মৌল বিশ্বাসকে মনগড়াভাবে পরিবর্তিত করে দিয়ে ছিলেন। তাঁরা তখন কুমার-কুমারী জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য প্রচার করছিলেন মুখে মুখে। আর গীর্জার অভ্যন্তরে এই কুমার-কুমারীদের অবাধ যৌন তৎপরতার বীভৎস কলুষতার জঞ্জাল সৃষ্টি করছিলেন। আর সাধারণ খৃীস্টান জনগণ এদের দাসত্ব করছিল নিতান্তই অন্ধভাবে ও নির্বিচারে। ফলে তারা কার্যত কঠিন শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। পাদ্রীদের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী এই মানুষগুলোর বর্তমান বলতেও যেমন কিছু ছিল না, তেমনি ছিল না ভবিষ্যত বলতে কোন আশা ও ভরসা।

শেষ পর্যন্ত দীন-ইসলামই এই বন্দী মানুষগুলোকে প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার বন্ধন, নীচতা-হীনতা ও শিরকের বেড়াজাল এবং আকীদা কুসংস্কারের জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে।

www.pathagar.com

শুষ্ক ও নিথর আকীদা-বিশ্বাস এবং পাদ্রী-পুরোহিতদের ঐশ্বরিক পবিত্রতার মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে ইসলাম নিয়ে এসেছিল এক প্রচণ্ড বিপ্লব, সকল প্রকার কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করার জন্য অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি।

ইসলাম মহান আল্লাহ্‌র তাওহীদী আকীদার মৌল ধারাসমূহ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছে। সেইসাথে এ কথা সকলের সম্মুখে দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তুলেছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ মহান, অসীম দয়ার মালিক এবং সকলের প্রতি অতীব ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক। মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান হচ্ছে সেই এক আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ঈমান আনার, তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার এবং সকল ব্যাপারে কেবল তাঁরই উপর একান্তভাবে তাওয়াক্কুল করার।

এ কথাও ঘোষিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী, প্রত্যেকটি কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট দিতে হবে এবং তার ভালো বা মন্দ ফলও পেতে হবে। সেই হিসাব-নিকাশে যারা অপরাধী প্রমাণিত হবে, তারা কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তা হবে পরকালে ; কিয়ামত ও হাশরের দিনে। অতএব পরকালীন জীবন অনিবার্য, অপরিহার্য।

আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যক্তি-সমষ্টির চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্‌তের নামায এবং বছরে একমাস রোযা ফরয করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও অসাম্য দারিদ্র্য বিদূরণের লক্ষ্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে। আর দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের অনুষ্ঠান হিসেব জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয ধার্য হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে সকল প্রকারের ভালো, উত্তম ও জনকল্যাণমূলক কাজ করার।

মিথ্যা কথা বলা, ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয়ে ধোঁকা-প্রতারণা, নির্লজ্জ কথা-বার্তা ও নৈতিক বিপর্যয়, ঝগড়া-ফাসাদ এবং দীনের মৌল বিষয়ে ভ্রান্তিমূলক তর্ক-বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

বৈরাগ্যবাদ ও কাপুরুষতার পরিবর্তে বীরত্ব ও পৌরুষকে উদ্বোধিত করেছে। মানুষকে আশাবাদী বানিয়েছে, মনুষ্যত্বকে ভ্রাতৃসম্পর্কের উপর

www.pathagar.com

সংস্থাপিত করেছে। মানব প্রকৃতির ভিত্তিগত মৌল তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করার যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভায় মানুষকে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

দুনিয়ার সব খ্রীস্টান দার্শনিকবৃন্দই ইসলামের এই মহান অবদানকে অকপটে স্বীকার করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তা অস্বীকার করতে পারেননি। অবশ্য এতসদত্বেও হিংসুক, পরশ্রীকাতর ও বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তিরা ইসলামের প্রতি নানারূপ গাল-মন্দ করেছে ও বলছে যে, এই মহান দীন নাকি তরবারিরর জোরে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে!

আমরা বিশ্বাস করি, দীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব-মহানত্ব সম্পর্কে এবং সারা বিশ্বে ইসলামের সুবিচার-ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার পূর্বোদ্ধৃত বিস্তারিত বিবরণের প্রেক্ষিতে ইসলামের বিরুদ্ধে সৃষ্ট যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় অপনোদিত হয়েছে। বস্তুত এইসব অকাট্য-অনস্বীকার্য প্রমাণাদির পর ইসলাম 'তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথার প্রতি দুনিয়ার কোন একজন বালকের মনেও একবিন্দু প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

## চাপের তীব্রতা বিস্ফারণের উদগাতা

বস্তুত পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলের জনগণ যখন খ্রীস্টীয় গীর্জার নিপীড়নমূলক শাসন ও নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীন ওষ্ঠাগত জীবন, খ্রীস্টান রাজাও সম্রাটরা যখন মানুষের উপর অত্যাচারী ও শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে রেখে মানুষের আল্লাহ্; হয়ে বসেছিল, তারা শুধু প্রধান শাসক-ই ছিল না, ছিল প্রধান পাদ্রীও ঠিক এই সময়ই বিশ্ববাসীর জীবন-ক্ষেত্রে ইসলামের নবীন সূর্যের উদয় ঘটে।

জাস্টিনিয়ান ধারণা করত, সে হচ্ছে খ্রীস্টানদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রধান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তখন থেকেই তার শাসন ব্যবস্থায় চরম হিংস্রতা প্রচণ্ড হয়ে উঠে। স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর গীর্জার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণের বুকের উপর চেপে বসেছিল।

খ্রীস্টীয় ৫৩২ সনে কনস্টান্টিনোপলের জনমনে দীর্ঘদিন থেকে জমে থাকা আক্রোশ প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। যদ্দরুণ গীর্জা ও রাষ্ট্র একসাথে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। জাস্টিনিয়ান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ৩৫,০০০ মানুষকে নির্মূল ও ধ্বংস করে। এই সময়ের জনগণের মধ্যে তীব্র

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া ও চরম নৈরাশ্য দেখা দেয়। তারা চিৎকার করে বলে উঠেঃ 'সুবিচার ও ন্যায়পরতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তা' আর কখনই ফিরে পাওয়া যাবে না।' জনগণ তখন শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই অবস্থার মধ্যদিয়েই অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর ইসলাম তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, ইসলামের দাওয়াত তাদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার বিলুপ্তি এবং প্রকৃত মানসিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তি—সুবিচার ও ন্যায়পরতা কেবলমাত্র ইসলামই দিতে পারে বলে তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। তারা আবার আশাবাদী হয়ে উঠে, জীবনে বেঁচে থাকার সুখলাভে তারা ধন্য হয়।

তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তাশক্তিতে চরম স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল, ইসলামে তারা পেল চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের তুলনাহীন প্রেরণা, বিশ্বমানবতার কল্যাণের অতুলনীয় বিধান ও ব্যবস্থা। মানুষের মরে যাওয়া বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি নবতর জীবন লাভ করে। মানুষ পায় প্রকৃত মানবীয় মর্যাদাও সম্মান।

বড় বড় খ্রীস্টান গ্রন্থ প্রণেতা এই পরম সত্যকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ক্রুশ যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইসলামী আদর্শবাদী জনতার মানব হিতৈষীমূলক ভূমিকার অকাট্য প্রমাণ। এই যুদ্ধে লুই সপ্তমের অন্যতম সাথী ছিলেন পাদ্রী দেনিস। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ১১৪৮ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টান বাহিনী যখন এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে বাইতুল মাকদেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ফ্রিজীয়র দুর্গম পর্বতসংকুল পথে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর নিকট চরম পরাজয় বরণ করতে ও কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সময় যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তারা এন্তাকিয়ার দিকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু পিছনে রেখে যায় বহুশত রোগী, আহত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের। তাদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষার ভার দিয়ে যায় তাদের মিত্র গ্রীকদের উপর। কিন্তু গ্রীকরা তাদের বন্দী করে রাখে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খাদ্যদানের বিনিময়ে বিরাট মূল্য আদায় করে। আসলে তারা করে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং এই বিপদগ্রস্থ মানুষগুলো মারাত্মক অবস্থার সমুখীন হয়ে পড়ে। তারা

www.pathagar.com

ক্ষুধায় কাতর, রোগে আক্রান্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় ছাট্‌ফট করতে থাকে। আর এই কঠিন সময়ে মুসলমানদের নির্বিশেষ মানবীয় কল্যাণের দরদী হস্ত তাদের প্রতি প্রসারিত হয়। তাঁরা এদেরকে হৃদয় নিঃসৃত দয়া ও কল্যাণ কামনাভিত্তিক সেবা-শুশ্রূষা ও খাদ্য-পানীয় সরবরাহ ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারই ফলে এই অগণিত লোক মৃত্যুর নিশ্চিত গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। মুসলমানদের এই অকৃত্রিম আন্তরিক দয়া-সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবা-যত্নের ফলে দুই ধর্মাবলম্বী দুই বাহিনীর মধ্যকার মানবীয় গুণের মৌলিক পার্থক্য তাদের নিকট দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ইসলামের ধারক-বাহক ও ইসলামের মানবিক গুণের বাস্তব প্রতিমূর্তি মুসলমান এবং তাদের প্রেরণার একমাত্র উৎস ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা একদিকে দেখল তাদেরই খ্রীস্টান ভাই গ্রীকদের নির্মম অমানুষিক আচরণ এবং অপরদিকে ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডাবাহীদের পরম নিরপেক্ষ মানবীয় কল্যাণমূলক আচরণ। তারা নিজেদেরই ধর্মাবলম্বীদের নিকট পেল কঠিন উপেক্ষা, মর্মান্তিক শোষণ-নির্যাতন ও হিংসা-প্রতিহিংসা, অমানবিকতা আর তাদের 'শত্রু' বলে চিহ্নিত ইসলামী বাহিনীর নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা-আশ্রয়, খাদ্য-পানীয়, চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা। এঁরা ছিলেন তাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র, সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী বন্ধু। উত্তরকালে এই লোকেরাই মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে।

বস্তুত ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য নয় কোনভাবে ও কোন অবস্থায়ই মানুষকে ইসলাম গ্রহণে জোর পূর্বক বাধ্য করা। এ পর্যায়ে কুরআনের উদাত্ত সংক্ষিপ্ত ঘোষণাই চূড়ান্ত ভিত্তি-দলীল। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ط قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥

www.pathagar.com

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই। প্রকৃত হিদায়েত ও কল্যাণের পথ মূর্খতা-বর্বরতার (অন্ধকার থেকে) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অতঃপর যে লোক তাগুত-আল্লাহ্‌হীন শক্তিকে অস্বীকার-অমান্য করবে এবং ঈমান আনবে এক আল্লাহ্‌র প্রতি, সে এমন এক সুদৃঢ়-অকাট্য রজ্জু শক্ত করে ধারণ করল, যা কোনদিনই ছিন্ন হয়ে যাবে না। বস্তুত আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সূরা বাকারা : ২৫৬

এই আয়াত সুস্পষ্ট সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, যুক্তি-প্রমাণ ও বাস্তব আচার-আচরণের মাধ্যমে আদর্শগতভাবে ইসলাম যখন কোন ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠবে, ইসলাম ও অ-ইসলামের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে, ঠিক তখনই একজন লোকের আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে। আর এই কাজ তরবারির জোরে সম্পাদিত হতে পারে না। অতএব ইসলাম গ্রহণে শক্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকতে পারে না, তার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই কথা ইসলামের মূল দলীল কুরআন মজীদে বারেবারে ও নানাভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামের সর্বশেষ বাহক হযরত মহম্মদ (স.) আহ্‌বানকারী (داعيا) ও প্রচারকারী (مبلغا) হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। কুরআন মজীদে দীনের দাওয়াত অকাট্য যুক্তি, প্রমাণ ও উত্তম ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশও দেয়া হয়েছে। লোকদের সাথে মতাদর্শ নিয়ে ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণের লক্ষ্যে তর্ক-বিতর্ক করতে বলা হয়েছে উত্তম ও হৃদয়স্পর্শী ভংগী ও পদ্ধতিতে। এই কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেও বলা হয়েছে যে, রসূলে করীম (স.) ও ইসলাম দুনিয়ায় এসেছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পরম সত্যতা সহকারে। অতএব যারাই দীন-ইসলাম গ্রহণ করবে তারা তা করবে একান্তভাবে নিজেদের জন্যই। আর যারা তা গ্রহণ করবে না, তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদের এই পথভ্রষ্টতার অনিবার্য কুফল ও খারাপ পরিণতি তাদেরই ভোগ করতে হবে। নবী করীম (স.) নিজে দীন-গ্রহণ করানোর জন্য জোর প্রয়োগকারী নন, তিনি এজন্য লোকদের গাজিয়ান হয়েও আসেননি, শক্তি, দাপট ও চাপ প্রয়োগ করে তিনি কাউকেই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন না। তিনি

www.pathagar.com

প্রথমত ভীতি প্রদানকারী এবং দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সুখময় পরিণতি লাভের সুসংবাদদাতা মাত্র।

কুরআনের এই ঘোষণা কার্যত ও সত্য প্রমাণিত। তিনি সাধারণ বেসামরিক মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রীস্টান, চুক্তিবদ্ধ বা আশ্রয় গ্রহণকারী জনতার বিরুদ্ধে কখনই যুদ্ধ করেন নি। তিনি ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান-দের ধর্মপালনের পথেও সৃষ্টি করেননি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা। খায়বর যুদ্ধে ইয়াহুদীরা চরমভাবে পরাজিত ও খায়বর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বহু সংখ্যক ইয়াহুদী মদীনায় ফিরে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু নবী করীম (স.) তাদের ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন তাতে কোনরূপ বাধাদান করতে স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেছেন।[১]

তবে চুক্তি ভংগকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই দিয়েছেন। সূরা তওবার কয়েকটি আয়াতেই এই নির্দেশ স্পষ্ট-ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। একটি আয়াত এই ঃ

وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ

دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ

لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

আর যদি চুক্তি করার পর তারা নিজেদের কিরা-কসম ভংগ করে এবং তারা তোমাদের দীনের উপর আক্রমণ করা শুরু করে দেয়, তা'হলে কুফরীর নিশানবর্দারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কেননা তাদের কিরা-কসমের কোন বিশ্বাস নেই। অতঃপর তারা সম্ভবত (তরবারির জোরেই) বিরত হবে। —সূরা তওবা ঃ ১২

অবশ্য এখানে চুক্তি ও কিরা-কসম বলতে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করার ওয়াদা বোঝানো হয়েছে। কেননা তাদের সাথে এ ছাড়া

১. Life of Muhammad by Haykal p. 372



www.pathagar.com

যখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন অন্যকোন ধরনের চুক্তি করার কোন প্রশ্নই ছিল না।

এর পরবর্তী আয়াতে আরও বলিষ্ঠ ভংগীতে এই কথাই বলা হয়েছে ঃ

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ......

তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না যারা নিজেদের ওয়াদা বারবার ভংগ করে এসেছে এবং যারা রসূলকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করার সংকল্প করেছিল? সীমালংঘনের সূচনা তো তারাই করেছে। —সূরা তওবা ঃ ১৩

চুক্তি ও ওয়াদা ভংগ করার শাস্তিস্বরূপ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নিশ্চয়ই দীন গ্রহণে লোকদের বাধ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োগ নয়। তবে সেইসাথে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, শিরক হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরমতম অধঃপতনের সুস্পষ্ট প্রতীক। সত্য দীনের দ্বার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার পরিবর্তে সর্বশক্তি দিয়ে তা বন্ধ করে রাখা এবং কাউকেই সে সত্যদীন কবুল করতে না দেয়াও মানবতার বিরুদ্ধে কম অপরাধ নয়। তদানীন্তন মানব সমাজকে নিরংকুশভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জাহিলিয়তের অমানবিক সর্বাত্মক ব্যবস্থা। তারই আশ্রয়ে মানুষ প্রকৃতি ও স্বহস্তনির্মিত প্রতিমূর্তি পূজা ও তারই মত মানুষের দাসত্বের দুশ্ছেদ্য শৃংখলে বন্দী হয়ে পড়েছিল এবং প্রতি মুহূর্ত প্রতীক্ষারত ছিল এমন এক মানব কল্যাণকামী শক্তির জন্য, যা তাদের বুকের উপরে চেপে থাকা জাহিলিয়তের এই জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে দেবে। রসূলে করীম (স.) ছিলেন সেই শক্তি। তাঁর আগমনই হয়েছিল মানুষকে জাহিলিয়তের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাওহীদের সত্য আকীদার আলোকোজ্জ্বল পটভূমিতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে, মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য। এমন কি বার বার চুক্তি ও ওয়াদা ভংগকারীদের সাথে নতুন করে চুক্তি করাও কিছু মাত্র নিষিদ্ধ ছিল না, যদি নবী করীম (স.) তাতে কোন কল্যাণের আশা করতেন এবং তা করা সমীচীন বিবেচনা করতেন।

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে সূরা আনফাল-এর ৬০তম আয়াতে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য পূর্ণমাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার পরও বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

হে নবী! শত্রুপক্ষ যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তা'হলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আনফাল ঃ ৬১

এই প্রসংগের প্রথম আয়াতে যদিও কাফিরদেরকে অতীব নিম্ন ও নিকৃষ্ট জীব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা ইসলামী শক্তির সাথে সন্ধি-সমঝোতা করতে আগ্রহী হলে ইসলামী শক্তির নেতা নবী করীম (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই অনুপাতে তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতা করতে রাজী হওয়ার জন্য। এই নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (স.) তা করেছেনও। কিন্তু প্রতিবারই তারা চুক্তি ভংগ করেছে। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণভাবে কোন শ্রেণীর মানুষের সাথে ইসলামের কোন শত্রুতা নেই। আছে আদর্শের বিরোধ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য যা কিছু যুলুম, অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতন তা নির্মূল করা এবং ইসলামের দুশমন শক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ও তাদের শক্তির দাপট চূর্ণ করাই ইসলামী জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা তার উদ্দেশ্য কখনই নয়।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর এক শ্রেণীর মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, তারা ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবধারিত। এই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের মুরতাদ হওয়াটা মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের প্রাপ্য দিতে অস্বীকৃতি। এদের কেউ কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার প্রতি বিশ্বাসী ছিল বলে হযরত

www.pathagar.com

উমর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

আল্লাহ্‌র নামে শপথ, যে লোক নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং নবী করীম (স.)-এর সময়ে যেমন যাকাত দেয়া হত, তেমনি যাকাতের জন্তুর গলার একটি রশি দিতেও অস্বীকার করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই জিহাদ করব।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুদ্ধ ঘোষণা মূলত তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার লক্ষ্যে ছিল না, তা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমন ও অনুগত করার উদ্দেশ্যে। কেননা তা বরদাশ্‌ত করে নিলে ও তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হত এবং জনজীবনকে চরম-ভাবে বিপর্যস্ত হতে হত। আর তা কোন রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হতেই পারে না।

তবে আহলি কিতাব---খৃস্টান-ইয়াহুদী এবং মুশরিকদের প্রতি গৃহীত নীতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। আহলি কিতাবরা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাযী হ'লে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা হবে না। আর যারা একবার চুক্তি করে পরে তা ভংগ করেছে, তারা তওবা করা ও ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও যুদ্ধমান প্রতিপক্ষ আহলি কিতাব হোক কিংবা মুশরিক, তাদের সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ নিষেধ করছে না। মুশরিক যুদ্ধমানদের সাথে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবুও যে পার্থক্যের কথা আমরা বলেছি, তা শুধু এই হিসেবে যে, আহ্‌লি কিতাবদের সাথে মুসলমানদের আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানদার হওয়ার দিকদিয়ে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের দীনের উৎস এক ও অভিন্ন অর্থাৎ আল্লাহর নাযিল করা কিতাব। তাদের শরীয়ত আসমানী কিতাব থেকে গৃহীত, যেমন মুসলমানদের। তাদের আসল শরীয়তে প্রায় সেই সবই হারাম ও হালাল ছিল যা মুসলমানদের শরীয়তে হালাল ও হারাম রয়েছে।

এই পর্যায়ে এই কথাও বলে দেয়া আবশ্যক যে, আহলি কিতাব ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করা কুরআন মজীদে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি- যদিও ইতিবাচকভাবে কোন আয়াতে

www.pathagar.com

তেমন কিছু বলা হয়নি। অপরদিকে নবী করীম (স.)-এর 'আমল' অত্যন্ত প্রকটভাবে বর্তমান রয়েছে। তিনি ইয়ামামা ও বাহরাইনের অগ্নিপূজারী-দের সাথে সন্ধি করেছেন জিযিয়া গ্রহণের শর্তে। এই সুন্নত অনুসরণ করেই খুলাফায়ে রাশেদুন পারস্য, তুর্কি ও সিন্ধুর অগ্নিপূজারী ও তারকা-পূজারীদের সাথে সন্ধি করেছেন। এথেকে স্পষ্ট প্রমণিত হয় যে, কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয় এমন বহুকাজ করার নিদর্শন স্বয়ং রসূলে করীম (স.)-এর জীবনে ও খিলাফতে রাশেদার আমলে রয়েছে। তবে সূরা আত্ তওবা'র ২৯ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তা নাযিল হওয়ার বিশেষ উপলক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রেক্ষিতে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, নবী করীম (স.)-এর সময়ে যা কিছু ঘটেছে, তা যেমন আল্লাহ্ নির্দেশিত, ও আল্লাহ্ কর্তৃক সমর্থিত, তেমনি তার সুদূর প্রসারী তাৎপর্যও অনস্বীকার্য। এই কারণে কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, কুরআন মজীদে একটি আয়াত রয়েছে, যা আয়াতুস্ সাইফ 'তরবারির আয়াত' নামে অভিহিত। মুশরিকদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ ও তাদের ক্ষমা প্রদর্শন বা তাদের উপেক্ষা করে চলার পর্যায়ে যত আদেশ রয়েছে, উক্ত তরবারির আয়াত'টি সেই সবকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে। উক্ত তাফসীরকারের মতে সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ কর।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, উক্তি বাণীটুকু কোন পূর্ণাংগ আয়াত নয়, পূর্ণাংগ আয়াতের একটি অংশ মাত্র। সূরা তওবার সে আয়াতটি পূর্ণাংগ-ভাবে এখানে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

www.pathagar.com

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

প্রকৃত কথা এই যে, যখন থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহ্‌র কিতাবের মাসগুলির সংখ্যা মাত্র বার। তার মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল ব্যবস্থা। অতএব এই চারমাসে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করো না। আর মুশরিকদের সাথে সকলে মিলিতভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা সকলে মিলিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন। —সূরা তওবা : ৩৬

মাঝখানে উদ্ধৃত আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্কের দিকটি বাদ দিলেও তার শেষাংশে উদ্ধৃত : 'যেমন তারা সকলে মিলিত হয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে'—এই বাক্যাংশ মূল কথার উপসংহার এবং তার সাথে ওতোপ্রোত জড়িত ও অবিচ্ছিন্ন। তাতে আয়াতের প্রথমাংশের নির্দেশের কারণ ও যুক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলিতভাবে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ দেয়া হ'ল তার কারণ এই যে, মুশরিকরা তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তি সহকারে যুদ্ধ করছে। এই কাজে তারা তাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছে। এইরূপ অবস্থায় অনুরূপ সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া মুসলমানদের পক্ষে একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়েছে। তাদেরও উচিত এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা ও সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করা।

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন আয়াতকে 'তরবারির আয়াত' নাম দেয়া কোনক্রমেই সমীচীন নয়। ঐ স্থানের দুইটি বাক্যের প্রত্যেকটিই অপরটির পরিপূরক। একটি অংশকে বাদ দিয়ে অপর অংশটির ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যেতে পারে না। তাই যারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা। তা অবশ্যই সমান মাত্রার প্রস্তুতি ও প্রচণ্ডতা সহকারে হতে হবে। এই কথাটি কুরআনের অন্যান্য আদেশগুলি থেকে

www.pathagar.com

খানিকটা ভিন্নতর। কেননা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যুদ্ধকে শুধু যুদ্ধরত শত্রু ও চুক্তি ভংগকারীদের বিরুদ্ধে সীমিত রাখার কথাই বলা হয়েছে। যারা শান্তিতে বসবাস করতে চায়, যারা চুক্তি করে তা রক্ষা করতে প্রস্তুত, তাদের প্রতি ওয়াদা পূরণ করার উপর যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে।

**শুভ পুন্যফল ও শাহাদাত লাভই লক্ষ্য গনীমতের মাল ও কর্তৃত্ব লাভ নয়**

অশুভ মন-মানসিকতাসম্পন্ন বিরোধী লোকেরা আর একটি অভিযোগ তুলেছে। তারা বলছে, আসলে গনীমতের বিপুল মাল-সম্পদ লাভই ছিল জিহাদের মৌল প্রেরণা ও আকর্ষণ। নবী করীম (স.) মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন গনীমতের মাল-লাভের সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য। তা-ই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই কথার জবাবে আমরা স্পষ্ট কণ্ঠে বলার প্রয়োজন মনে করছি যে, জিহাদের লক্ষ্য যেমন ছিল না লোকদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো, তেমনি ছিল না গনীমতের ধন-সম্পদ লাভ। উক্তরূপ কথার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। তা সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ মাত্র। গনীমতের মাল-সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি রয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ
مُؤْمِنًا ج تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ
مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে পদার্পন কর, তখন প্রত্যেকটি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানতে চেষ্টা কর এবং যে লোক তোমাদের প্রতি সালাম দেবে তাকে বলো না যে, তুমি

www.pathagar.com

মু'মিন নও। তোমরা তো দুনিয়ার উপকরণ পেতে চাও, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে বিপুল গনীমতের সম্পদ। পূর্বে তোমরা এইরূপই করছিলে পরে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব যা বলেছি প্রত্যেকটি ব্যাপারকে খুব ভালো করে জানতে চেষ্টা কর। তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ পূর্ণ অবহিত। —সূরা নিসা : ৯৪

ইসলামের দুশমনদের আক্রমণমূলক কথাবার্তার তীব্র প্রতিবাদ করছে এই আয়াত। এছাড়াও কুরআনের আরও বহু আয়াত এমন রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করছে যে, মুসলমানরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে মূলত আল্লাহ্‌র রহমত লাভ এবং তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য। যারা জিহাদের ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকতে চায়, শান্তি, নিরাপত্তা ও ঝঞ্ঝাটহীনতাই যাদের নিকট আকর্ষণীয়, তাদেরকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র পথে জান-প্রাণ ও ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় ও কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা ও ধন-ঐশ্বর্যের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সওয়াব প্রাপ্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়, কুরআন ও হাদীসে তাদের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে এই পর্যায়ে কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা যাচ্ছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ○

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ্‌র রহমত লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী। আর আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাশীল, দয়াবান। —সূরা বাকারা : ২১৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا

www.pathagar.com

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের কী হয়েছে, যখন তোমাদেরে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়, তবুও তোমরা মাটির সাথে অচলায়তন হয়ে লেগে থাক, তোমরা কি পরকালের তুলনায় এই পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাও ? জেনে রাখো ; দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী পরকালের তুলনায় তো অতি সামান্য। তোমরা যদি জিহাদে ঝাঁপিয়ে না পড়, তা'হলে আল্লাহ্ তোমাদের অতীব পীড়াদায়ক 'আযাবে নিমজ্জিত করবেন এবং তোমাদের বদলে দিয়ে অন্য জন-সমষ্টিকে ময়দানে নিয়ে আসবেন ; কিন্তু তোমরা তাঁর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।—সূরা তওবা ঃ ৩৮-৩৯

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ○ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

www.pathagar.com

কিন্তু রসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা তাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করেছে। তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফল-কাম। আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সদা-প্রবাহমান। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। বস্তুত এত অতীব বড় সাফল্য। —সূরা তওবা ঃ ৮৮-৮৯

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ
لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদের জন্য জান্নাত হবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, তাতে হত্যা করে, নিজেরাও নিহত হয়। এই ব্যাপারে অতীব সত্যতা সহকারে ওয়াদা করা হয়েছে তওরাতে, ইনজীলে ও কুরআনে; আর যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত এই ওয়াদা পূরণ করবে, তোমরা যে বিষয়ে বায়'আত করেছ, সেই বায়'আতের বাবত সুসংবাদ গ্রহণ কর। বস্তুত এই হচ্ছে বড় রকমের সাফল্য। —সূরা তওবা ঃ ১১১

এছাড়াও সূরা আস্-সাফ-এ আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা করেছেন ঃ

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ○

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয় যা তোমাদের দেয়া হবে, তা তোমরা খুবই পসন্দ কর, তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য এবং অতীব নিকটবর্তী বিজয়। আর এই সুসংবাদ মু'মিনদের দাও।—সূরা আস-সাফ : ১৩

এ আয়াত অনুযায়ী জিহাদে মুসলমানদের দুইটি জিনিস কাম্য। তার একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিকটে উপস্থিত বিজয়—যা খুব দূরে নয়। আল্লাহ্‌ জিহাদকারী মু'মিনদের এই দুইটি জিনিস দেয়ার ওয়াদা করেছেন, যে ওয়াদার সত্যতায় কোনই সন্দেহ নেই।

এ হচ্ছে জিহাদের তাৎক্ষণিক সুফল। এর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে পরকালীন সওয়াব। এই সওয়াবই হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য পরকালে লভ্য শুভ প্রতিফল। উদ্ধৃত আয়াতে যে সাহায্য ও বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই গনীমতের ধন-মাল বোঝায় না গনীমতের ধন-মাল লাভ তো রাজনৈতিক ফলাফল, যা ক্বচিৎ হস্তগত হয়। কেননা সব যুদ্ধ-জিহাদেই গনীমতের ধন-মাল হস্তগত হবে, এমন কোন নিশ্চয়-তাই নেই। অবশ্য কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াতে মু'মিন মুজাহিদদেরকে গনীমতের মাল দেয়ার কথাও বলা হয়েছে নসীহত ও উপদেশ গ্রহণের তাকীদ স্বরূপ। কিন্তু তা কখনই জিহাদের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করা হয়নি।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ط
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
عَزِيزًا ۝ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ

www.pathagar.com

وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا ○

আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারা কোন সুবিধা লাভ না করেই নিজেদের মনের জ্বালা নিয়ে এমনিই ফিরে গেছে আর মু'মিনদের পক্ষথেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হলেন। বস্তুত আল্লাহ্ খুবই শক্তিমান ও প্রবল পারাক্রান্ত। তা ছাড়া আহলি কিতাবের মধ্যে যারাই এই আক্রমণকারীদের সমর্থন দিয়েছিল, আল্লাহ্ তাদের গহ্বর থেকে তাদের নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের দিলে তিনি এমন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা তাদের একটি জনসমষ্টিকে হত্যা করছ এবং অপর এক জনসমষ্টিকে বন্দী করছ। তিনি তোমাদিগকে তাদের জায়গা-জমি, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-মালের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই বিশাল অঞ্চলও তিনি তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন, যার উপর তোমরা কখনই পদ সঞ্চালন করনি। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান। —সূরা আহ্যাব ঃ ২৫-২৭

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ○ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ط
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

আল্লাহ্ সেই মু'মিনদের প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা তোমার হাতে গাছতলায় বসে বায়'আত করছিল। তখন তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্ জেনে নিয়েছিলেন, তিনি তাদের প্রতি পরম প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং শুভ কর্মফল হিসেবে তিনি তাদের নিকটবর্তী

www.pathagar.com

বিজয় ও বিপুল পরিমাণের গনীমতের সম্পদ দান করলেন—যা তারা গ্রহণ করছিল। আর আল্লাহ্ তো সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞানীই আছেন।

—সূরা আল-ফাতাহ ঃ ১৮-১৯

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ ج حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ٥

আল্লাহ্ তায়ালা (সাহায্য ও সহযোগিতার) যে ওয়াদা তোমাদের প্রতি করেছিলেন, তা তো তিনি পূর্ণই করে দিয়েছেন। শুরুতে তাঁরই অনুমতিক্রমে তোমরা তাদের হত্যা করছিলে। কিন্তু পরে তোমরাই যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মতবিরোধ শুরু করে দিলে এবং যখনই আল্লাহ্ তোমাদেরে সেই জিনিস দেখালেন—যার ভালোবাসায় তোমরা মত্ত হয়েছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল-সম্পদ), তখনই তোমরা (তোমাদের সরদারের) নির্দেশ অমান্য ও তার বিরোধিতা করে বসলে। কেননা তোমাদের মধ্যে কতিপয় লোক দুনিয়ার স্বার্থের অন্বেষী ছিল, অবশ্য অপর লোকেরা পরকালেরই আকাঙ্ক্ষী ছিল- - -

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫২

বস্তুত গনীমতের ধন-মালের প্রতি মানুষের লোভ থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও উপরিউক্ত আয়াতে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বিদগ্ধ জনগণের নিকট এ কথা স্পষ্ট যে সাধারণ জন-মানুষের ঝোঁক প্রবণতা ও আকর্ষণ-আগ্রহ এবং কুরআনের শিক্ষা, উপদেশ, পথ-প্রদর্শন ও তার সংশোধনী-সংস্কারমূলক লক্ষ্য নিরূপণের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে, এ দুটি কখনই এক ও অভিন্ন কথা নয়। এখানে আমাদের মূলত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন উপস্থাপিত মহান মানব কল্যাণমূলক আদর্শ, সাধারণ জন-মানুষের আকর্ষণ-আগ্রহ বা ঝোঁক-

www.pathagar.com

প্রবণতা নয়। অর্থাৎ জিহাদে শরীক কিছু লোকের মনে গনীমতের মাল অর্জন লক্ষ্য ও আকর্ষণীয় হলেও কুরআন মজীদ তাদের সম্মুখে সে জিনিস পেশ না করে তার চাইতেও বৃহত্তর লক্ষ্যই উপস্থাপিত করেছে।

## বিচিত্র ধরনের মিথ্যাচার

উপরিউক্ত দীর্ঘ বিস্তারিত কুরআনী যুক্তিভিত্তিক আলোচনার পরও ইরফাঙ্ক-এর মত পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গ কি এই মিথ্যা কথা প্রচারের মুখ বন্ধ করবে না যে, ইসলাম শুধু তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে? --- সম্ভবত ওরা বিগত শতাব্দী থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যার ঢোল পিটিয়ে আসছে, তা কক্ষণই থামাবে না। এখন তো ওটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মিথ্যাচারের অভ্যাস যে সহজে ত্যাগ করা যায় না, তা সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ইয়াহুদী-খ্রীস্টান চক্র অবিশ্বাস্যভাবে এই মিথ্যার ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে অবিরামভাবে; তা বন্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেননা ওরা ইসলামের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণার সুযোগে শক্তি ও দাপট, ধোঁকা-প্রতারণা ও প্রলোভন ব্ল্যাকমেইলের সাহায্যে নিজেদের ধর্মমতকে দুনিয়ায় প্রচার করে নিচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করলেই তাদের মুখোশ খুলে যায় এবং বিশ্বের দরবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়।

১৯১৮ সনে মার্শাল লান্‌বী মিত্র শক্তির নামে যখন বাইতুল মাক্‌দেস দখল করে নেয়, তখন সে হেইক্যালে সুলাইমানের নিকট দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল: 'আজকের দিনে ক্রুশ যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল।'

> ডঃ পিটারসন স্মীথ তাঁর 'মসীহ চরিত' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন: বাইতুল মাকদেসের উপর এই বিজয় অষ্টম ক্রুশ যুদ্ধের ফলশ্রুতি। আজ এরই মাধ্যমে খ্রীস্টবাদ তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।

যদিও এ কথা সত্য—এবং তা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খ্রীস্টানদের এই বাইতুল মাকদেস বিজয় এককভাবে কেবলমাত্র খ্রীস্টান-দের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই লাভ করা সম্ভবপর হয়নি, তার সাথে ছিল ইয়াহুদীদের বাস্তব সাহায্য ও সহযোগিতা। তারা খ্রীস্টানদের গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছিল তাদের অপরিমেয় ডলার সাহায্যের মাধ্যমে। তারা চেয়েছিল ইসরাঈলীদের প্রাচীন বদান্যতার কথা খ্রীস্টানরা অন্তর

www.pathagar.com

দিয়ে স্বীকার করে নিক। আর এভাবেই তারা চেয়েছিল প্রতিশ্রুত ভূমিকে ইয়াহুদীদের আবাস ভূমি বানিয়ে নেয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে।

ইনজীলের ঘোষণা বর্তমান ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য কিন্তু ইসলাম ইসলাম প্রচারে কখনই তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি এবং তা কখনও করবেও না। কিন্তু ইরফাঞ্চ—এর ন্যায় শয়তানী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা আজকের খ্রীস্টান ইউরোপের অমানবিক কার্যক্রমের কালিমা ইসলাম ও মুসলিমদের উজ্জ্বল-পবিত্র ললাটে লেপন করার কু-মতলবে সদা সক্রিয়।

আজকের খ্রীস্টান ইউরোপ-আমেরিকা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে সেই-সব জঘন্য ও বীভৎস কার্যকলাপই চালিয়ে যাচ্ছে, যা অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায়ে করেছিল মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠা মোগল ও তাতাররা। অস্বীকার করছি না, উত্তরকালে তারা ইসলামের খোলস পরেছিল। কিন্তু সেইসাথে এ কথাও সত্য যে, তারা ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা ও জীবনাদর্শ তখন পর্যন্ত পুরাপুরিভাবে গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে পারে নি। তার ফল যা হবার তা-ই হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা কার্যকর হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তারা চিরকালের তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সাধারণ নিয়মের অধীন আজকের সেই সব পাশ্চাত্য পরাশক্তিসমূহকেও নিশ্চিহ্ন হতে হবে যারা মানবতার প্রতি মোগল-তাতারদের চাইতেও অনেক বেশী জঘন্য ও বীভৎস আচরণ করে যাচ্ছে।

মোগল ও তাতাররা যে সব দেশ দ্রুততার সাথে দখল করে নিয়েছিল, সেগুলি ছিল ইসলামে সদ্য দীক্ষিত। কিন্তু ইউরোপীয় বিশেষ শক্তিগুলি জনগণকে বিশেষ আদর্শে দীক্ষিত করা কিংবা বিশেষ কোন সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে তাদের অভিষিক্ত করার লক্ষ্যে নয়, নিছক সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা চরিতার্থ করা, বিপুল সংখ্যক মানুষকে অধীন ও নিকৃষ্ট গোলাম বানানোর একক উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করছে ও দেশের পর দেশ দখল করে নিচ্ছে। অবশ্য খ্রীস্টানী আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যেই তা করছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সারা দুনিয়ায় বিস্তীর্ণ হয়ে থাকা মিশনারীগুলো এই একই উদ্দেশ্যে সদাসক্রিয়, যদিও খুব বেশী সাফল্যের দাবি করার মত তাদের কিছুই নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তারা

www.pathagar.com

কোন মহান উদ্দেশ্যে এই কাজ করছে না। মানুষের সাধারণ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাসের কথা ইসলামের যুক্তি-ভিত্তিক ও বিবেকসম্মত আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলায় গ্রহণ করতেই প্রস্তুত নয়। মিশনারীদের নগদ অর্থ বা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে পড়ে অর্থনৈতিক দিকদিয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্থ কোন ব্যক্তির তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়াটা তেমন কোন গুরুত্ববহ ব্যাপার নয়।

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, দুনিয়ার বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তা আধুনিক হোক কি প্রাচীন ঐতিহাসিক—একান্তই খৃস্টান শক্তি। অথবা খৃস্টান-ইয়াহুদীর যৌথ শক্তি. যারা উত্তরকালে কমিউনিজমের ধারক-বাহক হয়েছে। এই হীন সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলে দুনিয়ার স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ভয়ানকভাবে তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধের আগুন জ্বলছে নানা দেশে, নানা ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক নৈতিকতা বলতে বর্তমানে কিছুই অবশিষ্ট নেই। সকল মানবিকতা ও মানবীয় সুকোমল ভাবধারা বিধ্বস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এদের পাশবিক আচরণে।

## তুলনা ও পার্থক্য

আমরা বলব, ইনজীলের বক্তব্য বা দীন প্রচারে তরবারি ব্যবহারের অভিযোগ যদি সত্যই হয় এবং তা মুসলিম উম্মতের মধ্যে কোথাও বাস্তবরূপে কার্যকর হয়েও থাকে, তবে তা নিতান্তই অতীতের ব্যাপার। আজকের দিনে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত দেখা যায় পাশ্চাত্য—তথা পরা-শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলআবিব সরকার এবং আজকের আফ-গানিস্তানে রুশ সরকার পূর্ণমাত্রার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাই পালন করছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানব কল্যাণাভিসারী কোন ভূমিকা গোচরীভূত নয়, তার পরিবর্তে মানবতা-বিধ্বংসী রূপই অত্যন্ত প্রকট। মানুষকে ধ্বংস করা, সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা এবং জাতি-সমূহকে করতলগত ও অধীন বানানোই যেন তাদের একমাত্র কাজ। এটাকে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক ও নির্বিশেষ সম্প্রসারণ বৈ আর কোন পরিচয়েই ভূষিত করা যায় না।

এই শক্তিসমূহ দুনিয়ার দুর্বল দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে এবং নিজ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পদানত

www.pathagar.com

করে রাখছে। সে সব দেশের সম্পদ দু'হাতে লুটেপুটে নিচ্ছে, মানব দেহের ইষদুষ্ণ শোণিতধারা নির্মমভাবে শুষে নিচ্ছে, মানুষকে নিষ্প্রাণ কাঁচামালের মত যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। আরও সাম্রাজ্যবাদী কালোথাবা বিস্তারের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করছে। গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মুখব্যাদান করে আছে।

কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর। স্বয়ং নবী করীম (স.), খুলাফায়ে রাশেদীন বা তার পরবর্তীকালের মুসলমানরা নিছক দেশজয় বা সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কখনই যুদ্ধ করেননি। প্রথম পর্যায়ে তাঁদের যুদ্ধ ছিল তাদের আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার জন্য। কেননা কুরাইশ ও গোটা আরবই তাঁদের সাথে মারাত্মক শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল। আর শেষ পর্যায়ে রোমান ও পারসিকরা যখন তাঁদের অস্তিত্বকেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছিল তাঁদের উপর। এইরূপ অবস্থায় তাঁদের যুদ্ধ না করে কোন উপায়ই ছিল না। আর পরবর্তীকালে দুনিয়ার নিপীড়িত-নির্যাতিত মানবতাকে সকল প্রকার যুলুম-অত্যাচার-নিষ্পেষণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ও অত্যাচারী-নিপীড়কের কালোহস্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার লক্ষ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করেছেন। কেননা আল্লাহ্র খিলাফতের দায়িত্ব পালনে এই কাজ ছিল একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু এর কোন একটি পর্যায়েও কোন একজন লোককে তাঁরা তাঁদের দীন গ্রহণে জোর প্রয়োগে বাধ্য করেননি। কেননা দীন গ্রহণে বাধ্য করার জন্য কোন জোর প্রয়োগ করার রীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়।

মুসলমানদের এসব যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল না। দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ দখল করে স্বাধীন মানুষকে অধীন ও দাসানুদাস বানানোর মানবতা বিরোধী কাজ তাঁরা কখনই করেননি। তাঁরা উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে কোন দেশ দখল করলেও বিজয়ের পর সে সব দেশের শাসকদের হাতেই সে দেশের কর্তৃত্ব প্রত্যার্পণ করে চলে গেছেন।

এ সব যুদ্ধে তাঁদের লক্ষ্য ছিল দীনের দাওয়াতকে সর্ব প্রকারের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করা, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিবেশে মানুষকে কোন আকীদা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া, স্বাধীনভাবে তা পালন করা এবং নিজেদের দীন ও ঈমানের পতাকা উড্ডীন করার পরিবেশ গড়ে তোলা।



www.pathagar.com

বস্তুত দীন-ইসলামের আকীদা ছিল পরম সত্যতা সমন্বিত। তার ভিত্তিতে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠত তাতে কার্যকর ছিল পূর্ণ সামাজিক সাম্য, ন্যায়পরতা ও নিরংকুশ সুবিচার। সেখানে আরবদের কোন প্রাধান্য বা বিশেষত্ব ছিল না অনারবদের উপর, অনারবদেরও ছিল না আরবদের উপর। তথায় শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্ণিত হত শুধু তাক্ওয়ার মানদণ্ডে। সর্বোপরি, সে সমাজে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোন শক্তির থাকত না একবিন্দু কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব বা প্রাধান্য সাধারণ জন-মানুষের উপর। বস্তুত মানুষকে তারই মত মানুষের নিকৃষ্ট দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করার এবং প্রকৃত মানবোপযোগী মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দীন-ইসলাম। ইসলামের দায়িত্ব ও মিশনই হচ্ছে সমস্ত মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে---মানুষের উপর মানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্ব খতম করে এক আল্লাহ্র প্রভুত্বের অধীন স্বাধীন-মুক্ত জীবন যাপনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

এ-ই হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের বিশেষত্ব। এই ধরনের দাওয়াতের প্রকৃতিই হচ্ছে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ। তা সমগ্র জীবনে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে অতি সহজেই---যেমন করে যে কোন সত্য আকীদা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে থাকে। বস্তুত এটাই হচ্ছে ইসলামের পরম সৌন্দর্য।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শেষের দিকে এমন সব লোক ইসলামে প্রবেশ করে, যারা ইসলামকে একটি ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। তারা ইসলামের এই সৌন্দর্যকে কলংকিত করার ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিছক দেশজয়ের মতলবে তরবারি হাতে নিয়েছে, যুদ্ধও করেছে। কিন্তু ঠিক যখনই তারা এই মানবতা বিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছে, সেই মুহূর্তে আল্লাহ্র তরবারি তাদের উপর নিপতিত হতে শুরু হয়েছে। কেননা অন্যায়ের পরিণতি অন্যায় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর যে এই অন্যায়ের সূচনা করে, সে-ই হচ্ছে বড় যালিম। তাই বলতে হবে, ইসলাম এই উদ্দেশ্যে কখনই যুদ্ধ করেনি, কখনও তা করতেও পারে না। এরূপ যুদ্ধের অনুমতিও দেয়নি ইসলাম।

ধর্ম প্রচারে জোর প্রয়াগ ইসলামের রীতি নয়। ইসলামের স্বীকৃতি পাওয়ার বা তার বিস্তৃতি সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগের আদৌ কোন প্রয়োজনও নেই। কেননা ইসলাম অতীব যুক্তিভিত্তিক, বিবেক-সম্মত ও

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়গ্রাহ্য দীন। মানুষের দেহ নয়, তার অকাট্য যুক্তি ও অনস্বীকার্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা-বৈশিষ্ট্যের জোরে মানুষের মন জয় করাই তার জন্য যথেষ্ট। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের দ্রুত ব্যাপক-বিস্তৃতি লাভের মৌল তত্ত্ব।

এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, বিগত শতাব্দীগুলোতে বহু রাষ্ট্র-শক্তি নিছক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বহু মুসলিম দেশকে পদানত করে নিয়েছে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, তাদের ঈমান পরিবর্তন করতে বা তাদের ইসলামে কোনরূপ বিকৃতি আনতে পারেনি। তারা শক্তির জোরে দেহ জয় করেছে, কিন্তু মন জয় করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

খ্রীস্টান ইউরোপ—আর আজকের পরাশক্তি সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ও বিশাল জনপদ কেবলমাত্র লৌহশক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র ও অত্যাচার-নিপীড়নের সাহায্যে দখল করে নিয়েছে, নিরীহ, অসহায় সাধারণ জন-মানুষের উপর শক্তি ও দাপটের বর্বরতা প্রদর্শন করছে, কিন্তু এতসব সত্ত্বেও—এবং এইরূপ অবস্থার মধ্যে যুগের পর যুগ জীবন যাপন করতে বাধ্য করেও তাদের ঈমানকে একবিন্দু দুর্বল বা শক্তিহীন করে দিতে সক্ষম হয়নি। এইরূপ অবস্থাকে মুসলমানদের নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরোপিত কঠিন পরীক্ষাই বলতে হবে। মহান আল্লাহ্ এই কথাই বলে দিয়েছেন তাঁর সর্বশেষ কালামে ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

লোকেরা কি ধারণা করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি', শুধু এতটুকু বলার দরুণই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের আদৌ যাঁচাই-বাছাই করা হবে না? (না, তা সত্য নয়)। আমরা তো তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরে কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছি। এই পরীক্ষার পরই আল্লাহ্

www.pathagar.com

প্রমাণিতভাবে জানতে পারেন কোন সব লোক তাদের ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।—এতো তিনি জেনে নেবেনই।

—সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আজ যারাই অস্ত্রের জোরে মুসলমানদের কাবু করে রাখছে, এই অস্ত্রই তাদের সেখান থেকে উৎখাত করবে—এই হচ্ছে 'যথা কর্ম তথা ফল'-এর শাশ্বত কার্যকরতা। ইঞ্জীল-এর ঘোষণাও তাই। এই ঘোষণা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হবে তাদের জীবনে ঃ 'তরবারির জোরে যে যা কেড়ে নেবে, তরবারির জোরেই তার হাত থেকে তা কেড়ে নেয়া হবে।'

## দুর্নাম রটনাকারীদের প্রতি

উপরিউক্ত সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, ইসলাম কোন মুহূর্তে তরবারির জোরে প্রচারিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদি বলা হয়, 'হ্যাঁ, ইসলাম তরবারির জোরেই প্রচারিত হয়েছে,' তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, তরবারি কি নিজেই ইসলামের পক্ষে চলেছে, না তার চালনাকারী হিসেবে কিছু লোক কাজ করেছে? প্রথম কথাটি তো অবাস্তব, দ্বিতীয় কথাটিই সত্য হতে পারে। তা' হলে প্রশ্ন, যেসব লোক ইসলামের পক্ষে তরবারি চালালো, তাদের ইসলামে দীক্ষিত করলো কে? এরা নিশ্চয়ই তরবারির ভয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। তা'হলে তারা যে কারণে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, পর মুহূর্তে সে কারণটি নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তা হলে ইসলাম প্রচারে প্রথম সূচনা মুহূর্তে যে কারণটি কার্যকর ছিল, পরবর্তীকালে ইসলামের প্রচার কার্যে সে কারণটি বাদ দিয়ে যে কারণটি শুরুতে গ্রহণ করা হয়নি তার আশ্রয় লওয়া হয়েছে বলে দাবী করার পিছনে কোনই যুক্তি থাকতে পারে না। আসলেও তা করা হয়নি। করা হয়েছে বলে যে দুর্নাম রটানো হয়েছে, তা দুর্নামকারীদের এক অমূলক, অসত্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ মাত্র।

প্রকৃত পক্ষেই ইসলাম কোন বস্তুগত শক্তির কারণে নয়, তার অকাট্য যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানসম্মত আবেদন এবং তার সার্বিক কল্যাণকারিতার অনবদ্য প্রমাণাদির কারণেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। প্রথম মুহূর্তেও তাই, শেষ পর্যন্তও তাই এবং বর্তমান মুহূর্তে—আরও সহস্র-লক্ষ বছর পরেও তা-ই সত্য থাকবে।

www.pathagar.com

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম বুঝি কোন বৈরাগ্যবাদী ধর্ম, বৈষ্ণবতাই বুঝি তার প্রকৃতি। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লেও বুঝি যুদ্ধকে সে ঘৃণা করে। যে তাকে বিপদে ফেলতে, হত্যা করতে বা তার প্রতিষ্ঠিত জীবন বিধানকে ধ্বংস করতে শক্তির দাপট নিয়ে এগিয়ে আসবে, তার হাত থেকে নিজেকে, নিজের ঈমান-আকীদা, সমাজ-ব্যবস্থা, ইজ্জত-আবরুকে রক্ষা করার জন্যও যুদ্ধ করবে না। এই কথা সত্য নয়। বিজ্ঞানসম্মতও নয়। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করাকে—শক্তির জওয়াবে শক্তি প্রয়োগকে-ইসলাম একান্তই কর্তব্য—ফরয বলে ঘোষণা করেছে। মুসলমান এই কর্তব্য পালনের জন্য বদ্ধপরিকর। তা অবশ্যই তাকে পালন করতে হবে। কেননা ইসলাম দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য এসেছে। আর দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য এটা একান্তই অপরিহার্য। ইসলাম তার আদর্শের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বমানবতাকে মানবীয় দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন মত অবশ্যই জিহাদ করবে। কিন্তু সে জিহাদ কখনই আক্রমণকারী, সীমালংঘনমূলক এবং প্রথম সূচনাকারী হবে না।

কেননা কুরআন মজীদ স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥

তোমরা সীমাতিক্রম করো না, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না—পসন্দ করেন না। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০

সীমালংঘন নিষিদ্ধকরণের এই বাণীর পূর্বেই বলা হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ...

তোমরা আল্লাহ্'র পথে যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে... —সূরা বাকারা ঃ ১৯০

অর্থাৎ যুদ্ধের সূচনাকারী তোমরা হবে না। অন্যরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু ক'রে দিলে—যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করতে পারবে না।

www.pathagar.com

এর অর্থ, যুদ্ধের সূচনাকারী তোমরা হবে না, সেইসাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েও তাতে বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। বাড়াবাড়ি করতে না পারার একটি দিক হচ্ছে, কতটা প্রচণ্ডতা-নির্মমতা ও শক্তি-প্রস্তুতি সহকারে ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তোমরাও অনুরূপ প্রচণ্ডতা-নির্মমতা ও শক্তি-প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ করবে, তার চাইতে বেশী নয়। এ-ও হতে পারে যে, যে সব ফ্রন্টে, তারা যুদ্ধ করছে, তোমরাও সেই সেই ফ্রন্টে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। নিজেরা উদ্যোগ করে নতুন কোন ফ্রন্ট খুলে দেবে না কিংবা এ-ও হতে পারে যে, ওরা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিলে তারপরও তোমরা নির্বিচারে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, থামবে না—ইসলামের দৃষ্টিতে তা কিছুতেই ঠিক হতে পারে না।

কুরআন মজীদের এই ঘোষণা ইসলাম ও মুসলমানরা কার্যকর করেছে। তা কোথাও লংঘিত হয়নি। হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-কে কিছু সংখ্যক মুহাজিরের নেতৃত্বে কুরাইশ সরদারদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য নবী করীম (স.) পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে আসার সময় যে সব ধন-মাল তথায় রেখে এসেছিলেন, কুরাইশরা তা সব আটক করে রেখেছিল। এইসব ধন-মাল ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তাদের বর্তমান মনোভাব কি, তা জানা মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের মক্কা ত্যাগের পর তারা তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা-ভাবনা করছে, তাদের বর্তমান মানসিকতা কোন্ ধারায় প্রবাহমান, সে বিষয়ে প্রকৃত খবর জানারও দরকার ছিল। মুহাজিরদের মক্কা গমণের এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁর সংগী-সাথীদেরসহ মক্কার নাখ্‌লাতে অবতীর্ণ হলেন। নাখলা মক্কা ও তায়েফের মধ্যখানে অবস্থিত। কুরাইশরা এই সংবাদ পেয়ে পরামর্শ বৈঠকে একত্রিত হ'ল। একজন বলল, আজকের রাত যদি সুযোগ পায়, তা হলে তারা নিশ্চয়ই হারাম শরীফে প্রবেশ করবে। অতএব এ থেকে তাদের বিরত রাখার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ওদিকে মুসলমানরাও কুরাইশদের একটি কাফেলার উপর আক্রমণ করার ও তাদের ধন-মাল হরণ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। দিনের শেষে তাঁরা এই আক্রমণ চালালেন। আক্রমণকালে কুরাইশের পক্ষের আমর আল-হাজরামীকে হত্যা করলেন, উসমানকে বন্দী করলেন আর নওফল পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। মুসলমানরা তাদের উষ্ট্রগুলো করায়ত্ত করে

www.pathagar.com

নিলেন। বলা যায়, এটা ছিল কুরাইশদের মুকাবিলায় মুসলমানদের প্রথম বিজয় এবং সর্বপ্রথম গনীমতের মাল লাভ। এই ঘটনা রজব মাসে সংঘটিত হয়। অতঃপর তাঁরা মদীনায় চলে যান, ফলে কুরাইশরা তাদের নাগাল পায় না। তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথে এই সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। অভিযোগ উঠে, নিষিদ্ধ হারাম মাসে মুসলমানরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে। কুরাইশ ও ইয়াহুদীরা সমানভাবে এই অভিযোগের কোরাস গাইতে শুরু করে। তারা বলে বেড়ায় মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সংগীরা হারাম মাসকে হালাল বানিয়েছে, রক্তপাত করেছে, ধনমাল লুট করছে ও লোকদের বন্দী করেছে। স্বয়ং মুসলমান সমাজেও-এর তীব্র সমালোচনা হতে থাকে। তখন নবী করীম (স.) তাদের লক্ষ্য করে বলেনঃ 'আমি তোমাদেরে হারাম মাসে যুদ্ধ করার কোন নির্দেশ দেইনি।' ফলে সে কাফেলার লোকেরা গভীরভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। এই প্রেক্ষিতেই সূরা আল্-বাকারার এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ط

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ

اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط

লোকেরা—হে নবী! তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, হ্যাঁ, এই মাসে যুদ্ধ করা অতীব সাংঘাতিক ব্যাপার। তবে আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের বিরত রাখা, এই পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, কুফরি করা, মসজিদে হারামে যেতে না দেয়া এবং সেখানকার জন্মসূত্রের অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহ্র নিকট অনেক বড় ব্যাপার। পরন্তু 'ফিত্না' হত্যাকাণ্ড থেকেও অনেক বড় অন্যায়।[১]

—সূরা বাকারা : ২১৭

১. نور اليقين - ص ١٠٥ — فلسفة الجهاد فى الاسلام - ص ١٧٤

www.pathagar.com

'হারাম' মাস সংক্রান্ত বিষয়ে শত্রুপক্ষের কুরাইশ ও ইয়াহুদীদের মিলিত অভিযোগের এ-ই ছিল কুরআনী জওয়াব। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, হারাম মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত করা কি কোন কবীরা গুনাহ?

কুরআন স্বীকার করেছে, হ্যাঁ, ব্যাপারটি সামান্য বা নগণ্য নয়। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড়, অতীব ভয়াবহ এবং বিশেষভাবে মারাত্মক ধরনের ব্যাপারও তো এখানে রয়েছে; তা কি উপেক্ষণীয়?—আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার ও অমান্য করা---এগুলো তো হারাম মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করার তুলনায় অনেক বড় ব্যাপার। মসজিদ হারামে যেতে না দেয়া, লোকদের--মক্কার প্রকৃত অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা, তাদের ঈমান অনুযায়ী দীন পালনে বাধাদান ও তাদের হত্যা করা মোটেই সামান্য ও গুরুত্বহীন ব্যাপার নয়। হারাম মাসে যুদ্ধ করার তুলনায় এগুলো অনেক বড় অপরাধ। উপরন্তু মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার সুযোগ না দেয়া, মানুষকে আল্লাহ্‌র দীন পালনের সুযোগ না দিয়ে তাদের মতই মানুষের দাসত্ব ও আইন-বিধান পালন করে চলতে বাধ্য করা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অনেক অনেক বড় এবং জঘন্য অপরাধ।[১] অথচ কুরাইশ ও ইয়াহুদীরা এই অপরাধই করে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে। তারা মক্কার অসহায় মুসলমানদের লোভ দেখাচ্ছে, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছে। তাতেও বিরত না থাকার দরুন তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তো মুসলমানদের তাদের দীন থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত এই কাজগুলো পূর্ণোদমে চালিয়ে যাবে!

কুরাইশ, মুশরিক ও ইয়াহুদীরা এই সব বড় বড় ও জঘন্য মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিকার চিত্তে। এতে তাদের মধ্যে কোনরূপ অন্যায়বোধও জাগ্রত হচ্ছে না। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই অপরাধীদের এসব পাল্টা অভিযোগের ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে এককড়া মূল্যও হতে পারে না। কেননা তারা তাদের অন্যায় ও জঘন্য কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে, তাতে কোন দোষ হবে না আর মুসলমানরা তাদের এসব অন্যায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে অস্ত্র ব্যবহার করবে না

১. الجامع الاحكام القرآن القرطبى - ج ٣ - ص ٤٤ - ٤٥

www.pathagar.com

শুধু নিষিদ্ধ মাস হওয়ার কারণে, এটা কোন যুক্তিসংগত কথা হতে পারে না। ওরা তো মুসলমানদের উপর এই সব জঘন্য কার্যকলাপ চালাচ্ছে হারাম মাস ও অ-হারাম মাস উভয় সময়ই। ওরা তো হারাম মাসেরও কোন মর্যাদা রক্ষা করে না। তার একবিন্দু পরোয়াও করে না। অথচ মুসলমানদের উপর যখনই যে যুলুম ও আক্রমণ আসবে, তার প্রতিরোধ করা তাদের দীনী কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জবাবদিহি করতে হবে।[১] বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ط

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ

وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

ফিরিশতাগণ যে সব লোকের জান কবজ করবে এমন অবস্থায় যে, তারা নিজেদের উপর যুলুমকারী হয়ে আছে; তাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা কি অবস্থার মধ্যে ছিলে? জওয়াবে তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে খুবই দুর্বল ও অক্ষম অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। তারা বলবে, আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, তোমরা তো তথায় হিজরত করেও যেতে পারতে? এই ধরনের লোকদের পরিণতি জাহান্নাম এবং তা পরিণতির দিকদিয়ে অত্যন্ত খারাপ স্থান। —সূরা নিসা ঃ ৯৭

এই আয়াতটি হিজরতের পর এবং মক্কায় থেকে যাওয়া ও কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে প্রাণদানকারী মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তাঁরা মুসলিম অবস্থায়ই জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও হিজরত না করা, অন্তত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট অভিযুক্ত হয়েছিলেন।[২]

---

১. في ظلال القرآن للسيد قطب الشهيد - ج ٢ - ص ١٦٣

২. الجامع الاحكام القرآن - ج ٥ - ص ٣٤٥

www.pathagar.com

অতএব হারাম মাস হলেও দুর্বল অবস্থায় পড়ে থাকতে রাযী না হয়ে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনক্রমেই অন্যায় বা অপরাধ হতে পারে না। হযরত যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

নবী করীম (স.) হারাম মাসে যুদ্ধ করতেন না, তবে তাঁর উপর আক্রমণ করা হলে ( নিশ্চয়ই জওয়াবী যুদ্ধ করতেন )।[১]

## ফিতনা হত্যাকাণ্ড অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক

'ফিত্না' কুরআন মজীদের ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর না থাকা অবস্থাকেই বোঝায় এই পরিভাষাটির দ্বারা। তাই কুরআনের ঘোষণা ঃ ফিত্না—অর্থাৎ উক্তরূপ অবস্থা হত্যা ও রক্তপাতের তুলনায় অধিক মারাত্মক। অতএব উক্তরূপ অবস্থার সার্বিক অবসান ঘটানো, তার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনের কারণে যুদ্ধ করা—রক্তপাত করা অতীব শ্রেয়। শুধু শ্রেয়ই নয়, মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র আরোপিত অতি বড় কর্তব্য। কেননা মুসলমানরা যখন দেখতে পায় যে, তাদের দীন পালন করতে দেয়া হচ্ছে না, তার পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ্র দেয়া আইনের পরিবর্তে মানুষের মনগড়া আইন-বিধান পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তখন যদি তার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ না করে, তা হ'লে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তারা সেই অবস্থায় পড়ে থাকাটাকেই পসন্দ করছে। আর তা'হলে তাদের ঈমান আছে বলে কোন বাস্তব প্রমাণই পাওয়া যায় না। কোন মুসলমানেরই এই অবস্থাকে মেনে নেয়া উচিত হতে পারে না। তখন তাদের উচিত হয়ে পড়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ শুরু করা, যেন উক্ত ফিত্না নির্মূল হয়ে যায় এবং লোকেরা আল্লাহ্র দীন পূরামাত্রায় ও যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয় স্বাধীনভাবে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই।[২]

---

১. تفسیر الکبیر للفخر الرازی، الجامع الاحکام القرآن - ج ٣ - ص ٣٣٣

২. فی ظلال القرآن - ج ٢ - ص ١٦٣

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও মিথ্যা দোষারোপকারীরা সমানে চিৎকার করতেই থাকে যে, শুধু রক্তের পিপাসু, রক্ত ঝরাবারই আহ্বান জানায়। তরবারি কোষমুক্ত করে মানুষের গর্দান কাটার জন্য সদা উস্কানী দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি...

আমরা বলব, ইসলাম সম্পর্কে এসব নিতান্তই মনগড়া অভিযোগ। ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই এই সব মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও ইসলাম সম্পর্কে তাদের এইসব অভিযোগকে সত্য বলে মেনে নিতে রাযী হতে পারে না। ইসলামের এই শাশ্বত নির্দেশ মুসলিম মন-মানসে চিরজাগরূক হয়ে রয়েছে যে,

তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করছে তোমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তোমরা (এই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করতে গিয়েও) সীমালংঘন করবে না কখনই।

ইসলাম তো ক্ষমা-সহিষ্ণুতার আহ্বান জানিয়েছে এবং দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত হয়ে এসেছে। ঘোষণা করেছে ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

আর নিশ্চয়ই যে লোক ধৈর্যধারণ করবে ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করবে—তা অবশ্যই বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের মধ্যে গণ্য।
—সূরা শূরা ঃ ৪৩

এ হচ্ছে কুরআন মজীদের ঘোষণা। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। তা অবশ্য ইঞ্জিলের ঘোষণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবধারাসম্পন্ন। ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘোষণা হিসেবে বলা হয়েছে ঃ

আমি বিশ্বে শান্তির বারতা প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিনি; এসেছি তরবারি চালাতে।

অথচ কুরআন উপস্থাপিত দীনের নাম 'ইসলাম'—এতে রয়েছে 'সালাম' অর্থাৎ 'শান্তির' ধাতুনিহিত। সেই ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অপবাদ দেবার দুঃসাহস করতে পারে নিতান্ত নির্লজ্জ অন্ধ ব্যক্তিরাই।

www.pathagar.com

**ইসলাম ও যুদ্ধ**

হ্যাঁ, ইসলাম কোন বৈরাগ্যবাদী দীনও নয়। একগালে কেউ চপেটাঘাত করলে অপর গালও পেতে দিতে হবে, ইসলাম এই পৌরুষহীনতার কোন শিক্ষা নিয়ে দুনিয়ায় আসেনি। ইসলাম যুদ্ধের আহ্‌বান জানিয়েছে, কার্যত যুদ্ধ করেছেও। কিন্তু সে কোন্ যুদ্ধ, কিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কি সে জিহাদ, যা ফরয করেছে ইসলাম সব মুসলিমের উপর?

ইসলামের সে জিহাদ হচ্ছে সেই শক্তির বিরুদ্ধে, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দীন পালনে বাধা দেয়। আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া বিধান অনুসরণ করে এবং অন্যকেও তাই অনুসরণ করে চলতে বাধ্য করে। আল্লাহ্‌র পথ বন্ধ করে, শয়তানের ও শয়তানীর পথ উন্মুক্ত করে। মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক না বানিয়ে জীবনের সর্বদিকে ও বিভাগে গুমরাহীর পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে।[১]

ইসলাম মূলত বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ্‌র আহ্‌বান। আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করার—আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জিহাদের আহ্‌বান করেছে ইসলাম। নির্বিশেষে মানুষের সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্‌বান, বিশ্বমানবতার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় এই জিহাদ। ইসলাম এই জিহাদেরই আহ্‌বান জানিয়েছে, তারই উৎসাহ দিয়েছে, তা-ই ফরয করেছে সব মুসলিমের ওপর। এই যুদ্ধকেই ইসলাম 'জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারই জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, পাথেয় জোগাড়, যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দান ও কাতার শৃংখলাবদ্ধকরণ ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ...

এবং শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাদের যদ্দুর সাধ্যে কুলায় শক্তি ও যুদ্ধের যানবাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর ... —সূরা আনফাল ঃ ৬০

ইসলাম সমর্থিত এই যুদ্ধ প্রকৃত স্বাধীনতার যুদ্ধ, মুক্তি ও মর্যাদা লাভের যুদ্ধ, মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য। কেননা তারই সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতি।

---

১. فی ظلال القرآن - ج ٢ - ص ١٦٦

ইসলামের এই যুদ্ধ দুনিয়ার তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে, মানুষের প্রভু হয়ে বসা শক্তি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে, চোর-ডাকাত, শোষক-উৎপীড়ক ও লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে—যারা মানুষের সব সম্পদ লুটপাট করে, শোষণ করে যাবতীয় জাতীয় সম্পদের একাচ্ছত্র মালিক হয়ে বসেছে। ইসলামের এই যুদ্ধ সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে—যারা আল্লাহ্‌র যমীন দখল করে বসেছে, আল্লাহ্‌র দেয়া সমস্ত কল্যাণ নির্লজ্জের মত একাই ভোগ করছে, আর মানুষকে দাসানুদাস ও ভিক্ষুক বানিয়ে দিয়েছে।

বস্তুত এ এক মহান যুদ্ধ, এক মহাপবিত্র জিহাদ। এই জিহাদ ময্‌লুমকে যুলুম থেকে মুক্ত করে, মানুষের কেড়ে নেয়া হক্‌ ফিরিয়ে দেয়। পাইয়ে দেয় তার হারিয়ে যাওয়া ও হরণ করে নেয়া সব মর্যাদা ও অধিকার। এ যুদ্ধ হচ্ছে আত্মরক্ষার যুদ্ধ—যা বিশ্ব মানবতাকে নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, সমস্ত অপরাধী-দুষ্কৃতিকারীদের নিপীড়ন থেকে বাঁচায়।

এ যুদ্ধ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস (conviction) রক্ষা করে। কেননা আকীদা-বিশ্বাসেই নিহিত রয়েছে মানুষের সুমহান মর্যাদা। এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের বিশেষত্বের সমস্ত তত্ত্ব ও মূল্যমান। এরই উপর নির্ভর করে তার জীবনের—জীবনের সব সম্ভ্রমের প্রতিষ্ঠা।

কেননা আকীদাবিহীন মানুষ ফলহীন বৃক্ষ সমতুল্য, মাল্লাহীন নৌকার মত, কিংবা প্রাণহীন দেহের মত। মনুষ্যত্বের মূল্য ও মর্যাদা যারা বুঝে, তাদের নিকট ধন-মাল-ইজ্জত, শক্তি-প্রতিপত্তি সব কিছুর তুলনায় আকীদা-বিশ্বাস অধিকতর মূল্যবান।

আকীদাবিহীন মানুষ নিতান্ত পশুর পর্যায়ে গণ্য। তখন তার জীবন একান্তভাবে বস্তুবাদী। আর বস্তুবাদী জীবনে মানুষ ও পশুতে কোনই পার্থক্য নেই—থাকতে পারে না।

আকীদা-বিশ্বাসই মানুষের সাথে মানুষের একমাত্র যোগসূত্র। মূলত আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এ সম্পর্ক আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। আর এই আকীদা-বিশ্বাসের কারণেই মানুষ মানুষের জীবনে পশুকুল থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিই হচ্ছে এই আকীদা ও বিশ্বাস।

www.pathagar.com

এই আকীদাই হরণ করার জন্য--তাকে ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করার জন্য যখন কোন শক্তি তার কালো হাত প্রসারিত করে, তখন সেই মানুষের কি কর্তব্য হতে পারে?- - -হওয়া উচিত ?

সে একজন মানুষ। হয় সে তার আকীদা ও বিশ্বাস রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে অথবা তার সে সামর্থ্য নেই। যদি তার সে সামর্থ্য নাই থাকে, তা'হলে তার করণীয় হচ্ছে তাই, যা করেছিলেন প্রাথমিককালের মুসলমানগণ হিজরতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। সর্বপ্রকারের নির্যাতন নিষ্পেষণ-উৎপীড়ন নীরবে ভোগ করেছেন। সীমাহীনভাবে ধৈর্য-ধারণ করেছেন, সব দুঃখ-দুর্দশা ও নিপীড়নের মুখে চরম ক্ষুধা ও বঞ্চনাও তাঁদের বিরত রাখতে পারেনি তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার চেষ্টা থেকে। প্রাথমিককালের খ্রীস্টানদেরও তা-ই করতে হয়েছিল, যা করেছিলেন প্রাথমিককালের মুসলমানরা। কিন্তু এই একনিষ্ঠ ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে সব মানুষ সমান নয়। সব মানুষ তা পারেও না। যাঁরা তা পারেন, তাঁরা হচ্ছেন সমাজের নির্যাস, অতীব সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ব্যক্তি। আল্লাহ্ যাঁদের এইরূপ ঈমানী শক্তি দান করেন, তাঁরা ঈমানের জন্য—ঈমান রক্ষার জন্য সব রকমের ত্যাগ ও তিতীক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত হন। পাথর চূর্ণ হতে পারে, লৌহ গলে যেতে পারে ; কিন্তু তাঁদের ঈমান একবিন্দু নমনীয় হয় না।

কিন্তু আকীদার ধারক যদি শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগ করে ফিত্‌নাকে প্রতিরোধ করতে পারে, তা' হলে তা করা তার জন্য একান্তই কর্তব্য হয়ে পড়ে। তখন যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তা সংগ্রহ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তার আর কোন উপায়ই থাকতে পারে না। এ ভাবেও সম্ভব হলে তাকে তার ঈমান অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় তার ঈমানের দুর্বলতাই প্রমাণিত হবে এবং এই ধরনের দুর্বল ঈমানদার সম্পূর্ণ ঈমানহীনেরই সমতুল্য।

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ মদীনায় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর উক্তরূপ নীতিতেই কাজ করেছিলেন। আর হুবহু তা-ই করেছিলেন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা—তাঁদের পূর্বে বাইজান্টাইনে ও রোমে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।[১]

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام - ص ٢٠٢

www.pathagar.com

**খৃীস্টীয় ধর্ম ও ইসলাম**

ইসলামের উপর দোষারোপকারী ও হিংসাশ্রয়ী কোন কোন লোক বলেছেন : খৃীস্টীয় ধর্ম ইসলামের বিপরীত যুদ্ধ ও রক্তপাতকে অস্বীকার করে। ইসলাম যুদ্ধ দানবকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছে এবং ইসলামের প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রকৃত ব্যাপার যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। খৃীস্টবাদের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে। অপর দিকে রয়েছে ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। খৃীস্টবাদ প্রথম সূচনাকাল থেকেই পৃথিবীর দেশসমূহকে পদানত করে নিয়েছে, মানুষের রক্ত বন্যা প্রবাহিত করে। আর নাম নিয়েছে ঈসা মসীহর। রোমান সরকার রক্তাক্ত করেছে ভূ-পৃষ্ঠকে, ইউরোপীয় জাতিসমূহও তাদেরই পদাংক অনুসরণ করেছে অক্ষরে অক্ষরে। ক্রুশ ধারাই দুনিয়ায় যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করেছে, খৃীস্টানরাই এই যুদ্ধকে শতগুণে তেজস্বী করে তুলেছিল, মুসলমানরা নয়। সংখ্যাতীত সৈনিক ক্রুশের মান রক্ষার নামে কয়েক শত বছরের মধ্যে ইউরোপ থেকে নেমে এসে প্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—নিবিড় অরণ্যে নিদ্রাক্রান্ত পথিকের উপর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তশোষক ভল্লুক। তারা সম্মুখে যাকেই পেয়েছে, হত্যা করেছে, রক্ত গঙ্গা বইয়েছে এবং প্রতিবারেই ঈসা-মসীহর খলীফা সেজে খৃীস্টান পোপেরা এই যুদ্ধংদেহী সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছে, দু'হাতে তালি দিয়ে বাহ্বা দিয়েছে বাইতুল মাকদেস ও সেই সাথে অন্যান্য পবিত্র ভূমিসমূহ দখল করে নেয়ার জন্য। এসব পোপেরা কি খৃীস্টান ধর্মাদ্রোহী ( Heretic ) ছিল? তাদের খৃীস্টানত্ব কি কৃত্রিম ( Counterfeit ) ছিল? অথবা মূর্খ দাবিদার ছিল, খৃীস্টানত্ব কি, তা তারা জানত না? জানত না যে, খৃীস্ট ধর্মযুদ্ধকে পসন্দ করেন না, বা তা অস্বীকার করেছেন? অথবা বলা হবে যে, ওটা মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সংঘটিত ব্যাপার এবং তা কেবল খৃীস্টবাদের উপরই প্রযোজ্য নয়?

যদি তাই বলা হয়, তা হলে এই বিশ শতকের আলোকোজ্জ্বল সময়ে যা ঘটছে, যখন মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ—বরং চরম

www.pathagar.com

উন্নতি ঘটছে সে বিষয়ে কি বলার আছে? এইযুগেও তো ঠিক তা-ই ঘটেছে ও ঘটছে, যা ঘটেছিল দূর অতীতের সেই মধ্যযুগে। ১৯১৮ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বাইতুল মাক্‌দেস দখল করার পর ইংরেজ, ফ্রান্স, ইটালী, রুমানীয় ও আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে লর্ডআল্লেশনেবী বাইতুল মাকদেসে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

আজকের দিনে ক্রুশ যুদ্ধের অবসান হ'ল।

এছাড়াও খ্রীস্টান চরমপন্থী হিংসুকদের হাতে যে ব্যাপকও নির্বিচার রক্তপাত হয়েছে, তাতে বিশ্ব ইতিহাস লালে লাল হয়ে আছে।

লিউদসর, অইলীহাদ, সম্রাট শার্লিমান, ইন্‌সিজার, সম্রাট কামুত, পাদ্রী গোট্‌ ক্রীড়া, বিশপ খ্রীস্টান, পাদ্রী থিওডরিক, পাদ্রী ফ্রান্সিস কামশীর, পুরোহিত ফালেসতিস প্রমুখের অ-খ্রীস্টানদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও নির্বাসন এবং শক্তি ও ভীতি দেখিয়ে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিতকরণের যে হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তা কোনদিনই মুছে ফেলা যাবে না।

উলাফ ত্রানফীসুন নিরেগ-এর দক্ষিণাংশের ফিকন অধিবাসীদের গলা কেটে দিয়েছিল কাস্তে (Moning) দ্বারা। যারা খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদেরকেই এই নির্মম পন্থায় প্রাণ দিতে হয়েছিল! অনেকের হাত ও পা কেটে দিয়েছিল! বিপুল সংখ্যককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল!

শুধু তা-ই নয়, সেইন্ট লুই খ্রীস্টবাদের প্রচার সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যে উপদেশ দিয়েছিল, তার তুলনায় অনেক বেশী অঘটন ঘটেছে। তার একটি উপদেশ ছিল, কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, খ্রীস্টীয় বিধান ভালো নয়, তা হলে তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করতে হলেও খ্রীস্টীয় বিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

**ছায়া-অপছায়া**

ইসলামের ভূমিকা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তা আরব খ্রীস্টানদের প্রতি এতই দয়া ও অনুকম্পা বিস্তার করেছিল যে, তারা ইসলামের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। একালেও যেসব খ্রীস্টান আরব মুসলিম সমাজের

www.pathagar.com

পাশাপাশি বাস করেছে, তারা ইসলামের এই ক্ষমাশীলতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার কল্যাণর সাক্ষ্য স্পষ্ট কণ্ঠে প্রচার করেছে।

লা-ইয়ার্ড বলেছেন, তিনি মৃৎসাগরের দুই পূর্বতীরে অবস্থিত কর্ক শহরে আরব খ্রীস্টানদের তাঁবুসমূহ দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তারা আরব মুসলিম থেকে কোন দিকদিয়ে বা কোন অবস্থায়ই কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। আদত-অভ্যাস ও পোশাকের ধরণ-ধারণ ছাড়া অন্য কোনভাবে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা সম্ভব নয়। তুরে সিনাইর পাদ্রী বরকাবৃত জানিয়েছেন যে, তিনি বিগত শতক পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি এমন বহু মরুবাসী খ্রীস্টানদের গোপন বিষয়েও অবহিত ছিলেন। সর্বশেষ ছিল এক বৃদ্ধা মহিলা, সে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছে এবং দীর উদ্যানে সমাধিস্থ হয়েছে।

ইন্তাকিয়ার ইয়াকুবী গোত্রীয় প্রধান ধর্মযাজক গ্রেট মিখাইল দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অত্যাচার-যুলুমের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হযরত ঈসার একই সত্তায় দ্বৈত জীবন—একটি হচ্ছে, তিনি খোদার পুত্র, এবং অপরটি হচ্ছে মানবীয় সত্তা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একে অস্বীকার করা হলে খ্রীস্ট ধর্মের স্বীকৃত আকীদাকেই অস্বীকার করা হয়, তার অর্থ, একই দেহ সংস্থায় একই ঈসার প্রকাশ ঘটেছিল। যারা এই আকীদা মানতে রাযী হয়নি সেই খ্রীস্টানদের জীবন অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল।

অতঃপর লিখেছেন ঃ আরব মুসলিমদের বিজয়ে আল্লাহ্‌র হাত কার্যকর রয়েছে। প্রাচ্যের গীর্জাসমূহ পাঁচশত বছরের অধিককাল ধরে ইসলামী শাসনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কিন্তু খ্রীস্টানদের পক্ষ থেকে কোনদিন কোন অভিযোগ তোলার কারণ ঘটেনি।

হেরাক্লিয়াসের নির্মমতা ও বর্বরতা-নৃশংসতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

> এই সম্রাট তার কার্যকলাপ দ্বারা জনগণের চেতনা এতটা তীব্র করে দিয়েছিল যে, তার সময়ে বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রে বসবাসকারী বৃহত্তর সংখ্যক গোঁড়া খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরাই আরব মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। কেননা তাদের দৃষ্টিতে এই মুসলমানরা ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। অথচ সম্রাট তাদের ধর্ম ত্যাগকারী মনে করে তাদের প্রতি খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাত।



www.pathagar.com

পরে লিখেছেন ঃ

ঠিক এই কারণেই সে তুলনাহীন শক্তি ও দাপটের বলে এরা তার উপর দিয়ে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

পরে স্বগতোক্তি করেছেন এভাবে ঃ

যে মহাশক্তি মানুষের রাষ্ট্রকে আবর্তিত করেন নিজ ইচ্ছামত, যাকে ইচ্ছা তাকে দেন, হীনকে উচ্চ করেন—তাঁর নামের শপথ করে বলছি, রোমানরা শক্তির দাপটে আমাদের গীর্জা লুট করেছে এবং আমাদের বেশীর ভাগ ঘর-বাড়ী হরণ করে নিয়েছে, আমাদের এমন দুঃসহ আঘাতে নিক্ষেপ করেছে, যাতে দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিল না। এই অবস্থা দেখে তিনি ইসামঈল পুত্রগণ (মুসলমানদের)-কে দক্ষিণ অঞ্চলীয় দেশসমূহ থেকে পাঠালেন রোমানদের হস্ত থেকে আমাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

সত্যি কথা হচ্ছে, ক্যাথলিকরা আমাদের হাত থেকে গীর্জাসমূহ কেড়ে নিলেও তা খালেকদীনীয়দের হাতে অর্পন করায় আমরা ভয়ানক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ি। এই গীর্জাগুলো ওদের দখলেই রয়ে গেছে। দেশের পর দেশ আরবদের অধীনস্থ হ'লে যার দখলে যে গীর্জা ছিল, সেটি তারই হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল।

এতদ্‌সত্বেও রোমানদের নির্মমতা ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ আমাদের জন্য খুব সহজ কাজ ছিল না। তবে আরব মুসলিমদের উদার ব্যবস্থাপনার অধীনে আমরা খুবই শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করতে সমর্থ হই।

ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন জর্ডান উপাত্যকায় পদার্পণ করে আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্‌র বীরত্ব ব্যাঞ্জক নেতৃত্বে, তখন এইসব খ্রীস্টান অধিবাসীরা আরবদের প্রতি লিখে পাঠালো ঃ

হে মুসলিম সমাজ! তোমরাই আমাদের নিকট রোমানদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়জন। তারা যদিও আমাদেরই ধর্মের ধারক বলে দাবিদার, কিন্তু তাদের তুলনায় তোমরাই আমাদের নিকট কৃত ওয়াদার অধিক পালন ও পূরণকারী। তোমরাই আমাদের প্রতি অধিক দয়াশীল। আমাদের উপর নিত্য যে যুলুম অনুষ্ঠিত হচ্ছিল,

www.pathagar.com

তোমরাই তার অধিক প্রতিরোধকারী। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা তোমরাই অধিক উত্তমভাবে করতে সক্ষম। কিন্তু ওরা (রোমানরা) তো আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে, আমাদের ঘর-বাড়ীও দখল করে নিয়েছে। - -

খ্রীস্টীয় ৬৩৩—৬৩৯ সনের মধ্যবর্তী সময়ে আরব মুসলমান এবং দামেশ্‌ক, হিম্‌স, মান্‌বাজ, ও সিরীয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারা খ্রীস্টান রোমান সম্রাটের অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের নিকট আশ্রয় ও সংরক্ষণ লাভ করে-ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলমানদের সাথে খ্রীস্টান ও অখ্রীস্টান বহু জাতির বিপুল সংখ্যক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুসলমানরা এই সময় যে সব দেশ ও অঞ্চল দখল করে, সেই সব দেশ ও অঞ্চলের অধিবাসী-দের সাথেই এই চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়েছিল। তাতে মুসলমানরা এসব চুক্তিবদ্ধ জন-সমষ্টিকে তাদের জান-প্রাণ ও ধন-মালের পূর্ণনিরাপত্তা দিয়েছিলেন। সেই সাথে দিয়েছিলেন তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরংকুশ অধিকার।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এখানে একটি ঐতিহাসিক চুক্তিনামার বংগানুবাদ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) বাইতুল মাক্‌দাস দখল করার পর ইলিয়া অধিবাসী খ্রীস্টানদের সাথে এই চুক্তি করেছিলেন এবং তাতে লিখিত দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। এটা ষোল কিংবা সতের হিজরী সনের ঘটনা।[১] চুক্তিটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।
আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ কর্তৃক
'ইলিয়া'বাসীদের প্রদত্ত নিরাপত্তানামা

তিনি তাদের রুগ্ন-সুস্থ সব লোককে জান-প্রাণের নিরাপত্তা দিলেন, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের ধন-মালের, গীর্জাসমূহের এবং ক্রুশসমূহেরও নিরাপত্তা দিলেন। তাদের গীর্জাসমূহ বাসগৃহে পরিবর্তন করা হবে না। সেগুলো ধ্বংসও করা হবে না। সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধনও করা হবে না। তাদের দখল থেকে কেড়ে নেয়াও হবে না, ক্রুশশূন্যও করা হবে

---

১. فتوح البلدان للبلاذری - ص ١٤٤

www.pathagar.com

না। তাদের অপর কোন ধন-মালও হরণ করা হবে না। তাদের ধর্ম পালনে কোনরূপ বাধাদান বা তা ত্যাগ করার জন্য তাদের উপর জোর প্রয়োগ করা হবে না এবং কাউকেই ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না।[১]

হযরত উমর (রাঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁর পরবর্তী খলীফার প্রতি ওসীয়ত করেন যিম্মী—যাদের সবকিছু রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, এদের প্রতি এবং মুসলমানদের দায়িত্বভুক্ত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য। তাঁর কথা ছিল ঃ

وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوفِىَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ

وَأَلاَّ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ۔

আমি তাকে ওসীয়ত করছি আল্লাহ্ ও রসূলের নামে গৃহীত দায়িত্ব-সমূহ পুরোপুরি রক্ষার জন্য, তাদের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ যথাযথ পালনের জন্য এবং তাদের সামর্থ্যের অধিক বোঝা তাদের উপর না চাপানোর জন্য।[২]

## শুধু এতটুকুই নয়

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও অনস্বীকার্য যে, বিশেষভাবে খ্রীস্টানরা ইসলামী শাসন-প্রশাসনের অধীন সর্বাত্মক সুযোগ-সুবিধা, স্বাধীনতা ও দয়া-সহানুভূতি লাভ করেছে। তারা তাদের জীবনের কোন একদিকেও একবিন্দু অসুবিধা বা সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়নি।

শুধু তা-ই নয়। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের প্রশাসনে তারা বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে চাকরী করারও সুযোগ পেয়েছে। খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে তারা। আরব খ্রীস্টান কবি আখ্তান ও দামেশকের ইউহান্না পাদ্রীর নাম এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি তো খলীফা আবদুল মালিকের উপদেষ্টা ছিলেন। মালমুইয়া নামক এক খ্রীস্টান এবং তার

১. تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی - ج ۱ - ص ۳۸۱ - ۳۸۲

২. فلسفة الجهاد فى الاسلام - ص ۲۰۷ - ۲۰۸

www.pathagar.com

এক খ্রীস্টান ভাই খলীফা আল্-মু'তাসিমের রাজত্বকালে মন্ত্রীপদের সমতুল্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কেউ কেউ। খলীফা আবদুল মালিক তাঁর ভাই আবদুল আজীজের জন্য গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন আস্‌নাম্ নামক এক খ্রীস্টানকে। খলীফা আল্-মু'তাজিদের শাসনামলে উমর ইবনে ইউসুফ নামক এক খ্রীস্টান আল-আনবার-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। খলীফা আল-মু'তামিদের সময়ে সেনা-সংগঠক ছিলেন ইসরাইল নামক এক খ্রীস্টান। তার খ্রীস্টান পুত্রকে খলীফার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়েছিল। ইরাক ও দক্ষিণ পারস্যের শাসক আজদুদ্দৌলার প্রধান উযীর ছিলেন নসর ইবনে হারুন নামক এক খ্রীস্টান। সরকারের দুইটি বড় বিভাগ, বিশেষ করে অর্থবিভাগ দীর্ঘদিন পর্যন্ত খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী-দের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

বস্তুত ইসলামী শাসনের নিরাপত্তাপূর্ণ সংরক্ষণাধীন অসংখ্য গীর্জা নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে। খলীফাগণ নিজেরাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। খলীফা আবদুল মালিক একটি গীর্জা নির্মাণ করে সাইয়্যেদা আয্‌রা'র নামে ওয়াক্‌ফ্ করে দিয়েছিলেন। একদল খ্রীস্টান ইউহান্না পাদ্রীর নামে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে একটি গীর্জা নির্মাণের অনুমতি চাইলে খলীফা তারও অনুমতি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ইয়াজিদের শাসনামলে--৭২০ খ্রীস্টাব্দে একজন ইয়াকূবী পাদ্রী বিপুল সংখ্যক খৃস্টান সমভিব্যহারে ইন্তাকিয়া প্রবেশ করে। তারা একটি নতুন গীর্জা নির্মাণ করে। পরবর্তী বৎসর সারমাদা নামক নগরে আরও একটি গীর্জা নির্মিত হয়।

এ এক দীর্ঘ ফিরিস্তি, এর ইতিহাসও সুদীর্ঘ। যা এখানে উদ্ধৃত করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অর্থহীন। এক কথায় বলা যায়, ইসলামের শাসনাধীন খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনতা নিজেদের ধর্মপালনের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সীমাহীন স্বাধীনতা ও আনুকূল্য ভোগ করেছে যা মুসলিম জনতা খৃস্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীনে কখনই পায়নি।[১]

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام - ص ٢١٠—٢١١

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## পঞ্চম অধ্যায়

# ইসলাম ও অমুসলিম

[ ইসলামের চরমতম লক্ষ্য—ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের উপর ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব—ইসলামের স্বাভাবিক উদারতা—ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিতে যিম্মীদের প্রতি আচরণ—দয়া ও সুবিচার—ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল পথ—ফিকাহবিদদের অবদান—উদারনীতির দৃষ্টান্ত—ইসলামের মানবিক আবেদন—সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি—আচরণ ও নৈতিকতা—লাভ-ক্ষতির বিচার—ওয়াদা ভংগ নিকৃষ্টতম কাজ—দুর্বলতা নয়, রূঢ়তা ও কঠোরতাও নয়—ইসলামী জিহাদ মানবিক—ইসলাম চির উচ্চশির। ]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## ইসলামের চরমতম লক্ষ্য

এ কথা সর্বজনজ্ঞাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য অবতীর্ণ একমাত্র দীন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত নবী ও রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই এই একই দীনের ধারক-বাহক ও আহ্বায়ক ছিলেন। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহম্মদ (স.) পর্যন্ত সব নবী ও রসূলের প্রচারিত ইসলামই একমাত্র দীন হওয়া সত্ত্বেও 'শরীয়ত' সম্মত কর্মবিধান ছিল প্রত্যেক নবীর জন্য আলাদা-আলাদা। কিন্তু মূলত তা সবই একই উৎস থেকে উৎসারিত, একই মালায় গ্রথিত ফুলসমূহের মত অভিন্ন। উৎস যেমন এক, চূড়ান্ত লক্ষ্যও তেমনি পার্থক্যহীন। সবই মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ, সবই এই দুনিয়ার মানুষের জন্য, মানুষের জীবনে বাস্তবভাবে অনুসরণীয়।

এই কারণে এ কথাও অকাট্য যে, হযরত মুহম্মদ (স.) প্রচারিত ইসলাম ও অন্যান্য নবী-রসূলগণের প্রচারিত ধর্মসমূহের মধ্যে কোন মৌলিক বৈপরীত্য নেই, নেই কোন বিরোধ ও পার্থক্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও নামের দিকদিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের রূপ ধারণ করার কারণে এক-একটি আলাদা-আলাদা ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও ইয়াহুদী ধর্ম আসমানী গ্রন্থ তওরাত-এর সাথে সম্পৃক্ত, খ্রীস্টান ধর্ম ইনজীল গ্রন্থের উপর ভিত্তিশীল। আর ইসলাম কুরআন উৎসারিত। অথচ মূল নূর তা-ই, যা তুর পর্বতে হযরত মূসার জন্য প্রতিভাত হয়েছিল, যা হযরত ঈসার জন্য প্রদীপ্ত হয়েছিল পৃথিবীর বুকে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং যা হেরা পর্বতের গুহায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন সর্বশেষবারের মত সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)।

ঈমানের 'নূর' এমনিভাবেই শুরু থেকে বর্তমান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

অতএব বিশ্বলৌকিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইয়াহুদী ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম একান্ত মৌলিক। আর এই তিনওটি ধর্মের শরীয়তী বিধানের ব্যাপারে ইসলাম তার নিজস্ব পন্থায় অগ্রসর হয়েছে। মূল তাওরাতকে সত্য কিতাব বলে ঘোষণা করেছে, যেমন স্বীকৃতি দিয়েছে আসল ইনজীলকে আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব হিসেবে। ইয়াহুদী ও খৃস্টান উভয়কেই ভালোবাসা সহকারে একই নির্ঘণ্টের দিকে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু অন্য দুটি ধর্ম, নিজ নিজ ধর্মমতে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আত্ম অহংকারে নিমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটিই নিজেকে একমাত্র সত্য ধর্ম বা আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রিয় ধর্ম হওয়ার দাবি করে দাঁড়িয়েছে এবং নিতান্তই অন্ধ বিদ্বেষমূলক শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আত্মশ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছে। তাই কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতেই ইয়াহুদী ও খৃস্টান-দের এই অন্ধ হিংসা-প্রতিহিংসামূলক কথাবার্তার উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে যে মতদ্বৈততা ও বিবাদ প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল, যার ফলে তারা মৌল ও প্রকৃত ধর্মমত থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তারও উল্লেখ হয়েছে কুরআনের আয়াতে। যে সব বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর উল্লেখ করে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়কারী পথের সন্ধান দিচ্ছে এই কুরআন। তারা নিজ নিজ মনের কামনা-বাসনা অনুসরণ করে আকীদার বিষয়াদির ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দান করেছে বলেই এই বিরোধ ও পার্থক্য পর্বত সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে---কুরআন মজীদ এই কথাও অকপটে জানিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে হযরত ঈসার ব্যাপারটি নিয়ে তো চরম মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। বলেছে, হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নবুওত ও রিসালাত সংঘটিত হয়েছে এমন সময়, যখন রসূল আসা বহুদিন থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন তারা পুরোপুরিভাবে গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর চেষ্টা ছিল, সকলকে সেই আসল পথে নিয়ে আসার জন্য এবং লোকদের মধ্যে পূর্ণ দীনী ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে। কেননা দীনের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তি ও পারস্পরিক হিংসাত্মক আচরণ আল্লাহ্‌র মহান অভিন্ন সত্য দীনের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি আচরণ। তার পরিণতিতে দলসমূহের চূড়ান্ত ধ্বংস, সাধারণ জনগণের সর্বাত্মক বিপর্যয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কাম্য সহৃদয়তা ও সুসম্পর্কের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়া অনিবার্য।

www.pathagar.com

বস্তুত কুরআন মজীদ আহলি কিতাব জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি এবং প্রকৃত দীনের দিকে তাদের আহ্বান জানানোর ব্যাপারটিকে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাব হিসেবে কুরআনের এবং আল্লাহ্‌র শেষ নবী হিসেবে মুহম্মদ মুস্তফা (স.)-এর এক পরম দায়িত্ব ছিল।

সন্দেহ নেই, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের একটা প্রভাবশালী অবস্থান ছিল তদানীন্তন বিশ্ব সমাজে। ইয়াহুদীদের সংখ্যা ছিল বিপুল। ইসলামের উৎস-কেন্দ্র আরবে তারা বিশিষ্ট মর্যাদারও অধিকারী ছিল। আরবের সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাত। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। পক্ষান্তরে খ্রীস্টানরা ছিল চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে। বিশেষ করে আরবের সন্নিহিত দেশ ও অঞ্চল-সমূহে—অর্থাৎ সিরিয়া, মিসর ও ইরাকে। আর জযিরাতুল আরব ও বিশেষ করে দুই হিজাজের উপর এসব দেশের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। আরব মুশরিকরা ইয়াহুদীদের ন্যায় এই খ্রীস্টানদের প্রতিও খুবই আস্থা ও মর্যাদাবোধ পোষণ করত। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত। ফলে তাদের উপর এদের খুব বেশী প্রভাব ছিল।

এ হ'ল একদিকের কথা। অপরদিকে মুহম্মদ (স.)-এর রিসালত এবং ইয়াহুদী-খ্রীস্টান ধর্মমত ভিত্তি, উৎস ও লক্ষ্যের দিকদিয়ে অভিন্ন ছিল। ফলে তারাও মুহম্মদ (স.)-এর নবুওতের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে, এটা ছিল পরম আশা ও সম্ভাবনা। তারা সকলে সাধারণ দীনী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্রিত হবে অন্যদের অপেক্ষা বহু আগে ও নির্বিবাদে, এটা ছিল অনেক বেশী কাম্য। ফলে এই ধর্মীয় ঐক্য ও একত্ববোধে সঞ্জীবিত হবে সমগ্র মানুষ, দুনিয়ায় দীনী ভাবধারা ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এটা ছিল বিশ্বমানবতার কল্যাণের দৃষ্টিতে অতি বড় প্রয়োজন।

সকলেরই জানা, ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র একত্ব ও নবী-রসূলগণের রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল--কেবলমাত্র ঈসা (আ.) ছাড়া। কুরআনও সেই এক আল্লাহ্ ও নবী-রসূলগণের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছিল। তাওরাত কিতাবও যে হিদায়েতী নূর বহনকারী কুরআনে তার উল্লেখ হয়েছে এবং তাতে যে সব নবী-রসূলের নামের উল্লেখ রয়েছে,

www.pathagar.com

তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আদেশ করেছে। হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-কে তেমনিভাবে স্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছে, যে ভাবে কুরআনে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। সেইসাথে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর রিসালাতও কুরআনের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছে। মূলত তারা এই দু'টি কথার সত্যতা বুঝতে পেরেছিল। এই দু'টির কথা বলে তারা কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতো। সূরা আল-বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ -

তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যখন কিতাব এলো, যা তাদের নিকট অবস্থিত কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী ; —পূর্বে এই নিয়ে তারা কাফিরদের উপর নিজেদের প্রাধান্যের দাবি করত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যখন তাদের নিকট তা এলো—যাকে তারা চিনেছিল, তখন তারা তাকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে বসলো। ফলে এই কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হ'ল। —সূরা বাকারা ঃ ৮৯

আশা ছিল, ইয়াহুদীরা ইসলামের সাথে একাত্ম হবে এবং উভয়ের মধ্যে পরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কার্যত হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের প্রতি আরোপিত এ দাওয়াত তারা অগ্রাহ্য করল। যদিও তাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যক আলিম সে দাওয়াতের সত্যতা বুঝতে পেয়ে কুরআন ও মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে পূর্বে যে জ্ঞানলাভ করছিলেন, তার সাথে এর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রীস্টানরাও আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী ছিল। নবী-রসূলগণের আগমণ ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও তারা ছিল বিশ্বাসী। যদিও উত্তরকালে এক আল্লাহ্‌কে তারা ত্রিত্ববাদে পরিণত করেছিল। তাওরাত যে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কিতাব অতীব সত্য ও পবিত্র এবং তার শরীয়ত, এইসবের প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিল। তা সত্ত্বেও তারা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত সে দল-উপদলসমূহের মধ্যে পরস্পর চরম হিংস্রতা ও শত্রুতা দেখা দিয়েছিল—একদল অপর দলকে হত্যা করতে শুরু করেছিল। কুরআনও ইনজীলের সত্যতা পুরামাত্রায় স্বীকার করেছিল। ঘোষণা করেছিল, হযরত ঈসা (আ.)-ও অন্যান্য নবী-রসূল-গণের ন্যায় আল্লাহ্‌র বান্দা, একজন মানুষ এবং সত্য নবী। তাঁর জন্মটা আল্লাহ্‌র একটা বিশেষ ধরনের মু'জিযা, যেমন মু'জিযা ছিল মাটি থেকে আদমের সৃষ্টি। বন্ধ্যা মায়ের গর্ভে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্মও সামান্য মু'জিযা নয়। তবে তাঁদের ব্যাপারে যে সব সীমালংঘনকারী ও অস্বাভাবিক কল্পনাপ্রসূত ধারণাবলী পরে সৃষ্টি হয়েছে, কুরআন সে সবের প্রতিবাদ করেছে। তারা ঈসাকে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পুত্র কিংবা অংশ মনে করেছে—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে তা প্রত্যাহার করে যথার্থ ঈমান গ্রহণের আহ্‌বান জানিয়েছে কুরআন।

ফলে এই তিনওটি ধর্ম একই নামে পরিচিত হতে পারছে। আর তা হচ্ছে আল-ইসলাম। এই তিনটি ধর্মের গ্রন্থই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম নামে পরিচিত। এই গ্রন্থত্রয় পরস্পরের সত্যতা স্বীকারকারী। কুরআন হচ্ছে এর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ কিতাব। এই কুরআন বহন করে নিয়ে এসেছেন খাতামুন্নাবীয়্যীনের রিসালাত। তিনি হযরত মুহম্মদ (স.)। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার তাঁর কালাম অন্যান্য নবী-রসূলগণের প্রতিও ঈমানদার। এই কিতাবের প্রতি ঈমান-দার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্বমানবের হিদায়েতের মশাল তুলে ধরা, বহন করা, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও পার্থক্য এড়িয়ে চলা এবং দুনিয়ার যে-সব জাতির নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব আসেনি বা এখন বর্তমান নেই। তাদের জন্য তারা হবে অনুসরণীয় আদর্শ। এই ঐকমত্য ও সংহতি পরিণত হবে একটি বিরাট শক্তিতে। ওসব জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাস হটিয়ে দিয়ে ইসলামের নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের আহ্‌বান জানাবে। তারা কখনই এদের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচার কর্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু কার্যত তা হয়নি, হয়েছে এর বিপরীত। পরিণামে এই ধর্মসমূহই পরস্পরের

www.pathagar.com

সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রকৃত সত্যের প্রকাশপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১]

## ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের উপর ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব

ইসলামী দাওয়াত প্রচারের এই কাজটি নীতিগতভাবে একটা ফরয কাজই নয়। শুরু থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহতভাবে চলেছে, চলে এসেছে। বস্তুত কুরআনী দাওয়াত অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, সুস্পষ্ট এবং সাধারণ জনবিবেক-বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয়। বিশেষ করে আহলি কিতাব লোকদের উপর এর একটা ইতিবাচক প্রভাব চিরন্তন। নবী করীম (স.)-এর জীবদ্দশায়ই তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেছে। মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের একটি আয়াতে সেই কথা স্পষ্টভাষায় উদ্ধৃতও হয়েছে।

আয়াতটি এই ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ -

তুমি তাদের বল ঃ তোমরা কখনও চিন্তা করেছ কি যে, এই কালাম যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা অমান্য অগ্রাহ্য করে বসলে, (তা'হলে তোমাদের পরিণতি কি হবে?) এই ধরনের এক কালামের সত্যতা সম্পর্কে বনু-ইসরাঈলের একজন সাক্ষীও সাক্ষ্য দিয়েছে। অতঃপর সে ঈমান আনলো. আর তোমরা তোমাদের অহংকারের মধ্যে ডুবে থাকলে! এই ধরনের যালিম লোকদেরকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়েত করেন না। —সূরা আহকাফ ঃ ১০

---

১. ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে এবং খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরে পারস্পরিক যে মারাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদোহ-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৫৩ আয়াতে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

শুধু মক্কাতেই নয়, মদীনা তাইয়্যেবায়ও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই পর্যায়ে সূরা আলে-ইমরানের ১৯৯, আন্-নিসা'র ১৬২ এবং আল-মায়েদা'র ৮২ ও ৮৪ আয়াত স্পষ্ট ইশারা করছে। (এ আয়াত-সমূহ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যে সব খ্রীস্টান দলবদ্ধভাবে মক্কা বা মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বড় বড় আলিম, বিদ্বান, পাদ্রী-পুরোহিত পর্যায়ের লোকও ছিলেন। দ্বিতীয়ত যে সব ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উলামা-ই-রাসিখীন—পাক্কা দৃঢ়, বিদ্যাধিকারী ব্যক্তিবর্গ। তৃতীয়ত যে সব ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান মক্কা ও মদীনায় ঈমান এনেছিলেন, ইসলামের সত্যতা-যথার্থতা অন্তর দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁরা সকল প্রকার জোর-জবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁরা নবীর দীনী দাওয়াত, কুরআনের আয়াতে নিহিত মহাসত্যের শক্তির দ্বারা ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতাও শক্তিহীনতা এবং স্থানীয় সরদারদের চরম বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়েছিল। আর মদীনার পুরানো অধিবাসী ইয়াহুদীদের সংখ্যা বিপুলতা ও বিরোধিতা থাকা অবস্থায়ও ইসলামের উপরিউক্ত প্রভাব কিছুমাত্র ম্লান থাকে নি। চতুর্থত কুরআনের আয়াতসমূহের বর্ণনাভংগী প্রমাণ করছে যে, খ্রীস্টানদের মধ্য থেকে যারা দীন-ইসলামকে সত্য মেনে নিয়ে ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা কুরআনের ঘোষণাবলীতে নিজেদের আবহমানকালের বিশ্বাস ও আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করেছিলেন।[১]

নবী করীম (স.)-এর অন্তর্ধানের পরও সাধারণভাবে আহলি কিতাব এবং বিশেষ করে খ্রীস্টানদের উপর এক ইতিবাচক প্রভাব বর্তমান ছিল। ফলে প্রথমদিকেই খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে, সিরীয়া, ইরাক, মিসর ও অবশিষ্ট উত্তর আফ্রিকার অঞ্চল মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার সময়ও বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামী দাওয়াতের কারণে অসংখ্য খ্রীস্টান মুসলিম হয়েছেন।

এই প্রেক্ষিতে আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে পারি যে, ইসলামী দাওয়াত, বিশেষ করে খ্রীস্টানদের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

---

১. تاريخ الدعوة و التبشير الاسلامى لتوماس ارنولد

নবী করীম (স.)-এর জীবদ্দশায় যেমন, তাঁর ইন্তিকালের পরও তেমনি। তবে এই আহ্‌লি কিতাবের লোকের বেশীরভাগ আরব উপদ্বীপ বহির্ভূত এলাকার অধিবাসী ছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণ অতীব দ্রুততা সহকারে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু আবার বলছি, তাতে শক্তির প্রয়োগ হয়নি একবিন্দুও ; তবে নবী করীম (স.)-এর জীবদ্দশায় সূচিত ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সম্প্রসারিত প্রভাবের ফলশ্রুতিতে বহু দেশ জয় করা সহজ হয়েছিল বলে সে সব এলাকার লোকেরা খুব শীঘ্র ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর পরবর্তীকালে ইসলামের ন্যায়পরতা ও মানবীয় কল্যাণমূলক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেও বহু লোক আগ্রহ সহকারে ইসলাম কবুল করেছেন। তার বড় একটা দিক হচ্ছে, খ্রীস্টানদের সাথে মুসলমানদের বহু সন্ধি ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। তাতে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং তার বিনিময়ে তাদের সবকিছুর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের কথা স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তখন মুসলমানরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তাদের কর্তব্য ততটা হবে, যতটা কর্তব্য খোদ মুসলমানদের এবং তাদের অধিকার ততটা, যতটা মুসলমানদের। সেইসাথে তাদের নিজেদের ধর্মপালন ও সংরক্ষণের পূর্ণ অধিকার থাকবে। থাকবে তা পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা। ফলে মুসলিম শাসনাধীন তাদের জীবন ততই সুখকর ও নিরাপত্তাপূর্ণ ছিল, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথায় ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১]

তবে ইয়াহুদীদের নিকট ইসলামী দাওয়াত খুব বেশী স্বীকৃতি ও সমর্থন পায়নি। বিশেষ করে আরব দেশে, যেখানে তারা বিপুল সংখ্যায় বসবাস করত। তাদের মধ্য থেকে কেবল সেই ক্ষুদ্র সংখ্যক লোকই ইসলাম কবুল করেছে, যারা নিজেদের মন-মানসিকতা হিংসা-বিদ্বেষ ও লোভ-লালসা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অবশিষ্ট সব ইয়াহুদীরা নিজেদের ধর্মমতে অবিচল ছিল। উপরন্তু তাদের সাথে নবী করীম (স.) ও মুসলমানদের কয়েকবার রীতিমত সংঘর্ষ হয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসিত ও উৎখাত করতে হয়েছিল। ইয়াহুদীদের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আচার-আচরণ সম্পর্কে কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমান ও ইয়াহুদীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চরম শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা বেশ কয়টি চুক্তি ভংগ

---

১. فتوح البلدان لبلاذری - ص ١٨٦

www.pathagar.com

করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল। তার বিশেষ কতিপয় কারণও ছিল। কতগুলো কারণ রাজনৈতিক, আর কতগুলো সামাজিক-সামষ্টিক, কতগুলো নৈতিক এবং কতগুলো উত্তরাধিকারের দরুণ। য়াহুদীদের ধর্মীয় পণ্ডিত-পুরোহিতদের আত্মম্ভরিতার কারণেও হয়েছে। তারা যে সব বৈষয়িক সুখ-শান্তি, সুযোগ-সুবিধা ও আয়েশ-আরাম ভোগ করছিল, সেগুলো হারিয়ে যাওয়ার ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়েও অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও জযিরাতুল আরবের বাইরের অনেক য়াহুদী সন্তান ইসলাম কবুল করেছে ও ইসলামী সমাজের মধ্যে শামিল হয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তা খালেসভাবে ইসলামী দাওয়াত কবুল করার দরুণই হয়েছিল। তাদের অনেকেই যে নিজেদের দীনের উপর অবিচল হয়েছিল এবং তা থাকতে পেরেছিল, তা ইসলামী শাসন তাদের প্রতি পরম উদারতা অবলম্বিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ, এতে সন্দেহ নেই।

**ইসলামের স্বাভাবিক উদারতা**

হিংসা-বিদ্বেষ ও বংশানুক্রমিক শত্রুতা য়াহুদী ধর্ম ও খ্রীস্টবাদকে চরমভাবে বিষজর্জরিত করে দিয়েছে, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু ইসলামের ভাবধারা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যে লোকই ইসলামের মৌল লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সামান্য পড়াশুনা করেছেন, তিনিই স্বীকার করবেন যে, ইসলামের উদারতা, ক্ষমাশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা তুলনাহীন। ইসলামের আইন-বিধানেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ, নির্বিশেষে এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সার্বিক কল্যাণই তার একমাত্র লক্ষ্য। ইসলাম সমগ্র মানুষকে ইহকালীন সমস্ত দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেয়, সভ্য ও ভদ্র জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়, সামাজিক সংস্থাসমূহকে উন্নত ও শক্তিশালী বানায়, ইসলামের আদর্শ ও বিধানাবলী যখনই বাস্তবায়িত হয়েছে, তার অধীন জীবন যাপন করে সুখ ও কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে। এমন কি, ইসলামের বিরুদ্ধবাদী-ইসলামের সাথে শত্রুতামূলক আচরণকারী ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীও ইসলামের নিকট থেকে কোনরূপ প্রতিশোধমূলক হিংসাত্মক আচরণ পায়নি। এই বিরুদ্ধবাদীরা হয় ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, না হয় চুক্তিবদ্ধ কিংবা যিম্মী যে-ই হোক-না কেন।



www.pathagar.com

১। যুদ্ধরত তারা, যারা মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করছে; কিংবা মুসলিম জনগণের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, শক্তি সংগ্রহ করছে। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার, তাদের শক্তিহীন করার ও বিষদাঁত চূর্ণ করে দেয়ার। কারুর অধিকার হরণে তারা সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম শুরু করলে তথায় পূর্ণ ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার। তবে তাতে দয়া—সহানুভূতি ও মানবিক আচরণ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ইসলাম এই পর্যায়ে যে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তিদের কোনরূপ কষ্ট দেয়া যাবে না। পাদ্রী-পুরোহিত, পণ্ডিত-বিদ্বজ্জন সাধারণ কৃষিজীবি, নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, রোগী, শ্রমিক, কর্মজীবি, অন্ধ-বধির-পংগু, ছাত্র-শিক্ষার্থী এবং যুদ্ধের সাথে কোনক্রমেই জড়িত নয় এমন সব মানুষকে কোনক্রমেই হত্যা করা যাবে না। ইসলামের কোন কোন ফিকাহবিদ এই মত দিয়েছেন যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সূচিত যুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করলেও যদি তারা অন্ধ বা রোগী হয়, তা হলে তাদের হত্যা করা যাবে না। দুর্গ প্রহরায় নিয়োজিত; কিংবা আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে রত নারীদের হত্যা করা জায়েয হবে না। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে এই কথা প্রমাণিত হয়ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥

এবং তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না, পসন্দ করেন না।

—সূরা বাকারা : ১৯০

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা যুদ্ধের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে বলেছেন। এরই ব্যাখ্যায় রসূলে করীম (স.) বলেছেন, যে লোক যুদ্ধ করে না, তাকে

www.pathagar.com

হত্যা করা যাবে না। একটি যুদ্ধে একটি নারীকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে রসূলে করীম (স.) বলেছিলেন ঃ

ما كانت هذه لتقاتل فلم قتلت ؟

> এই স্ত্রীলোকটি তো যুদ্ধ করেনি, তা'হলে সে কেন নিহত হ'ল?
>
> —মুসলিম, তিরমিযী

শত্রুপক্ষ যদি মুসলমানদের সম্মুখে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের এগিয়ে দিয়ে পিছনে পিছনে অগ্রসর হওয়ার কৌশল গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রুকে আঘাত হানলে সেই শিশু-নারী-বৃদ্ধরাই যদি প্রথম শিকার হয়, আর এইভাবেই তারা মুসলমানদেরর উপর বিজয়ী হতে চায়, তা'হলে তাদের এ কৌশলকে অবশ্যই ব্যর্থ করে দিতে হবে। অন্যথায় তাদের কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। শত্রুকে হত্যা করা হ'লেও তার দেহকে কোনক্রমেই বিকৃত করা যাবে না। এই পর্যায়ে মহান নবীর বাহিনী প্রধানদের দেয়া উপদেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ

ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا -

> এবং তোমরা নিহত শত্রুর দেহকে বিকৃত করবে না এবং বাচ্চাকে হত্যা করবে না।
>
> —মুসলিম, তিরমিযী

শত্রুপক্ষের নিহত লোকদের ছিন্ন মস্তক একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া ; কিংবা সমর নায়ক বা রাষ্ট্র প্রধানের সম্মুখে তা উপস্থিত করা সম্পূর্ণ জঘন্য ও বীভৎস কাজ। নবী করীম (স.) তা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এই কাজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

> এসব হচ্ছে অনারব-অমুসলিমদের কার্যকলাপ। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলাম কোন একটি নির্দেশ জারী করেনি। বরং ব্যাপারটিকে সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সরকারকেই যুদ্ধের সর্বদিক বিবেচনা করে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সরকার বন্দীদের বিনিময় করতে পারে, মূল্য গ্রহণ করে বন্দীদের

www.pathagar.com

ছেড়েও দিতে পারে। আর বিনিময়-মূল্য ছাড়াও ছেড়ে দিলে আপত্তির কোন কারণ নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণে বিচারের যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। এই পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً -

হয় কোনরূপ বিনিময় মূল্য ব্যতীতই অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করে দেয়া হবে, না হয় ছেড়ে দেয়া হবে মূল্য গ্রহণ করে। —সূরা মুহম্মদ ঃ ৪

কিন্তু কোন অবস্থায়ই বন্দীদের ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে না। অবশ্য মুক্ত করে দেয়ার কোন পন্থাই যদি বিবেচনায় না আসে, তা'হলে বন্দীদের রেখে দেয়া হবে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে তাদের থাকতে দেয়া হবে তাদের জান-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-মাল ইত্যাদি সব কিছুরই পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। এক্ষেত্রে বন্দীরা কোন্ ধর্মের অনুসারী, তার কোন বিবেচনা বা সেই দৃষ্টিতে কোন পার্থক্যমূলক আচরণ গ্রহণ করা হবে না।[১]

আর বিজিত এলাকার লোকেরা যদি নিরাপত্তা পেয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতে সম্মত হয়, তা হলে মুসলিম নয় এমন প্রত্যেক বন্দীর নিকট থেকেই জিযিয়া আদায় করা হবে। এ হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী লোকদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি।

২—**চুক্তিবদ্ধ জনগোষ্ঠী ঃ** চুক্তিবদ্ধ জাতি বা জনগোষ্ঠী বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যাদের সাথে আমাদের মুসলমানদের—শান্তি ও যুদ্ধ নয়-এর চুক্তি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা হচ্ছে, সে চুক্তি পুরোপুরি ও অক্ষরে-অক্ষরে রক্ষা করা আমাদের জন্য একান্তই কর্তব্য। তারা যদ্দিন আমাদের প্রতি সঠিক আচরণ করবে, আমরাও তাদের সাথে সঠিক আচরণ রক্ষা করব। কোন মুহূর্তে যদি অনুভব করা যায় যে, কোন শক্তিমান প্রতিপক্ষ আমাদের সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করার চিন্তা-ভাবনা করছে

১. এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে বলে অনেক মনীষী মত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে এর বিপরীত আয়াতটি মনসূখ এবং এটি বহাল আছে বলে মত দিয়েছেন।
احكام القرآن ج ٦، ص ٢١٢

www.pathagar.com

বা সেই ধরনের তৎপরতা শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সেই চুক্তিকে তাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করব। কেননা কুরআন মজীদে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ط

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

আর যদি কখনো কোন জাতি বা জনসমষ্টির পক্ষ থেকে তোমরা ওয়াদা ভংগের ভয় পাও, তা'হলে তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে প্রকাশ্য-ভাবে তাদের মুখের উপর নিক্ষেপ কর। কেননা আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভংগকারীদের ভালোবাসেন না, পসন্দ করেন না।

—সূরা আনফাল ঃ ৫৮

এই আয়াতের ভিত্তিতেই নবী করীম (স.) ইসলামের স্থায়ী মূলনীতি হিসেবে বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ يَحُلَّنَّ عَقْدَهُ حَتّٰى

يَنْقَضِىَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذُ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ -

যাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত থাকবে, তার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তার কোন শর্ত ভংগ করবে না। অন্যথায় উভয়ের সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে চুক্তিনামা প্রতিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করবে। —আবু দাউদ, তিরমিযী

এরই ভিত্তিতে ইসলামের এই সাধারণ নীতি নির্ধারিত হয়েছে ঃ

لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ -

তোমার সাথে যে লোক বিশ্বাসঘাতকতা করলো, তোমরা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। —মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ

www.pathagar.com

এর অর্থ, চুক্তিবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সাথে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। সন্ধির কোন চুক্তি কারুর সাথে থাকলে তা পুরোপুরি রক্ষা করতে হবে। কোনরূপ চুক্তির বহাল থাকা অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা করা ইসলামী রীতির লংঘন। তা ইসলাম নয়, জাহিলিয়াত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হঠাৎ করে রাশিয়ার উপর আক্রমণ এবং পারস্যের উপর রাশিয়া-বৃটেনের যৌথ সামরিক কার্যক্রম এই চুক্তি থাকা অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণার চরম বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপ মাত্র।[১]

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তাদানের অধিকার শুধু রাষ্ট্র প্রধান—সরকারেরই নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে এই অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারী নাগরিকেরই রয়েছে। কেউ কাউকে তা দিলে তা অবশ্যই কার্যকর হবে। কেউ বিপদে পড়েও এই নিরাপত্তা লাভ করলে সে তা অবশ্যই ভোগ করতে পারবে। অবশ্য এইরূপ কোন নিরাপত্তাদান যদি গোটা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তা হলে ভিন্ন কথা।

এই নিরাপত্তাদানের অধিকার ভোগ করার জন্য নিরাপত্তাদানকারীকে মুসলিম বা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার কোন শর্ত নেই। কোন বালক বা কোন অমুসলিম যিম্মীও যদি এই নিরাপত্তা কাউকে দেয়, তা হলেও তা সম্মানার্হ ও কার্যকর হবে। নিরাপত্তাদানের ব্যাপারটি রক্ষা করার জন্য ইসলাম এতদূর এগিয়ে গেছে এবং এটা যে চরম সীমা, তাতে সন্দেহ নেই। কোন মুসলিম নাগরিক কোন যুদ্ধরত শত্রু ব্যক্তি ইংগিতে নিরাপত্তা না দেয়ার কথা বলে; কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তদ্দারা নিরাপত্তাদানের কথা বুঝে থাকে, তা'হলেও তারই বুঝমত সে কার্যত নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। এই নিরাপত্তা দেয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াজিব।

এ হচ্ছে যুদ্ধকালীন নিরাপত্তাদান পর্যায়ের কথা। তবে কোন শত্রু পক্ষ যদি ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে ব্যবসায় ইত্যাদি কোন কাজ করার নিরাপত্তা লাভ করতে চায়, তবে তা সম্পূর্ণ সরকারের আয়ত্তাধীন ব্যাপার, কোন প্রজাপর্যায়ের লোক যদি কোন যুদ্ধমান ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেয় এবং সে ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং সেই যুদ্ধমান ব্যক্তি মনে করে যে, তাকে দেয়া নিরাপত্তা কার্যকর হবে

১. তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড

www.pathagar.com

ও সে তা লাভও করবে, তা হলে সরকার তা দিতে রাযী হলে তো কোন কথা-ই নেই। আর তা না হলে তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে সরকারের কর্তব্য।

আর কোন যুদ্ধমান ব্যক্তি যদি দীন-ইসলামকে জানবার ও বুঝবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা গ্রহণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না হয়, তা'হলে তাকে তার নিজের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার কর্তব্য পালন ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আর কিছুই করণীয় থাকতে পারে না। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে ঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ -

আর মুশরিকদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় (আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার উদ্দেশ্যে) তা হলে তাকে আশ্রয় দান কর যেন যে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে ; পরে তাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌঁছিয়ে দাও। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না।

—সূরা তওবা ঃ ৬

শত্রুর দেশ থেকে কোন যুদ্ধমান ব্যক্তি যদি মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছি, তা'হলে তার সাথে কোনরূপ খারাপ আচরণ করা জায়েয হবে না। অতঃপর তাকে নিরাপত্তা দানে কোন কল্যাণ বিবেচিত না হ'লে তাকে তার জন্য বিপদমুক্ত স্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া কর্তব্য হবে। ইসলামী দেশের আশেপাশে যদি যুদ্ধমান কোন দল মুসলমানরা দেখতে পায় এবং তারা বলে যে, আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই আমরা এদেশে এসেছি এবং আমরা মনে করি, ব্যবসায়ী লোকদের প্রতি তোমরা কোন খারাপ পদক্ষেপ নেবে না, এরূপ অবস্থায় তাদের ব্যবসায়ের জন্য ছেড়ে দেয়া ছাড়া মুসলামানদের অন্য কিছু করার থাকতে পারে না। তবে তা শুভ

www.pathagar.com

বিবেচিত না হ'লে তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি সন্দেহমুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা অসদুদ্দেশ্যে বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল, অথচ মুখে তারা অন্য কথা প্রকাশ করেছে, তা'হলে তাদের ব্যাপারে ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যে-কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তাদানের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাকে এই নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং সে তার ধন-মালও পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। এমন কি, নিরাপত্তা চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের দেশে ফিরে চলে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তার ধন-মাল আমানত বা ঋণ স্বরূপ রেখে যায়, তা হলে তা-ও তার নিকট ফেরত পাঠানো ওয়াজিব হবে। সেই লোকটি মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট পাঠাতে হবে। নতুবা পাঠাতে হবে তার দেশের সরকারের নিকট।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর একটি কথা থেকে ইসলামে এই নিরাপত্তা চুক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝা যায়। তিনি একটি ঘটনার কথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন ঃ

> আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি একজন কাফিরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে। সে পর্বতের অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছিল, তখন একজন বলেছিল ঃ তোমার ভয় নেই। কিন্তু সে যখন তাকে পেয়ে গেল, তখন সে তাকে হত্যা করে ফেলল। আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, যে লোকটি এই কাজ করেছে, সে এখন কোথায় তা জানতে পারলে আমি তাকে এই হত্যার বিনিময়ে অবশ্যই হত্যা করতাম।

৩—যে লোক ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে রাযী হবে, ইসলাম তার জন্য সুস্পষ্ট কতগুলো অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। তার স্বাধীনতা অবশ্যই সংরক্ষিত হবে। তাকে মুসলিম জনগণের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন অংগ হওয়ার মর্যাদা দেয়া হবে। সে প্রীতি ও ভালবাসা পাবে, সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভের পূর্ণ অধিকার থাকবে তার। কুরআন, হাদীস, সাহাবিগণের আচার-আচরণ বর্ণনা এবং ফিকাহবিদদের অভিমতে বিস্তারিতভাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

**কুরআনের আয়াত**

কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল বিধান। তা মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের কোন একটি দিকের প্রয়োজনীয় মূলনীতির উল্লেখ করতে একবিন্দু ত্রুটি করেনি। বিস্তারিত আইন-বিধান তা থেকে সহজেই পাওয়া যায়। অমুসলিম লোক ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বসবাস করতে চাইলে তখন ইসলামী রাষ্ট্রকে কি নীতি গ্রহণ করতে হবে, তা কুরআন স্পষ্ট কণ্ঠে বলছে ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِ
جُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

যে সব লোক তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের প্রতি তোমরা ভালো ও কল্যাণমূলক আচরণ করবে, আর তাদের প্রতি সুবিচার থেকে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করছেন না। কেননা আল্লাহ্ তো সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।

—সূরা মুমতাহানা ঃ ৮

উক্ত ধরনের লোকদের প্রতি সুবিচার করার বিধান দিচ্ছে এই আয়াতটি। আর সেইসাথে তাদের সাথে ভালো ও কল্যাণমূলক আচরণে উচ্চ মর্যাদার কথাও ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না, কথাটির ধরন এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে, উক্ত ধরনের লোকেরা দীন-ইসলামের বিরুদ্ধ পক্ষ বলে সাধারণত এই ধারণাই হয়েছিল যে, ওদের প্রতি ভালো আচরণ করা যাবে না ; বরং ওদের মানবিক অধিকার দেয়ার প্রয়োজনও হয়ত নেই। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। নবী করীম (স.) এই আয়াতের আলোকেই ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ যিম্মী ব্যক্তিকে তার সাধ্যের ঊর্ধ্বের দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে বাধ্য করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াব।

—আবু দাউদ, কিতাবুল গারাজ আবু ইউসুফ

ইসলামের সুবিচারক শাসক-প্রশাসকগণ এই নির্দেশকে দৃঢ়তা ও কঠোরতা সহকারে পালন করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর শাসক-প্রশাসকদের প্রতি সব সময়ই পরম সুবিচার করার নির্দেশ দিতেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) যখন মিসরের শাসনকর্তা, তখন তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'তোমার অধীনে অনেক যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ লোক রয়েছে, যাদের সম্পর্কে নবী করীম (স.) খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে ও কঠোর ভাষায় সতর্ক করে গেছেন। অতএব তোমরা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা উক্ত হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স.) যার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন ফরিয়াদী হবেন, তার পরিণতি যে অত্যন্ত খারাপ হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।'

এই প্রসংগেই রসূলে করীম (স.)-এর এই কথাটি স্মরণীয় ঃ

مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِّنْ نَارٍ -

যে লোক কোন অমুসলিম যিম্মী নাগরিককে মিথ্যামিথ্যিভাবে কঠিন দোষে অভিযুক্ত করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের চাবুক মেরে শাস্তি দেয়া হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির মূল্য ও মর্যাদা যে কত বেশী, তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অকাট্য ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর সাথে তুলনা করে দেখা যেতে পারে সে সব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি, যা দুনিয়ার সেরা শক্তিসমূহ দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের অধিকার রক্ষার নামে করে থাকে। এটা বাস্তব সত্য যে, এসব শক্তি মুখে বা কাগজে, ফলকে ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক বড় বড় কথা বলে থাকে ; কিন্তু কার্যত তা রক্ষা করার দায়িত্ব আদৌ

www.pathagar.com

পালন করে না। তারা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির সুযোগে দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রগুলোকে অক্টোপাশে বেঁধে নেয়। অতঃপর তাদের ধন-মাল ও ইজ্জত-আবরুই শুধু লুন্ঠন করে না, দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে দেয়। সেইসাথে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে পর্যন্ত জোরপূর্বক পরিবর্তন করে দিতে বাধ্য করে। স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সকল পথই তাদের সম্মুখে বন্ধ করে দেয়।

## ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিতে যিম্মীদের প্রতি আচরণ

ইসলামী ফিকাহ ব্যবহারিক আইন-বিধান কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিরচিত। ফিকাহবিদগণ যিম্মীদের প্রতি শুভ আচরণ এবং তাদের অধিকার রক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা এমন সব নিয়ম-বিধি রচনা করেছেন, যার ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে বাস্তবে কোনই পার্থক্য থাকে নি।

ফিকাহর বিধানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যে কোন মুসলিম নাগরিক যে কোন অমুসলিম নাগরিকের নামে স্বীয় বিষয়-সম্পত্তির একটা অংশ ওসীয়ত করে যেতে পারে। এবং করলে তা অবশ্যই কার্যকর হবে। রসূলে করীম (স.) বলেছেন ঃ

لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ -

কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তির ক্রয়ের উপর ক্রয় চাপিয়ে দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে একজন নাগরিক তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর আর একটি প্রস্তাব হাযির করতে পারবে না।

—বুখারী ঃ আবু হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস বর্ণিত।

এই কথাটি শুধু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়, মুসলিম-অমুসলিম (ইয়াহুদী-খৃস্টান) সকলের ক্ষেত্রেই তা অবশ্য পালনীয় বিধান বিশেষ। ফলে এ আইন পালনে সকলেই সমানভাবে বাধ্য।

সামাজিক নিয়ম-কানুন ও সুপ্রতিবেশী সুলভ আচরণে ফিকাহবিদগণ যিম্মীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত বলিষ্ঠতা সহকারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাদের প্রতি নম্রতা ও সহানুভূতির আচরণ অবলম্বনের

www.pathagar.com

জন্য তাকিদ দিয়েছেন। কোন মুসলিম নাগরিককেই তার প্রতিবেশী অমুসলিম নাগরিককে কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার বা তার অনুপস্থিতিতে তার ধন-মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু অধিকার দেয়া হয়নি। কাউকে তা করতে দিতেও স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী ফিকাহর দৃষ্টিতে যিম্মীদের দায়িত্ব গ্রহণ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব গ্রহণ। কেউ যদি সে দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে, তা'হলে সে আল্লাহ্ ও রসূলের গ্রহণ করা দায়িত্বের ক্ষতি সাধন করলো।

ইমাম ইবনে হাজম এতদূর লিখেছেন যে, কোন বিদেশীক আক্রমণ-কারী যদি ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মীদের উপর আক্রমণ চালায়, তা'হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে যুদ্ধ করা এবং সে যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হওয়াও মুসলমানদের কর্তব্য। কেননা আসলে এই যুদ্ধ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের গৃহীত দায়িত্ব সংরক্ষণের যুদ্ধ।[১]

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যকার সমাজপতিরা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বা রায় দেবে, তা অবশ্যই কার্যকর হবে। আর তাদের জনগণেরও অধিকার রয়েছে এসব পারস্পরিক ব্যাপারে তাদের নিকট মীমাংসা চাওয়ার। আর তারাই যদি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদির মীমাংসার জন্য মুসলিম বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করে, তা'হলে যেসব কাজের সম্পূর্ণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন শরীয়তে মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সেসব ব্যাপারে সুবিচারের ভিত্তিতে রায় দেয়া ও মীমাংসার চেষ্টা করা কর্তব্য হবে সেই মুসলিম বিচারকের। আর যদি শরীয়তসমূহের রায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন হয়, তা'হলে সে মুসলিম বিচারক বা ইসলামী আদালত ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করতেও পারে, নতুবা তা তাদের সমাজ-পতিদের উপর তার ভার ছেড়েও দিতে পারে।

এই কথাটির ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি :

فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ -

---

১. المحلى لابن حزم

www.pathagar.com

অতঃপর তারা যদি তোমার নিকট আসে এবং বিচার প্রার্থনা করে, তা'হলে তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে বিচার-ফয়সালা কর। অথবা তাদের থেকে ফিরে থাক। —সূরা মায়েদা ঃ ৪২

কিন্তু কোন কোন মুজতাহিদ বলেন, এই রূপ যাবতীয় ব্যাপারের বিচার করা ইসলামী আদালতের দায়িত্ব। বিচার না করে ছেড়ে দেয়া বা তা থেকে বিমুখ থাকার কোন অধিকার নেই। তাঁদের এই কথার ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ -

এবং বিচার-ফয়সালা কর লোকজনের পারস্পরিক বিবাদীয় বিষয়ে এবং অবতীর্ণ প্রকৃত সত্য-বিধানকে বাদ দিয়ে লোকদের ইচ্ছা-কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। —সূরা মায়েদা ঃ ৪৯

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী য়াহুদী বা খ্রীস্টান কন্যা বিয়ে করা মুসলিম নাগরিকের জন্য বৈধ। এই অমুসলিম স্ত্রী ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেসব অধিকারই পাবে—পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা একজন মুসলিম নারীর জন্য নির্ধারিত। এরূপ বিবাহে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তানরা পিতার বৈধ সন্তান এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং বৈবাহিক সূত্রে নিকটাত্মীয়দের যথাযথ আচরণ-ব্যবহার পাওয়ারও অধিকারী থাকবে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দীন-ইসলাম মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয় না এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, দয়া, ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনেও তা রক্ষায় কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

শুধু তা-ই নয়। অমুসলিমদের সাথে কোনরূপ খারাপ আচরণ করার যেমন কারুর অধিকার নেই, তেমনি তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর অন্যায়ভাবে আঘাত হানাও সম্পূর্ণ অবৈধ। তারা মনে কষ্ট পেতে পারে এমন শব্দ বা ভাষায় তাদের সাথে কোন বিতর্ক করাও ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

আহলি কিতাব লোকদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হবে না। আর হলেও তা করবে অতীব উত্তমভাবে। —সূরা আনকাবুত : ৬৪

বলেছেন :

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

হ্যাঁ, তাদের সাথে বিতর্ক কর অতীব উত্তম ভংগী ও পন্থায়। নিশ্চয় জেনো, তোমার রব খুব বেশী জানেন কে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কেও তিনি খুব বেশী জানেন। —সূরা নাহল : ১২৫

কুরআন মজীদের এইসব আয়াত মুসলমানদের সম্মুখে উজ্জ্বল কর্মনীতি উপস্থাপিত করছে। তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁর দীনকে ভদ্রতাপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক আচরণের বিধানরূপে প্রতিভাত করে তুলেছেন। তাঁরা এ-ও জানতে পেরেছেন যে, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে—যারা তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র পাকায় না, কোনরূপ শত্রুতা পোষণ করে না—খুবই উত্তমমানের সামাজিক ব্যবহার রক্ষা করতে হবে। তাদের সাথে অকৃত্রিম শুভ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ-কর্মে সহযোগিতা ও সহৃদয়তা রক্ষা করতে হবে। বস্তুত অন্যান্য ধর্মের যে-সব লোক দীন-ইসলাম কবুল করেছে। তারা ইসলামের এই উন্নতমানের মানবিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেই তা করেছে। তারা লক্ষ্য করেছে, মুসলমানরা সাধারণভাবে তাদের প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করে না। সকলই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের সেই আচরণ যা রোগীর প্রতি চিকিৎসকের থাকা উচিত। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানরা যে ভুল দেখতে পান, তা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা রদ করেন এবং ইসলামের ব্যাপারে তাদের মনে পুঞ্জীভূত শোবাহ্-সন্দেহ ও ভুল ধারণা বাস্তব ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারাই দূর করতে চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

**দয়া ও সুবিচার**

ইসলামের মহান গ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্বমানবের জন্য সার্বিক কল্যাণের বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামে বিশ্বাসী জনগণকে দয়া-সহানুভূতি, ক্ষমাশীলতার শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ যদ্দিন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে প্রস্তুত থাকবে, তদ্দিন তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার ও তাদের যাবতীয় মানবিক অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। আর তাদের সাথে কোন বিতর্কে আবতীর্ণ হলেও তা খুবই ভদ্রতা ও শালীনতা সহকারে করতে বলা হয়েছে। এই পর্যায়ে কুরআনর স্পষ্ট ঘোষণা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

তোমরা আহ্লি কিতাব লোকদের সাথে উত্তম পন্থা ও ভংগী ছাড়া অন্যভাবে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হবে না। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম, তাদের ব্যাপারে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। আর তোমরা বল ঃ আমরা তো ঈমান এনেছি সেই দীনের প্রতি, যা আসলে আমাদের ও তোমাদের নির্বিশেষে সকলের প্রতিই নাযিল হয়েছিল। কেননা আমাদের ও তোমাদের রব—উপাস্য-মালিক-মনিব সার্বভৌম একজনই। আমরা কিন্তু তাঁরই নিকট আত্মসমর্পিত।

—সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬

নির্বিশেষে সকল ভিন্নমত ও ধর্মের লোকদের সাথে ভালো আচরণ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আয়াতটিতে। সেই সাথে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যালিমদের সাথে এই নির্দেশ পালনীয় নয়। বলা হয়েছে ঃ তাদের মধ্যে যারা যালিম অর্থাৎ তাদের সকলেই যালিম, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এমন কথা নয়। তারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী বলে পাইকারী হারে ও বিনাকারণে তাদের

www.pathagar.com

সকলকেই ইসলামের শত্রু মনে করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই অন্যায়। কার্যত যদি কেউ তেমন কিছু করে, তা'হলেই তাকে শত্রু মনে করা যাবে এবং তাকে ভালো আচরণ থেকে বঞ্চিত করা এবং প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও সংগত হবে।

মুসলমানরা ইসলামে বিশ্বাসী। কিন্তু এই ইসলাম মূলত একান্তভাবে তাদের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নয় এবং এই ঈমানের কারণেই তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। যদিও সে দীন সকল মানুষের জন্যই নাযিল হয়েছিল, ঈমান গ্রহণের সুযোগ সকলেরই জন্য ছিল সমানভাবে। কিন্তু তারা তার প্রতি ঈমান আনেনি, এঁরা এনেছেন, এতটুকুই পার্থক্য। অতএব তাদের মধ্যে কোন দুরতিক্রম্য সমুদ্র সৃষ্টি হয়নি। আজও যদি তারা এই দীনের প্রতি ঈমান আনে, তা'হলে তারা সর্বদিক দিয়েই মুসলিমদের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর এই ঈমান না আনাটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার মাত্র।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবীকে দীনের দাওয়াত যথাযথভাবে লোকদের নিকট শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছেন। জোর-জবরদস্তি করে লোকদের মুসলিম বা মু'মিন বানানোর কোন দায়িত্ব বা অধিকার কোনটিই তাঁর নেই। স্বয়ং শেষনবী (স.)-কে সম্বোধন করে তিনি বলেছেনঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ -

তুমি কেবল লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও—উপদেশ ও দাওয়াত দাও—তুমি তো শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য দায়ী। তুমি তাদের উপর নিয়োজিত কোন দারোগা নও।

—সূরা গাশিয়া ঃ ২১-২২

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ -

তুমি কি লোকদেরে ঈমানদার হওয়ার জন্য তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করবে? —সূরা ইউনুস ঃ ৯৯

www.pathagar.com

খোদ এই কুরআন একটি স্মারক মাত্র। তার প্রতি ঈমান আনা না-আনা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য প্রত্যেককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে বলে কাউকে তার প্রতি ঈমান আনার জন্য জোর করা যাবে না। কেননা জোর করলে সেই স্বাধীনতাকেই হরণ করা হয়। বলা হয়েছে:

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا -

এই কুরআন তো স্মারক বা স্মরণীয় মাত্র। যার ইচ্ছা এর মাধ্যমে তার রবের নিকট যাওয়ার পথ অবলম্বন করবে (যার ইচ্ছা করবে না)। —সূরা দাহর : ২৯

অমুসলিমদের সাথে কোন পর্যায়ে কোন সন্ধিচুক্তি হলে তা ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই পালন ও রক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা ভংগ করবে না বা তাদের কেউ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন কর্মতৎপরতা গ্রহণ করবে না। ইরশাদ হয়েছে:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

এবং তোমরা পূর্ণ কর ওয়াদা চুক্তি। কেননা এই ওয়াদা ও চুক্তি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। —সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪

বলা হয়েছে:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا

وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ -

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○

তবে তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীতি গৃহীত হবে যে সব মুশরিকের সাথে তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছ, তারা সে চুক্তির একবিন্দু লংঘন করেনি,



www.pathagar.com

> কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে শত্রুতার আচরণও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি তোমরা অবশ্যই পূর্ণ করে চল সে চুক্তির মেয়াদের শেষ পর্যন্ত। এটা তাকওয়ার কথা। আর আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের ভালোবাসেন। —সূরা তওবা : ৪

নবী করীম (স.) নিজে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করার তাকিদ করেছেন, সব সময়ই চুক্তি রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেছেন:

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٥

> যে লোক চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপর জুলুম করবে বা তা লংঘন করবে, অথবা তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু তার উপর চাপিয়ে দেবে, কিংবা তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়াই তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াব।
> —আবু ইউসুফ কৃত কিতাবুল খারাজ

খ্রীস্টান বা য়াহূদী ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না বলে তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তাঁর নিযুক্ত ইয়েমেনের শাসনকর্তা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লিখে পাঠিয়েছিলেন:

مَنْ كَانَ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَلَا يُفْتَنُ عَنْهَا ـ

> য়াহূদী বা খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী কাউকে তার ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না। —আবু দাউদ

নবী করীম (স.) নিজে এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফাগণ যে সব দেশে বিজয়ী হিসেবে প্রবেশ করে সেসব দেশের অধিবাসীদের সাথে যে সব চুক্তি বিভিন্ন সময়ে করেছেন, তা পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। নবী করীম (স.) 'তাগাল্লুব' গোত্রের সাথে চুক্তি করেছিলেন হিজরী নবম সনে। তাতে

www.pathagar.com

তাদের খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকা ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। যারা খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হয়েছিল, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের জন্য ইয়েমেনে নিযুক্ত শাসনকর্তাকে নির্দেশ ও দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আরব দেশসমূহের সব খ্রীস্টান ও য়াহূদীদের সাথে এই একই নীতিমালা অবলম্বিত হয়েছে। আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে থাকা 'মজুসী' (অগ্নিপূজক)-দের নিজেদের ধর্মে অবিচল থাকার অধিকার দিয়েছিলেন। তাদের নিকট থেকে শুধু জিযিয়াই গ্রহণ করা হ'ত। এরা বাহরাইন, নাজরান, হিজর ও আম্মানের অধিবাসী ছিল।[১]

নবী করীম (স.) এবং তাঁর পরে চারজন খলীফার সময়ে নাজরান-বাসীদের সাথে যে আচরণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা থেকে ইসলামের পরম উদারতা ও সহিষ্ণুতাই প্রমাণিত হয়।

নাজরানবাসীদের প্রতিনিধি দলের লোকদের সাথে রসূলে করীম (স.)-এর দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছিল। এই দীর্ঘ কাহিনী বুখারী, বুখারীর শরাহ আইনী ও ইবনে ইসহাক লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নবী করীম (স.) তাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসলাম কবুল করার। কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পরে তারা রসূলে করীম (স.)-এর সাথে সন্ধি করতে সম্মত হয়। তিনি কয়েকটি শর্তে সন্ধি করেন এবং সন্ধিনামা লিখিয়ে দেন। তিনি সে শর্তসমূহ পুরোপুরি রক্ষা করেন।[২]

তাঁর ইন্তিকালের পর তারা খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সন্ধির নবায়ন করায়। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন যে, ইয়েমেনে মুসলমানদের পাশাপাশি নাজারানী খ্রীস্টানদের অবস্থান মুসলমানদের জন্য নানা দিক দিয়ে খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি নাজরান থেকে তাদের উৎখাত করে ইরাকের নাজরান এলাকায় পুনর্বাসিত করলেন এবং তখন তাদের জন্য আর একখানা সন্ধিনামা লিখে দেন।

---

১. فتوح البلدان بلاذری ص ٧٤—١٠٣

২. ঐ ৭৫ পৃঃ।

www.pathagar.com

হযরত উমরের শাহাদতের পর হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হলে তিনি তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তা ওলীদ ইবনে উকবাকে উক্ত নাজরানীদের সাথে সন্ধির কথা লিখে জানালেন।[১]

হযরত উসমানের শাহাদতের পর হযরত আলী (রাঃ) খলীফা হলেন। তখন নাজরানীরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্বের বসবাসস্থল ইয়েমেনের নাজরানে বসবাস করার সুযোগ প্রার্থনা করল। কিন্তু হযরত আলী তাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করলেন এবং বললেন ঃ

> উমর (রাঃ) অত্যন্ত দক্ষ ও সুবিজ্ঞ খলীফা ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থানকে মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেই তাদের ইরাকী নাজরানে নির্বাসিত বা স্থানান্তরিত করেছিলেন।

পরে তিনি তাদের যে সন্ধিনামা লিখে দেন তা এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب من عبد الله على ابن ابى طالب امير المؤمنين لاهل النجرانية ؛ انكم اتيتمونى بكتاب من نبى الله صلى الله عليه وسلم فيه شرط لكم على انفسكم واموالكم وانى وفيت لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فمن اتى عليهم من المسلمين فليف لهم ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينقص حق من حقوقهم ○

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম—আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন আবূ তালিব পুত্র আলীর পক্ষ থেকে নাজরানীদের জন্য লিখে দেয়া সন্ধিপত্র এই ঃ

তোমরা আমার নিকট নবী করীম (স.) লিখিত সন্ধিপত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছ। তাতে তোমাদের নিজেদের উপর ও তোমাদের ধন-মালের উপর আরোপিত কতগুলো শর্তের উল্লেখ রয়েছে। রসূলে করীম (স.), আবূবকর ও উমর তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে দিয়েছিলেন, আমি

১. فتوح البلدان بلاذرى ص ٧٢ - ١٥٣

www.pathagar.com

> তা সবই যথাযথভাবে পূরণ করে দিয়েছি। অতঃপর যে মুসলমানই তাদের উপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত হবে, তারই কর্তব্য হবে তাদের জন্য লিখে দেয়া শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূর্ণ করা, তাদের প্রতি কোনরূপ ত্রুটিপূর্ণ আচরণ না করা, তাদের প্রতি জুলুম না করা এবং তাদের কোন একটি অধিকারও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না করা।[১]
>
> —আবু ইউসুফ কৃত কিতাবুল খারাজ

বস্তুত শুধু নাজরানীদের প্রতিই নয়, নবী করীম (স.) এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের এমনি দয়া-উদারতাপূর্ণ আচরণ ছিল সব অমুসলিম—অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণের প্রতিও। মানবতার—সভ্যতার ইতিহাসে সেরূপ দয়া ও উদারতার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে না।

## ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল পথ

এটাই ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল পথ, ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত আদর্শ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য নবী ছিলেন। তাঁর উপস্থাপিত জীবন-বিধান কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়, সমগ্র মানুষের জন্যই কল্যাণকর। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, ইসলামের সামগ্রিক মানবিক কল্যাণ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখতে হবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করার অপরাধের এভাবেই প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, এমন কোন কথা—এমন কোন দৃষ্টিভংগী বা ভাবধারাই ইসলামে গ্রাহ্য নয়।

ইসলামের এই নীতি কেবল ইসলামের নবী (স.) কর্তৃকই পালিত ও কার্যকর হয়েছে, এমন কথাও নয়। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে সিরিয়া পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্বোধন করে একটি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন ঃ

> যার সাথেই কোনরূপ সন্ধি-সমঝোতা সাব্যস্ত হবে, তা অবশ্যই পূরণ, পালন ও কার্যকর করতে হবে, যুদ্ধে নির্দয়তা নয়, দয়ার আচরণ রাখতে হবে। জনসাধারণের ধন-মাল ধ্বংস করা যাবে না, তার সংরক্ষণ করতে হবে। পাদ্রী-পুরোহিত—নিতান্ত ধর্মীয়

---

১. কিতাবুল খারাজ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ৭৪ পৃ. عمدة القارى العينى شرح البخارى

www.pathagar.com

আরাধনা-উপাসনার কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত লোকদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না, তাদের ঘর-বাড়ী ও মন্দির-উপাসনালয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে দিতে হবে।

এসব মৌলিক ও নীতিগত হিদায়ত দানের পর সাধারণ সৈনিকদের লক্ষ্য করে স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ

তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, আমানতের খিয়ানত করবে না, ধোঁকা দেবে না, পরের ধন-মাল আত্মসাৎ করবে না, নিহত ব্যক্তিদের দেহ বিকৃত করবে না, বালক-সদ্যজাত সন্তানদের হত্যা করবে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও নয়, নারীদেরও নয়, ফলের গাছ, খেজুর-গাছ কাটবে না, জ্বালিয়ে দেবে না, ছাগল-ভেড়া খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া যবেহ্ করবে না। তোমরা যদি উপাসনালয়ে একান্তভাবে নিমগ্ন লোকদের দেখতে পাও, তা'হলে অমনিভাবেই থাকতে দেবে, কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

ইসলামের ইতিহাসে সর্বজয়ী নামে পরিচিত সিপাহসালার খালিদ বিন ওলীদ হীরা অধিবাসীদের সাথে অনুরূপ শর্তে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ঃ

তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করা হবে না, কোন গীর্জা চূর্ণ করা হবে না, কোন ঘর বা প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলা হবে না, যেগুলোকে তারা দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের সিঙ্গা ফুকানোর ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে না। তাদের খুশীর উৎসব দিনে ক্রুশের মিছিল বের করতেও বাধা দেয়া হবে না। এই শর্তে যে, কোন মুসলিমের উপর কোন কাফিরকে নিয়োগ করা হবে না এবং কাফির শক্তির পক্ষে মুসলমানদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হবে না।

সন্ধিচুক্তিতে আরও লিখিত হয়েছিল ঃ

কর্মক্ষমতাহীন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের অথবা কঠিন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের অথবা পূর্বে ধনী ছিল, এখন দরিদ্র হয়ে গেছে, এবং এমন দুরাবস্থায় পড়ে গেছে যে, দু'বেলা খাবার ও জোটে না তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। শুধু তাই-ই নয়, এরূপ ব্যক্তিদের ও তাদের

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততিদের, তাদের ঘরের লোকদের ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা বায়তুলমাল থেকে করা হবে—যদ্দিন পর্যন্ত তারা দারুল-ইসলামে বসবাস করতে থাকবে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আহলি কিতাব লোকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়তাসম্পন্ন। তিনি পারস্যের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছিলেন নীতি-নির্দেশ হিসেবে ঃ

> সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বা যিম্মী হিসেবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের থেকে তার সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই অনেক দূরে রাখতে হবে। সেখানে কোন সৈনিককে প্রবেশ করতে দেবে না দীনের দিক দিয়ে দৃঢ়, নির্ভরযোগ্য ও উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি ছাড়া।

> নির্দেশ দিলেন ঃ

> সেই লোকদের নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তাদের একটা মর্যাদা আছে, তাদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। তা পূরণ করা মুসলমানদের জন্য কর্তব্য।

> সিরিয়ায় নিযুক্ত তাঁর শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

> যিম্মীদের উপর জুলুম করা, তাদের একবিন্দু ক্ষতি করা এবং বিনা-অধিকারে তাদের ধন-মাল হরণ করা থেকে মুসলমান জনগণকে বিরত রাখবে। তাদের প্রতি যে সব শর্ত পূরণের ও যা কিছু দেয়ার ওয়াদা করেছি, তা সবই যথাযথভাবে পূরণ করতে থাকবে।

হযরত উমর (রাঃ) 'ইলিয়া' অধিবাসীদের জান-মাল সংরক্ষণ ও ধর্ম পালনের অধিকার রক্ষার পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। স্পষ্ট বলেছিলেন ঃ

> তাদের খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ার দরুন তাদেরকে কোনরূপ কষ্টের মধ্যে ফেলা হবে না, তাদের প্রতিশোধের শিকারে পরিণত করা হবে না। তাদের কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া হবে না। তাদের শহরে ও তাদের সংগে কোন য়াহূদীকে বসতি বানাতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

> এর বিনিময়ে ইলিয়াবাসীরা জিযিয়া দেবে, যেমন দিচ্ছে মাদায়েনের অধিবাসীরা। তাদের মধ্য থেকে রোমানদের এবং সব চোর-ডাকাত-দের বহিষ্কৃত করে দেয়া তাদের দায়িত্ব। তাদের থেকে যে লোক বের হয়ে যাবে, সে তার প্রাণের ও ধন-মালের নিরাপত্তা পাবে—তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। আর যদি কেউ তাদের হয়ে বসবাস করে, তাহলে সেও নিরাপত্তা পাবে। তবে ইলিয়াবাসীরা যেমন জিযিয়া দিচ্ছে, তাদেরও তেমনি জিযিয়া দিতে হবে।
>
> তবে ইলিয়াবাসীদের জন্য উত্তম হচ্ছে এই যে, তারা তাদের জান-প্রাণ ও ধন-মাল নিয়ে রোমে চলে যাক। তাদের উপাসনালয়সমূহ খালি করে দিক। তা'হলেও তারা সার্বিক নিরাপত্তা পাবে।

আল্লাদ ও বায়তুল মাকদেস অধিবাসীদের জন্যও এমনি নিরাপত্তার চুক্তি লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ দামিশ্‌কবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তা লিখে দিয়েছিলেন। ধর্ম পালনের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল, তাদের নগরের প্রাচীর চূর্ণ না করার ওয়াদা করা হয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ী দখল করা হবে না এবং তাদের কল্যাণ ছাড়া কিছুমাত্র অকল্যাণ করা হবে না বলেও কথা দেয়া হয়েছিল—যদি তারা নিয়মিতভাবে জিযিয়া দিতে থাকে এই শর্তে। আর তাদের এই নিরাপত্তা দান আল্লাহ্, রসূল, খলীফা ও মুসলিম জনগণের দেয়ারূপে গণ্য হবে।[১]

হযরত উমর (রাঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁর পরে যিনি খলীফা হবেন তার জন্য অনুরূপ উপদেশ দিয়া যেতে ভুলে যান নি।

> বলেছিলেন ঃ
>
> সব ওয়াদা পূরণ করতে হবে, তাদের জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধও করতে হবে। তাদের ঘরবাড়ী বা বসবাসস্থানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হবে না এবং তাদের সাধ্যের উর্ধ্বে কোন দায়িত্ব পালনে তাদের বাধ্য করা হবে না।

---

১. تاریخ ابن بلدان ج ۲ ص ۸۲

www.pathagar.com

অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণ এইরূপ চির উজ্জ্বল ঘটনাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ। আযারবাইযান দখল করার পর সেখানকার জনগণের সাথে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল তাতেও বলা হয়েছিল ঃ

> মুসলমানরা তাদের কাউকে হত্যা করবে না, বন্দীও করবে না। আগুন পূজা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘর ধ্বংস করা হবে না।

ঠিক এই কারণেই চতুর্থ হিজরী শতকের অর্ধকাল পর্যন্ত এসব আগুনের ঘরগুলো অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষিত ছিল।[১]

## ফিকাহবিদদের অবদান

ইসলামের ফিকাহবিদগণ যিম্মী ও অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের উক্তরূপ নীতি ও আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখেছেন। ফিকাহর গ্রন্থাবলী এইসব তত্ত্বে ও তথ্যে ভরপুর হয়ে রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ খলীফা হারুন রশীদকে যিম্মী ও অমুসলিমদের ব্যাপারে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> হে মুসলমানদের নেতা! আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন। আপনার নবী ও চাচার পুত্র হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গৃহীত যিম্মীদের প্রতি অতীব নম্র ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা আবশ্যক। তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর এমনভাবে নিতে হবে, যেন তাদের উপর কোনরূপ জুলুম হতে না পারে এবং কেউ তাকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়। তাদের সাধ্যের অতীত কোন দায়িত্ব পালনের বোঝা তাদের চাপানো না হয়। তাদের আইনসম্মতভাবে দেয় ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছু যেন তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা না হয়।[২]

এইরূপ অবস্থায় ইসলামের এই মহান উদারতা ও মুসলমানদের এই মানবিক শুভ ও কল্যাণময় আচরণ দেখে বিজিত দেশসমূহের অমুসলিম অধিবাসীদের চোখ যদি ঝলসে গিয়ে থাকে, যদি হৃদয়-মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে থাকে, তাদের মুখ যদি ইসলাম ও মুসলমানদের উচ্চ প্রশংসায়

---

১. فتوح البلدان لبلاذری ص ۳۲۲، فلسفة الجهاد فی الاسلام - ۳۳۳—۲۳۰

২. كتاب الخراج لابی یوسف

www.pathagar.com

মুখর হয়ে উঠে থাকে, এইরূপ উন্নতমানের নৈতিকতা ও নিখুঁত কার্য-সম্পাদনা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তা কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার হবে না। অতঃপর মুসলমানদের দেশ জয়ের অগ্রাভিযানে তারাই যদি তাদের প্রধান সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং পরে তারা দীন ইসলাম কবুল করে নিজেদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে থাকে, তবে তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

মুসলিম শাসক-প্রশাসকগণ বিভিন্ন সময়ে অমুসলিম যিম্মীদের সাথে যেসব সন্ধি-চুক্তি ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দান করেন, ইমাম শাফেয়ী তার জন্য একটা গঠনতন্ত্র রচনা করেছেন যেন তারা তা অনুসরণ করে কাজ করতে পারেন এবং তার লংঘন না হয়, সেদিকেও সতর্ক নজর রাখতে সক্ষম হন। এই গঠনতন্ত্রটি বস্তুতই একটি বিশেষ কর্মবিধান, একটি অনুসরণীয় আদর্শ এবং সকল প্রকার সন্ধি-সমঝোতা ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির জন্য সুস্পষ্ট দিকদর্শন।

ইমাম শাফেয়ী রচিত কর্মবিধানের বংগানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

তোমার, তাদের, আমার ও সব মুসলমানের জন্য পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা যতক্ষণ আমি ও তারা সুদৃঢ় হয়ে থাকব সেই সব সহ, যা আমরা তোমাদের উপর ধার্য করেছি।...আর তা' হচ্ছে, তোমাদের উপর ইসলামের বিধানই কার্যকর হবে, কোন অবস্থায়ই এর বিপরীত কিছু হবে না—যা তোমাদের জন্য কর্তব্য হতে পারে। আর যা আমরা বিবেচনা করে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছি, তা থেকে বিরত থাকার কোন অধিকার তোমাদের থাকবে না। দ্বিতীয়ত তোমাদের কেউ যদি হযরত মুহম্মদ (স.), আল্লাহ্‌র কিতাব বা আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি কোন অবাঞ্ছিত উক্তি করে, তা' হলে আমীরুল মুমিনীন ও সমস্ত মুসলিম জনগণের দায়িত্ব থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যে-শর্তে তোমাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, সেই শর্তই চূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষে তার ধন-মাল গ্রহণ ও রক্তপাত করা সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে, যেমন করে যুধ্যমান লোকদের ধন-মাল ও রক্ত হালাল হয়ে যায়।

সেই সাথে এই শর্তও থাকল যে, তোমাদের কোন পুরুষ ব্যক্তি যদি কোন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করে, কিংবা মুসলমানের উপর

www.pathagar.com

আক্রমণ বা ডাকাতি করে, অথবা কোন মুসলিমকে তার দীন ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাহায্য করে বা মুসলিম নারীর প্রতি আক্রমণ চালাতে সাহায্য করে, শত্রু পক্ষের গোয়েন্দাকে সাহায্য করে, তা' হলে নিরাপত্তার এই চুক্তি ভেঙ্গে যাবে, তার রক্ত ও ধন-মাল সেই হালাল করে দিল বলে মনে করতে হবে। কেউ যদি কোন মুসলমানকে পায় তার ধন-সম্পদ বা মান-সম্মানে এর চাইতে কমে; কিংবা তা কান মুসলমান থেকে পেয়ে যায়, পরে তার নিষেধ আসে এমন কোন কাফির থেকে—যার সাথে কোন চুক্তি আছে বা কোন নিরাপত্তা আছে, তা হলে তাতে আইন কার্যকর হবে। আরও শর্ত এই যে, তোমাদের ও মুসলমানের মধ্যে যা কিছু সাব্যস্ত হবে, সেই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করবে। তোমাদের যে জিনিস মুসলমানের জন্য হালাল নয়, তা যদি কেউ করে তা' হলে তা আমরা প্রত্যাখ্যান করব এবং সেজন্য তোমাদের শাস্তি দেব। তা এইভাবে যে, তোমরা মুসলমানের নিকট কোন হারাম জিনিস বিক্রয় করলে—যেমন মদ্য, শূকর, মৃতের রক্ত ইত্যাদি—তা হলে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেব। আর তার মূল্যটা তোমাদের নিকট থেকে আদায় করে নিয়ে নেব, তা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব না। পণ্যটা মদ্য বা রক্ত হলে তা ফেলে দেব, যদি মৃত জিনিস হয়, তা'হলে তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলব। আর সে-ই যদি তা নষ্ট করে ফেলে, তা'হলে আমরা তার ক্ষতিপূরণ দেব না, কিন্তু সেজন্য তোমাদের শাস্তি দেব।

আরও সাব্যস্ত হ'ল, তোমরা মুসলমানকে হারাম পানীয় বা খাদ্য দিতে পারবে না। তোমাদের মধ্য থেকে সাক্ষী বানিয়ে বা ফাসিদ পন্থায় কোন বিয়ের অনুষ্ঠান করলে—তোমাদের মধ্যের বা বাইরের কাফিরের সাথে তোমরা কোন চুক্তি করলে তা মানতে আমরা বাধ্য হ'ব না। তোমরা পরস্পরে কি কি শর্তে রাযী হয়েছ, সে বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদও করবো না। তোমাদের কোন বিক্রেতা বা ক্রেতা যদি বেচা-কেনা ভেঙে দিতে চায়, আর আমাদের নিকট থেকে তার মীমাংসা চায়, তা' হলে তখন তা আমাদের বিবেচনায় ভাঙার যোগ্য হলে আমরা তা ভেঙে দেব, আর জায়েয হলে তা বহাল রাখব। কিন্তু পণ্য হস্তান্তরিত হলে তা রদ হবে না। কেননা তা মুশরিকদের

www.pathagar.com

পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়। তোমাদের বা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে কোন কাফির আমাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করলে আমরা ইসলামী বিধান অনুযায়ীই তার বিচার করব। আর যে আসবে না, তোমাদের পারস্পরিক সে ব্যাপারে আমরা নাক গলাব না। তোমরা যদি কোন মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ লোককে ভুলবশত হত্যা কর তা'হলে তার দিয়ত দেয়ার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে—এইরূপ অবস্থায় মুসলমানদের উপর যেমন বর্তায়। তোমাদের কেউ যদি তার কোন অনাত্মীয়কে হত্যা করে, তা'হলে তার দিয়ত তার ধন-মাল থেকেই নিয়ে নেয়া হবে। আর ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে তার 'কিসাস' অবশ্যই হবে। তবে নিহতের উত্তরাধিকারীরা দিয়ত নিতে রাযী হলে, তারা তা নেবে। তোমাদের কেউ চুরি করলে ও তার মামলা বিচারকের সম্মুখে দায়ের হলে হাত কাটা পরিমাণ মালের চুরি হলে তার হাত কাটা যাবে। তার জরিমানাও করা হবে। আর যদি কেউ 'কযফ'—কারুর উপর জ্বিনার মিথ্যা অভিযোগ করে, অভিযুক্ত ব্যক্তি 'হদ্দ' পাওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হ'লে তাকে 'হদ্দ' দেয়া হবে। অন্যথায় অভিযোগকারীর 'তা'জীর' হবে। এইভাবেই ইসলামী আইন কার্যকর হবে সেসব ক্ষেত্রেই—যার উল্লেখ করেছি, আর যার উল্লেখ করিনি। তোমাদের সব সুস্থ সবল পুরুষকেই মাথাপিছু হারে জিযিয়া দিতে হবে প্রতি বছর এক 'দীনার' (স্বর্ণমুদ্রা) করে। তা যথারীতি আদায় না করে কেউ তার আবাসস্থল থেকে চলে যেতে পারবে না। তোমাদের ছোট বয়সের ছেলেদের ও অপ্রাপ্ত বালকদের উপর কোন জিযিয়া ধার্য হবে না। বিবেক-বুদ্ধি হারানো বা অসুস্থ ব্যক্তির উপরও জিযিয়া নেই। ক্রীতদাসরাও জিযিয়া মুক্ত। আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নগরে অবস্থান করতে থাকবে এবং অব্যবসায়ী হিসেবে মুসলিম শহরে ছড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ এই জিযিয়া ভিন্ন আর কিছুই তোমাদের ধন-মালের উপর ধার্য হবে না। আর ব্যবসায়ী হিসেবে ছড়িয়ে থাকলে তোমাদের গোটা ব্যবসায়ের উপর থেকে এক-দশমাংশ দিতে হবে। তা হলেই তোমরা মক্কা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রবেশ করার অধিকার পাবে। হিজাজ ছাড়া যেখানেই চাইবে, অবস্থান করতে পারবে। তবে তিন রাত্রির বেশী সময় অবস্থান করতে পারবে না। মুসলিম-অমুসলিমের নিকট

www.pathagar.com

থেকে জুলুম করে নেয়া যে সম্পদের মালিকানা তোমাদের জন্য আমাদের বিচারে, হালাল হয় না, তা থেকে আমরা তোমাদের বঞ্চিত করতে পারি। আর আমাদের ধন-মালের ক্ষেত্রে যে আইন-বিধান কার্যকর হবে, তোমাদের ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য হবে।

এই যা কিছু তোমাদের উপর আমরা ধার্য করলাম, তা পূরণ করা তোমাদের কর্তব্য হবে। আরও এই যে, তোমরা কোন মুসলিমকে ধোঁকা দেবে না, তাদের শত্রুদের পক্ষেও তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কাজ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই পরিপক্ক ওয়াদা ও আমীরুল মু'মিনীন অথবা শরয়ী ব্যাপারাদির ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব থাকবে। মুসলমানদের কর্তব্য হবে তোমাদের সাথে এই ওয়াদা পূরণের ব্যবস্থা করা। আর তোমরাই যদি এইসব শর্তের ব্যতিক্রম কিছু কর, তা'হলে আল্লাহ্‌র দায়িত্ব—পরে আমীরুল মু'মিনীনের বা শরীয়তী বিষয়াদির ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব থেকে তোমরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও বঞ্চিত হয়ে যাবে।

এই লিখিত দলীল যাদের নিকট দিলাম তাদের ছাড়া অন্য যারাই এই বিষয়ে জানতে পারবে, তারা যদি তার খবর জানতে পেরে তা মেনে নিতে রাযী হয়, তা'হলে এই শর্তগুলো পালন করা তাদের কর্তব্য হবে, আমাদের জন্যও। আর যে রাযী হবে না তার প্রতি আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ...... [১]

## উদার-নীতির দৃষ্টান্ত

বস্তুত ক্ষমা-সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে ইসলাম এই প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ ও উদার-নীতি গ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ইসলাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সকলেরই জানা, কুরায়শরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম (স.)-এর উপর অনেকগুলো চ্যালেঞ্জমূলক ও অত্যাচারী শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল কুরায়শ মনিবের অনুমতি ছাড়া যে লোক মুহম্মদ (স.)-এর নিকট আসবে, তাকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন। এই শর্তটি লেখার কালি শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সহলের পুত্র আবূ জান্দাল তার লোকদের জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জিঞ্জির পরা অবস্থায়

---

১. فلسفة الجهاد في الاسلام ص ٢٣

পালিয়ে এসে রসূলে করীম (স.)-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কেননা তিনি পূর্বেই ইসলাম কবূল করেছিলেন বলে এই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, রসূলে করীম (স.) তাঁকে গ্রহণ করবেন ও তাঁর সজ্জিত বাহিনীর কাতারে শামিল হওয়ার সুযোগ দেবেন। কিন্তু ওয়াদা পূরণে দৃষ্টান্তহীন ব্যক্তিত্ব হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, তাঁকে তাঁর লোকজনের নিকট ফেরত দিলেন। কেননা সন্ধির শর্তানুযায়ী তা করা তাঁর জন্য কর্তব্য ছিল। আবূ জান্দাল রসূলে করীম (স.)-এর এই ঘোষণা শুনতে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন এবং নবী করীম (স.)-কে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন।

হে রসূল! ওরা তো আমাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবে।

জওয়াবে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

اِصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا ۔ اِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا وَاَعْطَيْنَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَاَعْطَوْنَا عَهْدَ اللّٰهِ وَاِنَّا لَا نَغْدِرُ بِهِمْ ۝

হে আবূ জান্দাল! তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং অপেক্ষা করতে থাক। কেননা আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার সাথী অন্যান্য দুর্বল-অসহায় লোকদের জন্য আনন্দ ও মুক্তিপথের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা এই লোকদের সাথে পারস্পরিক একটা সন্ধি করেছি। তার ভিত্তিতে আমরা ওদেরকে ওয়াদা দিয়েছি, ওরাও আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা দিয়েছে। আমরা তো ওদের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারি না।

এরপর আবূ বুচাইর উতবা ইবনে উসাইদও মুসলিম হিসেবে তাঁর নিকট আশ্রয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে রসূলে করীম (স.) তাকেও

www.pathagar.com

ফিরিয়ে দেন, যেমন আবু জান্দালকে দিয়েছিলেন এবং তাকেও সেইরূপ কথা-ই বললেন, যেমন আবু জান্দালকে বলেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। ঠিক যে অবস্থায় মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণে একটুও দ্বিধান্বিত হয় না, ক্রোধ ও আক্রোশে মানুষ ফেটে পড়ে, ঠিক সেই সময় ও ইসলাম ও ইসলামের নবী (স.) তুলনাহীন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করেছেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের প্রতি অবলম্বিত নীতি ও আচার-আচরণ এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য তাঁর সাহাবিগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা খাদ্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপারে তাদেরকে নিজেদের উপরও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাদের কল্যাণ ও সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা ছিলেন সদাতৎপর। শেষ পর্যন্ত বন্দীদেরকে বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্তিলাভের সুযোগ দেয়া হয়। আর যারা লেখাপড়া জানতো, তাদের প্রত্যেককে বলা হ'ল, প্রতি দশজন বালককে লেখাপড়া শেখাবার বিনিময়ে মুক্তিলাভের সুযোগ দেয়া হবে। সুহাইল ইবনে আমর নামের এক বন্দীর মুখের নীচের মাড়ির দাঁত উপড়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বক্তৃতা-ভাষণ দিত। এই ঘটনার পর সে এই কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নবী করীম (স.) তা দেখে বললেনঃ এরূপ বিকলাংগ করা আমার রীতি নয়। কেননা আমি যদি তা করি, তাহলে আমার নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ আমাকে বিকলাংগ করে দেবেন। তা ছিল রসূলে করীম (স.)-এর অশ্রুতপূর্ব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নিদর্শন।

আল্লাহ্ তাঁকে এরই নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۝

এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আর তোমার এ ধৈর্য তো শুধু আল্লাহ্র ব্যাপারে। তুমি এই লোকদের জন্য চিন্তান্বিতও হবে না।

মক্কা ছিল বিশ্বনবীর জন্মস্থান। জীবনের অর্ধেকেরও অনেক বেশী—প্রায় ৫৩ বছর পর্যন্ত তিনি এখানেই কালাতিপাত করেছেন। সেই মক্কা থেকে রসূলে করীম (স.)-কে বহিষ্কৃত হয়ে মদীনায় নির্বাসিত জীবন যাপন

www.pathagar.com

করতে হয়েছিল। তিনি মক্কা জয় করলেন, লাভ করলেন তার উপর স্বীয় পূর্ণ কর্তৃত্ব। তখন তিনি সেই অপরাধীদের উপর যে-কোন প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কোথাও বাধা দেয়ার কেউ এতে ছিল না। তিনি মক্কার লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَا تَظُنُّونَ اَنِّى فَاعِلٌ بِكُمْ ۝

আমি তোমাদের প্রতি কি ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে কর? তারা তোষামোদী সুরে বলল ঃ আপনি সম্মানিত ভাই আমাদের, সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র আপনি।

তখন নবী করীম (স.) ঘোষণা করলেন ঃ

আমি আজ তোমাদেরকে সেই কথাই বলবো, যা হীন ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের উপর বিজয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইউসুফ বলেছিলেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ ۝

আজ তোমাদের উপর আমার কোন আক্রোশ বা প্রতিশোধস্পৃহা নেই। আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়াবান। তোমরা যাও, তোমরা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত ও আযাদ।[১]

খায়বর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর অধিবাসী য়াহূদীদের বসতিতে ও তাদের বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করতে মুসলিম জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছিলেন। যদিও তারা মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তিভংগ করেছিল, আরবদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু নবী করীম (স.) কোনরূপ প্রতিশোধস্পৃহার প্রশ্রয় দেননি। উপরন্তু তাদের ফসল ও ফল-ফাকড়া পাড়া বা তাদের নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করতেও নিষেধ করেছিলেন।

---

১. যাদুল মা'আদ ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১; সীরাতুন্নবী ঃ আবুল হাসান, পৃঃ ২৭৮।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) আহলি কিতাব লোকদের অলীমার দাওয়াতে উপস্থিত হতেন, তাদের মজলিসসমূহ গোলজার করতেন, বিপদে-আপদে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং একই সমাজে বসবাসের কারণে সর্বপ্রকারের সামাজিক সম্পর্ক, লেন-দেন ও আদান-প্রদান রক্ষা করতেন। তিনি প্রয়োজন হলে তাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং সে জন্য দ্রব্য গচ্ছিত রাখতেন। আসলে রসূলে করীম (স.) এইসব কাজ ঠেকায় পড়ে করতেন, তা নয়। ইসলামের উদারতা ও উচ্চমহান আদর্শের শিক্ষাদানের জন্য এই সামাজিকতা রক্ষা করে চলতেন। এ থেকে সকলে সহজেই জানতে পারত যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে দেশবাসীর সাথে—যদিও অমুসলিম—সামাজিকতা রক্ষা করতে নিষেধ করে না। কেননা দীন আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান। যে তা পালন করবে তা তারই। আর দেশ হচ্ছে বহুবিধ মানুষের আবাসস্থল।

উত্তরকালে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ইসলামের এই আদর্শকে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই সমুন্নত করে রেখেছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সিরিয়া গেলে একটি গীর্জার নিকটে নামাযের সময় হয়। গীর্জার পাদ্রী গীর্জা-অভ্যন্তরেই নামায পড়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হলেন না। কেননা তিনি মনে করেছিলেন, একবার যদি তিনি গীর্জার অভ্যন্তরে নামায পড়েন, পরবর্তীকালে মুসলমানরা সেই গীর্জাটিকে মসজিদ বলে দাবি করতে পারেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের প্রতি এক ওসীয়াতনামা লিখে দিলেন ঃ

> এইরূপ কোন স্থানে নামায পড়া হলে আযান না দিয়ে, জামা'আতবন্দী না হয়ে এক-একজন করে নামায পড়বে।

হযরত উমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধ জীর্ণ ব্যক্তিকে দ্বারে ভিক্ষা চাইতে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কোন্ আহলি কিতাব? বলল ঃ য়াহূদী। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার এই দুরবস্থার কারণ কি? বলল ঃ আমার দারিদ্র্য, তদুপরি জিযিয়ার বোঝা বহন এবং বার্ধক্য ও অক্ষমতা। এই কথা শুনে তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ঘর থেকে উপস্থিত ক্ষেত্রে যা কিছু সম্ভব ছিল তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর বায়তুলমাল-এর ভারপ্রাপ্তের নিকট তাকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, এর অবস্থাটি একবার লক্ষ্য কর। ওর যৌবনকালের উপার্জন দিয়ে তো



www.pathagar.com

আমরা উপকৃত হয়েছি ; কিন্তু ওর বার্ধক্যাবস্থায় ওকে অসহায় অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার লাঞ্ছনা ভোগ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছি। এটা ইনসাফের কথা নয়। ওর জন্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা কর। পরে তার জিযিয়াও প্রত্যাহার করা হয়।

হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর প্রতিবেশী খ্রীস্টান কবি আবু জুবাইদের প্রতি সব সময়ই দয়াবান ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাকে নিকটে রাখতেন, মর্যাদা দিতেন এবং স্থায়ীভাবে মাসিক বৃত্তি দিতেন। এই সবই ইসলামের মহান উদারনীতির ফলশ্রুতি ছিল। আর এই কারণেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল করার জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে উঠে। কেননা তারা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানদের চরিত্রে যে উন্নতমানের মানবিক আচার-আচরণ দেখা যায়, আসলে তা ইসলামেরই অবদান।

ইতিহাসে মুসলিম বাহিনীর যে দ্রুত অগ্রগতি ও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দেশের পর দেশ বিজয়ের তুলনাহীন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, তা যে অস্ত্রের বলে ও সৈন্যসংখ্যার বিপুলতা বা দক্ষতারই ফলশ্রুতি নয় ; বরং ইসলামের উপরিউক্ত অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক বিশেষত্বই মৌল কারণ, তা এক বাস্তব সত্য। তার ঐতিহাসিক প্রমাণ হচ্ছে, সেনাধ্যক্ষ আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে সিরিয়ার খ্রীস্টান জনগণ বলেছিল ঃ

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، أَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وَإِنْ كَانُوْا
عَلَى دِيْنِنَا - أَنْتُمْ أَوْفَى لَنَا وَأَرْأَفُ بِنَا وَأَكَفُّ عَنْ ظُلْمِنَا
وَأَحْسَنُ وِلَايَةً عَلَيْنَا - وَلٰكِنَّهُمْ غَلَبُوْنَا عَلَى أَمْرِنَا وَعَلَى مَنَازِلِنَا -

হে মুসলিম সমাজ! তোমরা রোমানদের তুলনায় আমাদের নিকট অধিক প্রিয় লোক। যদিও তারা আমাদেরই ধর্মীয় ভাই। কিন্তু তোমরা আমাদের ব্যাপারে অধিক ওয়াদা পূরণকারী, অধিক দয়াশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন। আমাদের উপর অনুষ্ঠিত জুলুম

www.pathagar.com

প্রতিরোধকারী তোমরা, তোমরাই আমাদের উত্তম পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু রোমানরা আমাদের উপর ক্ষমতা দখলকারী ও কর্তৃত্ব স্থাপনকারী ও আমাদের ঘর-বাড়ী দখলকারী হয়ে আছে।[১]

হিমস শহরের অধিবাসীরা নগরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল, যেন হেরাক্লিয়াস শহরে প্রবেশ করতে না পারে। তখন তারা মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সুবিচার নীতি রোমানদের জুলুম ও নৃশংসতার তুলনায় অধিক প্রিয়।

আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে যখন ইসলাম রোমানদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত ছিল, তখন আরবের খৃীস্টান গোত্রসমূহ অতি দ্রুত-গতিতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। বনূ গাস্সান প্রভৃতি গোত্রের ইতিহাস এরই বাস্তব প্রমাণ। হিজরী চতুর্দশ বছরে কাদেসিয়া যুদ্ধকালে ফোরাত নদীর তীরে বসবাসকারী খৃীস্টান আরব গোত্রসমূহও অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের বিজয়কে সহজতর করে দিয়েছিল। 'জসর' যুদ্ধকালে ফোরাত নদী ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে মুসলিম বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময় 'তাই খৃীস্টান গোত্রপতি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আল-মুসান্না ইবনুল হারিসার সাথে মিলিত হয়ে তাদের মুক্তির এবং অবরোধ থেকে বের হয়ে আসার ব্যবস্থা করে দেয়।

মিসরের প্রাচীন অধিবাসী কিবতীরা রোমানদের নির্মম নিষ্পেষণ-নির্যাতনের অধীনে অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। হযরত আমর ইবনুল 'আস কিবতীদের মুক্তিদূত হিসেবে তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ফলে কিবতীরা আন্তরিকভাবে তাদের সম্বর্ধনা জানায়। মিসর বিজয় অত্যন্ত সহজেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

রোমানদের অত্যাচার-উৎপীড়ন এতই চরম মাত্রায় পৌছে গিয়েছিল যে, তা মানবতার ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় হয়ে রয়েছে এবং ইতিহাস পাঠক সে মর্মান্তিক কাহিনী কোন দিনই ভুলতে পারবে না। তারা প্রতিপক্ষের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতো। অতঃপর

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٢٠٧

www.pathagar.com

তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করত। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে আলেক-জান্দ্রিয়া নগরের প্রায় দুইলক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ হয়েছে যে, জাস্টিনিয়ান ও তার উত্তরাধিকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু লক্ষ মানুষ সাহারা মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে ও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বহু লোক তাদের ধর্মবিশ্বাস গোপন রেখে কোনরূপ বেঁচে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-কে কিবতীরা অতি স্বাভাবিকভাবেই সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। তারা তাঁর নিকট পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই বহু কিবতী ইসলাম কবুল করেছিল।

হযরত উমর (রাঃ) গীর্জা কর্তৃপক্ষের সাহায্য-সহযোগিতার ফলে বাবলিয়ন দুর্গ জয় করার পর তাদেরকে এই চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন যে, কোন মুসলমানই তাদেরকে গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত করতে পারবে না এবং পাদ্রী বেনিয়ামীনের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। এই পাদ্রী তেরটি বছর পর্যন্ত পলাতক থাকার পর যখন ফিরে এসেছিল, তখন তাকে তার আসনে পুনরাধিষ্ঠিত করা হয়। সে যখন আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তাকে ব্যাপক সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

মুসলমানরা পারস্য বিজয়ে অগ্রসর হলে পারসিক জনগণের দিক থেকে তাদের কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা তাদের শাসকবৃন্দ মুসলমানদের উদারতা ও সহৃদয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফ-হাল ছিল। এমনিভাবে প্রায় সকল দেশের অধিবাসীরা শুধু ধর্মীয় নির্যাতনই ভোগ করতো না, অন্যায়ভাবে ধার্যকৃত কর দিতে, অত্যা-চারমূলক শ্রেণী পার্থক্যের নিষ্পেষণে এবং ব্যক্তি শাসনের অমানুষিকতায় তারা মর্মান্তিকভাবে জর্জরিত ছিল। তাদের সুচিন্তিত ও বাস্তব পরীক্ষালব্ধ অভিমত এই ছিল যে, এইসব মারাত্মক অবস্থা থেকে একমাত্র ইসলামই তাদের মুক্তিদান করতে পারে।

বাস্তবভাবে পারস্যবাসীরা মুসলমানদের উদারতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। কেননা তারা নিজস্ব পৈতৃক ধর্ম পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারেই

www.pathagar.com

পালন করছিল। মুসলমানরা তাদের উপাসনা-আরাধনা ও উপাসনা-লয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা দিয়েছিল। ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের পরও সুদীর্ঘকাল ধরে এসব উপাসনালয়ের অক্ষত থাকাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলমানরা তাদের একজন ব্যক্তিকেও ইসলাম গ্রহণে জোরপূর্বক বাধ্য করেনি। অতঃপর পারস্যের যারাই ইসলাম কবুল করেছে তারা তা করেছে তাদের অন্তরের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলে, গ্রহণ ও অ-গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার পর এবং তাদের পৈত্রিক ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তুলনা করে ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করার পর।

ইতিহাসের অনুরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল স্পেনে। মুসলমানরা যখন প্রথমত এই দেশ জয় করেন, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের দেখতে পেয়েছিলেন কঠিন অবিচার ও নির্মম নিষ্পেষণের মধ্যে। তারা তাদেরকে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন।[১]

উত্তরকালে মুসলিম শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে অমুসলিম সুধী ব্যক্তিদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে মুসলমানদের উদার অকৃত্রিম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বহু অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। কেননা মুসলমানরা অমুসলিম সংখ্যাগুরু সমাজে বাস করেও কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকেন নি। তাদের সাথে ব্যাপকভাবে মেলামেশা করেছেন। পারস্পরিক লেন-দেন ও কায়-কারবারের ফলে তারা অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিল। আইনের দৃষ্টিতে সামাজিক ও মৌলিক অধিকারের দিক দিয়ে শাসক ও শাসিত জনগণের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যের দরুন কোনরূপ তারতম্য করা হয়নি কখনই। এমন কি বিবদমান দুই পক্ষের একটি উচ্চ মর্যাদার মুসলিম এবং অপর পক্ষ অমুসলিম—য়াহূদী বা খ্রীস্ট হওয়া অবস্থায়ও সেই অমুসলিম পক্ষ একবিন্দু পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার ভোগ করেনি। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে একজন য়াহূদী হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে খলীফার দরবারে ফরিয়াদ করেছিল। খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ 'হে আবুল হাসান, আপনি আপনার প্রতিপক্ষের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করুন।' হযরত আলী তাই করলেন। তখন তাঁর চোখে-মুখে কিছুটা

---

১. فلسفة الجهاد فی الاسلام ص ٢٥٠—٢٥٢

www.pathagar.com

অস্বস্তি ও সংকোচের ভাব প্রকাশিত হয়। বিচারকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর খলীফা হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের সমান আসনে বসতে বলায় আপনি অসন্তুষ্ট হননি তো?' জওয়াবে তিনি বললেন ঃ সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হইনি। কিন্তু আপনি আমার উপনাম ধরে ডাকায় আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে আপনি আমার ও আমার প্রতিপক্ষের মাঝে পূর্ণ সমতা রক্ষা করেন নি। ফলে আমার মনে এই আশংকাবোধ জেগেছিল যে, য়াহূদী হয়ত ভাববে যে, মুসলমানদের নিরপেক্ষ সুবিচার, সমতা ও ন্যায়পরতা বুঝি বিলীন হয়ে গেছে![১]

বস্তুত এই সবই ছিল ইসলামের মহান অবদান। প্রশ্ন হচ্ছে, বিচার, দয়া, সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ সমতার দিক দিয়ে দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থা কি ইসলামের সাথে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে?

সুবিচার, সাম্য ও ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে ইসলামের তুলনাহীন গৌরব খিলাফতে রাশিদা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। ইসলাম ও মুসলিমের তা এক অবিনশ্বর ঐতিহ্য। আব্বাসী শাসক ইবরাহীম ইবনুল মাহদী সরকারী চাকরিরত। অমুসলিম (খৃস্টান) বখ্‌তী শু'র সাথে বিচারপতি আহমদ ইবনে আবূ দাউদের উপস্থিতিতে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বখ্‌তীশু'র দিকে স্পষ্ট ইংগিত করে কটু কথা বললেন, তার উপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করলেন এবং কর্কশ ও কঠোর ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। সংগে সংগে বিচারপতি আপত্তি জানালেন। বললেন ঃ 'থামুন হে ইবরাহীম! আপনি যদি বিচারালয়েই কারুর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন, তা'হলে উচ্চ কন্ঠস্বরে ও কর্কশ ভাষায় কথা বলবেন না, হাত দ্বারা প্রতিপক্ষের প্রতি ইংগিত করবেন না। আপনার অভিপ্রায় (Intention) হতে হবে সংশোধনমূলক, ভংগী হতে হবে শালীন, আচরণ হতে হবে শান্ত, আপনার কথা হবে ভারসাম্যপূর্ণ। বিচারালয়ের, সম্মান মর্যাদা ও ভাবমূর্তিকে অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।' তখন ইবরাহীম বলে উঠলেন ঃ হে বিচারপতি! আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাকে সঠিক আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। আপনার নিকট আমার মর্যাদা নষ্ট হয় এমন কাজ আমি আর কখনই করব না। যে কাজের ফলে শেষ পর্যন্ত 'ওযরখাহী' করতে

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٢٨٠—٢٨٢

www.pathagar.com

হয়, তাও এড়িয়ে চলব। যে সম্পত্তি নিয়ে বখ্তীশু'র সাথে আমার এই বিবাদ, তার উপর আমার অধিকার প্রত্যাহার করলাম। এতেও যদি আমার ভুল শুধরে যায়, তবে আমার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। আর যে সম্পদের বিনিময়ে মূল্যবান নসীহত পাওয়া যায়, তা হ'লে তা বিনষ্ট হ'ল বলে মনে করা যায় না।'

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করা হয় না, শুধু তা-ই নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তারা উভয়ই সর্বতোভাবে সমান।

—কিসাসের ক্ষেত্রে সমান,

—রক্তমূল্য, ক্ষতিপূরণ এবং তা'জীরের ক্ষেত্রেও সমান,

—দাম্পত্য ও পারিবারিক আইনে অমুসলিমরা নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী।

—যে বিয়ে তাদের ধর্মানুযায়ী বৈধ, তা ইসলামের বিরোধী হলেও তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে।

—যে তালাক তাদের ধর্মানুযায়ী, শুধু তা ইসলামে অগ্রণযোগ্য হলেও তা কার্যকর হবে।

অমুসলিম নাগরিকদের কোন ব্যাপারেই ইসলাম কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। মুসলমানরা যেমন অমুসলিমের উত্তরাধিকার পাবে না, তেমনি অমুসলিমরাও মুসলমানদের উত্তরাধিকারী হবে না। মুসলিম স্বামী খ্রীস্টান য়াহূদী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হবে না, স্ত্রীও হবে না মুসলিম স্বামীর উত্তরাধিকারিণী।

আহলি কিতাব য়াহূদী-খ্রীস্টানদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল। তবে সেই জন্তু হতে হবে, যা মুসলমানদের জন্য শরীয়ত অনুযায়ী হালাল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ......

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

www.pathagar.com

আহলি কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল, ..আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের ঘরের সংরক্ষিত মহিলারাও (হালাল)। —সূরা মায়িদা ঃ ৫

তবে মুশরিক রমণী বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য কখনই হালাল বা জায়েয নয়। কেননা মু'মিন স্বামী ও মুশরিক স্ত্রীর মধ্যে সেই আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক কখনই গড়ে উঠতে পারে না, যা দাম্পত্য জীবনে একান্তভাবে কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। তবে মুসলিম পুরুষের জন্য য়াহূদী-খ্রীস্টান রমণী বিয়ে করা জায়েয ঘোষিত হয়েছে শুধু এই কারণে যে, ধরে নেয়া হয়েছে তারা সকলেই আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানদার হেতু তাদের মধ্যে একাত্মতা সম্ভব। উপরন্তু মুসলিমমাত্রই হযরত মূসা ও হযরত ঈসা'র আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার প্রতি পূর্ণ ঈমানদার। ফলে সে কখনই য়াহূদী বা খ্রীস্টান স্ত্রীকে ইসলাম কবুল করাতে বাধ্য করবে না, কোনরূপ প্রভাব খাটাবে না। কিন্তু কোন মুসলিম রমণীকে আহলি কিতাব পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা মুসলমান যেভাবে অন্যান্য আসমানী কিতাব দীনকে বরহক বলে বিশ্বাস করে, কিতাবী লোকেরা ইসলামকে সেভাবে সত্য দ্বীন মানে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাম্য ও বাঞ্ছনীয় সম্পর্ক কখনই গড়ে উঠবে না। তাছাড়া সন্তানরা সাধারণত এবং বিশেষভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে পিতাকেই অনুসরণ করে। তাদের সন্তান মুসলিম হবে না। উপরন্তু একজন মুসলিম নারীর পক্ষে অমুসলিম স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনতা মেনে নেয়া কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। এরূপ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক মীরাসের অধিকারী হবে না। তবে য়াহূদী শরীয়তে এর বিপরীত বিধান রয়েছে। য়াহূদী স্বামী অ-য়াহূদী স্ত্রীর মীরাস পাবে ; কিন্তু অ-য়াহূদী স্ত্রী য়াহূদী স্বামীর মীরাসের অধিকারী হবে না। ইসলাম দীনের পার্থক্যকে মীরাসের প্রতিবন্ধক মেনে নিয়েছে। ফলে মুসলমান য়াহূদী-খ্রীস্টানের উপর মীরাসের ক্ষেত্রে কোন প্রাধান্য পাবে না।[১]

ইসলাম আহলি কিতাবের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তাদের উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে তাদের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করার অবাধ সুযোগ লাভ করে। উপাসনালয় পুরাতন হয়ে গেলে তার

---

১. تفسير محاسن التاويل ج ٦ ص ١٨٤٠—١٨٤٢

www.pathagar.com

পুনর্নির্মাণ করা এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করারও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপাসনার আহ্বানে তারা সিংগা ফুঁকাতে পারবে। আর তাদের উৎসবের দিনে ক্রুশ মিছিল বের করতেও কোন বাধা থাকবে না। ঐতিহাসিক টমাস আরনল্ড উল্লেখ করেছেন, ইসলামের কোন কোন খলীফা সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আলজিরিয়া ও মিসরে নতুন করে গীর্জা নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের। সে জন্য তাঁরা বিপুল অর্থও দিয়েছেন।

অমুসলিম নাগরিকদের ধন-মাল মুসলমানদের ধন-মালের মতই রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত। রসূলে করীমের নিম্নোদ্ধৃত কথাটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঃ

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنْ اَرْضٍ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

বিনা অধিকারে কারুর এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে নিলে কিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

মুসলমানরা তার শহরের-গ্রামের অধিবাসী গরীব কিতাবী ব্যক্তিদের সাদ্‌কা-ফিতর ও সাধারণ দান-খয়রাত দিতে পারে। কেননা ইসলাম এসব সাধারণ জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে মুসলিম-অমুসলিমে কোন পার্থক্য করে না।

### ইসলামের মানবিক আবেদন

ইসলামের মৌল ভাবধারা মানবতাবাদ, নির্বিশেষে বিশ্বমানবতার প্রকৃত কল্যাণ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য—কোন ন্যায়বাদী ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না বা তা পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। ইসলামের সম্মুখে রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ-যুগ-কাল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ। মানুষ হিসেবেই সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করেছে ইসলাম। মানুষের প্রতি ইসলাম তার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই তাকে হিদায়ত—সঠিক নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান দিতে চেয়েছে। মানুষ যে জুলুম-শোষণ-নির্যাতন-নিষ্পেষণে নিমজ্জিত ও বিপর্যস্ত,

www.pathagar.com

ইসলাম তা থেকেই মুক্ত করতে চায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে। আর এভাবেই ইসলাম দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে হিংসা-বিদ্বেষ, শ্রেণী শোষণ-নিষ্পেষণ, জাতীয় পর্যায়ে যে দলননীতি ও ধর্মীয় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, তা নির্বাপণ কেবল এইভাবেই সম্ভব। কেননা এইসব কারণেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সূচনা হয়, আর পরিণামে মানুষের সব সভ্যতা ভস্ম করে, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটায়। শক্তিমানেরা দুর্বলদের দুনিয়ার বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ইসলামের এই মানবতাবাদী সম্বোধন ধ্বনিত হয়েছে কুরআনের পাতায় পাতায়, আয়াতে আয়াতে। এখানে এই পর্যায়ের কতিপয় আয়াত তুলে ধরা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

হে মানুষ! তোমরা সকলে দাসত্ব কবুল কর তোমাদের সেই রব-এর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও। তা'হলেই আশা করা যায় যে, তোমরা রক্ষা পাবে।

—সূরা বাকারা ঃ ২১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا -

হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং শুধু পারস্পরিক পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি-প্রজাতি ও গোত্র-পরিবারে।

—সূরা হুজরাত ঃ ১৩

এ আয়াতদ্বয়ের ঘোষণানুযায়ী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁকেই একমাত্র মা'বুদ-রব-সার্বভৌম মেনে নেয়ার জন্য নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

সমস্ত মানুষের সৃষ্টি হয়েছে একই পিতামাতা থেকে। অতএব সকলেরই দেহে একই পিতামাতার রক্ত প্রবাহিত। অতএব তারা সকলেই নির্বিশেষে অভিন্ন। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে তাদের বিভক্তি কেবল পারস্পরিক পরিচিতির জন্য, মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর দাঁড় করার উদ্দেশ্যে নয়।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমরা একবার বসা ছিলাম, এমন সময় একটি লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে নবী করীম (স.) দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর সংগে সংগে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম ঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! এ তো এক য়াহূদী ব্যক্তির লাশ।' তিনি বললেন ঃ 'একি একটি মানুষের লাশ নয় ? অতএব তোমরা কোন মানুষের লাশ দেখতে পেলেই সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে।'

বস্তুত এই মানবতাবাদী দীন-ইসলামের বাহক বিশ্বনবীও ছিলেন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী ও রসূল। তাই তাঁরই জবানে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

বল, হে মানুষ ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রসূল, যাঁর রয়েছে সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর—অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা। —সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮

রসূলের পর তাঁর সাহাবী ও খলীফাগণ এবং সমস্ত মুসলমান এই মানবতাবাদী ভূমিকার ধারক ও বাহক হয়ে রয়েছেন। এই পথ থেকে তাঁরা কখনই বিচ্যুত বা বিভ্রান্ত হন নি। তবে অপরিকল্পিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি ইতিহাসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায়, তা আমরা দাবি করবো না। তবে তা ঘটেছে এমন লোকদের দ্বারা, যারা মুসলিম নামধারী হলেও তারা কখনই ইসলামের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হয়নি। তারা ইসলামের মানবিক আদর্শের সাথে সুপরিচিতও ছিল না। তারা ছিল ইসলামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মূর্খ। ওরা ভালো কাজের

www.pathagar.com

পরিবর্তে মন্দ কাজই করেছে বেশী। এই স্বল্প সংখ্যক লোকদের পদস্খলন ও আদর্শ বিচ্যুতি চিন্তাবিদদের নিকট নিশ্চয়ই 'ইসলাম' বিবেচিত হবে না এবং সেজন্য ইসলামের উপর কলংকও আরোপিত হতে পারে না।

## সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি

বস্তুত ইসলামের এই মানবতাবাদী আদর্শই বিশ্বের মানুষকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং ইসলামকে কেন্দ্র করে একত্র হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছে অতীব দ্রুততা সহকারে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার। ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি ও প্রসারণ বিশ্ব-ইতিহাসে একটা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ঐতিহাসিক টমাস আরনল্ড এই পর্যায়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি মনে করেছেন, ইসলামের এই দ্রুত প্রসার ও ব্যাপক বিজয়ে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। প্রাচ্যের গীর্জাসমূহ পাঁচ শতাধিক বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। হিরাক্লিয়াসের মানবতা বিরোধী নির্যাতন-নিগ্রহের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, এ কারণেই প্রতিশোধের খোদা—যিনি শক্তি, প্রতাপ ও দাপটে একক ও অনন্য, যিনি মানুষের রাষ্ট্র শক্তিকে আবর্তিত করেন, যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা উর্ধ্বে তোলেন—যখন দেখতে পেলেন যে, রোমান শাসকরা শক্তিমদমত্ত হয়ে আমাদের গীর্জাসমূহ ও ঘরবাড়ীসহ সমস্ত মালিকানা সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে গেছে, আমাদের উপর নির্দয় নির্যাতন চালাচ্ছে, তখন তাদের হাত থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতিদানের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর—মদীনা থেকে ইসমাঈল বংশীয় লোক—আরবদের তিনি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের হাত থেকে ক্যাথলিক গীর্জাসমূহ কেড়ে নিয়ে সেগুলো 'খালকীদুনিয়া'দের নিকট হস্তান্তরিত করায় আমরা যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম, মুসলমানদের সহযোগিতায় আমরা তার ক্ষতিপূরণ করে নিতেও সক্ষম হয়েছিলাম।

এ অঞ্চলের শহর-নগরগুলো যখন একের পর এক মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করলো, তখন যে জনগোষ্ঠীর দখলে যে গীর্জা ছিল, তা তাদের নিকটই থাকতে দিলেন। আমরা অতি সহজেই রোমানদের নির্মমতা ও নিগ্রহ-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম। আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পেলাম।... হিমসের অধিবাসীরা হিরাক্লিয়াসের বাহিনীর জন্য তাদের শহরের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের

www.pathagar.com

নিকট এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের নিকট রোমানদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিচার নীতি অতীব বেশী প্রিয়, কাম্য ও গ্রহণীয়। ৬৩৩—৬৩৯ খৃীস্টাব্দের মধ্যে সিরীয় অঞ্চলে যেসব যুদ্ধ হয় এবং যেসব যুদ্ধের ফলে মুসলমানরা রোমানদেরে এই অঞ্চল থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখনও এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে এই অনুভূতিই জাগ্রত ও সক্রিয় ছিল। ৬৩৭ খৃীস্টাব্দে দামিশ্‌কবাসীরা মুসলমানদের সাথে একটা সন্ধি করে রোমানদের লুন্ঠতরাজ ও নির্যাতন-নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সমগ্র এলাকা মুসলমানদের করতলগত হয়ে গিয়েছিল। রোমানদের ধর্মীয় নির্যাতন-নিষ্পেষণকে মুসলমানদের দেয়া ধর্মীয় স্বাধীনতার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি প্রতিরুদ্ধ করেছে। তারা রোমানদের বা অন্য কোন খৃীস্টান সরকারের অধীনতা থেকে মুসলমানদের অধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।[১]

সন্দেহ নেই, ইসলাম তার এই মানবতাবাদী ও নিরপেক্ষ সুবিচার-নীতির ফলেই অতীত বিশ্বে পরম শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং কেবল এই নীতির বাস্তব অনুসরণের ফলেই ভবিষ্যতের পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে। কেননা ইসলাম মানবতাকে যা দিয়েছে, তা দুনিয়ার কোন ধর্ম—কোন মতবাদ, আইন বা সমাজ ব্যবস্থাই দিতে পারেনি। সমস্ত মানুষকে একই কাফিলার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বিশেষে সকলকে শান্তি ও সমৃদ্ধিদানের অন্য কোন উপায়ই নেই।

মিঃ গীব লিখেছেন ঃ

ইসলামের এই চিরন্তন সামর্থ্য রয়েছে মানবতার জন্য মহান কল্যাণ সাধনের। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত মানব জাতিসমূহকে একই সূত্রে গ্রথিত করে রাখার ও সকলের কল্যাণ সাধনের কোন বিকল্প পন্থার অস্তিত্ব নেই। ইসলাম এই কাজ করতে সক্ষম পূর্ণ সাম্য ও সমতার ভিত্তিতে। আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত বিরাট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চীনের ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়—সবই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, এসব বিভিন্ন বংশ, সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণীর লোকদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করার শক্তি-সামর্থ্য কেবল ইসলামেরই

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ٢٦٢—٢٦٥

www.pathagar.com

রয়েছে। আর অধ্যয়নের ক্ষেত্রেই যখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ঝগড়া নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে, তখন গোটা দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ নির্মূলকরণে ইসলামেরই আশ্রয় গ্রহণ একান্তভাবে জরুরী।

লক্ষণীয়, এখানে যে দুইটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা দুইজন ইউ-রোপীয় খ্রীস্টান ব্যক্তির উক্তি। দুইটি উক্তিই ইসলামের মানবিক দয়ার্দ্রতা ও নির্বিশেষ কল্যাণ ও নিরপেক্ষ সুবিচারের কথা প্রমাণ করে। আকীদা ও বিশ্বাসে পরস্পর দ্বন্দ্বমান মানুষগুলোর মধ্যে এরূপ আচরণের সাক্ষ্য সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। এই আচরণই অপরিহার্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সব কয়টি সভ্যতাই এ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বর্তমান পৃথিবীর মানবকুলকে ছিন্ন ভিন্ন করে রেখেছে ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও জাতীয় শক্তি-দ্বন্দ্ব। এই সব অমানবিক হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাই মানব কল্যাণকে ধ্বংস করেছে, মানব সমাজকে টুকরা টুকরা বানিয়ে দিয়েছে। মনুষ্যত্ব ধ্বংসের মুখে পেঁৗছে গেছে। অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের মূল কারণ এখানেই নিহিত। যুদ্ধের দাবানলে মানুষই ইন্ধন হয়ে জ্বলছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাতিসমূহ প্রতিটি মুহূর্ত ভয় ও আতংকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয় সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে, স্নায়বিক রোগের তীব্রতা মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। আকস্মিক বিপদের আতংকে মানুষ কম্পমান। মানুষের জীবনে কোন শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তির কোন সন্ধান নেই। পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আজকের মানবতা, সূচাগ্র পরিমাণ আলোকরেখারও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

এতদসত্ত্বেও এই মানব ধ্বংসকারী সভ্যতার স্থিতি ও বিজয় রক্ষার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ শক্তি ব্যয় করছে, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। কেননা বিশ্বের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে তারা নিজেদের মুঠোর মধ্যে ধরে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাষ্প ও বিদ্যুৎ আজ তাদেরই করায়ত্ত। আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার গুদামসমূহের চাবি তাদের মুঠির মধ্যে।

ওরা মানুষকে ধ্বংস করতে পারে, বাঁচাতে পারে না। নির্যাতন দিতে পারে, ভালোবাসতে পারে না। অতীতে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল ইসলাম। আজও মানুষকে ইসলামই রক্ষা করতে পারে। ভবিষ্যতে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিন পর্যন্ত কেবল ইসলামেরই শক্তি ও সামর্থ্য থাকবে মানুষকে সর্ব প্রকারের দুরবস্থা থেকে রক্ষা করার। এই ইসলামকে

www.pathagar.com

বাদ দিয়ে—তাকে এড়িয়ে গিয়ে যত চেষ্টাই করা হবে, সবই চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে; সাফল্য কখনই সম্ভব হবে না।

## আচরণ ও নৈতিকতা

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, ইসলাম অন্যান্য সব ধর্ম ও মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার মানবিকতা, নৈতিকতা ও অধ্যাত্মিকতার কারণে, যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে মানবিকতা ও নৈতিকতার প্রাধান্যই হচ্ছে প্রধান প্রভাবশালী উপাদান। রাষ্ট্র ও জাতি-সমূহের অহমিকা, দম্ভ ও অন্য মানুষকে পায়ের তলে রাখার প্রবণতাই আজকের দিনে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ মানবিকতা ও নৈতিকতা পদদলিত করে স্বীয় প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা জাতি ও রাষ্ট্রমাত্রেরই চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা সর্বতোভাবে পরিহার করা ছাড়া মুক্তি ও কল্যাণের আর কোন পথ নেই।

আজকের জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ গভীর অরণ্যের হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়েছে। তাদের কোন দয়া নেই, মায়া নেই, ক্ষমা নেই, সহানুভূতি নেই। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির আধকড়া মূল্যও নেই তাদের নিকট। আত্মম্ভরিতা, মুনাফিকী ও বিশ্বাসঘাতকতাই আজকের শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের প্রধান পরিচিতি।

ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের প্রাধান্য বিস্তারলাভের পর দুনিয়ার মানুষকে চরম বন্যতা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের চুক্তিসমূহ আজ বিশ্বাস্য বা নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও সন্ধি চুক্তি-সমূহকে তারা 'কাগজের উপর কালি'র অধিক গুরুত্ব দিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছে, জংগলের হিংস্র পশু-গুলোও তা দেখে লজ্জা পায়। এদের হিংস্রতার আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মানুষ ও সভ্যতা। আর বর্তমান নাস্তিক্য-বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে এই বর্বরতার প্রকাশই সম্ভব। যেমন অতীতে, তেমনি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে ওরা বাস করে; কিন্তু আল্লাহকে স্বীকার করে না। আল্লাহর প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী প্রাকৃতিক শক্তি করায়ত্ত করে ওরা আল্লাহর মানুষকে নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত করে রেখেছে;

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহ্‌র শরীয়তী আইন ওরা মেনে চলতে রাযী নয়। মানুষকে চরম মাত্রার বর্বরতার শিকার বানানো ওদের শক্তি ও ক্ষমতার দাপট রক্ষার জন্য জরুরী। মানুষের—মানুষের সভ্যতার ভস্মের উপরই নির্মিত হয় এ শক্তি ও দাপটের গগনচুম্বী প্রাসাদ। ওদের কাছে মানুষের কোন স্বীকৃতি নেই, মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই। নৈতিকতা-আধ্যাত্মিকতা ওদের দৃষ্টিতে চরম বোকামি। শক্তি আর শাসনই ওদের দেবতা। ওদের কাছে কোন অপরাধ অপরাধ নয়। বিশ্বাসঘাতকতা রণকৌশল মাত্র!

কিন্তু ইতিহাসে ইসলামী শাসন প্রশাসনের যে অভিজ্ঞতা, তা-ই বিশ্ব-মানবতার গৌরবের একমাত্র সম্বল। এই সময়ই জাহিলিয়তের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে আলোকচ্ছটা ফুটে উঠেছিল মানুষের জীবনে। কেননা ইসলাম মানবজীবনের মুক্তির বারতা ও ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল। ইসলাম মানুষকে দিয়েছে প্রকৃত মুক্তি, নিষ্কৃতি, স্বাধীনতা, আলো, মর্যাদা ও অধিকার। এই ব্যাপারে কে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী, কে কোন্ বংশের সন্তান এবং কার গায়ের চামড়ার বর্ণ ও মুখের ভাষা কি, সে দিক দিয়ে কোন পার্থক্য বা তারতম্যের একবিন্দু প্রশ্রয় দেয়নি। ন্যায় ও সত্যের এই শক্তি যখন ময়দানে অন্যায়-জুলুম-শোষণ নির্যাতনের শক্তির সহিত সংঘর্ষ বাঁধালো, তখন এই চরম আক্রোশে ফেটে পড়লো, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য অর্জনে উদ্যত হ'ল, অর্থনৈতিক শোষণ-লুণ্ঠনে আত্ম-নিয়োগ করলো। ইসলামী শক্তিকে অগ্রসর হয়ে সে শক্তির বিষদাঁত চূর্ণ করতে হয়েছে, মানুষকে মুক্ত করতে হয়েছে তার করাল গ্রাস থেকে।

কেননা নবী করীম (স.) দুনিয়ায় এসেছিলেন মানবতার দিশারি হয়ে, অর্থ লুণ্ঠন ও মানুষকে দাস বানানোর জন্য নয়। পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়ে জিযিয়া'র পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়ে গেলে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, জিযিয়া দিত যেসব লোক, তাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অর্থ লুণ্ঠনই যে ইসলামের লক্ষ্য নয়, এ তারই ঐতিহাসিক প্রমাণ।

ইসলাম মানুষকে মুক্তিদানের অভিযানে নেমে একথা কখনই ভুলে যায়নি যে, সামগ্রিকভাবে মহান মানবতার কল্যাণই তার প্রথম লক্ষ্য। বিজয়ীদের কল্যাণ ও স্বার্থ মুখ্য নয়, গৌণ। কেবল মুসলমানদের কল্যাণই তাঁর একমাত্র কর্তব্য নয়। ফলে অন্যায় ও জুলুমকে সাময়িক প্রয়োজনের

www.pathagar.com

বিচারেও কখনই প্রশ্রয় দিতে রাযী হয়নি। মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা, মুনাফিকী ও বিশ্বাসঘাতকতাকে 'রাজনৈতিক কলাকৌশল' বা 'ডিপ্লোমেসী' হিসেবেও গ্রহণ করেনি।

ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি অতীব মূল্যবান, পবিত্র, অবশ্য পালনীয় ও রক্ষণীয়। তাতে যদি মুসলমানদের স্বার্থ নষ্ট হয়, বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়, তবু ওয়াদা পূরণ অনস্বীকার্য দায়িত্ব।

## লাভ-ক্ষতির বিচার

বস্তুত ইসলাম এই নীতিতে অবিচল থেকে লাভ করেছে, পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কেননা ওয়াদা পূরণ মৌলিক নৈতিকতা। আর নৈতিকতার বাস্তব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। এই কারণে যুদ্ধ বা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম তার নীতির উপর অবিচল রয়েছে। আল্লাহ্‌র মদদ এবং অপ্রতিরুদ্ধ বিজয় মুসলমানরা লাভ করেছে তাদের এই নীতিবাদিতার কারণেই। এরই ফলশ্রুতিতে দুনিয়াবাসী দেখেছে সেই চমৎকার দৃশ্য, যার চিত্র অংকিত হয়েছে সূরা আন্‌-নসর-এ :

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -

আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় যখন আসলো...তুমি দেখলে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে ......

ইসলামের আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বমানবিক আইন হচ্ছে ওয়াদা পূরণ এবং চুক্তিরক্ষা। কেননা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا -

এবং পূর্ণ কর ওয়াদা। কেননা ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। —সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪

২৪—

www.pathagar.com

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ -

তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। —সূরা মায়িদা : ১

অপর আয়াতে ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দেয়ার পর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ওয়াদা খিলাফীর বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا -

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ -

তোমাদের অবস্থা যেন সেই স্ত্রীলোকটির মত না হয়, যে নিজেই শ্রম করে সূতা কাটলো এবং পরে সে নিজেই তা টুকরা টুকরা করে ফেলল। তোমরা নিজেদের প্রতিজ্ঞাসমূহকে পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার বানাও, যেন এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় অধিক লাভবান হতে পারে। —সূরা নাহ্ল : ৯২

এ আয়াতে ওয়াদা ও চুক্তি ভংগ করার নিকৃষ্টতম রূপটা তুলে ধরা হয়েছে। এটি দুনিয়ায় সর্বাধিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যাপার। বড় বড় ধার্মিক লোকেরাও এই কাজ অবলীলাক্রমে করে যায়; কিন্তু এটা যে মারাত্মক ধরনের অপরাধ, তার চেতনা পর্যন্ত হয় না তাদের। একালের বড় বড় রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়করা এ কাজ করছে। এক রাষ্ট্রনেতা অপর রাষ্ট্রনেতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে, পরে নিছক খামখেয়ালী কিংবা বিশেষ কোন স্বার্থের কারণে সে চুক্তি ভংগ করে কার্যক্রম গ্রহণ করে বসে, তাতে একটুও লজ্জা বোধ করে না। এই কাজকে তো অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তকার রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক 'স্ট্রাটেজী' বা 'ডিপ্লোমেসী' নাম দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে।

কিন্তু ইসলাম এই নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের নিকট ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বিরাট মাত্রার ক্ষতি হলেও ওয়াদা ও চুক্তির উপর অবিচল থাকাই ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা। ওয়াদা ভংগ করাকে ইসলাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ বলে ঘোষণা করেছে এবং তা যে-

www.pathagar.com

কোন মূল্যে রক্ষা করাকে অতিশয় মহান কাজ বলে অভিহিত করেছে। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে যথেষ্ট সংখ্যক আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ -

বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। তারা সেই লোক যারা আল্লাহ্‌র কাছে করা ওয়াদা পূর্ণ করে এবং কোন চুক্তিই ভংগ করে না। —সূরা রা'দ ঃ ২০

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ -

যেসব লোক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করে তাকে শক্ত করার পর এবং আল্লাহ্ যার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ করেছেন সেই সম্পর্ক যারা ছিন্ন করে এবং এরই ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদেরই জন্য অভিশাপ এবং তাদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে অত্যন্ত খারাপ ঘর। —সূরা রা'দ ঃ ২৫

এমনকি যে সব মুশরিক ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর এমন নির্মম নিষ্পেষণ চালিয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের বলছেনঃ

وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً -

www.pathagar.com

> তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের কাবু করতে পারলে তোমাদের ব্যাপারে না-কোন নিকটাত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখে, না-কোন ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দায়িত্বের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়।—সূরা তাওবা ঃ ৮

অর্থাৎ সময় ও সুযোগ পেলে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া মুশরিকদের চারিত্রিক বিশেষত্ব, ঈমানদার লোকদের নয়। এই ওয়াদা ভংগকারী লোকদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও একবার ওয়াদা ভংগের পর আল্লাহ্‌র ও রসূলের নিকট থেকে আর কোন ওয়াদা প্রতিশ্রুতি তারা পাবে না। কিন্তু যে ওয়াদা ইতিপূর্বে দৃঢ় করা হয়েছে, তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। মুসলমানরা নিজেদের দিক থেকে সে ওয়াদা ভংগের সূচনা করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

> হজ্জের বড়দিনে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে, আল্লাহ্ মুশরিকদের দায়িত্বমুক্ত, তাঁর রসূলও। এখানে তোমরা যদি তওবা কর তাহলে তোমাদের জন্যই মংগল। আর যে তা করা থেকে বিরত থাকবে—ভালোভাবে বুঝে নাও—তোমরা আল্লাহ্‌র মুকাবিলা করতে পারবে না। কাফিরদের পীড়াদায়ক আযাবের সংবাদ দাও সেই মুশরিকরা ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে, পরে তারা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্যও করেনি। এই লোকদের সাথে তোমরাও কৃতচুক্তিকে মেয়াদের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদেরই পসন্দ করেন। —সূরা আত্-তওবা-৩-৪

এমনকি মুসলমানরা যখন শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে যাচ্ছে, তখনও পূর্বের কৃত ওয়াদা ও চুক্তিভংগ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। বিপদগ্রস্ত ও আক্রান্ত মুসলমানরা যদি দীনের ব্যাপারে মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তা'হলে তাদের সাহায্য করা মুসলমানদের কর্তব্য, কিন্তু সেই সাহায্য সেই লোকদের বিরুদ্ধে করা যাবে না, যাদের সাথে পূর্বে ওয়াদা ও চুক্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ -

আর তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু এমন কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। —সূরা আনফাল ঃ ৭২

বস্তুত চুক্তি রক্ষায় ও ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে ইসলামের এই নীতি দৃষ্টান্তহীন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমত, কোন মতবাদই ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষার জন্য এইরূপ বলিষ্ঠতা দেখায়নি। কোন কিছুর দৃষ্টিতে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সেই গুরুত্ব নেই, যা ইসলামের দৃষ্টিতে। মূলত ইসলাম আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, ক্ষমা-সহিষ্ণুতা ও ওয়াদা পূরণের দীন। এই দীনের কোন বিকল্প নেই, হতে পারে না।

**ওয়াদা ভংগ নিকৃষ্টতম কাজ**

ইসলাম নিছক নীতিগত বা আদর্শগতভাবেই ওয়াদা রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তাই নয়। তা চিরদিনই ইসলামের বাস্তব কর্মনীতি। মুসলিমদের জীবনে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন ও অনুসরণের দৃষ্টান্ত চির প্রকট। রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তা সদা কার্যকর। ইসলামের ইতিহাসে এই পর্যায়ের ঘটনাবলী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাঃ) একজন অতীব সম্মানিত সাহাবী। কিন্তু একটি ওয়াদা পূরণ সংক্রান্ত ঘটনাই তাঁকে দলবলসহ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ---বদর যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত রেখেছিল। তিনি বলেন, 'আমি কয়েকজন সংগী সমভিব্যাহারে বদর যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়ে রওনা হয়েছি। পথিমধ্যে কুরায়শের লোকেরা আমাদের ধরে ফেলল।' জিজ্ঞাসা করল, তোমরা মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে যোগদানের জন্য যাচ্ছ ? আমরা বললাম, 'আমরা মদীনা যাচ্ছি। তখন তারা আমাদের নিকট থেকে এই ওয়াদা নিল যে, আমরা

www.pathagar.com

মদীনা যাব, কিন্তু নবী করীম (স.)-এর সংগী হয়ে যুদ্ধ করবো না।' পরে রসূলে করীম (স.)-কে এই কথা জানালে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন:

انصرفا ...... نفى بعهدهم ونستعين الله عليهم -

হ্যাঁ, তোমরা ফিরে যাও। ...... আমরা তাদের নিকট কৃত ওয়াদাও পূরণ করবো। আর সেই সাথে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্যও চাইবো। —মুসলিম

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কতিপয় মুশরিক বিশ্বাসঘাতকতা করলো, অথচ তাতে ওয়াদা ছিল—মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে যারাই কুরায়শদের সাথে মিলিত হবে, তাদের গ্রহণ করা হবে, কিন্তু কুরায়শদের যেসব লোক মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হবে, তাদের গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মুহূর্তে কুরায়শ-দের অধীনস্থ যেসব লোক রসূলের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছিল, উক্ত চুক্তির কারণেই তিনি তাদের গ্রহণ করলেন না। তিনি তাঁর কৃত ওয়াদার উপর অবিচল হয়ে থাকলেন।

আবূ রাফে' ছিলেন রসূলে করীম (স.)-এর ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করা মুসলিম। পূর্বে তিনি যখন দাস ছিলেন, তখন কুরায়শরা তাকে নবী করীম (স.)-এর নিকট কোন কাজে পাঠিয়েছিল। সম্ভবত পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, আমি যখনই নবী করীম (স.)-কে দেখতে পেলাম, আমার অন্তরে ইসলাম ও তার প্রতি ঈমান দৃঢ়মূল হয়ে বসলো। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি আর ফিরে যাব না, আপনার নিকটই থেকে যাব।' তখন তিনি বললেন:

انى لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد ولكن ارجع اليهم

فان كان فى قلبك الذى فيه الان فارجع -

আমি চুক্তি ভংগ করতে পারবো না এবং প্রেরিত প্রতিনিধিকে আটক করেও রাখবো না। না, তুমি বরং ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন

www.pathagar.com

তোমার মনের যা অবস্থা, তা যদি স্থায়ী থাকে, তাহলে পরে ফিরে আসবে।[১]

সুহাইল ইবনে আমর হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে নবী করীম (স.)-এর সাথে কথাবার্তা বলছিল। যখন শান্তি ও বিশ্রামের এ চুক্তি লিখিত হয়েছিল, তখন তাতে স্বাক্ষরদানের পূর্বেই আবু জান্দাল ইবনে সহল শৃঙ্খল জর্জরিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কাফির কুরায়শদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। সুহাইল দেখলো এ তারই পুত্র, সে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে ধরে ফেললো। বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ! এক্ষণে মূল ঝগড়া তো তোমার ও আমার মধ্যে সৃষ্টি হল।' নবী করীম (স.) বললেন ঃ 'তুমি ঠিকই বলেছ! আবু জান্দাল অবস্থা দেখে শংকিত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন ঃ 'হে মুসলমানরা! আমাকে কি মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে? তাহলে তো তারা আমাকে ইসলাম কবুলের কারণে কঠিন নির্যাতনে ফেলবে।'

কিন্তু তার এ ফরিয়াদ কোন কাজে আসলো না। রসূলে করীম (স.) সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে তাঁর পিতার হাতে কুরায়শদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন, যদিও তখন পর্যন্ত সন্ধিপত্রে কোন পক্ষ থেকে স্বাক্ষরই করা হয়নি।[২]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নিয়োজিত সেনাপতি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ইরাক অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লিখে পাঠালেন ঃ 'আমাদের একজন ক্রীতদাস ইরাক অধিবাসীদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে, সে এ বিষয়ে আমার মত জানতে চাচ্ছে। অতএব আমি কি করবো, তা নির্দেশ করুন।' জওয়াবে খলীফা নির্দেশ লিখে পাঠালেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَظَّمَ الْوَفَاءَ فَلَا تَكُوْنُوْنَ اَوْفِيَا حَتّٰى تَفُوْا ...

فَوَفُّوا لَهُمْ وَانْصَرِفُوْا عَنْهُمْ -

১. مستدرک حاکم ج ۳ ص ۵۹۸

২. سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۲

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা পূরণের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তোমরা ওয়াদা পূরণ না করা পর্যন্ত ওয়াদা পূরণকারী হিসেবে গণ্য হতে পারো না। অতএব তোমরা এই ওয়াদা পূরণ কর ও তাদের থেকে ফিরে দাঁড়াও।[১]

ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং কিছু বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। দাসশ্রেণীর একজন মুসলমানের কৃত ওয়াদাকে খলীফাতুল মুসলিমীন সত্য বলে মেনে নিলেন এবং তাঁর সেনাপতিকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। এতে করে ইসলামে মুসলমানদের পারস্পরিক পরম সাম্যনীতির যথার্থতা প্রমাণিত হল। এক ব্যক্তির দেয়া ওয়াদা—সে ব্যক্তি যে-ই এবং যে মর্যাদারই হোক না কেন, সে ওয়াদা পূরণ করতে গোটা মুসলিম সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রচালকও একান্তভাবে বাধ্য। ইসলামে রণকৌশলের খাতিরেও ওয়াদা খিলাফী করার অধিকার দেয়া হয়নি; বরং ওয়াদা রক্ষাকে ভিত্তি করেই রণকৌশল রচনা এবং প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তন করতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। তারও মূল কারণ রসূলে করীম (স.)-এর এই ঘোষণা ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ -

মুসলিম জনগণের রক্ত পরস্পর সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার এবং তাদের গৃহীত দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের সকলকে চেষ্টা করতে হবে।

—বুখারী, মুসলিম

মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করবে, তা হবে গোটা জনগোষ্ঠীরই বোঝা। সকলকেই তা বহনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে একজনের ওয়াদা সকলেরই ওয়াদা। তাই তা অপূরিত থেকে গেলে গোটা জনগোষ্ঠীরই সেজন্য অপরাধী সাব্যস্ত হতে হবে।

হযরত উমর (রাঃ)-এর কথা, 'ওয়াদা পূরণ না করলে ওয়াদা পূরণকারী হতে পারবে না' এ বাক্যটি খুবই অর্থপূর্ণ। ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি-চরিত্রের সহিত এই বাক্যটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম নিছক মৌখিক ওয়ায-নসীহত ও নীতিকথার ধর্ম নয়। তা একটি পূর্ণাংগ ও পুরোপুরি

---

১. زاد المعاد ج ١ ص ٣٨٣

www.pathagar.com

বাস্তব জীবন বিধান। তাই অপর পক্ষ চুক্তি ভংগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এইরূপ আশংকা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ওয়াদা ভংগের ও বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুমতি নেই। যদি তেমন অবস্থাই দেখা দেয়, তাহলে প্রকাশ্যভাবে সে চুক্তি ও সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ ঘোষণা করাই ইসলামের নীতি। (সূরা আল-আনফাল-এর ৫৮ আয়াতে এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আয়াতটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে)।

এই পর্যায়ে অনেকের মনে রসূল করীম (স.)-এর একটি কথা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় জেগেছে। কথাটি হল الحرب خدعة। 'যুদ্ধ প্রতারণা মাত্র।' যদিও মূলত এতে সংশয়ের কিছুই নেই। কেননা 'যুদ্ধে' তো 'প্রতারণা' চলেই। তাতে দোষ নেই। কেননা যুদ্ধ এমন ব্যাপার, যেখানে 'শান্তির' কোন প্রশ্ন নেই। যুদ্ধ যখন কার্যত ঘোষিত হয়, তখন যুদ্ধ পর্যায়ের কর্মনীতিই অনুসৃত হবে, শত্রুপক্ষ তা ভালো করেই জানে এবং সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তার যা নেওয়া দরকার, সে তা নেবেই। তখনকার সময়ে 'প্রতারণা' বা ধোঁকাবাজি একটা রণকৌশল, রণদক্ষতা পর্যায়ে গণ্য। কিন্তু তা শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তো চলতে পারে না।

এই কারণেই নবী করীম (স.) যখন কোন যুদ্ধ করার সংকল্প করতেন, তখন তিনি বিপরীতটা প্রদর্শন করতেন, যেন শত্রুপক্ষ ধোঁকায় পড়ে যায় এবং অসতর্কাবস্থায় আক্রান্ত হয়। সেই সাথে তারাও, যারা শত্রুর পক্ষ সমর্থন করেছে ও তাদের কাতারে শামিল হয়ে গেছে। এজন্য নিশ্চয়ই নয় যে, শান্তিপ্রিয় ও চুক্তিবদ্ধ লোকেরা ধোঁকায় পড়ে এবং অতর্কিতে আক্রান্ত হবে।

## দুর্বলতা নয়, রূঢ়তা-কঠোরতাও নয়

ইসলামের এই নীতিবলিষ্ঠতাই ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। অতএব তাতে ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ধূর্ততা বা চাতুর্যের কোন স্থান নেই। অতএব ইসলাম যেমন কোনরূপ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয় না, তেমনি রূঢ়তা ও কর্কশতারও কোন সুযোগ নেই। ইসলাম তাই শক্তিমানের শক্তি, মর্যাদা-শীলের মর্যাদা, ওয়াদা পূরণকারীদের প্রতিশ্রুতি।

আশ্রয় প্রার্থনাকারী কাফিরদের নিরাপত্তাদানেও ইসলামের নীতি অপরিবর্তিত। কেননা তার কোন শক্তি থাকে না—যদ্দ্বারা সে আঘাত হানতে

www.pathagar.com

পারে। অতএব তাকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়াই শিষ্টাচার। কেননা ইসলাম বিরোধী ও প্রতিপক্ষের ধ্বংস ও বিলুপ্তি চায় না, চায় কল্যাণের দিকে তাদের পথ দেখাতে এবং নিয়ে যেতে। ইসলাম খুব তাড়াহুড়ো করেও আগে-ভাগে কাউকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করার পক্ষপাতী নয়। তবে শত্রুপক্ষ সর্বাগ্রে পদক্ষেপ শুরু করে দিলে তখন তা অবশ্যই প্রতিরোধ এবং মুকাবিলা করা হবে। অত্যাচার যে শুরু করল, আসলে সে-ই অপরাধী এবং দায়ী। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না (সূরা তওবা'র ৬ আয়াতে এই নির্দেশ রয়েছে। আয়াতটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে)। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী আশ্রয় প্রার্থনা এবং আশ্রয় দেয়ার ওয়াদা করা নিছক কথার কথা নয়, তা রীতিমত সংরক্ষণ ও হিফাযতের প্রতিশ্রুতি। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানদানের এই উচ্চতর মান কেবল ইসলামই কার্যত রক্ষা করেছে, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ তা করেনি এবং পারেওনি। ইসলামের আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইনে শত্রুপক্ষের প্রেরিত দূত বা দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও কথোপকথনের (Negotiations) লোকেরাও পূর্ণ নিরাপত্তা প্রাপ্তির অধিকারী। তাদেরকে কোন অবস্থাতে স্পর্শও করা যেতে পারে না।

মিথ্যা নবুওয়্যত দাবীকারী মুসায়লামা আল্-কায্যাবের প্রতিনিধি হয়ে ইবনুন্ নাওয়াজাহ ও ইবনে আতাল এই দুই ব্যক্তি রসূলে করীম (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে আল্লাহ্‌র রসূল, তোমরা দুইজন কি এই বিশ্বাস রাখো এবং এর সত্যতার সাক্ষ্য দাও ?' তারা বললো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রসূল।' জওয়াবে রসূলে করীম ( স. ) বললেন :

آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَلْتُكُمَا -

আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানদার। আমি যদি কারুর প্রেরিত ব্যক্তিকে হত্যা করার নীতিতে বিশ্বাসী হতাম, তা হলে অবশ্যই তোমাদের দুইজনকে হত্যা করতাম।

কিন্তু যুদ্ধ ভিন্নতর। যুদ্ধকালে শান্তিকালীন নীতি অনুসরণীয় হতে পারে না। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ হচ্ছে মানবতার মুক্তি সংগ্রাম।

www.pathagar.com

মানুষকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সীমালংঘন, জুলুম ও নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কুসংস্কার ও বাতিল মতবাদের উৎখাতের সংগ্রাম। সর্ব দিক দিয়ে মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রাম। লালসা-কামনার লোভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ব্যক্তি-শাসন, রাজতান্ত্রিক শাসন ও প্রভু শ্রেণীর শাসন নির্মূল করার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম মানবতার মর্যাদা রক্ষা করে, বৃদ্ধি করে। মানুষের অধিকার আদায় করে ও পাইয়ে দেয়। দুঃখী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যই তা চালিত হয়।

ইসলামের যুদ্ধ পুঁজিপতিদের চালিত যুদ্ধ নয়। ওরা যুদ্ধ করে শিল্প-কারখানার উৎপাদনকে বাজারজাতকরণ, তার চাহিদা বৃদ্ধি ও যথেচ্ছ মূল্য আদায়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে। সে যুদ্ধ সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। মানুষের আত্মা ও নৈতিকতাকে কঠিনভাবে বিপর্যস্ত করে, মনুষ্যত্বকে সংহার করে। মানুষের কল্যাণের সকল পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

ইসলামের যুদ্ধ মওজুদদারদের সম্মিলিত শক্তির যুদ্ধ নয়। ওরা তো শাসনাধীন দেশগুলোর কাঁচামাল লুটে নিয়ে 'ফিনিশ্‌ড গুডস্‌' বানিয়ে উপনিবেশের লোকদের তা অতি চড়াদামে কিনতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। কিন্তু ইসলাম এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, উপনিবেশবাদের উচ্ছেদকামী।

এই যুদ্ধ সুদখোর সুদী কারবারীদেরও যুদ্ধ নয়। বে-হিসাব মুনাফা লুটার ও পুঁজির স্তূপ রচনার এবং পরে তা দিয়ে সাধারণ জনমানুষকে শোষণ করে আরও পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম কখনই যুদ্ধ করে না। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা ইসলামের নীতি বহির্ভূত, এমনকি অন্য কাউকে তার সুযোগ করে দিতেও রাযী নয়।

**ইসলামের যুদ্ধ**

লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করে একই দেশের—একই নগরের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই দেশে পরিণত করে জনসাধারণকে চিরদিনের তরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ইসলাম যুদ্ধ করে না, ইসলামী যুদ্ধের পরিণতিতে কোন দেশকে বিড়ালের পিঠা ভাগ করার মত অবস্থায়ও ফেলে দেয়া হয় না। অধিকৃত দেশের বা এলাকার লোকজনকে অন্ধ,

www.pathagar.com

'বধির' 'মূক' বানিয়ে দেয়ার অমানুষিক কার্যক্রমের পক্ষপাতীও নয় ইসলাম।

ইসলামের যুদ্ধ মানবতাবাদী যুদ্ধ। সে যুদ্ধ মানব সমাজে নিয়ে আসে অনাবিল শান্তি, সাম্য, প্রীতি ও সমৃদ্ধি-নির্বিশেষে সকলের জন্য। মানুষ-মাত্রের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই হয় ইসলামী যুদ্ধের পরিণতি। কেবল নীতিকথা হিসেবেই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও সেখানে কালো-শ্যাম-হলুদ-সাদা-পীত বর্ণের যেমন তারতম্য থাকে না, তেমনি থাকে না মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্য, সকলের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা; সকলের জন্য অধিকার ও মর্যাদা।

ইসলাম সুদ, ঘুষ, মওজুদদারী, সীমাতিরিক্ত মুনাফাখোরী এবং শোষণ সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধেই ইসলামের যুদ্ধ। মানুষকে এইসব শোষণমূলক কার্যক্রম থেকে চিরতরে মুক্ত করার লক্ষ্যেই চলে ইসলামের ক্ষমাহীন জিহাদ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগুলোর প্রচণ্ডতাই যুদ্ধের কারণ ঘটায়। ইসলাম এগুলোকে হারাম করে দিয়ে যুদ্ধের কারণকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

ইসলামের যুদ্ধ বা জিহাদ কেবল আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁরই দেখিয়ে দেয়া নিয়ম-নীতিতে। এক আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ইহকালে ও পরকালে লাভ করাই হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধের চরম ও পরম লক্ষ্য।

## ইসলামী জিহাদ মানবিক

ইসলাম কেবল উপরিউক্ত লক্ষ্যেই যুদ্ধকে সমর্থন করে, তার অনুমতি দেয়। এই কারণে তা একান্তই মানবিক। নির্বিচারে মানুষকে কষ্ট দেয়া, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করা, পাইকারী হারে নরহত্যা চালানো এবং সম্মুখের সবকিছু ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কোন কাজই হতে পারে না ইসলামী যুদ্ধে। বেসামরিক জনগণ ও দুর্বল-অক্ষম-রোগাক্রান্ত লোক হত্যা তার কাজ হতে পারে না। জুলুম ও অনিষ্টের কারণসমূহ দূর করা এবং তা থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই চালিত হয় ইসলামী যুদ্ধ। সম্প্রসারণবাদ, লুট-তরাজ ও নারী ধর্ষণের লালসা চরিতার্থ করা হয় না ইসলামী যুদ্ধে। রসূলে করীম (স.) ইসলামী যোদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

www.pathagar.com

فَلَا يُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيْفًا وَلَا امْرَأَةً

শিশু, শ্রমজীবী এবং নারীকে যুদ্ধে কখনই হত্যা করবে না। [১]

যুদ্ধে প্রতিপক্ষের কাতারে পড়ে নিহত বালকদের দেখে নবী করীম (স.) দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে রসূল! আপনি কেন এত দুঃখিত হচ্ছেন, ওরা তো মুশরিক লোকদের সন্তান'? এই কথা শুনে তিনি ব্যথিত হলেন এবং বললেন :

إِنَّ هٰؤُلَاءِ خَيْرٌ مِنْكُمْ إِنَّهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ أَوَ لَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَإِيَّاكُمْ وَقَتْلَ الْأَوْلَادِ - إِيَّاكُمْ وَقَتْلَ الْأَوْلَادِ ...

মনে রেখো, ওরা কিন্তু তোমাদের চাইতে অনেক ভালো। কেননা ওরা তো জন্মগত স্বভাবের উপর রয়েছে। ওরা যদি মুশরিকদের সন্তান হয়ে থাকে তা' হলে তোমরাও কি তা-ই নও? সাবধান হও, কখনই শিশু-সন্তানদের হত্যা করবে না, সাবধান থাকবে, শিশু-সন্তানদের কখনই হত্যা করবে না।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর প্রেরিতব্য সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে নসীহতস্বরূপ বললেন :

তোমরা এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে, যারা মনে করে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে, তাদের প্রতি ও তাদের কাজের প্রতি তোমাদের নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কোন নারীকে তোমরা হত্যা করবে না, বালক-বালিকাও নয়, থুত্থুরে বুড়োদেরও নয়। অকারণে গাছ-গাছালি কাটবে না, কোন প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবে না। —মুয়াত্তা ইমাম মালিক

যুদ্ধের ময়দানে সেনাবাহিনীর হাতে হযরত উমর (রা.)-এর এই মর্মে এক ফরমান পৌঁছায় :

---

১. তিরমিযী, ষষ্ঠ খণ্ড।

www.pathagar.com

'বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বাচ্চাদের হত্যা করবে না এবং বিশেষ করে চাষী ও কৃষিজীবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে অবশ্য ভয় করবে। ... ... ...

অন্য এক ক্ষেত্রে তিনি সৈনিকদের উপদেশ দিয়েছেন ঃ

থুত্থুরে বৃদ্ধদের হত্যা করবে না, নারীদের হত্যা করবে না, বাচ্চাদের হত্যা করবে না। দুই পক্ষ যখন প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত, সেই মুহূর্তেও তাদের হত্যা করাকে এড়িয়ে যাবে। কঠিন লুঠ-তরাজের সময়ও।

বলা বাহুল্য, খলীফাগণের এ সব উপদেশ হাওয়ায় উড়ে যেত না, ইসলামের মুজাহিদগণ এসব পালনের মাধ্যমেই যুদ্ধ করতেন। অতীতকাল থেকেই এইসব ইসলামের যুদ্ধনীতির অন্তর্ভুক্ত, অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ব্যতিক্রম ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিরল।

**ইসলামের চির উচ্চশির**

ইসলাম শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়ে অমুসলিমদের প্রতি যে ভূমিকা পালনের ঘোষণা দিয়েছে, তা সর্বদিক দিয়েই উন্নত। ইসলাম চির উচ্চশির। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতা বিশ্বমানবতার সাথে চরম শত্রুতা করেছে। যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে এই সভ্যতা যে ভূমিকা পালন করেছে, তাতে মনুষ্যত্বের ঘটেছে চরম অপমান। মানবতা হয়েছে ধূলাবলুন্ঠিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত। এই সভ্যতার মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বর্তমান পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী রাখেনি। চতুর্দিকে ও সর্বক্ষেত্রে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, ভস্ম করে দিচ্ছে মানুষের সত্তা, মানুষের বসতি, মানুষের নৈতিকতা, মানুষের খাদ্য-পানীয় সম্পদ, পণ্যদ্রব্য, ক্ষেত-খামার, হাট-বাজার, শহর-বন্দর-নগর, হাসপাতাল-পাঠশালা, মাদ্‌রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ-মন্দির, গীর্জা-গুরুদাওয়ারা সব-কিছু। এরই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে স্বৈরতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী আকাশ-চুম্বি প্রাসাদ। মানবদেহের অংশকে ইট বানানো হয়েছে এবং রক্তের সিমেন্ট দিয়ে সে প্রাসাদের ইটগুলো একটির উপর আর একটি রেখে গেঁথে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার করার এবং মানুষের রচিত বিধানের অন্ধ অনুসরণের ফলেই আজকের মানবতা চূড়ান্ত ধ্বংসের গভীর গহ্বরে নিপতিত।

www.pathagar.com

অথচ ওরা হয়ত মনে করে যে, ওরা নিজেদের জন্য তার চাইতেও উত্তম কল্যাণের ব্যবস্থা, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য করতে চান। ওরা আসলে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে। ওরা বুঝে না, আল্লাহ্ ওদের জন্য যে মহাকল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন, তার চাইতে উত্তম কিছু করা ওদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। ওরা নিজেদের জন্য একের পর এক—যত পথই বের করেছে ও অনুসরণ করেছে, তার কোনটিই ওদেরকে একবিন্দু কল্যাণ দিতে পারেনি। কাফির সভ্যতা বা ধর্মহীন সভ্যতা মানবতার কোন কল্যাণই করতে পারে না, এই কথাটুকুও ওরা বুঝতে পারে না। বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যদ্দিন ইসলামের হস্তে সমর্পিত না হবে, ইসলামের সুবিচার, ন্যায়পরতা, প্রেম-ভালোবাসা ও শান্তির নীতি যদ্দিন বাস্তবভাবে কার্যকর না হবে, তদ্দিন বিশ্বমানবতা ধ্বংসের গ্রাস থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। মানব রচিত মতাদর্শের ভিত্তিতে ওরা যত সভ্যতাই গড়ে তুলুক, কোনটার দ্বারাই কিছু হওয়া সম্ভব হবে না।

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

কালের শপথ! মানুষ মূলতই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত—সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে। —সূরা আসর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ইসলামই শান্তি

[ সংশয়মুক্ত সত্য—শান্তির বাহন শরীয়ত—নিদর্শন ও আচরণ—বিশ্বাসঘাতকতার জওয়াবে ও বিশ্বাসঘাতকতা নয়—শান্তিই ইসলামের মৌল ভাবধারা—শান্তির জন্য অস্ত্র সংগ্রহ—যুদ্ধ—দয়া সহকারে; কুরআন ও মানসিক শান্তি—ঈমানই শক্তির উৎস। ]

২৫—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## সংশয়মুক্ত সত্য

সন্দেহ নেই, ইসলাম শান্তির বিধান, শান্তির বাহক, শান্তির স্থাপয়িতা, শান্তির পৃষ্ঠপোষক। ইসলামের অপর নাম শান্তি। ইসলামের ধাতুগত অর্থই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কেননা ইসলাম হচ্ছে বিশ্বলোক স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধান। এই বিধান মানুষ গ্রহণ করে নিজেকে আল্লাহ্র নিকট পূর্ণমাত্রায় সমর্পিত করতে পারে। আর নিজেকে আল্লাহ্র নিকট পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্পিত করতে পারলেই শান্তি অনিবার্য। তাই ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্র নিকট সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ। বিশ্ব-লোকের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্র নিকট পূর্ণমাত্রায় আত্মসমর্পিত বলেই তথায় পূর্ণ মাত্রায় শান্তি বিরাজিত। তা' হচ্ছে আল্লাহ্র প্রাকৃতিক বিধানের কার্যকারিতা। কিন্তু আল্লাহ্ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিধান দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। প্রাকৃতিক বিধানের পূর্ণমাত্রায় কার্যকারিতার পর মানুষের কর্মজীবনের অনুসরণের লক্ষ্যে তাঁর নবী-রসূলগণের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন শরীয়তের বিধান। প্রাকৃতিক জগতে শান্তি বিরাজ করছে আল্লাহ্র প্রাকৃতিক বিধানের কার্যকারিতায়। অতএব মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় আল্লাহ্র শরীয়তী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

আল্লাহ্র শরীয়তী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই ইসলামী জিহাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। কেননা মানুষ বিশ্বলোকের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ন্যায় —এই দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণী ও জীব-জন্তুর ন্যায় শান্তিতে বসবাস করতে চায়। অশান্তি মানুষের কাম্য নয়। মানব-স্বভাবের সাথে শান্তিহীনতার নেই একবিন্দু সাযুজ্য; বরং আছে চরম বিরোধ, চিরবৈপরীত্য। অশান্তি মানুষের স্বভাব বিরোধী। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য তার চেষ্টা, তার সংগ্রাম চিরন্তন, অশান্তি দূরীভূত করে পূর্ণাঙ্গ শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যেই নিবদ্ধ হয় ইসলামের জিহাদ। তাই জিহাদ মানুষের স্বভাবগত। ইসলামের দাওয়াত এই জিহাদেরই আহ্বান। তাই জিহাদ অস্ত্রনির্ভর নয়। ইসলামী

www.pathagar.com

দাওয়াতের সূচনা যুক্তির ভিত্তিতে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং মন ও মানস বিজয়ী উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে। ভয় দেখিয়ে, প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বাধ্য করে, লোভ দেখিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য করে এই জিহাদ চলতে পারে না। এই জিহাদের বীজ বপিত হয় মানুষের চিন্তায়, চরিত্রে, কর্মে, আচরণে, তৎপরতায় ও সাধনায়। শক্তি প্রয়োগ এক্ষেত্রে শুধু অর্থহীনই নয়, হাস্যকরও। ইসলামী শরীয়ত রহমতের দীন। ইসলাম এই রহমতের সীমা কখনই লংঘন করেনি।

বরং প্রকৃত কথা এই যে, ইসলাম মুসলমানদের কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছে সমগ্র সৃষ্টিলোকের প্রতি, দুনিয়ার সব জীবজন্তু ও বস্তুর প্রতি এবং নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের প্রতি দয়া-অনুকম্পা, প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করতে এবং বাস্তবে তা প্রদর্শন করতে। নিছক গায়েপড়ে শত্রুতা, অকারণ সীমালংঘন ও বিদ্রোহ ভিন্নতর অবস্থা। এই ভিন্নতর অবস্থার জন্য বিধানও ভিন্নতর।

ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর খলীফা চতুষ্টয় এই নীতি ও ভাবধারায়ই কাজ করেছেন। এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছেন, এই উন্নত মানবিক আচরণকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করে তুলেছেন নিজেদের জীবনব্যাপী সাধনা ও তৎপরতার মাধ্যমে।

ইসলামের প্রথম আবেদন প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি। ব্যক্তিকেই তা সর্বপ্রথম গ্রহণ করতে হয়। ইসলামের বিধান ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। কেননা কোন ব্যক্তিই এককভাবে—অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক না রেখে জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষ স্বভাবতই মানুষের সাথে সম্পর্কশীল। মানুষের নিঃসংগ জীবন অসম্ভব।

মানুষ প্রথমে একত্রিত হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। এখানেই মানুষের জন্ম এবং লালিত পালিত হয়ে ক্রমশ বড় হওয়া। পরিবারসমূহের সম্পর্কশীল জীবনই হচ্ছে মানুষের সামাজিকতা। মানুষ তাই সামাজিক সত্তা। সমাজ ও পরিবারের বাইরে মানুষের জীবন অচিন্তনীয়।

মানুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত। সমস্ত মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতা এক ও অভিন্ন। এই অভিন্ন মানবতাই ইসলামের লক্ষ্য। তাই কুরআনের ঘোষণা স্মরণীয়ঃ

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى ۝

হে মানুষ! আমরা তো তোমাদের সকলকে একই আদি পুরুষ ও আদি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। —সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

অতএব মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই। মানুষের এই অভিন্নতা ও একত্বই ইসলামের লক্ষ্য। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এক ও লা-শরীক এবং সমস্ত মানুষ অভিন্ন, এই হচ্ছে ইসলামের তওহিদী আকীদার মর্মবাণী। এই তওহিদী আকীদা অকাট্য যুক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও মর্মস্পর্শী উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমেই প্রচারিতব্য। এইজন্য ইসলাম মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে, চিন্তা-শক্তিকে উদ্বোধন করে, আল্লাহ্র সৃষ্টিলোককে অনুধাবন করতে এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়মকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়।

**শান্তির বাহন শরীয়ত**

ইসলামী শরীয়ত শান্তির পক্ষপাতী। শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের প্রবণতা। যেখানে ইসলাম নেই, সেখানে শান্তিও নেই। তাই শান্তি স্থাপন এবং শান্তি রক্ষার লক্ষ্যেই ইসলামের জিহাদ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথম যেদিন তওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন, সে দিন থেকেই তিনি 'জিহাদ' শুরু করেছেন। এই জিহাদ যাবতীয় অন্যায়, মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে। কেননা এই অন্যায়, মিথ্যা ও বাতিলই হচ্ছে যাবতীয় অশান্তির মূল উৎস। তিনি অশান্তির মূল উৎসটিকেই উৎপাটিত করতে চেয়েছেন। মক্কার অধিবাসীরা তাঁর উপর এবং তাঁর প্রতি ইমানদার লোকদের উপর অবর্ণনীয়ভাবে অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছে কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও জিহাদকে থামান নি। কেননা এই জিহাদ চালানোর দায়িত্ব দিয়েই তো তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘ তেরোটি বছর পর্যন্ত তাঁকে এই জিহাদ চালাতে হয়েছে; কিন্তু 'কিতাল' তিনি শুরু করেন নি মক্কার পটভূমিতে। কারণ আল্লাহ্ তখন তাঁকে শুধু জিহাদই করতে বলেছেন, কিতালের কোন নির্দেশ দেন নি। এই কারণে কুরআন মজীদের মক্কায় অবতীর্ণ অংশে শুধু জিহাদের নির্দেশই প্রকট, কিতালের নয়। কেননা 'জিহাদ' ব্যাপক অর্থবোধক, আর 'কিতাল' বিশেষ অর্থ বোঝায়। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা—ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়ার পর আবার উঠে চেষ্টা চালানো, চেষ্টা চালাতে থাকারই নাম জিহাদ। আর সশস্ত্র যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষকে দমন করা, প্রয়োজনে নরহত্যা চালানোকেই কুরআনী পরিভাষায় বলা হয় 'কিতাল'। এই কিতাল-এর অনুমতি মক্কী পর্যায়ে রসূলে করীম (স.)-কে দেয়া হয়নি। মক্কী পর্যায়ের সুদীর্ঘ তেরোটি বছর পর্যন্ত রসূলে করীম (স.)-কে শুধু জিহাদই চালাতে হয়েছে, কিতালের আশ্রয় নিতে পারেন নি। আসলে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার বিরাট ও দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামে মক্কী পর্যায় ছিল নিতান্তই প্রাথমিক এবং তখন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে শত্রু নিধনের বা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে লোকদের মুসলিম হতে বাধ্য করার কোন প্রশ্নই উঠে না। মক্কী পর্যায় ছিল অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক দাওয়াতী ও মনমগজ গড়ে তোলার পর্যায়। আর দলীল-প্রমাণ দেয়ার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলেই তখন অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কারণে মক্কী পর্যায়ে ইসলামের দুশমনরা অস্ত্র ও শক্তির প্রয়োগ করেছে লোকদের ইসলাম থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। কেননা তাদের নিকট জাহিলিয়তের—শিরক-এর স্বপক্ষে পেশ করার মত কোন যুক্তিই ছিল না। তারা শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগ করেছে সাধ্যানুপাতে, নবী করীম (স.) ও মুসলমানরা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও অনস্বীকার্য দলীল উপস্থাপিত করেছেন। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে উদ্বোধন করেছেন।

উত্তরকালে মুসলমানরা যখন একটি সুসংবদ্ধ দল বা সমাজে সংগঠিত হয়ে উঠেন, তখন তাঁদের উপর অকারণ আক্রমণ হলে তার প্রতিরোধ করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। দীনী দাওয়াত বিস্তারের পথে অনাহূত বাধা এলে তা অতিক্রম করা—প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে তা দূর করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কেননা অন্যায়কে অনুরূপ অন্যায় দ্বারাই প্রতিরোধ করা স্বভাবের নিয়ম। মানুষের প্রকৃতিও তাই। এই কারণে ইসলামী বিপ্লবী দাওয়াতের ত্রয়োদশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'কিতাল'-এর অনুমতি প্রদান করা হয়। এই অনুমতি দানের মূলে দুইটি কারণ নিহিত। একটি শত্রুপক্ষের অকারণ সীমালংঘনমূলক আচরণ ও গায়েপড়ে আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা এবং দ্বিতীয়, দীনের দাওয়াতী অভিযানকে সকল বাধা ও বিপত্তি থেকে মুক্ত করা। মানবতাকে সকল জুলুম-নিপীড়ন ও দুঃশাসন থেকে নিষ্কৃতি দান, আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণ করে একান্তভাবে তাঁর বান্দা হয়ে জীবন যাপন করার পথে বাধাদানকারী শয়তানী শক্তিসমূহের মস্তক চূর্ণ করা। কেননা ইসলাম সারাজাহানের

www.pathagar.com

সৃষ্টিকর্তার নাযিল করা দীন। এই দীন কবুল করা ও তদনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করা দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার। এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার ইখতিয়ার কারুরই থাকতে পারে না। যদি কেউ তা রাখতে চায়, তা'হলে তার এই মানবতা-পরিপন্থী কাজ নস্যাৎ করে দেয়া ইসলামী শক্তির কর্তব্য।

ইসলামী শক্তির এই 'কিতাল' নীতি মানব-সমাজের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতে সুবিবেচিত। সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতির সাথে অতিশয় সাযুজ্যপূর্ণ। তাই ইসলামের 'কিতাল' বা যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক (Defensive) ও আক্রমণমূলক (Offensive) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা নিতান্তই অর্থহীন। এই সবই ইসলামের সেই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য নির্দেশিত হয়ে বিশ্বনবী (স.) কাজ শুরু করেছিলেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র দাওয়াত দিয়ে সেই প্রথম দিনে।

এই 'কিতাল'-এর প্রথম অনুমতিমূলক আয়াত নাযিল হয় মদীনা শরীফে। তাতে শুধু অনুমতি দান স্বরূপ বলা হয়ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا - وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ۝ نِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ
يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ - وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا - وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ - إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

www.pathagar.com

الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

অনুমতি দেয়া হয়েছে সেই লোকদের, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা ওরা মজলুম। আর আল্লাহ্ তাদের সাহায্যে নিশ্চয়ই সক্ষম। এরা সেই লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত-বহিষ্কৃত হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলেঃ আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি ওদেরকে পরস্পরের দ্বারা দমন না করতে থাকেন, তা'হলে খানকাসমূহ, গীর্জাসমূহ, উপাসনালয়সমূহ এবং মসজিদসমূহ—যেসব স্থানে খুব বেশী করে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হয় সেগুলো সব চুরমার করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের সাহায্য করেন যারা তাঁর সাহায্য করবে। আল্লাহ্ বড়ই শক্তিমান, সর্বজয়ী। এরা সেই লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায আদায় করবে, যাকাত দেবে, সব কল্যাণমূলক কাজের বিধান করবে ও সব অন্যায় কাজ নিষিদ্ধ করবে। আর সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ। —সূরা হজ্জ ঃ ৩৯-৪১

এই আয়াত কয়টিতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র এবং অনুমতির কারণ অতি সূক্ষ্মভাবে ও সীমিত-সুনির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, ইসলামী সমাজের ব্যক্তিদের উপর থেকে জুলুম প্রতিরোধ করা। এই প্রতিরোধ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য করার ওয়াদাও রয়েছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

এই জুলুমের প্রকৃতি ও রূপ বিভিন্ন। তার মধ্যে নিকৃষ্টতম ও বীভৎসতম রূপ হচ্ছে মুমিন লোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা শুধু এই অপরাধে যে, ওরা কেবল আল্লাহ্‌কেই ওদের রব বলে ঘোষণা করেছে। ওরা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক মেনে নিয়ে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে প্রস্তুত নয়। আয়াতের শেষাংশে সমাজ-সভ্যতার চিরন্তন ও শাশ্বত নিয়মের উল্লেখ রয়েছে। তারই

www.pathagar.com

কারণে প্রাচীনতম কাল থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। তা হচ্ছে, পৃথিবীতে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ, দীন প্রচারের সুযোগ-সুবিধা এবং যে কোন দীন গ্রহণ করে জনগণের জীবন যাপনের অধিকার বহাল রাখা। প্রতিষ্ঠান বলতে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সব ধর্মের উপাসনালয়, গীর্জা, গুর্দাওয়ারা এবং মসজিদ ইত্যাদির। আসলে এগুলোই তো ধর্মীয় পীঠস্থান ও পাঠশালা। তাতেই নিহিত মানুষের সৌভাগ্যলাভের কারণসমূহ। ধর্মবিরোধীদের উৎপাত ও অত্যাচারে মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত, পদদলিত হতে থাকে, তখন বিজয়ীদের কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বের নির্মাণ ও সংগঠন, সুবিচার ও ন্যায়পরতার বিস্তার এবং আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ কার্যকরকরণ এবং ন্যায়ের প্রচলন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সাধন।

সূরা আল-মুমতাহানার নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকেও যুদ্ধ সংক্রান্ত ইসলামী চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আয়াতটি এই ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ○ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ
وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ -
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

যেসব লোক তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের কারণে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘড়-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের প্রতি তোমরা ভালো ব্যবহার কর.ব এবং সুবিচার করবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছেন না। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের কারণে যুদ্ধ

www.pathagar.com

করছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘড়-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃত করার কাজে পরস্পর প্রকাশ্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, এই লোকদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করতে পারবে না। যারা এই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।

—সূরা মুমতাহানা ৮-৯

এই আয়াতদ্বয় থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কাফির লোকদের সাথে ভালো আচরণ করা নিষিদ্ধ হয়েছে কেবল এ কারণে নয় যে, তারা কাফির; বরং স্পষ্টত এ কারণে যে, তারা নিজেরাই পূর্বাহ্নে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে, দীনের কারণেই শত্রুতা করেছে এবং মুসলমানদের ঘড়-বাড়ী থেকে তাদের বহিষ্কৃত করেছে, বহিষ্কারে পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। কিন্তু যারা তা করেনি, তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ যথাযথ আদায় করা কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। অতএব প্রথমোক্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খুবই যুক্তিসংগত। এই যুদ্ধ না করলেই বরং মুসলমানদের কঠিন বিপদ।

উপরে উদ্ধৃত যুদ্ধ করার অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর ক্রমাগতভাবে এই পর্যায়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। সেই সব আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইসলামের যুদ্ধ যেমন নিছক আক্রমণাত্মক নয়, তেমনি নয় নিছক প্রতিশোধমূলকও। সমাজে বিরাজমান অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন, আল্লাহদ্রোহিতা ও মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে রাখার মত অপরাধ নির্মূল করা ও সামাজিক-সামগ্রিক বিপর্যয় রোধ করা এই যুদ্ধ ছাড়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য অন্যায় ও বিপর্যয়ের হস্তকে চূর্ণ করে দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব পন্থা।

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণাদানকারী যে সব আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য তুলে ধরেছে, তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। কেননা সমাজ-সমষ্টির সংরক্ষণের জন্য তা একান্তই অপরিহার্য। তা হচ্ছে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের উপর আঘাত ও আক্রমণ। এই আক্রমণ ও আঘাত মানুষের জান-প্রাণের উপর আঘাত ও আক্রমণের তুলনায়ও অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। মানুষের প্রাণ সংহারও এর তুলনায় ভালো। কেননা মানুষ যদি তার বিশ্বাসকে রক্ষা করে জীবন যাপন করার সুযোগ না পায়, তাহলে শুধু মানুষের আকৃতি নিয়ে

www.pathagar.com

বেঁচে থাকা পশু জীবনের চাইতেও নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য। অতএব মানুষের স্বাধীন আকীদা-বিশ্বাস রক্ষার এবং তা সহ জীবন যাপনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যুদ্ধ করা থেকেও পিছপা হওয়া চলবে না। মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা না থাকলে এবং নিজেদের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপনের সুযোগকে অস্বীকার করা হলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, কুরআনী পরিভাষায় সেই অবস্থাকে বলা হয়েছে 'ফিত্না'। কুরআন মজীদে যে কা'বা ও হারাম শরীফকে শান্তি ও মানুষের মিলনকেন্দ্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে শিকার ও রক্তপাত, জীবহত্যা—এমনকি তাজা ঘাস উপড়ানোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেখানেও যদি ফিত্নার সৃষ্টি হয়, মানুষের মর্যাদা যদি ধূল্যাবলুণ্ঠিত হয়, তাহলে সেই 'ফিত্না' দমন এবং মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূল কা'বা ও হারাম শরীফেও যুদ্ধ করার অনুমতি আল্লাহ্ দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পরিণতিতে মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়, কেবল এক আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করে জীবন যাপনের সুযোগ পায়, তা হলেই মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল বলে মনে করা যেতে পারে। যুদ্ধের কারণও তখন নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে কুরআনের দুটি আয়াত এখানে উল্লেখ্য ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا -
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ -
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ -

এবং যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমালংঘন করবে না। কেননা আল্লাহ্

www.pathagar.com

সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। তোমরা তাদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাবে এবং তাদের বহিষ্কার কর সেই স্থান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছিল। কেননা আসলে 'ফিত্না' হত্যা থেকে অধিক ক্ষতিকর। মসজিদে হারামের নিকট তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছে। আর তারাই যদি তোমাদের বিরুদ্ধে তা করে, তাহলে তোমরাও তাদের হত্যা করবে। —সূরা বাকারা ঃ ১৯০-১৯১

এ আয়াতে 'ফিত্না' 'হত্যাকাণ্ডের' চাইতেও অধিক মারাত্মক বলা হয়েছে। কেননা এই ফিত্না বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও চেতন-অনুভূতির উপর আঘাত ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অবস্থা। মানুষকে হত্যা করার তুলনায় এই অবস্থা বস্তুতই অধিক মারাত্মক।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ٥

এবং যুদ্ধ কর ওদের সাথে, যেন ফিত্না'র চূড়ান্ত অবসান ঘটে এবং দীন-আনুগত্য-প্রাধান্য ও আইন-বিধান কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর ওরা বিরত হয়ে গেলে আর কোন বাড়াবাড়ি করা চলবে না। তবে জালিম লোকদের সম্পর্কে এই নির্দেশ বহালই থাকবে। —সূরা বাকারা ঃ ১৯৩

পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

অতঃপর যে লোক তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক কাজ করবে, তোমরাও তার উপর সেই সীমালংঘনমূলক কাজ কর—

www.pathagar.com

যতটা সে তোমাদের উপর সীমালংঘনমূলক আচরণ করেছে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। —সূরা বাকারা ঃ ১৯৪

এ আয়াতে সীমালংঘনমূলক আচরণের প্রতিরোধার্থে সীমালংঘনমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে ঠিক এতটুকুই, যতটা শত্রুপক্ষ করেছে, তার অধিক নয়। অধিক যাতে না হয়ে যায়, সে জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করতে—সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ভয় মানব মনে জাগ্রত করে দিয়ে কুরআন আশা করছে যে, যুদ্ধ হবে কেবলমাত্র সে সব অবস্থায় যখন শত্রুপক্ষ থেকে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়িমূলক তৎপরতা চালানো হবে। মানুষের মন যেন একগুঁয়েমিতে না পড়ে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে না যায়।

ইসলামে যুদ্ধ করার প্রথম কারণ পর্যায়ে এ সব আয়াত থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেছে। এর দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

তোমাদের কি হয়েছে—তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এরূপ অবস্থায়ও যুদ্ধ করছো না, যখন দুর্বল-অক্ষম-দরিদ্র পুরুষ-নারী ও বাচ্চারা ফরিয়াদ করছে এই বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরে এই দেশ থেকে বাইরে নিয়ে যাও—মুক্তি দাও, যে দেশের শাসন কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকেরা নিরন্তর জুলুমকারী এবং প্রার্থনা করছে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য তোমার নিকট থেকে একজন বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দাও এবং

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দাও তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী। —সূরা নিসা ঃ ৭৫

জালিম শাসকদের অধীন মানুষের জীবন স্বাভাবিক নয়। তথায় নারী-পুরুষ ও বালকরা এতই দুর্বল অক্ষম অবস্থায় দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয় যে, শত চেষ্টা করেও সে জুলুম থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, পারে না সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে জুলুম থেকে বাঁচতে। এরূপ অবস্থায় তাদের ফরিয়াদ জানাবার একটি মাত্র স্থানই অবশিষ্ট থাকে, আর তা হচ্ছে সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্। কোন স্থান বা এলাকার মানুষ যখন নিরুপায় হয়ে এই ধরনের আর্তনাদ করে উঠে, তখন দুনিয়ার মুসলমানদের কর্তব্য হয় এই মজলুম জনগণকে মুক্তি-দানের লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের জন্য মুক্তিদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা উচিত। মুসলিম শক্তির নির্যাতিত মুসলিমদের এই বুকফাটা আর্তনাদ শোনার পর কোন মুসলিম শক্তির পক্ষেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার ও তাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কোন অধিকারই থাকতে পারে না। এট তাদের দীনী কর্তব্য—দায়িত্ব।

অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং স্বীয় বাছাই অনুযায়ী যে কোন ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং তা যাদের নেই, যারা তা থেকে বঞ্চিত, তাদের তা অর্জন করিয়ে দেয়ার জন্য ইসলামী যুদ্ধ চলবে, চালাতেই হবে।

কিন্তু এরূপ অবস্থা যদি না হয়, যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু না করে, বরং তোমাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করে, তা'হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ

فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

www.pathagar.com

তবে তারা যদি তোমাদের ছেড়ে দেয়—তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে বরং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে তা হলে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর কোন পথই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখেন নি। —সূরা নিসা ঃ ৯০

আয়াতটি থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। যারা মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসবে না, সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবে, কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ বাঁধাতে চাইবে না, মুসলমানদেরও কোন অধিকার নেই তাদের সাথে অকারণ সংঘর্ষ বাঁধাবার, গায়ে পড়ে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধাবার। উপরন্তু যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে আগ্রহী ও উদ্যোগী হবে, তাদের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মুসলমানদের কর্তব্য।

কিন্তু অমুসলিমদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। তারা সেই লোক, কুরআন যাদেরকে 'মুনাফিক' গণ্য করেছে। তাদের আচরণ অস্পষ্ট ও প্রতারণাপূর্ণ। তারা নিজেদের লোকদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের সাথে সাথে মুসলমানদের নিকট থেকেও নিরাপত্তা লাভের কৌশল ও ছল-চাতুরী করে। কিন্তু সুযোগ পেলে মুসলমানদের উপর আঘাত হানতে একটুও দ্বিধা বা সংকোচ করে না। এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ -
كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا - فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ○

www.pathagar.com

এমন আরও কিছু লোককে তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়, পেতে চায় নিজেদের জনগণের দিক থেকেও ; কিন্তু তারা যখনই ফিত্‌না সৃষ্টির সুযোগ পাবে, তাতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোক তোমাদের সাথে মুকাবিলা করা থেকে যদি বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে ও নিজেদের আক্রমণের হাত বিরত না রাখে, তা'হলে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য আমরা তোমাদের সুস্পষ্ট ফরমান দিলাম। —সূরা নিসা : ৯১

## নিদর্শন ও আচরণ

ইসলামী সমাজের এ-ই ছিল বিশেষত্ব। ইসলামী যুদ্ধের মূলীভূত কারণ-সমূহ এতেই নিহিত। সর্বক্ষেত্রে তা-ই কার্যকর। ইসলামের মূল লক্ষ্য শান্তি, মানবতাকে শান্তি দানই ইসলামের একমাত্র সাধনা। কেননা মানুষ যদি দুনিয়ায় শান্তি এবং স্বস্তিতেই বসবাস করতে না পারলো, তা'হলে তার গোটা বৈষয়িক জীবনই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম তা বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়, এই শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যেই মুসলমানকে যুদ্ধ করতে হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠাই তার পরমতম লক্ষ্য। এমন কি অমুসলিম শক্তি যদি নিতান্ত প্রতারণার ছলেও শান্তি ও সন্ধির কথা বলে, তা'হলেও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে, তাদের এই কথা মেনে নিতে হবে। বলা হয়েছে :

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

ওরা যদি সন্ধিচুক্তি করার জন্য আগ্রহী হয়, তা'হলে তোমরা সেজন্য প্রস্তুত থাকো। সেই সাথে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও রাখো। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। —সূরা আনফাল : ৬১

শত্রুপক্ষের সন্ধি প্রস্তাব যদি প্রথম দিক দিয়ে প্রতারণাপূর্ণও হয়, কুরআন বলছে, তা সত্ত্বেও তাদের সাথে সন্ধি করতে হবে। যেহেতু মুসলমানদের

www.pathagar.com

ভরসা থাকবে মহান আল্লাহ্‌র উপর, কাজেই তাতে ইসলামী সেনাবাহিনী তথা মুসলিম জনগণের খুব একটা ক্ষতি হবে না। কেননা ওরা যতই ধোঁকা দিতে চাক না কেন, আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্যে মুসলমানরা সব-রকমের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে :

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ - هُوَ الَّذِي

أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ -

ওরা যদি তোমাকে ধোঁকায় ফেলতেও চায়, তা'হলেও আল্লাহ্‌ই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনিই তো তাঁর বিশেষ সাহায্য করে তোমাকে সহায়তা দিয়েছেন। তাঁর এ সহায়তা মুমিনদের প্রতিও।

—সূরা আনফাল : ৬২

এ প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই প্রশ্ন তুলতে পারি ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে নীতি অত্যন্ত বলিষ্ঠতা সহকারে অবলম্বন ও অনুসরণ করেছে, দুনিয়ার আর কোন্ ধর্ম—কোন্ মতাদর্শ তা করেছে? যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে এতটা সতর্কতা আর কেউ করেছে বলে কেউ কি দাবি করতে পারে? ইসলামের পক্ষ থেকে এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ।

ইসলামের সেনাবাহিনী যখন ময়দানে নেমে আসত, সেনাধ্যক্ষের হাতে যেমন থাকত প্রতিরক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি, তেমনি থাকত শান্তির ঘোষণা। নবী করীম (স.) ইয়েমেনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-কে দায়িত্বশীল বানিয়ে পাঠাবার সময় বললেন :

তুমি চলতে চলতে তাদের অংগনে গিয়ে পৌঁছবে। তখন তোমার প্রথম কাজ হবে তাদেরকে 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্‌র' প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো। তারা তা গ্রহণ করলে তাদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ করবে। এর অধিক আর কিছু চাইবে না তাদের নিকট। তোমার চেষ্টায় একজন লোকও যদি আল্লাহ্‌র হিদায়িত পায়, তা হলে তা তোমার জন্য গোটা সৃষ্টির তুলনায়ও অধিক উত্তম। আর তারা নিজেরা যতক্ষণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু না করছে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করবে না।



www.pathagar.com

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ)-কেও নবী করীম (স.) ইয়েমেনে পাঠালেন। উপদেশ দিলেন ঃ

তোমরা দুইজন জনগণের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবে, কাঠিন্য ও কঠোরতা নয়। লোকদের সুসংবাদ জানাবে, তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে না।

পরে তিনি শ্রমজীবী ও অক্ষম লোকদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন। মোটকথা তিনি যখনই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তিনি নিম্নোদ্ধৃত বাক্য উচ্চারণ করতেন ঃ

بِاسْمِ اللهِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ تُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ لَا تَغُلُّوْا

وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اِمْرَاَةً وَلَا وَلِيْدًا -

আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা আল্লাহ্‌রই পথে। তোমরা যুদ্ধ করবে সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার ও অমান্য করেছে। তোমরা কারুর প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করবে না, কাউকে ধোঁকা দেবে না, নিহত ব্যক্তির দেহাকৃতি বিকৃত করবে না এবং নারী ও শিশু হত্যা করবে না।[১]

**বিশ্বাসঘাতকতার জওয়াবেও বিশ্বাসঘাতকতা নয়**

ইসলামের পূর্বে পারস্য ও রোমানদের সৈন্যবাহিনী যখন কোন দেশ দখল করত, তখন তারা সে দেশটিকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দিত। শত্রু পক্ষের লোকজনকে হত্যা করার পর তাদের নাক-কান-হাত-পা কেটে, চক্ষু উপড়ে ফেলে আকৃতি এমনভাবে বিকৃত করে ফেলত যে, তাদেরচেনাই সম্ভব হ'ত না। তা'ছাড়া তারা মাথাটি কেটে আলাদা করে বীভৎসরূপে বিজয়ী পক্ষের রাজা-বাদশাহর সম্মুখে উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করত এবং তারপরে উল্লাসে নৃত্য করে চলত। অতঃপর মুসলমানদের সাথে রোমানদের যুদ্ধ হয়, তখন তাঁরাও অনুরূপ কাজ করার কথা চিন্তা করতে

১. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

শুরু করেন। সিরিয়ায় প্রেরিত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আমর ইবনুল 'আস ও শারাহ বিল ইবনে হাসানা 'বানান' নামের এক ব্যক্তির মস্তক কেটে ছিন্ন করে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত করলেন। তা দেখে খলীফা ভয়ানক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। এই সময় উক্‌বা ইবনে আমরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ হে খলীফাতুল মুসলিমীন! আমাদের শত্রুরা ঠিক এইরূপ কাজই করে থাকে। তিনি এই কথা শুনে বললেনঃ

أَفَتَسْتَنُّونَ بِالْفُرْسِ وَالرُّوْمِ لَا يُحْمَلُ اِلَىَّ رَأْسٌ بَعْدَ الْيَوْمِ
اِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ -

তা'হলে তোমরা কি পারসিক ও রোমানদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে? না, আর যেন কখনো কোন ছিন্ন মস্তক আমার সম্মুখে পেশ করা না হয়। শুধু লিখে পাঠালে ও খবর দিলেই যথেষ্ট হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম নবী করীম (সঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিধানের ব্যাপক প্রচার করেন। তিনি উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সৈন্যদের একটি বাহিনী প্রেরণের সময় নিম্নোদ্ধৃত নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিলেনঃ

لَا تَخُوْنُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا طِفْلًا وَلَا شَيْخًا
كَبِيْرًا وَّلَا امْرَأَةً وَّلَا تَعْقِرُوْا نَخْلًا وَّلَا تُحْرِقُوْهُ وَلَا تَقْطَعُوْا
شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَلَا تَذْبَحُوْا شَاةً وَّلَا بَقَرَةً اِلَّا لِلْاَكْلِ وَسَوْفَ

www.pathagar.com

تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم

وما فرغوا انفسهم له -

তোমরা খেয়ানত-বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চুক্তিভঙ্গ করে ধোঁকাবাজি করবে না, নিহতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করবে না, বালক, বৃদ্ধ ও নারী হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালিয়েও দেবে না, ফলদায়ক কোন গাছই কাটবে না। ছাগল ও গাভী খাওয়ার প্রয়োজন পূরণ ছাড়া যবাই করবে না। তোমরা এমন লোক দেখতে পাবে যারা উপাসনালয়ে একান্ত হয়ে অবস্থান করছে। তাদের এমনিই থাকতে দেবে, তাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।[১]

বস্তুত এই সময় থেকেই পারস্পরিক দয়া-অনুকম্পা, রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তির প্রতি উদগ্র আগ্রহ প্রভৃতিই হয় মুসলমানদের তৎপরতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের যুদ্ধনীতি এরই ভিত্তিতে রচিত হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে রোমানরা ওয়াদা ভঙ্গ করে। তখন মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর নিকট রোমানদের বহু লোক বন্দী ছিল। মুসলমানরা ইচ্ছা করলে এই সব বন্দীকে হত্যা করে চুক্তি ভঙ্গের প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু মুসলমানরা তা না করে সকলকেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এই সময় বলে উঠলেন ঃ

وفاء بغدر خير من غدر بغدر -

চুক্তিভঙ্গের জওয়াবে চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিবর্তে এক পক্ষের ওয়াদা ভঙ্গের জওয়াবে ওয়াদা পূরণ করাই উত্তম।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর একজন সেনাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

বিনা কারণে রক্তপাত করা থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রকৃত ও উপযুক্ত কারণ ব্যতীত রক্তপাত অপেক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণের অধিক

১. تاريخ الطبري ص ١٨٥

www.pathagar.com

দাবিদার, নিয়ামত বিলীন হওয়ার ও মেয়াদ শেষ হওয়ার বড় কারণ আর কিছু হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পারস্পরিক রক্তপাতের বিষয়টি নিয়েই সর্বপ্রথম বিচার শুরু করবেন। তখন হারাম রক্তপাতের যৌক্তিকতা প্রমাণের কোন ক্ষমতা তোমার থাকবে না। উপরন্তু অকারণ রক্তপাতে শক্তির ক্ষয়, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে, আর এই কাজের কোন 'ওযর' আল্লাহ্র কাছেও দেবার থাকবে না, আমার কাছেও না।

### দীনের ভিত্তি ইসলাম

বস্তুত ইসলামে জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে ইসলামী দাওয়াতের সমর্থনে, ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্য। কেননা ইসলামী দাওয়াতের প্রতিবন্ধকতাকারী যেমন রয়েছে, তেমনি ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধাদানকারী এবং প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক ও চেষ্টাকারী শক্তি এই দুনিয়ায় অসংখ্য রয়েছে। এরূপ অবস্থায় প্রতিটি পর্যায়েই বিপরীত শক্তিকে দমন করা না হলে ইসলামই রক্ষা পেতে পারে না। এই কারণেই 'জিহাদ' অপরিহার্য।

এই জিহাদ যেহেতু কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানো কিংবা বিরোধীদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ হয়নি, এই কারণে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে শান্তি। এ শান্তি নিরংকুশ শর্তহীন, সর্বব্যাপক, মানবতার সৌভাগ্য বিধায়ক। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তো এ সব আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্যই বিধিবদ্ধ। অতএব কাফিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সক্রিয় না হবে, আগ্রাসনে লিপ্ত না হবে এবং যুদ্ধ শুরু না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ তাদের প্রতি কল্যাণ-কামী, দয়াশীল ও শুভ আচরণকারী থাকবে। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বহু আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

### শান্তিই ইসলামের মৌল ভাবধারা

ইসলাম তার অনুসারীদের নিজেদের জন্য এবং অন্য সকলের জন্য শান্তির ভাবধারাকেই মৌল তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই শান্তিকে কেন্দ্র

www.pathagar.com

করেই চলে মুসলমানদের যাবতীয় তৎপরতা। মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সম্বোধন হচ্ছে আস্‌সালাম, তার অর্থ শান্তি। নামায শেষে ডান দিকে মুখ ক'রে 'আস্‌সালাম' বলা হয়, বলা হয় বাম দিকে মুখ করেও।

কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম রাত্রিও এই শান্তিতে ভরপুর। এই পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরা'র শেষ বাক্যটি হচ্ছে ঃ

سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

এই রাত্রিভর শুধু শান্তি—প্রভাতকালের উদয় পর্যন্ত। —সূরা কদর ঃ ৫

জান্নাতে প্রবেশকারীদের অভ্যর্থনা জানানো হবে এই 'সালাম' শব্দ বলে ঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ -

যেদিন ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাবে, সেদিন তাদের সম্বোধন হবে 'সালাম'। —সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪৪

ফেরেশ্‌তাগণও বেহেশতী লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'সালাম' পেশ করবেন ঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ - سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ -

ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেকটি দ্বারপথে তাদের সম্মুখে এসে বলবে ঃ তোমরা ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করেছিলে বলে তোমাদের প্রতি 'সালাম'।

—সূরা রা'দ ঃ ২৩-২৪

ঈমানদার-মুত্তাকী লোকদের জন্য পরকালীন নির্দিষ্ট ঘরের নাম 'শান্তির ঘর' ঃ

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

তাদের আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তাদের জন্য শান্তির ঘর।

—সূরা আন'আম ঃ ১২৭

www.pathagar.com

আল্লাহ্ এই ঘরে প্রবেশের সুযোগ লাভের জন্যই আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ -

আল্লাহ্ শান্তির ঘরের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। —সূরা ইউনুস ঃ ২৫

আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম। তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে 'আস-সালাম'।

এই সব দিয়েই বলা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এসেছে, ইসলাম শান্তি চায়। ইসলাম দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কাজ করেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় ও নিয়ম-বিধান উপস্থাপিত করেছে। ঠিক এই কারণেই ইসলাম মদীনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের মূল উৎসকেই চিরদিনের তরে বন্ধ করে দিতে চেয়েছে।

ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সংকীর্ণ পরিবেশে এবং বিশেষ নিয়ম-বিধানের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। শত্রুতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ করাকে হারাম করে দিয়েছে। সুবিচার, ন্যায়পরতা, দয়া-অনুকম্পা, ক্ষমাশীলতা ও মানুষের অধিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে, ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। রসূলে করীম (সঃ) কৈশোর জীবনে তদানীন্তন মক্কার লোকদের মধ্যে মারামারি দেখতে পেয়ে তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'হিলফুল ফুজুল' নামে কিশোর-যুবকদের একটি সমিতি বানিয়েছিলেন।

কোথাও মুসলমানদের দুটি পক্ষ যদি পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা'হলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের মধ্যে সন্ধি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা অপর মুসলমানদের কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -

মু'মিনদের দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। —সূরা হুজুরাত ঃ ৯

www.pathagar.com

ইসলাম এই শান্তির জন্য এতোদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, সন্ধি করার পরও যদি কোন পক্ষ তা অস্বীকার করে যুদ্ধ করে, তা'হলে মুসলমানদের কর্তব্য সেই অমান্যকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যেন শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর বিধানের সমীপে আত্মসমর্পণ করে।

এই শান্তির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কুরআন মজীদ ঈমানদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে সত্য ও ধৈর্যের ওসীয়ত করার বিধান দিয়েছে। কেননা এছাড়া সমাজের সংরক্ষণ অসম্ভব। বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ -

পরে তারা সেই লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল, যারা ঈমান এনেছে, পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে, পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া ও অনুকম্পার। —সূরা আল বালাদ ঃ ১৭

ইসলাম শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছে, ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে দূরে থাকতে বলেছে। মানুষ যদি তার গুরুত্ব স্বীকার করে ও তদানুযায়ী জীবন যাপনে প্রস্তুত হয়, তা হলে যুদ্ধের সকল কারণ নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু দুনিয়ার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি, অনুসরণ করেনি তার প্রদর্শিত আদর্শ ও পথ, ফলে দুনিয়ায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-দ্বেষ ও মারামারি-কাটাকাটির কারণে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। এই পৃথিবী এখন আর মানুষের বাসোপযোগী থাকেনি।

অথচ ইসলাম মানুষকে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা দিয়েছিল। সে সমাজ ব্যবস্থাতেই নিহিত ছিল শান্তির সব উপায়। ইসলামকে উপেক্ষা করে সেদিনের মক্কাবাসীরা প্রাচীন অশান্তির পথেই চলেছে, যেমন আজকের দুনিয়ার পরাশক্তিসমূহ এবং তাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলোও শুধু যুদ্ধের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এ পথে মানুষের ও মানব সভ্যতার ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.) মক্কী জীবনে রক্তপাত এবং যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। নিজে অপরিসীম ধৈর্য ধারণ করেছেন। কুরাইশ কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইয়াসার পরিবারকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

صَبْرًا آلَ يَاسِرَ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ -

হে ইয়াসার পরিবারের লোকগণ। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। মনে রেখো, তোমাদের জন্যই জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।[১]

রসূলে করীম (স.) অত্যাচার-নিপীড়নে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিও আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

হে আল্লাহ্ ! আমার জনগণকে তুমি ক্ষমা করে দিও. ওরা বাস্তবিকই জানে না (আমি কিসের দাওয়াত দিচ্ছি এবং কি করতে চেয়েছি।

শেষ পর্যন্ত তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান। কিন্তু মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। হিজরতের পর দ্বিতীয় বর্ষেই তিনি যুদ্ধের অনুমতি পান। পান তখন, যখন এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুরা তখন চারদিকে খুব বেশী তৎপর হয়ে উঠেছিল। একদিকে আরবের মুশরিক সমাজ, অপরদিকে য়াহূদীরা প্রচণ্ড শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল। ইসলামী বৃক্ষের মদীনার বুকে বপিত চারা গাছটি সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা গায়ে পড়ে মুসলমানদের সাথে ঝগড়া ও বিবাদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। নানাভাবে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই ইসলামী বৃক্ষের চারাটিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই বৃক্ষটিকেই শক্তি প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেন।

তার স্পষ্ট অর্থ, মজলুম মানুষকে রক্ষা করাই এই শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দানের একমাত্র কারণ—যেন তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

---

১. سیرة ابن هشام ق ۱ ص ۳۱۷ ،

রক্ষা করতে পারে নিজেদের ভূমির ও ইসলামী জীবন-বিধানের সার্বভৌমত্ব ও ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সূচিত যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনাকে।

ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে, মুসলমানরা যুদ্ধের ব্যাপারে এই নীতিকে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা প্রথমে ইসলাম কবুলের দাওয়াত পেশ করেছেন, তা অগ্রাহ্য হলে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাযী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তা-ও স্বীকৃত না হলে নিরু পায়ের উপায় হিসেবে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। রসূলে করীম (স.) বিভিন্ন দেশের অত্যাচারী ও আল্লাহদ্রোহী শাসক ও রাজা-বাদশাহর নিকট যেসব চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়। তাঁর সব চিঠিতে এ বাক্যটি বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে লিখিত থাকত ঃ

أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ -

তুমি ইসলাম কবুল কর—বশ্যতা স্বীকার কর, তুমি নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করবে এবং আল্লাহ্ তোমাকে তোমার এই কাজের শুভ ফল দুবার দেবেন।

অনেকেই এই আহবান কবুল করেছে, কেউ কেউ প্রত্যাখ্যানও করেছে। আবার কেউ কেউ শুধু অগ্রাহ্যই করেনি, প্রেরিত প্রতিনিধিকে পর্যন্ত হত্যা করেছে।[১]

পরবর্তীকালে 'খুলাফায়ে রাশেদুন' রসূলে করীম (স.)-এর উক্ত নীতিরই অনুসরণ করেছেন।

### শান্তির জন্য অস্ত্র সংগ্রহ

কুরআন মজীদের একটি আয়াত এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

---

১. زاد المعاد ج ٣ ص ، منهاج سفر الدين بتيق الصالحين ص

www.pathagar.com

بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۔ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۔ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ

اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

এবং শত্রুদের কারণে তোমরা সাধ্যমত শক্তি ও সামরিক যানবাহন, অশ্ব ইত্যাদি সংগ্রহ কর। তদ্দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সব শত্রুদের এবং বিশেষভাবে তোমাদের শত্রুদের। এ ছাড়াও আরও অনেককে, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদের পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, তোমাদের ক্ষতি সাধন করা হবে না। —সূরা আনফাল ঃ ৬০

আয়াতটি মুসলমানদের প্রতিরক্ষামূলক শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে এবং এই কাজে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তা করাও মুসলমান-দের কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। মুসলমানরা এই কাজে যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়রূপে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্‌ই তা তাদের ফিরিয়ে দেবেন। এই অর্থ ব্যয় যে তাদের জন্য কোন দিক দিয়েই ক্ষতির কারণ হবে না, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কেননা এই অর্থ ব্যয়ের ফলে যে সামরিক প্রস্তুতি হবে, তা মুসলমানদেরই সামষ্টিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে, এর দ্বারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। তার অর্থ ইসলাম কোন শক্তিহীন বৈরাগ্যবাদী ধর্মমত নয়। ইসলাম খোদায়ী ও বৈষয়িক উভয় দিক দিয়েই বিশেষ শক্তির অধিকারী। তার এ শক্তির দাপটে ইসলামের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু এই আয়াতে ইসলামের শত্রুদের উপর আক্রমণ চালানোর কোন নির্দেশ নেই। সামরিক শক্তি সংগ্রহেরই নির্দেশ রয়েছে শুধু। এতে সকল পরিবর্তিত উচ্চমানের ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেরও নির্দেশ রয়েছে—তা এমন সব অস্ত্র, যা শত্রুপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে। যে অস্ত্র শত্রুপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না, তেমন অস্ত্র সংগ্রহ করে কোন

www.pathagar.com

লাভ নেই। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে নিত্য নব উদ্ভাবিত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা থেকে একবিন্দু পিছপা হওয়াও আল্লাহ্‌র উক্ত নির্দেশের পরিপন্থী হবে। শত্রুরা যখন জানতে পারবে যে, মুসলমানরা একদিকে দুর্জয় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, সেই সাথে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রও তাদের নিকট বিপুল পরিমাণে বর্তমান, তখন তারা অবশ্যই ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে। তারা সহজে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসবে না। তাদের মুকাবিলায় আসাকে এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হবে। তারা এমন কোন উস্‌কানিমূলক কাজ করবে না, যার ফলে মুসলমানরা তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে বাধ্য হবেন।

এই কারণেই অধিকাংশ মুফাস্‌সির, ইসলামী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ফিকাহবিদগণ উক্ত আয়াতটিকে ايـة السلام المسلح সশস্ত্র শান্তির আয়াত' নামে অভিহিত করেছেন। এ ঠিক 'অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের ব্যবহার নিবারণ' কিংবা অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাসকরণ পর্যায়ের কথা এবং তা আরবী কথ্য القتل انفى للقتل হত্যা হত্যার রোধকারী'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরূপ সামরিক প্রস্তুতির দরুন মুসলমানগণ কয়েকভাবে উপকৃত হতে পারেন।

ক. এর কারণে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের অন্য শত্রুদের সাহায্য করার দুঃসাহস করবে না।

খ. এসব শত্রুকে মুসলমানদের প্রাপ্য সব কিছু যথারীতি দিতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত করে রাখবে।

গ. অনেক সময় এই কারণেও বহু লোক ইসলাম কবুল করে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে জীবনযাপনে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতিতে আমাদের জ্ঞাত শত্রুদেরই শুধু সন্ত্রস্ত করবে না, এমন সব শত্রুও তার কারণে দমিত হবে, যাদের আমরা জানি না, জানি না তাদের শত্রুতার রূপ ও প্রকৃতি এবং সেজন্য তাদের গোপন তৎপরতা---যদিও আল্লাহ্‌র অজানা কিছুই নেই। উপরিউক্ত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে শান্তি স্থাপিত হবে, শান্তি রক্ষিত হবে, বিঘ্নিত হবে না।

তার অর্থ, ইসলাম যুদ্ধ ও শান্তির মাঝে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছে। কেননা কুরআনে যেমন যুদ্ধের কথা বারবার বলা হয়েছে, সেজন্য পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণেরও তাকিদ করেছে, তেমনি শান্তির কথাও অত্যন্ত

www.pathagar.com

গুরুত্ব সহকারে বলেছে, তার মানে কুরআনের শান্তি যুদ্ধবর্জিত নয় এবং অনুরূপভাবে কুরআনে যুদ্ধও নয় শান্তি বিবর্জিত।

কিন্তু ইসলাম এতদুভয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছে তা গভীরভাবে অনুধাবন সাপেক্ষ। জীবনের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী কি, কি ভাবে তা শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় দুনিয়ার মানুষকে? ...তা আমাদের ব্যাপক ও গভীরভাবে বুঝতে হবে।

মানুষের জীবন নীতি ও তার সংগঠন পদ্ধতি পর্যায়ে কুরআন প্রদর্শিত পন্থা জানবার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে, কুরআন জীবন সম্পর্কে মানুষকে কি বুঝ ( Understanding ) দিয়েছে, সাফল্যের কি পথ প্রদর্শন করেছে। আর এরই আলোকে আমরা কুরআনের বিশ্বনীতি ও তার সংগঠনের ভিত্তিও জানতে পারব।

কুরআন মানুষের সম্মুখে এই ধারণা উপস্থাপিত করেছে যে, জীবন কর্মের বিধানে সুসংগঠিত। কর্মের দ্বারাই জীবন হয় সুসংবদ্ধ, সুদৃঢ় বাস্তবতার সুষমায় মণ্ডিত। এতেই জীবনের সাফল্য নিহিত। জীবন সাধনার মধ্যেই বর্ষিত হয় আল্লাহর সাহায্য। বাহ্যিক ও বাস্তব কর্মের নিকটই জীবন ঋণী। কর্মে মুখরিত জীবনই মানুষের জন্য কাম্য। কর্মের নির্ভুল অনুভূতি দ্বারাই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের সুষ্ঠুতা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

তাৎপর্যগতভাবে অন্য কোন জিনিসই মানুষের জন্য বিকল্প হতে পারে না। মানব জীবনের যথার্থতা প্রমাণিত হয় যখন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়। শুধু চিন্তা ও মানসিক ভাবধারার কোনই মূল্য নেই। সেই চিন্তা ও মানসিকতা যখন কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, ঠিক তা কোন মূল্যের দাবীদার হতে পারে। তা ভুল কি সঠিক, তা স্পষ্টভাবে বুঝতেও পারা যাবে ঠিক তখনই।

কোন মানুষই কোন কাজে বা ব্যাপারে নিছক ঘুমিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকে বিজয় বা সাফল্যের আশা করতে পারে না। কোন শুভ মানসিকতাসম্পন্ন বা উন্নতমানের চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিও কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকে কোন বিষয়ে একবিন্দু সফলতা লাভের আশা করতে পারে না। তাকে অবশ্যই কর্মে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর হতে হবে। ইতিবাচক বা নেতিবাচক একটা না-

www.pathagar.com

একটা ভূমিকা পালন করতে হবে। বস্তুত এ-ই হচ্ছে জীবনের ধর্ম, জীবনের বিধান।

মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কার্যত যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন। তারপর বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের কুদ্‌রতের সাহায্য তাদের দেবেন, তাদের শত্রু ধ্বংস করবেন। যুদ্ধ করা ছাড়াও যদি তা করার বিধান থাকত তাহলে তিনি তাই করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা চান না। তিনি স্পষ্ট কন্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۔ ذَٰلِكَ

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۔

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۔

অতঃপর (তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে) হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, না হয় রক্তমূল্য গ্রহণের চুক্তি করবে—যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র সংবরণ করে। —সূরা মুহাম্মদ : ৪

এটাই হ'ল তোমাদের করার মত কাজ, আল্লাহ্ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে ফেলতেন। কিন্তু তিনি (এ পন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন), যেন তোমাদেরকে একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিহত হবে, আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ কখনই নষ্ট বা নিষ্ফল করবেন না।

এই আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, ইসলামের দুশমনদের শুধু ধ্বংস করাই যদি লক্ষ্য হ'ত তা'হলে, আল্লাহ্ সে জন্য কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। যে কোন একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাদের সকলকে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতে সক্ষম ছিলেন, রয়েছেন।

কিন্তু তা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলার বৃহত্তর লক্ষ্য কখনই পূর্ণ হতো না। তিনি তো' চেয়েছেন, সমাজের সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হোক। সত্যপন্থীরা বাতিল পন্থীদের নির্মূল করার সংগ্রামে কার্যত ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়ুক। কেননা এর মাধ্যমেই প্রত্যেক পন্থী লোকদের অন্তর্নিহিত সত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কে সত্যপন্থী এবং কে বাতিলপন্থী তা এই সংঘর্ষের মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে। আর প্রত্যেকেই স্বীয় চরিত্র ও ভূমিকার দিক দিয়ে যে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হবে, তাকে সেই মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

বস্তুত আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদেরকে এই কাজের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। ফলে যারাই আল্লাহ্র পথে ধন-মাল ও জীবন উৎসর্গ করবে, আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য পুরোপুরিই দান করবেন। তা থেকে একবিন্দু বঞ্চিত করবেন না। পরিণামে তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এইরূপ সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ সৃষ্টি হলেই এবং ঈমানদার লোকেরা তাতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলেই আল্লাহ্র সাহায্যও আসতে পারে। আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার এ-ই হচ্ছে সঠিক সময় ও ক্ষেত্র।

ইমাম রাগিব লিখেছেন, এই ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষা সাধিত হয়। প্রথমত তার নিজের অবস্থাটা ভালোভাবে জানা যায় এবং তার ব্যাপারে যা কিছু অজানা রয়ে গেছে তা-ও স্পষ্ট হয়ে সম্মুখে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমেই তার উত্তমতা ও মন্দত্ব প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সে প্রকৃতপক্ষে ভালো না প্রকৃতই মন্দ, তা প্রকাশ পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এই সংঘর্ষ। অনেক সময় একসাথেই দুটি জিনিস পেতে চাওয়া হয়, আর অনেক সময় তার মাত্র একটির প্রকাশ চাওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে, মু'মিন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের কুদরতে তাদের জয়ী বানিয়ে দেবেন, তা' আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা নয়। তিনি চান, ঈমানদার লোকেরা বাতিল ও কাফির শক্তির সাথে সংঘর্ষে এসে তাদের ঈমানের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণ ও প্রকাশ করুক। তারা কতটা খাঁটি ঈমানদার তার প্রমাণ তো এভাবেই পাওয়া সম্ভব। উক্ত সূরারই সাত নং আয়াত হচ্ছে :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ -

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য কর, তা'হলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থিতিকে দৃঢ় করে দেবেন।

এখানে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়াটাকে তাঁর সাহায্য করার উপর নির্ভরশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ঈমানদার লোকেরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন কায়েমের লক্ষ্যে জান-মাল নিয়োগ করে সংগ্রাম করে, তা'হলে আল্লাহ্‌ও সাহায্য করবেন। উপরন্তু আল্লাহ্‌ তাদের এই চেষ্টা ও সংগ্রামে অবিচল এবং সুদৃঢ় বানিয়ে দেবেন। এর সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌ তো সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তা পাওয়ার অধিকার পেশ করতে হবে তাঁর সাহায্য কাজে আত্মনিয়োগ করে। তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যই শুধু পাওয়া যাবে না, ঈমানের দৃঢ়তাও পাওয়া যাবে।

শুধু কল্পনা করলে, মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলে বা রঙীন দিনের স্বপ্ন দেখলেই আল্লাহ্‌ তাঁর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন না।

আল্লাহ্‌ তা'আলার এই পরীক্ষা গ্রহণ নীতির কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই আয়াতে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ -

আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যেন তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ ও ধৈর্য ধারণকারী কে কে, তা আমরা বাস্তবভাবে জানতে পারি। সেই সাথে তোমাদের সম্পর্কিত বাস্তব সংবাদের যথার্থতাও যাচাই করব। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১

এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে এবং পরীক্ষা না দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে বলে ধারণা করলে তা কখনই সত্য হবে না। আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বাস্তবভাবে জানতে পারবেন না যে তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করলো আর ধৈর্য ধারণ করলো আর এমনিতেই তোমরা বেহেশ্‌তে দাখিল হয়ে যাবে বলে ধারণা করে রেখেছ নাকি?
—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২

এতদ্ব্যতীত আরও বহু আয়াতে এই পরীক্ষার কথা আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এবং এই পরীক্ষার মধ্যে পড়লেই ঈমান ও ত্যাগ-তিতিক্ষা অনুপাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়া যাবে. সাহায্য করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন, এ কথাও বলা হয়েছে। এই সাহায্যও কেবলমাত্র যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হ'লে যুদ্ধরত অবস্থায়ই পাওয়া যেতে পারে।

বস্তুত কুরআন এভাবে বহু সংখ্যক আয়াতে মানুষের জীবনের মূল দায়িত্ব ও কর্মধারার বিবরণ উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীন-পন্থী ও দীনপন্থী নয় এমন বহু লোকই কুরআনে উপস্থাপিত জীবনধারা বুঝতে ভুল করেছেন। দীনপন্থীরা ভুল করেছেন এভাবে যে, তাঁরা মনে করে নিয়েছেন, আকীদা-বিশ্বাসটা ঠিক করে ইবাদতের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করলেই দীন পালন হয়ে গেল এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবার অধিকারী হয়ে গেলেন। অন্যের ধারণা আরও অগ্রসর হয়ে এতটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে যে, তারা মনে করতে শুরু করেছে, এই-টুকু করা হলেই আল্লাহ্‌র 'ওলী' হওয়া সম্ভব এবং যাঁরাই আল্লাহ্‌র 'ওলী' হন, তাঁরাই ইসলামের—কুরআনের বাস্তব প্রতিমূর্তি। তাঁরা সব পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। কিন্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা যেমন পূর্বোদ্ধৃত আয়াত থেকে স্পষ্ট, তেমনি আরও বহু আয়াত থেকে প্রমাণিত। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ -

আর বল, তোমরা সকলে কাজ কর। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখবেন—তাঁর রসূল এবং সব মু'মিনরাও।—সূরা আত্-তওবা ঃ ১০৫

এ আমল অর্থাৎ কাজ শুধু ঈমান-আকীদা ঠিক রেখে ইবাদতের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা গোটা জীবনের জন্য পরিব্যাপ্ত।



www.pathagar.com

ধর্মপন্থী নয় এমন লোকদের ভুল ধারণা হচ্ছে, তারা ইসলামকে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের মতই নিছক একটা ধর্ম মনে করে নিয়েছে, যা অলৌকিক ও আকস্মিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল। অদৃশ্য জনগণের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্তাধীন বানাবার 'কারামত' ইত্যাদির প্রতিই আশাবাদী হয়ে থাকে। ফলে তারা জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হয় না কখনও। জীবনের ঝামেলা ও ঝড়-ঝাপটাকে সব সময় এড়িয়ে চলাই হয় তাদের অভ্যাস। তারা তাস্‌বীহ্-তাহলীল, দু'আ ও মুরাকাবা'র দ্বারাই বাতিল শক্তির মুকাবিলা করতে ইচ্ছা করে ফুঁ দিলেই শক্তির প্লেন-কামান-ট্যাংক স্তব্ধ, বিফল ও জরাজীর্ণ হয়ে যাবে বলে তারা মনে করে।

কিন্তু সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কে এই অভিযোগ সত্য হলেও ইসলাম সম্পর্কে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অসত্য। কেননা প্রথমত ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতই একটা ধর্মমাত্র নয়। দ্বিতীয়ত ইসলাম তো একটি পূর্ণাংগ ও কর্মময় জীবন-বিধান। তাকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম করা তার প্রতি ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। কুরআন এই সাধনা ও সংগ্রামের আহ্‌বান নিয়ে এসেছে। চেষ্টা, শ্রম এবং সাধনা ও সংগ্রামের জন্য কুরআনের আহ্‌বান শুধু নীতিগতভাবেই নয়, তা কুরআন উপস্থাপিত জীবন-ব্যবস্থায়ও পুরোপুরি বিধৃত। কুরআনের আইন-বিধান, তার হালাল-হারামের আইন, পরিবার গঠন, পরিবারের লোকদের অধিকার ও কর্তব্য, তার অর্থোপার্জন, শাসন-প্রশাসন, আদর্শ রক্ষা ইত্যাদি সব কিছুতেই এই সাধনা-সংগ্রাম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই সবের মধ্য দিয়েই তো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতা প্রকাশিত হয়। সেই দক্ষতা দেখানো তো প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এইজন্যই জিহাদ ও 'কিতাল' বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

**যুদ্ধ—দয়া সহকারে**

কুরআন মুমিন লোকদেরকে দীন কায়েম করার জন্য জিহাদ করতে বলেছে এবং মজলুম ও অধিকার বঞ্চিত মানবতার মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মত যুদ্ধও করতে বলেছে। কিন্তু কুরআন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে জুলুম, সীমালংঘন ও নির্মমতা প্রদর্শন

www.pathagar.com

করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছে। যুদ্ধ চলাকালেও আল্লাহ্র ভয়—তাক্ওয়া মনে রেখে মানুষের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছে। শান্তি ও সন্ধির মাধ্যমে মানব-জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান করা ও জুলুম প্রতিরোধ করার মূলেও নিহিত থাকতে হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা। নিপীড়িত জনতার মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কুরআন এমনিভাবেই মানবজীবনকে সুসজ্জিত ও সুগঠিত করতে চেয়েছে। শান্তি ও যুদ্ধের ব্যাপারটিকেও এমনিভাবেই স্পষ্ট করে তুলেছে। কুরআন এমনিভাবেই দেখিয়েছে যে, শান্তিই হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবনের চরম লক্ষ্য। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যে চায়, আল্লাহ্ তাকে এমনিভাবেই শান্তির পথ দেখিয়ে দেন। কুরআনের দৃষ্টিতে জীবনের এটাই সঠিক পথ, যারা এ পথে চলতে ইচ্ছুক, তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব, এই পথেই চলা উচিত। এ পথ সংকীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। এ পথে অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন, তা-ও সন্দেহাতীত। তবু ঈমানদার লোকদের সম্মুখে এই পথটাই উন্মুক্ত।

এই পথে চলেই এক-একজন লোক নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে; পারে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সত্যতা প্রমাণিত করতে। কুরআন বলছে ঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ -

আল্লাহ্ শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি যাকে চান সরল-স্বচ্ছ-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন। —সূরা ইউনুস ঃ ২৫

এই শান্তিই ক্ষয়িষ্ণু মানবতার ক্ষত ঘোচাতে পারে, পারে দুঃখী মানবতাকে সুখের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে। ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের কপালের ঘাম মুছে ফেলার জন্য এই শান্তির প্রয়োজন। কোন হিংসা-বিদ্বেষ নয়, শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, নয় মানুষের ব্যক্তি-মালিকানার সব অধিকার হরণ করার। তা দুঃখী মানুষকে আরও কঠিন দুঃখে ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা বঞ্চিতকে করে সর্বদিক দিয়ে চির বঞ্চিত।

www.pathagar.com

এই শান্তি কেবল ইসলাম উপস্থাপিত শান্তি এবং এই ইসলামই সব আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে। এই ইসলামই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে, যেন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠা ফিতনা চিরতরে খতম হয়ে যায় এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই দীন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুনিয়ার মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই এসেছে এই দীন-ইসলাম। এই ইসলামই মুসলিম উম্মতের চরম আদর্শ হিসেবে নিরূপিত করেছে শান্তিকে।

এই কারণেই আমরা বলি, দীন-ইসলাম শুধুমাত্র কতগুলো অলৌকিক ধারণা-বিশ্বাস সম্বলিত ধর্ম নয়; বরং ইসলাম এক পূর্ণাংগ সামষ্টিক বিধান। এই ইসলামেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তির, পরিবারের, সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর, জাতির ও গোটা মানবতার যাবতীয় সমস্যার সঠিক ও নির্ভুল সমাধান।

ইসলাম গোটা মানবতার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত—দয়া ও অনুকম্পার প্রতীক। এর মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। কুরআনের ব্যবহার অনুযায়ী এই রহমত—দয়া ও অনুকম্পা মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণ। 'রহমান' ও 'রহীম' আল্লাহ্‌র এই দুটি নাম দ্বারাই তার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। তার অর্থ, আল্লাহ্ নাফরমান লোকদের প্রতি কষ্টদানকারী দৃষ্টিতে নয়; দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকান।

'রহমত' মূল থেকেই আল্লাহ্‌র দুটি গুণবাচক নাম রচিত হয়েছে, একটি 'রহমান' আর অপরটি 'রহীম'। শব্দদ্বয়ের অর্থে আধিক্য ও বিপুলতার ভাব বিদ্যমান। কুরআন-মজীদের একটি সূরা বাদে আর সব কয়টি সূরার উপর যে বাণীটুকু মুকুটের মত বিরাজ করছে, তা হচ্ছে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' তাতে আল্লাহ্‌র এই বিপুল অনুকম্পার অর্থ সমন্বিত দুইটি নামই একসাথে পর পর সন্নিবেশিত। প্রতিটি কাজের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য বলে ঘোষিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌র এই অনুকম্পা সম্বলিত নাম দুটি উচ্চারণের ফলে ব্যক্তির হৃদয়েও দয়া ও অনুকম্পার অমিয়ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে, এক অলৌকিক ভাবধারা জাগিয়ে দেয়। সূরা তাওবা'য় যেহেতু যুদ্ধ ও শত্রু নিধন সংক্রান্ত বিষয়াদির

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ আলোচনা রয়েছে, এ জন্যই তার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিত হয়নি। আর জন্তু যবেহ্ করার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলার সুন্নাত জারি করা হয়েছে, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নয়।

বস্তুত আল্লাহ্‌র 'রহমত' অত্যন্ত সীমাহীন, সর্বব্যাপক। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ -

আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

—সূরা আ'রাফ : ১৫৬

رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ -

তোমাদের রব ব্যাপক সর্বাত্মক দয়ার মালিক।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا -

হে আল্লাহ্! তুমি সবকিছুকে দয়া ও জ্ঞানের আওতার মধ্যে নিয়ে নিয়েছ। —সূরা মুমিন : ৭

তিনি নিজেই রহমত বর্ষণে চির উদার। তিনি নিজেই 'রহমত' বিমুখতা ও নৈরাশ্য বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন :

يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا - إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

হে আমার সে সব বান্দা! যারা নিজেদের উপর অনেক বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব গুনাহ্ই মাফ করে দেবেন। কেননা তিনিই হচ্ছেন অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান। —সূরা যুমার : ৫৩

www.pathagar.com

আল্লাহ্ নিজেই রহমত বর্ষণকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। বলেছেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -

তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমাদের রব নিজের জন্য রহমত দান কর্তব্য করে নিয়েছেন। —সূরা আন'আম ঃ ৫৪

যে ধর্ম তার ঘোষিত ইলাহ্'কে যে সব গুণে ভূষিত করে, সে ধর্মে সেই গুণ অতিশয় প্রভাবশালী হয়ে থাকে এবং তার অনুসারী মানুষও হয় সেই অনুপাতে উক্ত গুণের ধারক ও বাহক। এই দৃষ্টিতে বলা যায়, কুরআন ইসলামের ইলাহ্কে যে মহান অসীম দয়া ও অনুগ্রহসম্পন্ন সত্তারূপে পেশ করেছে, ইসলামের নবীকেও 'রউফ', 'রহীম' ( সহৃদয়তাসম্পন্ন, দয়ালু ) বলে অভিহিত করেছে। কাজেই বলা যায়, ইসলামে নির্মমতা ও দয়াহীনতার কোন স্থান নেই।

এই কারণে 'রহমান', 'রহীম' আল্লাহ্র বান্দা মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে, অপরাধীর প্রতি দয়াপ্লুত দৃষ্টিতে তাকানো, অযথা কষ্টদানের মনোভাব নিয়ে দুনিয়ায় যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তা নিজেরই অপরাধের ন্যায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়, কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই সমাজে এমন থাকা উচিত নয়, যার প্রয়োজন অপূরিত থেকে যাবে, কুরআন-ভিত্তিক সমাজ এই কারণে দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় ভরপুর হয়ে থাকে এবং তারই ফলে তথায় বিরাজ করে অনুপম শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি।

এ শান্তি ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজ-সমষ্টির, জাতির। শান্তি গোটা মানবতার।

ব্যক্তির শান্তির অর্থাৎ মানসিক শান্তির ব্যাপক প্রভাব পড়ে ব্যক্তির দেহে ও স্বাস্থ্যের উপর ও বাস্তব কাজকর্ম ও তৎপরতায় তার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, তার চিন্তা ও বিবেক শক্তিও এই শান্তির কারণেই হয় সদা সক্রিয় এবং তেজস্বী। শান্তির আকর মানব মনকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

www.pathagar.com

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي -

হে পরম প্রশান্তি স্থিতিসম্পন্ন মন-প্রাণ! তুই তোর আল্লাহ্‌র দিকে সাগ্রহে, সন্তুষ্ট চিত্তে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে গণ্য হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। —সূরা আল ফজর ঃ ২৭-৩০

বস্তুত কুরআন মজীদ মানুষের হৃদয়-মনকে এই মানসিক শান্তি অর্জন ও তা ধারণ করার জন্য উদাত্ত আহ্‌বান জানিয়েছে, সেজন্য সব সময় তৎপর হয়ে থাকতে উৎসাহিত করেছে। সেই সাথে যারা এই মানসিক শান্তি-প্রশান্তি বঞ্চিত, তাদের তা লাভ করার জন্য নানা পন্থা ও উপায় অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

### কুরআন ও মানসিক শান্তি

কুরআন মজীদ মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি অর্জনের জন্য নানা পন্থা ও উপায় নির্ধারণ করেছে। যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে এই শান্তি ও প্রশান্তি, তাদের একান্তই কর্তব্য হচ্ছে কুরআন-নির্দেশিত সেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বন করা।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতের সাথে সংগতি রেখে অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের দিল আল্লাহ্‌র স্মরণে পরম প্রশান্তি লাভ করে—জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই দিলসমূহ পরম শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে থাকে। —সূরা রা'দ ঃ ২৮

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান, মানসিক দৃঢ় প্রত্যয় ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র স্মরণ—কোন মুহূর্তেই আল্লাহ্‌কে ভুলে না যাওয়াই হচ্ছে মানসিক শান্তি ও পরম প্রশান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিলাভের কুরআন-নির্দেশিত একমাত্র পন্থা ও উপায়। মনস্তত্ত্বের গভীর সূক্ষ্মতায় উত্তরণ না

www.pathagar.com

করেও দৃঢ়তা সহকারে বলা যায়, ঈমান হচ্ছে নির্ভুল পরিচিতি, দৃঢ় আস্থা ও তার উপর স্থিতিলাভের উপায়। পক্ষান্তরে মহাসত্য অস্বীকৃতি ও তাতে সংশয়-ধর্মহীনতা হচ্ছে চরম মূর্খতা, অন্ধকার, অস্থিরতা, বিভ্রান্ত, অপচয় ও অবক্ষয়ের মৌল কারণ। তার দরুনই মানুষের জীবনে নেমে আসে ব্যাপক বিপর্যয়, অশান্তি, সংকীর্ণতা, অস্বস্তি ও অস্থিরতা। আর মানব-মন সাধারণতই এই অবস্থাকে অপসন্দ করে, এ অবস্থাকে এড়িয়ে চলতেই তা সব সময় সচেষ্ট থাকে। কেননা উপরিউক্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে মানব-মন চরম কষ্ট ও পীড়া বোধ করে।

এ কথাও প্রমাণিত যে, মানুষ জীবনব্যাপী সত্য উদ্ঘাটন ও পরম সত্যের বাস্তব প্রকাশের জন্য সাতিশয় আগ্রহী ও সাধনায় রত থাকতে উৎসুক।

এই বিশাল বিশ্ব প্রকৃতি নিহিত মহাসত্য একটি অতীব জটিল সূক্ষ্ম ও বিরাট ব্যাপার। মানব মনের চিরন্তন স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা ঃ এই বিশ্বলোক কি? কোথায় এর সূচনা? কখন তা সূচিত হ'ল? এই সব কেন? কি উদ্দেশ্যে এইসব অস্তিত্ব লাভ করেছে? এর মূলীভূত কারণটা কি? কি এর চরমতম লক্ষ্য? কি এর পরিণতি? কোথায় গিয়ে স্থিতিলাভ করবে এই সদা আবর্তনশীল বিশ্বলোক?

অনাদিকাল থেকেই মানব মনে এইসব প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মানব-মন এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জওয়াব চাচ্ছে। এর সঠিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যালাভের জন্য মানুষের চেষ্টা ও সাধনার কোন অন্ত নেই। এ সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য এবং এর মাধ্যমে মানসিক শান্তি ও স্থিতি-লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এই চেষ্টা প্রচেষ্টাই মানুষের দার্শনিকতার মূল উৎস।

এই চিন্তা-ভাবনা-গবেষণায় মানুষ একদিন 'বস্তু' বা 'জড়ে'র সন্ধান পেয়েছে কিন্তু এই 'জড়'কে কেন্দ্র করে নানা মত ও দৃষ্টিকোণের উদ্ভবও হয়েছে। সে মতসমূহ যেমন বিভিন্ন, তেমনি পরস্পর সাংঘর্ষিক। সেই মতের বিভিন্নতাই নানা দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠার কারণ হয়েছে। ফলে মানুষ চরম অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। সঠিক পথের ও স্থির নির্ভুল সিদ্ধান্তের সন্ধান না পেয়ে মানুষ হয়ে পড়েছে দিশেহারা। দর্শনে এমন একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করা হয়নি এবং যার বিপরীত দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করা হয়নি। এই কারণে মানুষ দর্শনের নিকট কোন নিশ্চিত পথের সন্ধান পায়নি, পায়নি মনের শান্তি ও স্বস্তি।

আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতিও মানুষকে দিতে পারেনি একবিন্দু শান্তি ও স্বস্তি। বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করেছে বিজ্ঞান। মানুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করেছে চিন্তার নতুন দিগন্ত, মানুষকে করেছে কুসংস্কারমুক্ত। মানুষকে অপূর্ব ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানিয়েছে, তাকে চাঁদে পৌঁছার ও পদচারণা করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই সবই সত্য। কিন্তু বিজ্ঞান শুরু থেকেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, বিজ্ঞান 'বস্তু'র বিশেষ গুণকেই শুধু জানে, শুধু বাহ্যিক প্রকাশমানতা (phenomenon) নিয়েই বিজ্ঞানের সমস্ত কারবার। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে বিজ্ঞানের কিছুই বলার নেই। তা বিজ্ঞানের আওতা বহির্ভূত। ফলে মানুষ বিজ্ঞানের নিকট থেকেও পায়নি মনের শান্তি ও স্বস্তি।

শান্তিবঞ্চিত বিশ্বমানবের মনের জন্য একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে ঈমান। মহান স্রষ্টার প্রতি ঈমান, তাঁর নাযিল করা ওহীর প্রতি অকৃত্রিম অবিচল বিশ্বাস। তা-ই মানুষের মনকে শান্তি, স্বস্তি ও সান্ত্বনা দানে সক্ষম। বিশ্বলোকের যাবতীয় সমস্যার সমাধান—সকল প্রকার রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন সম্ভব কেবল এই ঈমানের পক্ষে। আল্লাহ্‌র মহা কুদরতের জন্য তাই হচ্ছে একমাত্র নিয়ামক। মানুষকে নিয়ে যেতে পারে পরম শান্তি ও স্বস্তির দ্বারপ্রান্তে. এই পর্যায়েই মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে ঃ

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ

مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ -

আমি কি তোমাদের বলে দেইনি যে, আমিই জানি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে নিহিত সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব (যা তোমাদের অজানা) এবং তোমরা প্রকাশ কর তা-ও জানি, আর যা গোপন কর, তা-ও আমার জানা।

—সূরা বাকারা ঃ ৩৩

www.pathagar.com

বস্তুত মানুষের মন এই ঈমানের মাধ্যমেই প্রবেশ করতে পারে সুবিশাল, সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক শান্তি ও সুখের জগতে।

এই কারণেই কুরআন মানুষের জন্য ঈমানের অপরিহার্যতার কথা বলেছে। মানব-মনে সে ঈমান ঐকান্তিকভাবে জেগে ওঠে যখন জীবনতরী বিপদাপন্ন হয়, সুউচ্চ তরংগমালা যখন ক্রুদ্ধ ফণা তুলে চারদিক থেকে গ্রাস করতে আসে এবং জীবনতরী হয় ডুবুডুবু। তখন মানুষের চোখের সামনে দিয়ে সব আবরণ অপসৃত হয়ে যায়, মহাসত্য উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হয়ে ভেসে ওঠে। কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াতেই এই কথাটি বলা হয়েছে:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ -

বিপদ যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন সে তার আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ হয়ে। —সূরা যুমার: ৮

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

যখন তরংগমালা তাদের গ্রাস করে মেঘের মত, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে, তাঁরই জন্য সমস্ত আনুগত্য একনিষ্ঠভাবে নির্দিষ্ট করে …।

—সূরা লুকমান: ৩২

এরূপ অবস্থায় ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারে একজন ব্যক্তির যে অবস্থা দেখা দেয়, একটি জনসমষ্টিরও সেই অবস্থা দেখা দিয়ে থাকে।

### ঈমানই শক্তির উৎস

মানসিক শান্তি ও স্বস্তিই হচ্ছে অন্তর্নিহিত শক্তি। কোন বস্তুগত শক্তিই তার বিকল্প হতে পারে না। এই মানসিক প্রশান্তি মানুষকে এমন এক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা দান করে, যার সাহায্যে যে-কোন প্রতিকূলতার মুকাবিলা করা সম্ভব। এই শক্তির বিকল্প মানুষের নিকট কিছুই নেই। এই জাগ্রত মানসিক চেতনা-শক্তিই মু'মিনের জীবনে বিরাট সহায় ও সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। এই শক্তির পূর্ণত্বই মু'মিনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে কাম্য।

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এই দুনিয়ার জীবনে মানুষকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়, সইতে হয় অনেক আঘাত ও অত্যাচার-উৎপীড়ন, অভাব-অনটনের জ্বালা ও যন্ত্রণা। সেই সময় মানুষের যে সান্ত্বনা একান্তই প্রয়োজন, তা এই ঈমানই মানুষকে দিতে পারে। কুরআন মজীদ বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে মানব-মনের প্রশান্তির জন্য অপরিহার্য এই সান্ত্বনা রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

বস্তুত ইসলাম শান্তির বিধান। শান্তির উদ্গাতা। শান্তিই ইসলামের লক্ষ্য। শান্তিই ইসলামী জিন্দেগীর পরিণতি। ইসলাম মানুষের জীবনে শান্তির বন্যা নিয়ে আসে, প্রবাহিত করে শান্তির বায়ু। এই শান্তি তার দেহের সুস্থতায়, তার দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যে, তার মনে, আত্মায় ও মানসিকতায়, তার অনুভূতিতে, চেতনায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে, আচার-আচরণে ও মূল্যবোধে এবং তার ইলাহ্‌র সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনে—সকল ব্যাপারে সব রকমের অশান্তি ও দুষ্কৃতি থেকে নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম। এভাবেই মানুষ এই পৃথিবীর বুকে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে মহান আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সপ্তম অধ্যায়

# জিহাদের প্রকৃতি ও ধারা-পদ্ধতি

[ কুরআন ও তরবারি—মনুষ্যত্ব ও মানবতা সর্বোচ্চে—সর্বমুখী যুদ্ধ—অস্ত্রের পূর্বে ব্যক্তি—অতঃপর—নারীদের অংশগ্রহণ—যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য—প্রশিক্ষণ ও চর্চা—যুদ্ধাস্ত্রে বিবর্তন—ইসলামী সমাজের যুবকদের বৈশিষ্ট্য—যুগসন্ধিক্ষণে মানবতা—শুধু ঈমান ও তাক্ওয়াই নয়—অস্ত্রও—যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক কর্তব্য ও দায়িত্ব—মুসলিম যোদ্ধাদের একাত্মতা—প্রস্তুতি ও আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা—যোদ্ধা শক্তিসমূহের সংগঠন—শত্রুপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ—পূর্ণমাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা—সফল ও সার্থক সামরিক নেতৃত্ব—কুরআন উপস্থাপিত গুণাবলীর শর্ত—আল্লাহ্‌র সাহায্যের বিশেষ কারণসমূহ—আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও একাত্মতা—নির্ভেজাল মানবতাবাদী যুদ্ধনীতি—বীরত্ব সমন্বিত নেতৃত্ব—এ এক বিস্ময়কর ঈমান—ঈমানই জীবন গঠন করে—উবাদাই একমাত্র নন্—ঈমান ও ধৈর্য। ]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## কুরআন ও তরবারি

ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি। ইসলামের শিক্ষা, উপদেশ, আদেশ-নিষেধ, আহ্বান-আমন্ত্রণ, ইঙ্গিত-ইশারা সবকিছু থেকেই একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার সর্বাত্মক কল্যাণই ইসলামের কাম্য। এই ব্যাপারে তুলনা করা যেতে পারে না দুনিয়ার অপর কোন ধর্মমত বা মতাদর্শের সহিত।

কিন্তু তাই বলে ইসলাম কোন 'বৈরাগ্যবাদী' বা 'অহিংস' ধর্মমতও নয়। ইসলাম খ্রীস্ট ধর্মের ন্যায় এ রকম কথা কখনই বলেনি, যেমন খ্রীস্টানদের 'নতুন নিয়মে' লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ

> তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না ; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও।
>
> —মথি ঃ ৫-৩৯

> তবে কিসরার (caesar) যাহা যাহা, কিসরাকে দাও ; আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দাও। —মথি ঃ ২২-২১

> তোমার খড়্গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। —মথি ঃ ২৫-২৬

ইসলাম এরূপ কথা কখনও বলেনি যে, 'My kingdom is not of this world' 'ইসলাম' এই দুনিয়ায়ই মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে নাযিল হয়েছে এবং তা এই জীবনেই বাস্তবভাবে পালিত হ'তে হবে। এই কারণে এই দুনিয়ায় ইসলামের রাজত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামে বিশ্বাসীদের প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যেমন যুদ্ধ বাধতে পারে, তেমনি বিরুদ্ধবাদীদের—মানুষের উপর অত্যাচারকারী ও মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিতকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে। শান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

উভয়ই হতে পারে ইসলামের যুদ্ধ ঘোষণার কারণ। আর প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই এবং যুদ্ধের মৌল লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া ও বন্ধ করা মুসলিমদের কর্তব্য। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

ওরা যদি শান্তির জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে, তা হলে তুমিও শান্তির জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। —সূরা আনফাল ঃ ৬১

শত্রুপক্ষের শান্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ যদি প্রতারণাপূর্ণ ও ধোঁকাস্বরূপও হয়, তবু তাকে যথার্থ মনে করে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা তা কখনই ইসলামের সেনাবাহিনীর পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর হতে পারবে না। তাদের মন-মানসিকতায়ও কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। কেননা তাদের মনে রয়েছে দৃঢ় সংকল্প, মরণজয়ী সংকল্পবদ্ধতা, আল্লাহ্র উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ও তাঁর সহিত সুদৃঢ় অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। আর এই-সব গুণই তাদের বিজয়ী বানিয়ে দেয়। দুনিয়ার কোন শক্তি ধোঁকা-প্রতারণার দ্বারা ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে না। আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ - هُوَ الَّذِىْ

اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۝

শত্রুপক্ষ যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে জেনে রাখবে যে, আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাঁর বিশেষ সাহায্য দানে ও মু'মিনদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয়ে পারস্পরিক সখ্যতাবন্ধুত্বের উদ্ভব করেছেন। —সূরা আনফাল ঃ ৬২

বস্তুত শান্তি এভাবেই ইসলামের চিরসঙ্গী হয়ে রয়েছে। তা কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি, বিরোধিতাও করেনি। দুনিয়ার অপর কোন মতবাদ, কোন

www.pathagar.com

ধর্ম বা কোন আন্দোলন এ ব্যাপারে ইসলামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না।

ইসলামী সেনাধ্যক্ষ সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে যখনই বের হয়, তখন তাঁর সঙ্গে থাকে প্রতিরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা, থাকে অতীব উত্তম উপদেশ-নসীহত। তখন তাঁর এক হস্তে যেমন থাকে তরবারি, তেমনি অপর হস্তে থাকে কুরআন। যুদ্ধের দামামার সাথে উচ্চারিত ও প্রচারিত হয় শান্তির উদাত্ত ঘোষণা। শান্তির এই ঘোষণাবাণী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাঁর ভাষা যেমন উন্নত, গম্ভীর, তেমনি তা দয়া-ভালোবাসায় পরিপ্লাবিত। নম্রতা-সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি তাঁর চিরন্তন সহচর।

ইয়ামনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, এই প্রেক্ষিতে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বলা হয়েছিলঃ

يَا عَلِيُّ سِرْ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فَادْعُهُمْ اِلَى قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، فَاِنْ قَالُوْا......نَعَمْ فَمُرْهُمْ بِالصَّلٰوةِ وَلَا تَبْغِ مِنْهُمْ غَيْرَ ذٰلِكَ وَلَاَنْ يَهْدِيَ بِكَ اللّٰهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَلَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوْكَ -

হে আলী! তুমি চলতে থাকবে। শত্রুপক্ষের নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছে তাদের আহ্বান জানাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপনের। তারা যদি তার প্রতি ঈমান ঘোষণা করে, তা' হলে তো খুবই ভাল কথা। তখন তাদের সালাতের জন্য আদেশ করবে। তার অতিরিক্ত কিছুই চাইবে না তাদের নিকট থেকে। মনে রাখবে, তোমার দ্বারা আল্লাহ্ যদি এক ব্যক্তিকেও ইসলামে নিয়ে আসেন, তবে তা তোমার জন্য সারা দুনিয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তুমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার করবে না।



www.pathagar.com

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসা আল-আশ্‘আরী (রাঃ)-কে এডেনের উচ্চ ও নিম্ন এলাকায় প্রেরণ করা কালে রসূলে করীম (স.) তাঁদের বললেন ঃ —মুসলিম

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا -

সব সময় সহজতার বিধান করবে, কষ্ট-সংকীর্ণতা ও কঠোরতার প্রশ্রয় দেবে না। মানুষকে খুশীর খবর শোনাবে, তাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না।[১]

এমনিভাবে রসূলে করীম (স.) যখনই কোন বাহিনী শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করার জন্য পাঠাতেন, তখনই সাধারণ সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ভাষণ দান প্রসংগে বলতেন ঃ

بِاسْمِ اللهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ...

لَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا امْرَأَةً وَّلَا

وَلِيْدًا وَّلَا عَسِيْفًا وَّلَا ضَعِيْفًا -

আল্লাহ্র নামে......আল্লাহ্র পথে তোমাদের পাঠানো হচ্ছে। যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করবে। কিন্তু কখনই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক কাজ করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, নিহতের হাত-পা-নাক-কান কেটে বিকৃত করবে না এবং হত্যা করবে না কোন নারী, শিশু, শ্রমজীবী বা দুর্বল ব্যক্তিকে। —মুসলিম

একটি যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে রসূলে করীম (স.) বললেন, ‘মেয়ে লোককে হত্যা করা উচিত ছিল না।’ অতঃপর তিনি যুদ্ধে স্ত্রীলোকদের হত্যা করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেন।[২]

---

১. মুসলিম শরীফে হাদীসটি সাঈদ ইবনে আবূ বুরদা তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত এবং তাতে হযরত মুয়াযের সংগে আবূ বুরদার পিতাকে ইয়ামনে প্রেরণ-কালে উক্ত কথা বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, অপর একটি হাদীসে হযরত মুয়াযের সংগে হযরত আবূ মূসাকে এডেনে নয়—ইয়ামনে প্রেরণকালে উক্ত কথাটি বলা হয়েছিল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু তাতে শব্দগুলি উল্টা-পাল্টা। (مسلم مع شرحه للنووى ج ٢ ص ٨٢ اصح المطالع)

২. মুসলিম ২য় খণ্ড, ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।

www.pathagar.com

এমনিভাবে ইসলামের যুদ্ধনীতি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে রচিত। এই দৃষ্টিতেই নবী করীম (স.) সব সময় সকল সৈন্যবাহিনী প্রধান ও সাধারণ সেনাকে নির্দেশ দিতেন এই বলে যে, শত্রুপক্ষের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে না। আযানের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় কিনা এই দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের মুসলমান হওয়া বা কাফির হওয়া নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করবে। যদি প্রতিপক্ষের শিবির থেকে আযানের ধ্বনি শুনতে পাও, তা হলে বুঝতে হবে, তারা মুসলিম এবং তখনই যুদ্ধ বিরতি করবে। এইরূপ অবস্থায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ ও অস্ত্র চালনার পরিবর্তে ভিন্নতর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। অনুরূপভাবে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে যদি মসজিদ বা নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্যভূত হত, তা'হলেও সাথে সাথেই যুদ্ধ বিরতি হয়ে যেত। শত্রুদেরকে আগুনে জ্বালানো বা অগ্নি-উত্তাপে পীড়ন দেওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইসলামে, তাদের সাথে শত্রুতা যতই সাংঘাতিক হোক-না কেন। রসূলে করীম (স.) একবার মুসলমানদের দুইজন চরম শত্রুকে জ্বালিয়ে মারার নির্দেশ দিয়েও তা বন্ধ করে দেন এবং বলেন ঃ

كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ
بِهَا إِلَّا اللّٰهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُ -

আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে মারার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে খেয়াল হল যে, আগুন দিয়ে আযাব দেয়ার কাজ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর হতে পারে না। কাজেই আমার সে নির্দেশ আমি প্রত্যাহার করছি এবং নতুন করে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ওদের পেলে তোমরা হত্যা করবে।

রসূলে করীম (স.)-এর নির্দেশিত যুদ্ধনীতি অনুসরণে সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন খুব বেশী আগ্রহী এবং অবিচল। তাই তাঁরা শত্রুকে হত্যা করার ব্যাপারে সব সময় মুখমণ্ডলে আঘাত হানাকে এড়িয়ে যেতেন। কেননা তাতে মানুষের সুন্দর মুখাবয়বের আকৃতি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায় অবধারিতভাবে। বুখারী শরীফের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَالتَّصْبِيْرِ

وَسَائِرِ أَسَالِيْبِ الضَّرُوْرَةِ وَالشَّرَاسَةِ الَّتِى تُلَازِمُ الْحُرُوْبُ عَادَةً -

নবী করীম ( স. ) আকৃতি বিকৃতকরণ, শক্ত করে বেঁধে হত্যা করা এবং সাধারণত যুদ্ধে যে জবরদস্ত ক্ষতিকর ও অন্যায় আচরণ হয়ে থাকে তা করতে নিষেধ করেছেন।[১]

আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে একবার রোমানদের মধ্য থেকে ধৃত দুইজন বন্দীকে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে তীর নিক্ষেপণে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) এই খবর শুনতে পেয়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ...فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ

بِيَدِهٖ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا -

রসূলে করীম (স.) আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, আমি শুনতে পেয়েছি ... ...যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি, একটি মুরগী যবাই করতে হলেও আমি তা বেঁধে যবেহ-করবো না।

আবদুর রহমান এই কথা শুনতে পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন এবং তাঁর এই ভুল কাজের কাফ্ফারাস্বরূপ চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ( রাঃ ) থেকে বর্ণিত, একটি যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা হয় বিজয়ী। অতঃপর পরাজিত মুশরিকরা তাদেরই এক নিহত ব্যক্তির লাশ ক্রয় করার প্রস্তাব পাঠালে রসূলে করীম (স.) তা বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানালেন শুধু মানুষের মর্যাদা রক্ষা, মানব দেহ নিয়ে দর-দস্তুর করার অপমান থেকে তাকে উন্নীত করা, তার মনুষ্যত্বকে অপমান-লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে।

---

১. বুখারী শরীফ ঃ ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

বস্তুত মানুষ জীবিত হোক কি মৃত, উভয় অবস্থায় মানব দেহের মর্যাদা ও সম্ভ্রম অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং তা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না, তার যত উচ্চ মূল্যই নির্ধারণ করা হোক না কেন। মানব দেহের বা তার মাথার খুলির ব্যবসায় করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। কেননা তার চাইতে মানবতার অপমান আর কিছু হতে পারে না।

**মনুষ্যত্ব ও মানবতা সর্বোচ্চে**

প্রাচীনকালে পারসিক ও রোমানরা কোন জনপদ দখল করে নিলে সেটিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিত। পরাজিত শত্রুদের নাক-কান-হাত-পা কেটে অবয়ব বিকৃত করে ফেলত এবং কর্তিত মস্তক বল্লমের মাথায় গেঁথে উঁচিয়ে নিয়ে সেনাধ্যক্ষ ও বীর দাম্ভিক রাজা-বাদশাহ প্রমুখের সম্মুখে উপস্থিত করতো গৌরব প্রকাশের জন্য, নিজেদের বিজয়ের বাস্তব প্রমাণ-স্বরূপ।

উত্তরকালে রোমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে কোন কোন মুসলিম সেনাধ্যক্ষও অনুরূপ কাজ করার কথা চিন্তা করছিলেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস ও শারাহবীল—এই দুইজন সেনাধ্যক্ষ সিরিয়ার নামকরা ব্যক্তি 'বানান'-এর মস্তক ছিন্ন ক'রে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সমীপে পেশ করলে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। 'পারসিক ও রোমানরা এইরূপ করে'—একথা বললে তিনি এর প্রতিবাদ করে রাগত কণ্ঠে বললেন ঃ

أَاَسْتِنَانٌ بِالْفُرْسِ وَالرُّوْمِ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَىَّ رَأْسٌ بَعْدَ
الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكْفِى الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ -

তোমরা কি পারসিক ও রোমানদের রীতিনীতি অনুসরণ করতে চাও? ...অতঃপর কোনদিনই যেন কোন ছিন্ন মস্তক আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা না হয়। আমাদের জন্য তো কুরআন ও সুন্নাহ্ই যথেষ্ট (পথ প্রদর্শক ও নীতি নির্ধারক) অথবা শুধু চিঠি লিখে সংবাদ জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে সকল শত্রুপক্ষীয় লোকজনের প্রতি মুসলমানদের এইরূপ আচরণই ছিল চিরকাল এবং তা যুদ্ধের বাইরের সাধারণ অবস্থায় সমানভাবে অনুসৃত হত।

অনুরূপভাবে মানুষের প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন, রক্তপাত বন্ধকরণ এবং শান্তির প্রতি আগ্রহ ঔৎসুক্য—এগুলো ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক ও শাসক-প্রশাসক নেতৃবৃন্দের বিশেষ গুণ ও পরিচিতি। আমীর মু'আবিয়ার শাসনকালে রোমানরা মুসলমানদের সহিত চুক্তিভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে। তখন তাঁর নিকট বিপুল সংখ্যক লোক বন্দী ছিল। মুসলমানগণ তাদের হত্যা বন্ধ করে দেন এবং মুক্ত করে ছেড়ে দেন।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর অধীন একজন শাসনকর্তাকে এই ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء أدعى
لنقمة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك
الدماء بغير حقها والله سبحانه وتعالى مبتدئ بالحكم
بين عباده فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة
فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه
ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي ۝

রক্তপাত থেকে দূরে থাকবে, বিশেষ করে প্রকৃত ও উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যে রক্তপাত। কেননা তার তুলনায় অধিক আযাব আহ্বানকারী ও নিয়ামত বিলোপকারী আর কিছু নেই। অকারণ রক্তপাতে আয়ুষ্কালও নিঃশেষ হয়ে আসে। দুনিয়ায় তোমরা পরস্পরে যে রক্তপাত কর, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে এই

www.pathagar.com

বিষয়েই বিচার করবেন। অতএব অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে তুমি তোমার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শক্ত করতে চাইবে না। কেননা আসলে তাতে তা দুর্বল ও শক্তিহীন বানিয়ে দেয়, তা নিঃশেষ করে ও তার অবসান ঘটায়। আল্লাহর নিকটে পেশ করার মত না তোমার নিকট কিছু থাকবে, না আমার নিকট।[১]

ইসলামী দাওয়াতের লোকেরা সাধারণত যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন, তাঁদের চেষ্টা সব সময় নিয়োজিত থাকত শত্রুতার মাত্রা ও শত্রুদের সংখ্যা হ্রাস করার দিকে। তাঁরা কোন জনসমষ্টিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতেন না। কেননা তাতে ক্রোধ ও আক্রোশের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। বস্তুত তাঁরা রক্তের সাগরে তাঁদের ইসলামী দাওয়াত নিয়ে চলতেন না। তাঁরা যুদ্ধ করতেন বিপর্যয়কারীদের বিপর্যয় বন্ধ করার লক্ষ্যে। অতঃপর তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যেত দীনের জন্য উদার বিস্তীর্ণ পথ। দয়াশীল মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হ'ত।

কিন্তু অমুসলিমদের অতীত ও বর্তমান কালের যুদ্ধে এইরূপ মানবতা-বাদী নীতির অনুসরণের নাম-চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমান দুনিয়ায় নিত্য সংঘটিত ঘটনাবলীতে মানবতার চরম অবমাননা সংঘটিত হচ্ছে, ইসলামের মানবিক নীতির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে যা কিছু ঘটছে তাকে নিতান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকি প্রভৃতি স্থানে কোটি কোটি মানুষকে যেভাবে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে, ইসলামের বিগত চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাসে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও দেখা যাবে না।

বর্তমানে পরাশক্তিসমূহ যেভাবে মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও দুনিয়ার অন্যান্য মানুষকে যেভাবে তিল তিল করে ধ্বংস করা হচ্ছে, ইসলামের যুদ্ধনীতির সাথে তার দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুধ্যমান শত্রুপক্ষকে দমন করা বা আত্মসমর্পণে বাধ্য করার লক্ষ্যে একালের শক্তিধররা যেসব নিপীড়ন ও মানবতা-বিধ্বংসী উপায়-উপকরণ উৎপাদন ও প্রয়োগ করছে, ইসলাম তা আদৌ সমর্থন করে না।

---

১. হযরত আলী (রাঃ) প্রায় সময়ই যুদ্ধ শুরুর প্রথমে এই মর্মের ভাষণ দিয়ে সৈন্যদের হিদায়ত দান করতেন। এই পর্যায়ের আরও অন্ততঃ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে। امام علی بن ابی طالب محمد رضا ص ۱۸۱-۱۸۶

www.pathagar.com

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে নবী করীম (স.) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। ফলে যেসব শত্রুপক্ষীয় লোক অস্ত্র সংবরণ করে এবং স্পষ্ট ভাষায় শান্তি ও আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে হত্যা করার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন কি তার এই শান্তি ও আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থতায় যদি প্রবল সন্দেহও থাকে, তবু তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়ারই নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

যে লোক তোমার প্রতি 'সালাম' বা শান্তির প্রস্তাব পেশ করলো, তাকে তুমি বলো না যে, 'তুমি মু'মিন বা বিশ্বাসযোগ্য নও'। তুমি কি দুনিয়ার স্বার্থ চাচ্ছ? —সূরা নিসা ঃ ৯৪

এ থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সাধারণত সম্পূর্ণ মানবতাবাদী নীতি ও আদর্শের অনুসারী। যুদ্ধ ও রক্তপাত ইসলামের লক্ষ্য নয়। শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ নির্মূল বা ধ্বংস করে দিতে ইসলাম কখনই চায়নি। ইসলাম চেয়েছে মানুষকে মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করে, মর্যাদা দিয়ে, বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে। কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্মহীন গণতন্ত্রবাদী বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শানুসারীদের আচরণ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের লক্ষ্য শত্রুকে নিপাত দেওয়া, নিঃশেষে ধ্বংস করা ও নাম-চিহ্ন পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের তরে মুছে ফেলা।

বর্তমান আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন বাহ্যত দয়াপ্রবণ ও মানবতাবাদী মনে হ'লেও তা বাস্তবভাবে কার্যকর নয়। বর্তমানে তা অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন বিধানের ন্যায় 'কাগজের উপর লিখিত' মাত্র। বাস্তবে তার কোন একটিরও এক বিন্দু কার্যকর নেই। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ আইন শরীয়তের অন্যান্য আইনের মতই সদা কার্যকর। ইসলামী বিধানে বিশ্বাসীদের ঈমানী শক্তির বলেই তা কার্যকর। অতএব মুসলিম যোদ্ধারা যুদ্ধ করেন কেবলমাত্র এই লক্ষ্যে ঃ

لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا -

www.pathagar.com

যেন আল্লাহ্‌র কালেমা সর্বোচ্চ ও বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

—ইবনে মাজাহ্

এই যোদ্ধার কখনই চুক্তিভঙ্গ করেন না, চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যাও করেন না, করতে পারেন না। কেননা তিনি জানেন, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

ইসলামের মৌলিক মানবতাবাদী নীতিকে অধিক কার্যকর ও কল্যাণকর বানিয়ে দিয়েছে ইসলামের এই যুদ্ধ আইন। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ হচ্ছে একটি সময়ের প্রচণ্ড চেষ্টা-সাধনা মাত্র। অতঃপর তা শেষ হয়ে যায়। এর মধ্যেই মানুষের অনেক দুঃখ-দুর্দশা ও অশেষ নির্যাতন নিষ্পেষণের অবসান ঘটে। তা থেকে তাদের বাস্তব মুক্তি সম্ভব হয়। অকল্যাণের গর্ত থেকে মানুষকে উদ্ধার করাই যুদ্ধের লক্ষ্য, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ইসলামী যুদ্ধের কাম্য। অতএব এই লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর মুহূর্তের তরেও যুদ্ধ চলতে পারে না।

## সর্বমুখী যুদ্ধ

ইসলামের যুদ্ধ সর্বমুখী। তা প্রধানত তিন পর্যায়ে প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে ঃ

১. যোদ্ধা সংগ্রহ ও তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকরণ।
২. যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ ও ব্যবহারোপযোগীকরণ।
৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়া।

আল্লাহ্‌তা'আলা একটি মাত্র আয়াতে উপরিউক্ত তিনটি পর্যায়ের কথাই বলে দিয়েছেন ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ -

এবং শত্রুদের দমনের জন্য তোমরা যতদূর সাধ্যে কুলায় শক্তি সংগ্রহ কর এবং অশ্ব ও যানবাহন ইত্যাদি যোগাড় কর।

www.pathagar.com

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তার অর্থ মুসলিমকে শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুতি গ্রহণে তাদের সমগ্র শক্তি একীভূত করতে হবে এবং সাধ্যে কুলায় এমন কোন কাজই বাকী রাখা চলবে না। 'শক্তি' বলতে কোন বিশেষ এক ধরনের শক্তি বোঝায় না, এ শক্তি সর্বমুখী। কাল ও যুগের পরিবর্তনে এবং যুদ্ধ শিল্পের বিকাশের পরিবর্তনশীল পর্যায়-সমূহে শক্তিরও রূপান্তর ঘটে। তাই শক্তি সংগ্রহে কালের সাথে তাল মিলিয়ে চলা মুসলিমদেরও কর্তব্য। এজন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্যা অর্জন যেমন জরুরী, তেমনি জরুরী সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত বিদ্যা অর্জনও।

সেই সাথে যোদ্ধাদের নিরন্তর ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে তাদের মন-মানসিকতাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার সাথে সাথে তাদের শরীরকেও যুদ্ধোপযোগী বানাতে হবে। শত্রুপক্ষকে দমন করা এবং তাদের সংবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও আনুকূল্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার সব উপায় পন্থা-পদ্ধতি ও কলা-কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে। কেননা এই সবকিছু দ্বারাই শত্রুপক্ষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলা সম্ভব এবং সেজন্য এগুলো অতীব প্রয়োজনীয়। ফল কথা, ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ প্রস্তুতিই যুদ্ধের প্রতিবন্ধক, যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপন্থী। এ কারণেই নবী করীম (স.) প্রতি মুহূর্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতেন। তা দেখে বা জানতে পেরে শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে থাকতো। এই ভীতি ও আতংক রসূলে করীম (স.)-কে খুব বেশী সাহায্য করেছে এবং তা আল্লাহ্‌র সাহায্যরূপে বিবেচিত। রসূলে করীম (স.)-এর এই যুদ্ধ প্রস্তুতি হ'ত অত্যন্ত প্রবল ও আতংক সৃষ্টিকারী। এমন এক প্রভাবশালী শক্তি, যা কোন সীমায় পৌঁছে শেষ হয়ে যেত না। নবী করীম (স.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এই নির্দেশই দিয়েছিলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ -

হে নবী! মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দাও—উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে রাখো। —সূরা আনফাল ঃ ৬৫

এ কারণে তিনি সব সময়ই মুসলমানদের উপদেশ দিতেন, উৎসাহিত করতেন ; তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও দিতেন।

www.pathagar.com

**অস্ত্রের পূর্বে ব্যক্তি**

যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্যায়ে সর্বপ্রথম গুরুপূর্ণ কাজ হচ্ছে যোদ্ধা ব্যক্তিদের তৈয়ার করা। যুদ্ধের জন্য ব্যক্তিরা প্রস্তুত না হ'লে অন্যান্য সব প্রস্তুতিই সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হতে বাধ্য। এজন্য যোদ্ধাদের সর্বদিক দিয়েই যুদ্ধের লক্ষ্যে প্রস্তুত করতে হবে। সেজন্য সূক্ষ্ম মানদণ্ডে লোক বাছাই, ভর্তি ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক, যুদ্ধের দুঃসহ ও কঠিন পদক্ষেপসমূহেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কোন্ অবস্থায় কিরূপ কাজ করতে হবে, তা আগে থেকেই তাদের ভালোভাবে জানিয়ে-বুঝিয়ে ও তাদের মন-মানসিকতায় তা দৃঢ়মূল ক'রে বসিয়ে না দিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে যেমন, তেমনি অনেক বিপদেরও কারণ ঘটতে পারে। অনেক সময় গোটা যুদ্ধের জয়-পরাজয়ও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। কঠিন-কঠোর কষ্ট সহ্য করার ট্রেনিং যেমন প্রয়োজন, তেমনি বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতা সৃষ্টি করাও আবশ্যক। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদানের জন্য তৈরী না হলে যোদ্ধাদের দ্বারা বিজয় লাভের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

এ জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন যোদ্ধাকে স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্তভাবে জানতে হবে, সে যুদ্ধে কেন এসেছে এবং এই যুদ্ধটি কি লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একজন মুসলিম হিসাবে ইসলামের নির্দেশে সূচিত যুদ্ধে তার দায়-দায়িত্ব কি এবং তাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কি ভূমিকা পালন করতে হবে, তা-ও তাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে। এজন্য তার হৃদয়-মনকে পূর্ণ সচেতন বানাতে হবে, তাকে আল্লাহ্ নিবেদিত বানাতে হবে একান্তভাবে। আল্লাহ্র সাথে বান্দার ঈমানের দিক দিয়ে যে চুক্তি রয়েছে, তাকে নতুন করে 'ঝালাই' করতে হবে। সে যে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে 'আল্লাহ্র পথে' অগ্রসর হচ্ছে, এই দৃঢ় প্রত্যয় তার মন-মগজে দৃঢ়মূল থাকতে হবে।

এই কথাই বলা হয়েছে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ

www.pathagar.com

وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ

وَالْقُرْاٰنِ - وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا

بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আল্লাহ্ মু'মিনদের জান-প্রাণ ও ধন-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বলে যে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। এ মু'মিন লোকরাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে তারা যেমন শত্রুকে হত্যা করে, তেমনি তারাও (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। এদেরকে জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা সত্যভিত্তিক যা তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে উদ্ধৃত।...আর আল্লাহ্র চাইতে সঠিকভাবে ওয়াদা পূরণকারী আর কে হতে পারে? অতএব তোমরা যে বিষয়ে আল্লাহ্র সহিত 'বায়'আত' করেছ, সেই বায়'আতের জন্য তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ হচ্ছে অতি বড় সাফল্য। —সূরা তাওবা ঃ ১১১

এই বিশ্বাসও দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মু'মিনদেরই সাহায্যদানের ওয়াদা করেছেন এবং তা অবশ্যই পূরণ হবে। এ মু'মিনদেরই সত্যিকারভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি, মানবতার প্রতি তারা পুরোপুরি আস্থাশীল। সবব্যাপারে আল্লাহ্ই যে প্রকৃত ইনসাফ ও সুবিচারক তাতেও কোন সন্দেহ রাখা চলবে না। কেননা আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মু'মিনদের সাহায্য করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কর্তব্য।

—সূরা রূম ঃ ৪৭

ইতিবাচক ভাবধারা ও দৃঢ়তা সংকল্পবদ্ধতায় মুজাহিদ মু'মিনের হৃদয়মন ভরপুর হয়ে থাকতে হবে। ঈমানের কর্মশালায় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে তার ঈমান ও প্রত্যয়। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, সে

দু'টি কল্যাণের কোন একটি অবশ্যই লাভ করবে ঃ সাহায্য ও নেতৃত্ব—বিজয়; অথবা শাহাদাত ও শুভ কর্মফল।

এ কথা তার নিঃসন্দেহে জানা থাকতে হবে যে, যুদ্ধের ময়দানে তাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, বহু আঘাত সহ্য করতে হবে। সইতে হবে অনেক নির্যাতন-নিষ্পেষণ। আসলে যুদ্ধটা হচ্ছে জীবন-মরণের ব্যাপার। এজন্য অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা-অবিচলতার একান্ত প্রয়োজন। তা'হলেই সে শত্রুর সম্মুখে একবিন্দু দুর্বলতা দেখাবে না, সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই একবিন্দু ভয় পাবে না। ভয় পাবে না শত্রুপক্ষের আঘাতকে, পঙ্গুত্বকে, এমনকি মৃত্যুকেও নয়। সবকিছুর মুকাবিলায় সে থাকবে অবিচল হয়ে। যুদ্ধের ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর কোন চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তার চিন্তাও করবে না। কেননা তার অজানা নয় যে, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বড় গুনাহ মহান আল্লাহ্র নিকট। অনেক সময় তা কুফরী পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে মু'মিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন, আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদই হবে তার নিকট নিজের, তার সন্তান, পিতা-মাতা-স্ত্রী-ভাই বংশের লোক, তার ব্যবসায়, ধন-মাল ও মনোরম ঘর-বাড়ী সবকিছুর তুলনায় অনেক বেশী প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া। এ জন্য তাকে নিম্নোক্ত বিষয়ের দিক দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. যে আদর্শের জন্য সে লড়াই করতে প্রস্তুত, সে সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাকে। সে আদর্শের পূর্ণ আনুগত্য করে চলতে রাযী হতে হবে। যার নেতৃত্বে এই জিহাদ সূচিত, তার প্রতি শরীয়ত-সম্মত আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা গ্রহণ করতে হবে। এই কাজটি একটি নতুন আনুষ্ঠানিক বায়'আতের মাধ্যমেও হতে পারে, যেমন বায়'আতে রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ -

হে নবী, যারা তোমার হাতে বায়'আত করছে, তারা আসলে বায়'আত করছে আল্লাহ্র সাথে। কেননা তাদের হাতের উপর আল্লাহ্র হাত ছিল। —সূরা ফত্হ ঃ ১০

www.pathagar.com

বায়'আতে রিযওয়ানের পর এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দিয়েছিল যে, হুদায়বিয়ায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং রসূলের হাতে উপস্থিত সাহাবীদের আত্মদানের বায়'আত গ্রহণকে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিয়েছেন।

২. আল্লাহ্‌র পথে শেষ জীবন পর্যন্ত যুদ্ধ করার এই ওয়াদা প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হ'তে হবে এবং তা পূর্ণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা থাকতে হবে। ওয়াদা অনুযায়ী যুদ্ধে আত্মদানের এই কথাটিই বলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতেঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ـ

মু'মিনদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি রয়েছে, যারা যে বিষয়ে তারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল, তাতে সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের অংশ পূর্ণ ক'রে দিয়েছে (আত্মদান করে) আর অপর লোকেরা অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের কৃত ওয়াদা পরিবর্তন করেনি। —সূরা আহ্‌যাব ঃ ২৩

৩. শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রামকালে অবিচল থাকা এবং কঠিন বিপদ কালে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন শত্রুপক্ষের কোন বাহিনীর সহিত যুদ্ধরত হবে, তখন তোমরা অবশ্যই দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করবে এবং খুব বেশী করে আল্লাহ্‌র যিকর করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। —সূরা আন-ফাল ঃ ৪৫

৪. ভয়-ভীতি ও আতংক-আশংকাকে দৃঢ়তা সহকারে মুকাবিলা করতে হবে। মন থেকে সব দুঃখ ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনা দূর করে

www.pathagar.com

দেবে। তা'হলেই মন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত থাকতে পারবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

তোমরা দুর্বলতা দেখাবে না, তোমরা দুঃখ বোধ রাখবে না। তোমরা ঈমানদার হলে অবশ্যই বিজয়ী হবে। —সূরা আলেইমরান ঃ ১৩৯

৫. সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাওয়া, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন, নির্ভীকতা এবং ঈমান সহকারে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, যাকে হত্যা করা সম্ভব হবে তাকে হত্যা করা এবং যাকে বন্দী করা সম্ভব হবে, তাকে বন্দী করা আবশ্যক। আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ - حَتَّى إِذَا

أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ -

যখন তোমরা কাফির শত্রুদের সহিত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের (একমাত্র ও প্রধানতম) কাজ হচ্ছে হত্যা করা। শেষ পর্যন্ত যখন শত্রু নিধন যজ্ঞ সমাপ্ত করে ফেলবে, তখন যাদের পাবে, তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪

৬. যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে—যখন উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ও হাহাকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, চতুর্দিকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, তখন ইসলামী মুজাহিদকে দৃঢ়তা ও অবিচলতা অবলম্বন করতে হবে। পারস্পরিক ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে হবে, ধৈর্য ধারণে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে আল্লাহ্র ভয় পোষণের আন্তরিকতা সহকারে। তখন বিজয় লাভের কার্যকারণ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকে বেশী মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ্তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ -

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা নিজেরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য ধারণে পারস্পরিক সহযোগিতা কর এবং শত্রুপক্ষের গতিবিধি ও তৎপরতার উপর অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। আর আল্লাহ্‌র ভয় মনের মধ্যে সদা জাগ্রত রাখ, সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। —সূরা আলেইমরান : ২০০

৭. শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করা, তাদের নাগাল পাওয়া, তাদের পালিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া, তাদের বেঁচে থাকার উপায়-উপকরণ করায়ত্ত করা এবং তাদের চলাচলের পথ সংকীর্ণতর করে দেওয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় লাভের পূর্ণত্ব বিধানের জন্য জরুরী। এরই তাকিদ এসেছে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ - إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ
يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ - وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ -
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

কাফির শত্রুপক্ষের লোক সমষ্টির পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখাবে না। তোমরা কষ্টে পড়ে গিয়ে থাকলে তোমাদের ন্যায় ওরাও তো কষ্টে পড়ে গেছে। তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে জিনিসের আশা পোষণ কর, ওরা তার আশা করে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞানী।
—সূরা নিসা : ১০৪

৮. কখনই এবং কোন অবস্থাতেই কাফির শত্রুদের নিকট আত্মসমর্পণ করা চলবে না। অন্যায় ও কুফরের সাথে অনমনীয় ও অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই সন্ধি করা চলবে না। কোনরূপ সহজ ও অপমানকর শর্তে কথাবার্তা চালাবার আহবানকে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি শত্রু পক্ষকে বিজয়ী হতে দেখলেও কিছুমাত্র নমনীয় হওয়া চলবে না। কেননা এ যুদ্ধ ক্ষমাহীন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে :

www.pathagar.com

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ -

অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়বে না এবং সন্ধি-সমঝোতার আবেদন পেশ করে বসবে না। আসলে তোমরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং তোমাদের অবদান তিনি কখনই বিনষ্ট করবেন না। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৫

মনে রাখা আবশ্যক যে, এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন, যখন মদীনার ছোট জনপদে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত মুষ্টিমেয় মুসলিম জনতা ইসলামের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। আর তার বিরোধিতা করছিল সমগ্র আরব জনতা।

৯. দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে এই চূড়ান্ত সত্যের প্রতি যে, জিহাদই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন লাভের একমাত্র উপায়।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-প্রাণ ও ধন-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই কথা বলে যে, তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত। —সূরা তাওবা ঃ ১১১

**অতঃপর**

কুরআন মজীদের মৌল হিদায়াতের ভিত্তিতে যুদ্ধকালে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণীয় কতিপয় নীতি পদ্ধতি ও বিশ্বাস ভাবধারার উল্লেখ করা হল। এগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হ'লে যুদ্ধের গতিবিধি অবশ্যই নির্ভুল হবে, যুদ্ধকালীন পদক্ষেপসমূহ দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন হবে। এই পবিত্র ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়েই যোদ্ধাকে জিহাদে শরীক হতে হবে। সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হবে। জিহাদকে সে মনে



www.pathagar.com

করবে—বিশ্বাস করবে শাশ্বত জীবন লাভের একমাত্র উপায় বলে। দীন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের ইতিহাসে সে যে বিরাট দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছে ও কঠিনতম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এই অনুভূতি তার মধ্যে তীব্র হয়ে থাকবে সর্বক্ষণ।

মুজাহিদ অতঃপর অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়বে। কিন্তু যান্ত্রিক মারণাস্ত্রই তার একমাত্র সম্বল হবে না, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও হবে তার বড় সম্বল।

সে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস রাখবে, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হস্ত সব সময়ে তার দিকে প্রসারিত। অদৃশ্য শক্তি তার সাথে সাথে রয়েছে, তাকে রক্ষাও করবে, বিজয়ীও বানিয়ে দেবে। তাদের দিলে পরম প্রশান্তি জাগিয়ে দেবে। তারা সকল প্রকার ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করে যেতে পারবে।

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ - وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

সেই মহান আল্লাহ্‌ই মুমিনদের দিলে পরম প্রশান্তি অবতীর্ণ করে দিয়েছেন, যেন তাদের ঈমানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর শক্তিসমূহ আল্লাহ্‌রই করায়ত্ত আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও মহা-বিজ্ঞানী। —সূরা ফাত্‌হ ঃ ৪

এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করে, জান্নাত লাভের ঔৎসুক্য সফল করে এবং সেজন্য শাহাদত বরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কেননা সে শাহাদতের মর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত এবং এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র অবিনশ্বর ঘোষণাকে পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا - بَلْ أَحْيَاءٌ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ○ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। তারা তো জীবিত, তাদের আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রিয্‌কপ্রাপ্ত, আল্লাহ্‌ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের যা কিছু দিয়েছেন তা পেয়েই তারা আনন্দিত, সন্তুষ্ট এবং তাদের পিছনে এসে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের তারা এই বলে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা যেন দুঃখিত-চিন্তান্বিত না হয়।

--সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭০

শাহাদতপ্রাপ্ত লোকদের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে ইসলামের দুশমনদের প্রতি তাদের অন্তরের তীব্র ঘৃণা, তাদের পিছনে ফেলে তাদের উপরে উঠার ও এগিয়ে যাওয়ার উদগ্র বাসনা। কেননা ইসলামের দুশমনরা হয় কাফির, না হয় মুশরিক। আর এই ব্যক্তিরা তাদের কুফরী বা শিরকী মন-মানসিকতার কারণে প্রকৃত মহাসত্যকে অস্বীকারকারী। এদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ -

মুশরিক ব্যক্তিরা অপবিত্র—নিকৃষ্ট। —সূরা তাওবা ঃ ২৮

আর কাফিররাও যেহেতু শিরকের মধ্যেই লিপ্ত হয়, এই কারণে তাদের সম্পর্কেও এই কথা সত্য। পক্ষান্তরে তাদের সহকর্মী মু'মিন ভাইদের প্রতি থাকে তাদের মনে পরম বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ। তারা সকলে একই ঈমানের ধারক ও বাহক, একই আদর্শের অনুসারী, অভিন্ন লক্ষ্যের অভিসারী। যুদ্ধের ময়দানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পারস্পরিক একাত্মতা ও

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধতা সহকারে এবং পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী। ফলে তাদের পরস্পরের দিল সহমর্মিতার পবিত্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বসিত। আল্লাহ্ নিজেই এই কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ -

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ - اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমাকে—হে নবী। শক্তিশালী করে দিয়েছেন তাঁর বিশেষ সাহায্য এবং মু'মিন লোকদের মাধ্যমে। সেই মু'মিনদের দিলসমূহকে তিনি একত্রিত, একই ভাবধারা সম্পন্ন ও পরস্পর বন্ধুত্ব বানিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তুমি সারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করেও তাদের দিলসমূহকে একত্রিত করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা করে দিয়েছেন। তিনিই তো সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞানী।

—সূরা আনফাল ঃ ৬৩

সেই সাথে এই শাহাদতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধের ময়দানে—যুদ্ধের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে—সেই কঠিনতম মুহূর্তে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারেন, আল্লাহ্ প্রেরিত ফিরিশতাগণ তাদের সাথে শরীক রয়েছেন; তাদের উপরে দুই পার্শ্বে সম্মুখে পেছনে অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক বাহিনী হয়ে মহাবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে যুদ্ধের ভারসাম্য তাঁদের পক্ষেই থাকছে। পরিণামে তা মু'মিনদের বাস্তব সাহায্যের রূপ পরিগ্রহ করছে, শত্রু নিধন ও বিজয় লাভ তাদের পক্ষে সহজতর হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ

مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ○

www.pathagar.com

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন তোমাদের আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি এই বলে তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের সহ-আরোহী এক হাযার ফিরিশ্‌তা পাঠিয়ে অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো। —সূরা আন ফাল : ৯

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَٰثَةِ
أَلَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُنْزَلِينَ ۝ بَلَىٰٓ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
أَلَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

হে নবী! তুমি যখন মু'মিনদের বলছিলে যে, তোমাদের আল্লাহ্‌ তিন হাযার অবতীর্ণ ফিরিশতা দিয়ে তোমাদের যে সাহায্য করবেন, তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না? ... ...হ্যাঁ, অবশ্যই! তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ্‌র ভয় মনে দৃঢ়মূল করে রাখো, এবং তারা অবিলম্বে তোমাদের নিকট এসে যায়......এটা এভাবে যে, তোমাদের আল্লাহ্‌ চিহ্ন ধারণকারী পাঁচ হাজার (ফিরিশ্‌তা) দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। —সূরা আলে ইমরান : ১২৪-১২৫

বস্তুত এ সৈনিকগণ যেহেতু কেবল আল্লাহ্‌র দীন কায়েম, দীনী হুকুমাত রক্ষা এবং দীনের ভিত্তিতে পরিচালিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতিরক্ষার জন্যই শুধু যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাই তাঁরা প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ্‌র সর্বপ্রকারের সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশী। আর এ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গেলে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তখন তাঁরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে এবং কোন এক মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেও একবিন্দু কুন্ঠিত হন না। বস্তুত 'সবর' এবং 'তাক্‌ওয়া'ই মানুষকে শত্রুর মুকাবিলায় প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী বানিয়ে দেয়। তখন তাঁরা যেমন

পর্বতের ন্যায় অনমনীয় ও সুদৃঢ় হয়ে লড়তে থাকেন, তেমনি শত্রু নিধনে তাঁরা হন ক্ষমাহীন।

যুদ্ধের সূচনাকাল থেকেই ইসলামী সৈন্যবাহিনী নিজেদের সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা মেনে চলেন নি। 'সংখ্যা তাঁদের সাধারণত এতটাই হ'ত, যতটা থাকতো মুসলমানদের মোট সংখ্যা। 'কেননা যে লোকই ইসলাম কবুল করতেন তিনিই হতেন ইসলামের একজন সৈনিক। সৈনিকদের সংখ্যা বেড়ে যেত মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং সেই অনুপাতে। ফলে ইসলামী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সীমিত ও কোথাও নির্দিষ্টভাবে স্থায়ী হয়ে যেত না, যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য তেমন কোন শর্তও আরোপিত ছিল না ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব গভীরভাবে অনুধাবন ব্যতীত। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নির্মমতা ও সর্বধ্বংসী পরিণতির কথা অবশ্যই বুঝতে হ'ত। এ দিক দিয়ে যোগ্য প্রত্যেক মুসলিমকেই এই যুদ্ধ-জিহাদে শরীক হতে হ'ত বাধ্যতামূলকভাবে। তবে দুর্বল-রোগাক্রান্ত, অক্ষম, বৃদ্ধ এবং যুদ্ধ করার মত সামর্থ্য পায়নি এমন বালক বয়সের লোকদের শরীক করা হ'ত না। যাঁদের কোন-না-কোন শরীয়তসম্মত ওজর থাকতো, তাঁদেরকেও যুদ্ধে শরীক হতে বাধ্য করা হ'ত না। বদর যুদ্ধে স্বয়ং রসূলে করীম (স.) হযরত উসমান (রাঃ)-কে যুদ্ধে না যাওয়া ও মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন এই কারণে যে, এই সময় তাঁর স্ত্রী, রসূল-তনয়া হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ) অসুস্থা ছিলেন। রসূলে করীম (স.) তাঁকে বলেছিলেন ঃ 'যুদ্ধে না গিয়েও তুমি একজন সৈনিকের শুভ প্রতিফল এবং গনীমতের অংশ পাবে।' অনুরূপভাবে হযরত আবূ ইমামাতা ইবনে সা'লাবাতো আল-আনসারী (রাঃ)-কেও মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু এজন্য যে, তাঁর মা তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

অল্প বয়সের বালকদেরকেও যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হ'ত না। হযরত উসামা ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, যায়দ ইবনে সাবিত ও নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ)-কে ওহুদের যুদ্ধে শরীক হ'তে দেয়া হয়নি তাঁদের এই অল্প বয়স্কতার কারণে, যদিও তাঁরা যাওয়ার জন্য পরম উৎসাহে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

অবশ্য অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের বাহিনীতে শামিল হয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি রসূলে করীম (স.) কখনই দেন নি। কেননা তাদের উপর কোন ক্রমেই আস্থা স্থাপন করা যেত না। বরং যে কোন মুহূর্তে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকাই ছিল প্রবল। য়াহূদীরা কুতায়বা ইবনে উবাই'র নেতৃত্বে কুরায়শদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু রসূলে করীম (স.) তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেনঃ শির্কী আকীদার লোকেরা যতক্ষণ ইসলামের তওহীদে ঈমান না আনবে ততক্ষণ তাদের নিয়ে করা যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই। প্রখ্যাত মুসলিম সেনাধ্যক্ষ হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালীদ (রাঃ) শত্রুদের পরাজয় বরণ ও ইসলাম গ্রহণের পর তাদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতেন, পরবর্তী যুদ্ধে তাদের শরীক হতে দিতেন না। কেননা তাদের হাতের অস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারা কিংবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া বা স্বপক্ষ ত্যাগ করে বিরোধী পক্ষে শরীক হওয়ার আশংকা থেকে কখনই মুক্ত হওয়া যেত না। আর তা কখনও সংঘটিত হলে খোদ ইসলামী বাহিনীর পক্ষেই অত্যন্ত মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া একান্তই অবধারিত।

তার মৌল কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের এই যুদ্ধ একান্তই আদর্শের লড়াই। ইসলামকে যারা নিজেদের জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেনি, তাদের পক্ষে এই যুদ্ধ করা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হতে পারে না।

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধ। রসূলে করীম (স.)-এর নিকট ইসলাম কবুলকারীদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের এটাই ছিল প্রথম সুযোগ বা ঘটনা। এই সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য—ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দু'টি বছরও অতিবাহিত হয়নি তখন। এই যুদ্ধে মাত্র তিনশত পাঁচজন ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। তাঁদের তিরাশি জন ছিলেন মুহাজির, আর একষট্টি জন ছিলেন আওস বংশের আনসার। অবশিষ্টরা ছিলেন খাজরাজ বংশ থেকে।

নবী করীম (স.) যখন গাত্ফান গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন, তখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে চার শ' জন। দওমাতুল জান্দাল পর্যন্ত যাত্রায় রসূলের সঙ্গী হয়েছিলেন এক হাযার ব্যক্তি। দ্বিতীয় বদর

যুদ্ধে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। আবূ সুফিয়ানের মুকাবিলায় রসূলে করীম (স.)-এর সংগে যোদ্ধা হিসাবে শরীক ছিলেন এক হাযার পাঁচ শত জন। আর খায়বর যুদ্ধে যোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক হাযার ছয় শত জন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (স.) পরিখা যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত য়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়যা'র দুর্গ ধ্বংস করে তাদের মনে ইসলামের ভীতি জাগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সৈন্য পরিচালনা করার নির্দেশ পান। রসূলে করীম (স.)-এর আহ্বানে এই যুদ্ধে তিন সহস্র মুসলিম অংশগ্রহণ করেন।

রসূলে করীমের (স.) মুক্ত গোলাম হযরত যায়দ ইবনে হারিসা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত মওতা'য় তিন হাযার যোদ্ধা পাঠিয়েছিলেন। বায়তুল মাকদিসের নিকটে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্বও তাঁদেরই উপর অর্পিত হয়।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হলে মক্কা জয় করার সময় নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এই সময় রসূলে করীম (স.) চারদিকে ঘোষণা প্রচার করে দিলেন ঃ 'আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষই যেন রমযান মাসে দলবদ্ধভাবে মদীনায় এসে সমবেত হন। পরে রসূলে করীমের (স.) নেতৃত্বে দশ সহস্র—আর একটি বর্ণনা মতে বারো সহস্র মুসলিম মক্কার দিকে যাত্রা করেন। আনসার, মুহাজির ছাড়াও আসলাম, সিফার, মুজাইনা, জুহাইনা, আসজা, সুলাইম, গাতফান প্রভৃতি কবীলার লোক এই বাহিনীর মধ্যে শামিল হয়েছিলেন।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য প্রেরিতব্য বাহিনীর সহিত শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানালে প্রাণ উৎসর্গকারী ত্রিশ হাযার বীর যোদ্ধা একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন রসূলে করীম (স.)-এর নির্দেশে।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ইসলামী বাহিনী বিজয় ভিযানে চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে এবং ইসলামী শাসন-এলাকা হয়ে দাঁড়ায় প্রশস্ততর। পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদুনের সময়ে ইসলামী বাহিনী আরব উপদ্বীপের সীমানা লংঘন করে বাইরের দুনিয়ায় বের হয়ে পড়ে। বিশ্ব জনতাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো এবং মজলুম মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগদানের লক্ষ্যেই এই অভিযানসমূহ

www.pathagar.com

পরিচালিত হয়। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ) যে সময় ইরাকের দিকে অভিযান পরিচালনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ), হযরত আমর ইবনুল 'আস, (রাঃ), হযরত শারাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ) প্রমুখ ইসলামের বীর সেনানায়ক ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আবার ঠিক যে সময় ইসলামী শক্তি সিরীয় অঞ্চলে অভিযানরত ছিল, তখন হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) পশ্চিম দিকে মিসর, বারকা ও ত্রিপলির দিকে অভিযান চালাচ্ছিলেন। ইরাক, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এলাকার অভিযানে ইসলামী বাহিনীর শক্তি বহু সহস্রে উন্নীত হয়েছিল।

**নারীদের অংশগ্রহণ**

যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম নারীরাও অংশগ্রহণ করেছেন ইসলাম-বিরোধী শক্তি দমন করার জিহাদে। তাঁরাও পুরুষদের পাশাপাশি থেকে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। কেননা এ ব্যাপারে পুরুষদের ন্যায় তাঁদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরাও ছিলেন ইসলামী সমাজের সচেতন সক্রিয় অংশ। ইসলামের সহিত কুফরের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে তাঁরা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। ফলে এই পর্যায়ে তাঁদের সাধ্য ও শক্তির শেষ বিন্দুও নিয়োগ করাই ছিল তাদের ঈমানী ও দীনী দায়িত্ব।

হযরত রবীয়া (রাঃ) নাম্নী মহিলা সাহাবী বলেছেন ঃ আমরাও রসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। আমরা মুজাহিদদের পানি খাওয়াতাম, সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় বহন করে নিয়ে আসতাম।

রসূলে করীমের (স.) কোন কোন বেগমও যুদ্ধকালে তাঁর সঙ্গী হতেন। মক্কা বিজয়ের অভিযানে হযরত উম্মে সালমা ও মাইমুনা (রাঃ) রসূলে করীম (স.)-এর সঙ্গী হয়েছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে রসূলে করীম (স.) আহত হলে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-ই তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফলের মা। বলেছিলেন ঃ 'আপনার সহিত যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিন আমাকে হে রসূল! আমি অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করবো। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করবেন।' জওয়াবে রসূলে করীম (স.) বলেছিলেন ঃ

قَرِّىْ فِىْ بَيْتِكِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُرْزِقُكِ الشَّهَادَةَ -

তুমি ঘরেই স্থিতি গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তোমাকে এখানেই শাহাদত দান করবেন।

ইসলামী মহিলারা যুদ্ধে গমন করলেও তাঁরা সাধারণত অস্ত্র ধারণ করেন নি। কেননা যোদ্ধা পুরুষের ন্যায় স্বভাবতই তারা শক্তি, সাহস ও পরাক্রমের অধিকারী হন না। তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁরা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন তাতে সন্দেহ নেই। ফলে পুরুষ যোদ্ধারা তাঁদের কাছ থেকে বাস্তব সহযোগিতা পেতেন। এর দরুন যুদ্ধকার্য চালানো তাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হ'ত। মহিলারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র-শস্ত্র, পানি ও খাদ্য বহন ও পরিবেশন করতেন। এমনকি ঠিক যুদ্ধ চলাকালে তাঁরা অগ্রবর্তী যোদ্ধাদের নিকট প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছিয়ে দিতেন। তবে যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করত এবং পুরুষদের ন্যায় তাদেরও অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধ করার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দিত, তখন তাঁরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতেও ত্রুটি করতেন না। উম্মে আমারা (রাঃ) নাম্নী এক আনসার মহিলা ওহুদ যুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ আমি ওহুদের রাত্রিতে অবস্থা দেখার জন্য বের হলাম। আমার সংগে পানি ছিল, তা আহতদের পান করাচ্ছিলাম। এক সময় রসূলের নিকটে পৌঁছে গেলাম। তিনি সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন দুর্বলতা দেখাচ্ছিল, তখন আমি রসূলে করীম (স.)-কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে গেলাম। শত্রুদের পক্ষ থেকে তরবারির যে আঘাত আসত আমিই তা প্রতিরোধ করছিলাম। আর আমি নিজে তীর নিক্ষেপ করতাম, যেন শত্রুর আক্রমণ রসূলের দিকে না হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে হয়।

রসূলে করীম (স.)-এর ফুফু হযরত সফিয়া (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে তুলনাহীন বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। হুনায়নের যুদ্ধে হযরত উম্মে সলীমা যোদ্ধাদের কাতারে দাঁড়িয়ে রীতিমত যুদ্ধও করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اِتَّخَذْتُ خَنْجَرًا يَوْمَ حُنَيْنٍ اِنْ دَنَا مِنِّيْ اَحَدُ الْمُشْرِكِيْنَ

بَقَرْتُ بَطْنَهُ -

হুনায়ন যুদ্ধের দিন আমি খঞ্জর ধারণ করেছিলাম। কোন মুশরিক আমার নিকটবর্তী হ'লে আমি তার পেট কেটে দেব এই ছিল উদ্দেশ্য।

**যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য**

যুদ্ধে যোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কোনদিনই ঘটে না. তাতে অস্ত্র ধারণ. বহন, শত্রু নিধনে দৃঢ়তা ও সাহসিকতা এবং প্রকৃত যুদ্ধ মুহূর্তে অপরিসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যই হয়ে থাকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য বিষয়। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা যখন তীব্র হয়ে উঠে, সংকট মুহূর্তে সতর্কতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ যখন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়, যখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করা অনিবার্য পড়ে এবং যখন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত সাহায্য অতি নিকটবর্তী হয়ে আসে, তখন ঈমানের অনমনীয় পরীক্ষা দিতে কে কে প্রস্তুত, যোদ্ধাদের নিকট থেকে তখন কতটা আত্মোৎসর্গ ভাবধারার আশা করা যায়, যুদ্ধের ব্যাপারে মৌলিক প্রশ্ন তা-ই।

কিন্তু এই ভাবধারা সকল যোদ্ধার নিকট থেকে সমান মাত্রায় পাওয়ার আশা করা যায় না। উক্তরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হওয়া চাট্টি-খানি কথা নয়। এজন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন মন-মানসিকতার যোদ্ধার প্রয়োজন। এরূপ যোদ্ধাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তৈরী করতে হবে। সে প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ দৈহিক. পেশাগত. নৈতিক, ও আত্মিক-এই সব কয়টি দিক দিয়েই হতে হবে এবং পূর্ণ মাত্রায় হতে হবে।

তদানীন্তন আরব যুবকরা সাহসিকতা, বীরত্ব, বিক্রম ও অগ্রবর্তিতার প্রশিক্ষণ গ্রহণে স্বভাবতই নিয়োজিত হ'ত। তারা তাদের যুবক-কিশোরদের শক্তি ও অনমনীয়তার শিক্ষাদানে ও শিক্ষালাভে পরস্পর উৎসাহিত করত। এজন্য তারা এমন সব নাম ধারণ করত, যা শক্তি ও দাপটের প্রতীক হত। যেমন আসাদ—ব্যাঘ্র, সওর—ষাঁড় বা বলদ, ফাহাদ—চিতা, চখর-প্রস্তর ইত্যাদি বলা হয়েছে। শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখাই ছিল এই ধরনের নাম গ্রহণের উদ্দেশ্য। আবুল আরফীশ নামক জনৈক এ'রাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : তোমরা নিজেদের নাম রাখো ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধরনের, আর

www.pathagar.com

তোমাদের ক্রীতদাসদের নাম 'মরজুক'—জীবিকাপ্রাপ্ত, রিবাহ—লাভ বা মুনাফা প্রভৃতি উত্তম ধরনের রাখো কেন? জওয়াবে বলেছিল : আমরা আমাদের নিজেদের নাম রাখি আমাদের শত্রুদের জন্য এবং আমাদের ক্রীতদাসদের নাম রাখি আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য।

আরবদের গোটা ধারাই ছিল শিকার, অভিযান ও যুদ্ধ। এই কারণে তারা মেয়েদের তুলনায় পুরুষ ছেলেদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতো। কেননা উক্ত পরিবেশ প্রেক্ষিতে মেয়েদের তুলনায় পুরুষ ছেলেরাই অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারতো।

ইসলামের পূর্বে আরবের গোত্রীয় জীবন গড়েই উঠেছিল শত্রুদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতা, নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ অথবা মৈত্রী ও সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে। তাদের স্বভাবগত প্রকৃতি ও সামষ্টিকতা আরব জনগণকে প্রকৃতিগতভাবেই যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত করে রাখতো। চারণভূমি, পশুর পানি পান স্থান ও দল বা গোত্রপতিত্ব নিয়ে দিন-রাত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'ত। লুটতরাজ ও মিত্রের সাহায্য করার ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্বিচার। এ ছিল জাহিলিয়্যতের যুগের কথা।

ইসলামই এই দুর্ধর্ষ আরব প্রকৃতিকে সংশোধিত, মার্জিত ও সংস্কার করে। ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণে এইসব গুণকে নিয়োজিত করার প্রশিক্ষণ দেয়। সর্বোপরি ইসলামকে জীবন-আদর্শ রূপে গ্রহণ, তার পূর্ণ মাত্রার অনুসরণ ও তাকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে ব্যবহার করার যোগ্য বানিয়ে দেয়। একজন তাবেয়ী বলেছিলেন :

كُنَّا نُعَلِّمُ أَبْنَاءَنَا الْغَزَوَاتِ كَمَا نُعَلِّمُهُمُ الْآيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ -

আমরা আমাদের সন্তানদের যেমন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতাম, তেমনি কুরআনের আয়াতও শিক্ষাদান করতাম।

হযরত উমর (রাঃ) সব সময় মুসলমানদের উপদেশ দিতেন এই বলে :

عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ -

তোমরা তোমাদের পুত্রদের ধাতু গলানো তীর নিক্ষেপ এবং অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ দাও।

www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.) কতিপয় যুবকদের কুস্তি লড়তে দেখে তাদেরকে উৎসাহ দিলেন এবং আরও কতিপয় যুবককে তীর নিক্ষেপণে ব্যস্ত দেখে বললেন ঃ

ارموا يا بني اسماعيل فان اباءكم كان راميا -

হ্যাঁ, হে ইসমাঈলের বংশধররা, তোমরা তীর নিক্ষেপণের কাজ কর। তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো তীর নিক্ষেপণে বিশেষ দক্ষ ছিল।[১]

হযরত আলী (রাঃ) মুসলমানদের সব সময় নসীহত করতেন তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্যে এবং তাদের নিজেদের ও ইসলামের জন্য কল্যাণকর কার্যাবলীর প্রতি তাদের আগ্রহী ও তৎপর বানানোর জন্য। তাঁর এই কথাটি গুরুত্ব সহকারে স্মরণ রাখার মত ঃ

علموا ابناءكم فوق ما تعلمون فانهم تخلوقون

لزمان غير زمانكم -

তোমরা তোমাদের সন্তানদের তোমরা যা জানো তার চাইতেও উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে। কেননা তোমাদের জীবনকাল থেকে ওদের জীবনকাল সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

বস্তুত ইসলাম সব সময়ই উপযুক্ত যোদ্ধারূপে তৈরী হওয়া ও তৈরী করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে। রসূলে করীম (স.) সব সময়ই সাহাবীদের ও তাঁদের পুত্র-সন্তানদের 'সামরিক ব্যক্তিত্ব' রূপে গড়ে উঠা ও গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতার দাবী করতেন। জনগণের মধ্যে সামরিক ভাবধারা, সাহসিকতা, বলিষ্ঠতা ও দুর্জয়তা জানিয়ে দেবার উপদেশ দিতেন, যেন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই বীর যোদ্ধা হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ইসলাম তো প্রস্তরের কাঠিন্যের মধ্যে লালিত, যেন প্রত্যেকটি মুসলিমই সিংহের ন্যায় দুরন্ত সাহসী হয়ে উঠতে পারে।

সাধারণ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষার উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ' রসূলের এই কথাটি সব সময়ই সাহাবীদের কর্ণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ত।

---

১. ইবনে মাজাহ্ হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলাম নিয়ম-শৃঙ্খলা, সুসংবদ্ধতা ও সুবিন্যস্ততার আহ্বান জানিয়েছে সব সময়ই। মুসলমানদের রক্তে-গোশতে তা মিলিয়ে-মিশিয়ে দিতে বলেছে। কেননা সমস্ত কাজের মানদণ্ডই হচ্ছে তা। জাতীয় অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা এর উপরই নির্ভর করে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধতা স্বভাবসম্মত প্রক্রিয়া। আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি মৌল ইবাদত অনুষ্ঠান পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। এরই প্রভাবে গোটা মুসলিম জীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলাই লক্ষ্য। শত্রু প্রতিরোধ, শত্রু দমনে এবং মজলুম মানবতার মুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ পরিচালন তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। যেন মুসলমান দুর্বল, নিঃশক্তি ও পরাজিত না হয়, যেন হয় বিজয়ী, দুর্জয় ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা।

## প্রশিক্ষণ ও চর্চা

ইসলাম শরীর চর্চা ও ব্যায়ামেব উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছে, যেন সাধারণভাবে সমাজের লোকেরা সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় এবং বিশেষভাবে যুদ্ধের ঝুঁকি পোহানো ও তার তীব্রতা ও রুঢ়তা সহ্য করার মত যুবশক্তি গড়ে উঠে। ব্যায়াম ও শরীর চর্চা দেহকে শক্ত শাণিত বানায়। এই কারণে মুসলমানরা বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম ও শরীর চর্চা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে দৌড়, অশ্বারোহণ, তরবারির খেলা, মল্লযুদ্ধ ও তীর নিক্ষেপণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রসূলে করীম (স.) নিজে এগুলো করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি এবং রসূলে করীম (স.) নিভৃতে জনবিরলতায় দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। তদানীন্তন আরবে রুকন নামে প্রখ্যাত এক প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিল। সে রসূলে করীমের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেঃ মল্লযুদ্ধে রসূলে করীম (স.) যদি তাকে পরাজিত করতে পারেন, তা'হলে সে ইসলাম কবুল করবে। রসূলে করীম (স.) মল্লযুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। শেষে লোকটি বলে উঠেঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রসূল (স.) নিছক মানবীয় শক্তিরই অধিকারী নন।'

বস্তুত শরীর চর্চা, দৈহিক বল ও শক্তি-সামর্থ্য ইসলামের বিশেষ বাহ্য প্রকাশের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম প্রচার ও দাওয়াত প্রতিষ্ঠার বিশেষ মাধ্যম। রসূলে করীম (স.) সব সময়ই বলেতেন ঃ

www.pathagar.com

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الضَّعِيْفِ -

শক্ত সমর্থ মু'মিন দুর্বলের তুলনায় আল্লাহ্র নিকট অধিক উত্তম ও সবচাইতে বেশী প্রিয়।

হযরত উমর (রাঃ) একজন ইবাদতকারী যুবক দেখতে পেলেন। তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে। বিনয় ও একাগ্রতার চিহ্ন তার সারাদেহে প্রকট। হযরত উমর (রাঃ) লোকটিকে ধরলেন, লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন। তাকে বললেনঃ এই ব্যক্তি, মাথা তোল, শরীরকে চাঙ্গা করে তোল। আল্লাহ্ যতক্ষণ তোমাকে না মারছেন, ততক্ষণ মরে থেকো না। হযরত উমর (রাঃ) নিজে অশ্বারোহণ খুবই পছন্দ করতেন। তিনি জীন ও লাগাম ছাড়াই এবং কোন কিছু না ধরেই অশ্বারোহণ করতে পারতেন। হযরত আলী (রাঃ) দৌড়ে এতই পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁর নাগাল কেউ পেত না। হযরত মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রাঃ) এতই শক্ত বাহু সম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি এক আঘাতেই তাঁর তরবারি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতেন। হযরত তাল্হা ও যুবায়র (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে নামকরা মল্লযোদ্ধা ছিলেন।

ইসলাম শান্তির সময় এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছে, যেন শত্রুপক্ষ হঠাৎ করে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পরাজিত করতে না পারে। মুসলমানরা তীর নিক্ষেপণের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই কাজের যোগ্যতা অর্জনে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। রসূলে করীম (স.) বলেছেনঃ

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرْضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ -

তোমরা শীগ্গীরই বহু দেশ জয় করে নেবে, আল্লাহ্ই হবেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কেউ তার তীর দ্বারা তোমাদের কাউকে ঘায়েল করতে পারবে না।

রসূলে করীম (স.) সর্বক্ষণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চর্চা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সাহাবিগণকে বিশেষ করে তীরান্দাজি করার জন্য উৎসাহিত

www.pathagar.com

করতেন। এই দুইটিকে তিনি শক্তির উৎস মনে করতেন। একদা তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে পড়লেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ -

আর তোমরা শত্রু দমনে যতটা সম্ভব শক্তি সংগ্রহ কর।

অতঃপর বলতে লাগলেন।

اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ...اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ...اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ -

জেনে রাখো, তীর নিক্ষেপণই হচ্ছে শক্তি ..... মনে রেখো, তীর নিক্ষেপণই শক্তি .... তীর নিক্ষেপণই শক্তি।

রসূলে করীম (স.) তীর নিক্ষেপণ চর্চা পরিহার করা এবং শরীর চর্চা ও ব্যায়ামবিমুখতা গ্রহণকে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করার মত অপরাধ মনে করতেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا -

যে লোক তীর নিক্ষেপণে পারদর্শিতা অর্জন করলো, পরে সে তা পরিহার করলো, সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। —ইবনে মাজাহ্

তীর নিক্ষেপণের গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং সেজন্য আল্লাহ্‌র দেয়া ওয়াদার কথা তিনি সব সময়ই সাহাবীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ ... صَانِعَهُ

يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهِ وَمُنْبِلَهُ

وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا

وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً مِّنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا -

আল্লাহ্ তা'আলা একটি তীরের দৌলতে তিনজনকে বেহেশ্‌তে পাঠাবেন ...তীর নির্মাতা কারিগর—যে তার কারিগরিতে দক্ষতা দেখিয়েছে,

www.pathagar.com

তীর নিক্ষেপকারী এবং যে সেটিকে শানিত করে রাখে।'... তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, অশ্বারোহণ কর। তবে তোমাদের অশ্বারোহণের তুলনায় তীর নিক্ষেপণ আমার বেশী পসন্দ। যে লোক সাগ্রহে তীর নিক্ষেপণের দক্ষতা অর্জন করবার পর তা ত্যাগ করে সে আল্লাহ্‌র দেয়া একটা বড় নিয়ামতকে অস্বীকার করে।

এই পর্যায়ে বহু কয়টি হাদীসের মধ্যে একটি ঃ

مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَخْطَاَ اَوْ اَصَابَ فَكَاَنَّهُ اَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وَّلَدِ اِسْمَاعِيْلَ -

যে লোক আল্লাহ্‌র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করলে—তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হোক, কি লক্ষ্য ভেদ করুক, সে যেন হযরত ইসমাঈলের বংশে একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করলো।

হযরত উমর (রা.) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌ (রা.)-কে বলে পাঠিয়েছিলেন ঃ

عَلِّمُوْا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْىَ -

তোমাদের বালক-বালিকাদের সাঁতার কাটা এবং তীরন্দাজির যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা দাও।

এমনি করেই ইসলাম তার সেনাবাহিনীকে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

আর এই সর্বকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতকরণই ছিল শত্রুদের উপর মুসলমানদের চিরন্তন বিজয়ের মূলে অন্যতম প্রধান কারণ। এই বিজয় কেবল আরব উপদ্বীপেই নয়, ইরাক, সিরিয়া, মিসর—মুসলিম বাহিনীর পদচারণা হয়েছে যে যে ভূখণ্ডে এবং যে যে ভূখণ্ড ইসলামী শক্তির পদানত হয়েছে—সর্বত্রই এই একই দৃশ্য।



www.pathagar.com

এই প্রস্তুতি ও সার্বক্ষণিক চর্চার ফলে এক-একজন মুসলিম যোদ্ধা শত্রুপক্ষের দশ-বিশ জন বীর-যোদ্ধাকেও পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুরআন মজীদের এই ঘোষণার মূলে যথার্থ বাস্তবতা নিহিত রয়েছে :

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ-

তোমাদের ধৈর্য-স্থৈর্যসম্পন্ন বিশ জন ও দু'শ জনকে পরাজিত করবে। আর তোমাদের একশ' জন হলে কাফিরদের এক সহস্রজনকে পরাজিত করবে। তার কারণ, ওরা নির্বোধ লোক। —সূরা আনফাল : ৬৫

বস্তুত যুদ্ধের ব্যাপারে তদানীন্তন দুনিয়ায় মুসলমানরা কাফিরদের তুলনায় অধিকতর দক্ষ পারদর্শী ও কৌশল জ্ঞানে অনেক বেশী অগ্রসর ছিল, তা এই আয়াত থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

### যুদ্ধাস্ত্রে বিবর্তন

ইসলামে যুদ্ধাস্ত্রের বিকাশ, উন্নয়ন, নবনব রূপায়ণ ও রূপান্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে তওহীদী আকীদার মতই এ বিষয়েও সর্বাধিক তাকীদ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত জটিল প্রকৌশের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন, আয়ত্তকরণ এবং তা কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট তাকীদ দেয়া হয়েছে। এর প্রতি একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শনের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে অস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিবর্তিত যুগ-চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অবস্থা ও প্রতিপক্ষের শক্তির মান অনুপাতে প্রস্তুতি গ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুত কর—অশ্ববাহিনী সংগ্রহ ও তার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে এবং তোমাদের শত্রুকেও... ।

এ আয়াতটি বিশ্লেষণ করা হলে আমাদের সম্মুখে নিম্নোদ্ধৃত তত্ত্বসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয় ঃ

১. অস্ত্র সংগ্রহের এই নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এ নির্দেশ একদিনের বা এক সময়ের জন্য নয়, সর্বকালের—কিয়ামত পর্যন্তকার জন্য তা কার্যকর থাকবে।

২. এই প্রস্তুতি শক্তির। শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সমর্থ হয় এমন শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। যা শত্রুকে সন্ত্রস্ত করতে অক্ষম, তা যেমন 'শক্তি' নামে অভিহিত হতে পারে না, তেমনি তা প্রস্তুতকরণের কোন নির্দেশও দেয়া হয়নি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

৩. আয়াতের 'শক্তি' শব্দটি সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কোন অস্ত্রকে 'শক্তি' বলা হয়নি। অতএব অস্ত্র পরিবর্তনশীল, অস্ত্রের ধরন, আকার-আকৃতি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কোনটাই বিশেষ একটা পরিস্থিতি বা পরিবেশ-প্রেক্ষিতে আটকে থাকবে না। যুগ, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তা অবশ্যই পরিবর্তিত ও বিকশিত হতে বাধ্য। এই নির্দেশটি নাযিল হওয়ার সময় 'অস্ত্র'রূপে যা-ই ব্যবহৃত হত, তা-ই চিরকাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয় নি। যে সময়ে ও যে অবস্থায় যা 'শক্তি'রূপে অভিহিত হতে পারে, যুগের চাহিদানুযায়ী তা-ই সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা করা না হলে মুসলিম বাহিনী 'শক্তি'র ধারক হতে পারবে না, সময়ের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, অন্যান্য শক্তির তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়বে। ফলে যে উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ —শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা—তা পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পড়বে। শুধু তা-ই নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌ কঠিন বিপদে পড়ে যাবে।

এ প্রেক্ষিতে উক্ত নির্দেশ যাঁর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল—সেই রসূলে করীম (স.) এই নির্দেশ কিভাবে পালন করেছিলেন এবং নির্দেশ পালন

www.pathagar.com

করতে গিয়ে কিভাবে সময়ানুপাতে অস্ত্রে ও রণকৌশলে পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন তা সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে হবে। বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস এবং বিশেষভাবে মধ্যযুগের যুদ্ধ-শিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই তা নিঃসন্দেহে জানা যেতে পারে।

তদানীন্তন সময়ে মূল 'আঘাতকারী শক্তি' (striking force) রূপে গড়ে তোলা হত অশ্বারোহী বাহিনীকে। আরব উপদ্বীপ বেষ্টনকারী দু'টি শক্তিই তদানীন্তন দুনিয়ার প্রধান সামরিক শক্তিরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই উভয় শক্তির নিকটই মূল আঘাতকারী শক্তিরূপে প্রস্তুত হয়েছিল এই অশ্বারোহী বাহিনী। কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট সেরূপ কোন শক্তি সংগৃহীত ছিল না।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল 'বদর' নামক স্থানে। এই যুদ্ধে মাত্র তিনশ' তেরজন মুসলমান যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিলেন অশ্বারোহী। অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন পদাতিক। অশ্বারোহী সৈন্য শতকরা একজনেরও কম। ফলে এই বাহিনীতে মূল 'আঘাতকারী শক্তি' ছিল না বললেই চলে। অথচ তদানীন্তন বিশ্ব সামরিক প্রস্তুতি প্রেক্ষিতে মূল আঘাতকারী শক্তি হিসেবে একটি অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলা ছিল উদীয়মান মুসলিম বাহিনীর জন্যে একান্তই অপরিহার্য। ঠিক এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধের পরে পরে যুদ্ধাবস্থার পর্যালোচনা করে যে আয়াতসমূহ নাযিল করেন—সূরা আল-আনফাল—তাতেই স্থায়ী যোদ্ধা বা সামরিক বাহিনী (standing Army)-র সাথে সাথে মূল আঘাতকারী বাহিনীরূপে দৃঢ় লালিত অশ্বারোহী বাহিনীও গড়ে তোলার নির্দেশ সম্বলিত এ আয়াতটি নাযিল নয়।

অতঃপর নবী করীম (স.) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী এই অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। ফলে আমরা দেখতে পাই, তাবুক যুদ্ধে যেখানে মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাযার, সেখানে অশ্বারোহী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল দশ হাযার। অর্থাৎ মোট সৈন্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। লক্ষণীয়, কালের অগ্রগতির সাথে সাথে—দ্বিতীয় হিজরী থেকে নবম হিজরী পর্যন্ত মাত্র সাত বছরের মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতির ধরন এবং অস্ত্রেশস্ত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) মুসলমানদের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে সৈন্যদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে ও যুদ্ধের কলা-কৌশল অবলম্বনে অনেক অভিনবত্ব সংযোজিত করেছিলেন। ক্রমশ এমন সব নতুন নতুন অস্ত্র মুসলিম বাহিনী ব্যবহার করতে শুরু করে যা পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন পদ্ধতি গ্রহণের কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

মুসলমানদের নিকট অবরোধকারী এবং দুর্গ ও নগরপ্রাচীর ভেদকারী কোন অস্ত্র পূর্বে ছিল না। অথচ সেকালের প্রধান রাষ্ট্রদ্বয়—ফারেস ও বাইজান্টাইন-এর নিকট তা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল এবং তাদের সৈন্যরা তা প্রয়োজনে ব্যবহারও করত। তখন নবী করীম (স.) হযরত উর্‌ওয়া ইবনে মাস্‌উদ ও গাইলান ইবনে সালমা (রা.)-কে প্রস্তর নিক্ষেপকারী (الروادات), প্রাচীর চূর্ণকারী (منجنيق) ও হামাগুড়ি দিয়ে চলা (الدبابات) প্রভৃতি যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ কৌশল শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে 'জারশ'[১] নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন।

রসূলে করীম (স.) তায়েফের দুর্গ জয় করার কাজে এসব অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ

اَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِنَصْبِ الْمَنْجَنِيْقِ

عَلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا اَيْقَنُوْا بِالْهَلَكَةِ سَاءَلُوْهُ الصُّلْحَ -

খায়বর যুদ্ধে দুর্গ জয়ের লক্ষ্যে নবী করীম (স.) 'মিন্‌জানিক' প্রয়োগ করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু পরে খায়বরবাসীরা যখন তার পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য মনে করলো, তখন তারা রসূলের নিকট সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে।

এসব তথ্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স.) প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন এবং

১. বাল্‌কা প্রদেশের সওয়াদ বার্বত ও হুরান নামক স্থানের পূর্বে অবস্থিত একটি নগর। তখন এ নগরটি বাইজন্টাইন শাসনাধীন ছিল। বর্তমানে নগরটি জর্দান রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।

www.pathagar.com

এভাবেই তিনি শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণিত যে, রসূলে করীম (স.) যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সমসাময়িক প্রকৌশল বা প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হন নি, মুসলিম সমাজের বিশেষজ্ঞ ও এই শিল্পে দক্ষতা অর্জনকারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যুগের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী সম্ভাব্য পরিবর্তন, উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যেও জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত উত্তরকালে ইরাক, সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতির প্রাচীরবেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গনগরীসমূহের মুসলিম বাহিনীর নিকট সহজেই পরাজিত হওয়ার মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েছে।

ফারেস নগরের লোকেরা তীর নিক্ষেপণ বিদ্যায় খুব বেশী দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। রসূলে করীম (স.) একদা সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ هو اقوى منكم رمية 'ওরা তীর নিক্ষেপের ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও খুব বেশী অগ্রসর, অধিকতর ক্ষিপ্র।'

স্বভাবতই মনে করা যায়, রসূলে করীম (স.) অন্তর দিয়ে চেয়েছিলেন যে,মু সলমানরা এই ব্যাপারে ফারেস অধিবাসীদের তুলনায় অধিক দক্ষতা অর্জন করুক। সেই সাথে একথাও মনে করতে হয় যে, রসূলে করীমের এই উক্তিটি সাহাবিগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকবে এবং তারা অবিলম্বে এই লক্ষ্যে বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করে থাকবেন। কালের যে কোন সময়ের মুসলমানদের জন্য প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক সামরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং প্রেরণা লাভের উৎস হয়ে থাকবে রসূলে করীম (স.)-এর এই কামনা ও বাসনা। কেননা উম্মতে মুহাম্মদীকে তৈরীই করা হয়েছে সকল কালের ইসলাম-দুশমন শক্তির উপর প্রাধান্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ দান এবং এই কাজে তাদের মশ্গুল রাখাও রসূলে করীম (স.)-এর প্রবর্তিত এক মহামূল্য ও চির অনুসরণীয় সুন্নত। তিনি এজন্য বারবার তাকীদ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সাহাবিগণ এ জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা এ কাজে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমনকি ঈদের দিনেও তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তীর নিক্ষেপণ কাজের অনুশীলন পরিহার করতেন না।

সাহাবিগণের এমনি এক চর্চা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ কেন্দ্রে রসূলে করীম (স.) জুতা মুবারক খুলে আসন গ্রহণ করেছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি সে স্থানটিকে روض من رياض الجنة 'জান্নাতের বাগানসমূহের একটি' পরিচয়ে অভিহিত করলেন। তার অর্থ যেস্থানে তীর নিক্ষেপণ বিদ্যার চর্চা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করা হয় এই কাজটি সে স্থানটিকে জান্নাতের একটি বাগান হওয়ার মর্যাদায় উন্নীত করে দেয়।

ইসলামের প্রথম অধ্যায়ে রণকৌশল ও যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে যথেষ্ট বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নৌবাহিনী গঠন এই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। বস্তুত মুসলমানদের নৌবাহিনী গঠন তদানীন্তন বিশ্বপ্রেক্ষিতে একটি বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম তাতে সন্দেহ নেই। আরব মুসলমানরা মূলত ধূ-ধূ করা মরুভূমির অধিবাসী. পানির সমুদ্রের পরিবর্তে বালুকা সমুদ্র ও পর্বতসঙ্কুল মরুভূমির সাথেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এ কারণে সামুদ্রিক যুদ্ধের পর্যায়ে শুরুতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ রণকৌশলের যে বিকাশ ও বিস্তৃতি তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল, তাতে নৌবাহিনী গঠন তাঁদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যথায় তখনকার শত্রুদের পরাজিত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। এই কারণে তাঁরা এ ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন. তাঁরা বিরাট রণপোত বহর ( Fleet ) গড়ে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তাঁরা তৎকালীন বিশ্বের রণপোত-ধারী একমাত্র রাষ্ট্র বাইজান্টাইনীদের সাথে যুদ্ধও করেছিলেন। উত্তরকালে মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনে খালদুনের বর্ণনা মতে পরবর্তীকালে রোমান, চাকলব ও ফ্রাংগী প্রভৃতি সকল নৌশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন এবং ওসব নৌশক্তি মুসলিম নৌশক্তির দাপটে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যেতেও বাধ্য হয়েছিল।[১]

---

১. The Encyclopeadia of millitery History ( from 3500 B. c. th the present byr. Ernest pupuy and Trover. N. Dupuy-p-201 )

www.pathagar.com

ভন্‌ক্রেমার তাঁর 'খলীফাদের শাসনাধীন প্রাচ্য' শীর্ষক গ্রন্থে বাইজান্টাই-নীয় শাসন সম্রাট লিউ (৭৭৬—৯১২ খৃঃ)-র এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

> 'দক্ষতা ও অস্ত্রশস্ত্রে আরবরা বাইজান্টাইন বাহিনীর তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিলেন না। সেকালে অস্ত্রই ছিল তীর-ধনুক, তরবারি, কুঠার ( Battleaxe ), লৌহ শিরস্ত্রাণ, বর্ম, লৌহ দস্তানা ও কাস্তে (Seythe) প্রভৃতি—এসব আরবদের ব্যবহারেও ছিল। ইসলামে অস্ত্রশস্ত্রের এই বিবর্তন এবং ইসলামী শক্তির পক্ষেও এই বিবর্তনকে অনুসরণ করা সুন্নাতে রসূল অনুসরণের মতই একান্ত কর্তব্য।[২]

## ইসলামী সমাজের যুবকদের বৈশিষ্ট্য

বস্তুত ইসলামী সমাজের যুবকরা তাঁদের ঈমানের বলে ছিলেন বলীয়ান, অনমনীয় এবং উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। এই কারণেই তাঁরা আল্লাহ্‌র সাহায্য-অনুগ্রহে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও পূর্বে তাঁরা ছিলেন উপেক্ষিত, অবহেলিত ও ইতরশ্রেণীভুক্ত, জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্য সাধারণ মান-মর্যাদার অধিকার থেকেও বঞ্চিত। রসূলে করীম (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন যখন, তখন বিশ্বমানবতা চরম ভাগ্যাহত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। বিরাট মানবতার মধ্যে মাত্র এক শ্রেণীর কতিপয় মানুষ সর্বপ্রকারে সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করত, কোন শ্রম, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ তাদের স্পর্শ করতেও পারতো না। আর বৃহত্তর মানবতা তাদের যাবতীয় সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন দিতে এবং সর্বপ্রকারের বিপদ-ঝুঁকি ও ধনমালের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হত। এই ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে রক্ষা করা, পতিত অবস্থা থেকে মানবতাকে উদ্ধার করে মানুষের মর্যাদা ও অধিকারসহ বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামী মুজাহিদগণ বিপুল বিক্রমে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তদানীন্তন দুনিয়ার রোমান, ফারেস ও অন্যান্য বড় বড় সভ্য জনগোষ্ঠী যারা তখনকার দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করতো, শ্রেষ্ঠত্ব আভিজাত্যের গৌরবে দাপট চালাতো—নিজেদের সুখী স্বচ্ছন্দ জীবনে কোনরূপ কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না, শুষ্ক মানব সেবা তাদের রসময় জীবন ধারার সাথে

২. খলীফাদের শাসনাধীন প্রাচ্য—ভন্‌ক্রেমা'র।

www.pathagar.com

একবিন্দু সামঞ্জস্যশীল ছিল না। তাদের জীবনে বিলাসিতা, সুখ-সম্ভোগ, উচ্চমানের আহার—পরিচ্ছদে একবিন্দু মাত্রা হ্রাসেও তারা প্রস্তুত ছিল না। তাদের লালসা চরিতার্থ করার পথে একবিন্দু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে, এমন কেউ ছিল না কোথাও। ফলে তাদের লোভের জিহ্বা দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর হয়েছিলো, শোষণ করে নিচ্ছিল একটি মানুষের শুষ্ক দেহের শেষ রক্তবিন্দুও। এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শেষ নবী রসূল (স.)-কে দুনিয়ায় পাঠান বিশ্বমানবতার সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে। আর তাঁর এই দায়িত্বে সঙ্গী-সহকারী বানিয়ে দেন এমন উম্মাত—জনগোষ্ঠীকে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ, দাওয়াত ও জিহাদের কাজে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দুর্জয় পরাক্রমশালী ত্যাগ-তিতিক্ষায় ও শাহাদত বরণের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত। বিলাসী লালসা পংকিল সভ্যতা যাদের স্পর্শও করেনি, তাঁরা ছিলেন জ্ঞানে-বুদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কৃত্রিমতা মুনাফিকী বিবর্জিত মুক্ত আদর্শবাদী, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্ষমাহীন এবং মানবতার কল্যাণ সাধনে প্রচণ্ডভাবে উদ্যোগী। আর এরাই ছিলেন ইসলামী জিহাদে আত্মোৎসর্গীকৃত সেনানী যুবশক্তি। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তৈয়ার করেছিলেন নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ জীবন লক্ষ্যে অবিচল, সুদৃঢ়রূপে। এই পর্যায়ে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ

وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ

كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

www.pathagar.com

> বল, (হে নবী!) তোমাদের পিতৃ পুরুষ, পুত্র সন্তান, ভাই বেরাদর, স্বামী স্ত্রী, বংশের লোকগণ এবং তোমাদের ধন-মাল যা তোমরা কষ্ট করে উপার্জন করেছ, ব্যবসায়—যার মন্দাভাবকে তোমরা সব সময় ভয় পাও এবং তোমাদের পসন্দসই ঘর-বাড়ী যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্‌র পথের জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে পড়ে, তা হলে তোমরা অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ তো ফাসিক—সীমালংঘনকারী লোকদের হিদায়ত করেন না। —সূরা তাওবা ঃ ২৪

অর্থাৎ দুনিয়ার সব আপনজন এবং স্বোপার্জিত ধন-মাল-ব্যবসায়-ঘর বাড়ী ঈমানদার লোকদের নিকট এর কোন কিছুই আল্লাহ্‌, রসূল ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হতে পারে না। তাদের নিকট আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদই সর্বাধিক প্রিয়। সেজন্য তারা অতি আপনজন এবং শ্রমার্জিত ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ী সব কিছুই অকাতরে উৎসর্গ করতে পারেন। বস্তুত এ-ই ছিলো ইসলামের মুজাহিদদের গুণবৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ -

> মদীনার অধিবাসী এবং চারপাশের বেদুঈনদের জন্য কখনও শোভনীয় ছিল না যে, তারা আল্লাহ্‌র রসূলকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ঘরে বসে থাকবে এবং তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ নিজ কাজ-কর্মের চিন্তা-ধান্ধায় মশগুল হয়ে যাবে। —সূরা তাওবা ঃ ১২০

অন্য কথায় মুসলমান মদীনার নগরবাসী হোক কিংবা মরুবাসী, সব সময়ই তাঁরা রসূলের দরবারে তাঁকে পরিবেষ্টিত করে থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে বা নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকা তাদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। কখনও নিজেদের কাজ-কর্মের তাকীদে রসূলের দরবারে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলে তাঁদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া

www.pathagar.com

দেখা দিত এবং সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে রসূলের নিকটে উপস্থিত হতেন। কেননা রসূলই ছিলেন তাঁদের নিকট প্রিয়তর ব্যক্তিত্ব।

বিশেষ করে ইসলামের জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করাই ছিল ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায়। এই কারণে এ কুরবানী করার জন্য তাঁরা প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। কেননা আল্লাহ্‌তা'আলা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈমানদারদের ঈমানের পরীক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে এবং পরীক্ষা ছাড়া কাউকেই মৌখিক ঈমানের দাবীর ভিত্তিতে জান্নাতে যেতে দেয়া হবে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ -

লোকেরা কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা মুখে 'আমরা ঈমান এনেছি' বলেই তারা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, তাদের ঈমানের যথার্থতা যাচাই করা হবে না ? —সূরা আনকাবুত ঃ ২

অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণ ও ঈমানের যথার্থতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন লোককে ঈমানদার মেনে নেয়া হবে না এবং জান্নাতে চলে যেতেও দেয়া হবে না। এই পরীক্ষা গ্রহণ তো সর্বোত্তমভাবে সম্ভব হয় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের মাধ্যমে। আর সে জিহাদ নিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের দাসত্ব-শোষণ-নির্যাতন থেকে মানবতার মুক্তি বিধানের লক্ষ্যে। এই জিহাদ ব্যতীত না আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, না মানবতার মুক্তি সম্ভব। আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ -

যদি তোমরা এই ঈমান গ্রহণ—হিজরত ও জিহাদ না কর, তা'হলে দুনিয়ায় চরম বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। —সূরা আনফাল ঃ ৭৩

কুরআনে 'ফিত্‌না' সাধারণত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং 'ফাসাদ' শব্দটি সামাজিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক বিপর্যয় বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, জিহাদ করে যদি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক

www.pathagar.com

সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা না হয় তা'হলে দ্বিবিধ বিপদ অনিবার্য। সে বিপদ যেমন রাজনৈতিক, তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক ও নৈতিক। আর এই সার্বিক বিপদকে কোন মানুষই কামনা করে না, মেনে নিতে রাযী হতে পারে না। অতএব জিহাদ অনিবার্য, জিহাদ অপরিহার্য।

এই সব কথা বলেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (স.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী উম্মাতকে গড়ে তুলেছিলেন।

এই সময় বিশ্বমানবতা এক কঠিন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রসূলে করীম (স.)-এর মানবতার মুক্তির পথ উদ্ঘাটিত করে কার্যত জিহাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল এক কঠিন পরীক্ষা। তারা তাদের নিজেদের, তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-মাল সে পরীক্ষার আগুনে নিক্ষেপ করতে রাযী হবে, দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির লোভ ও লালসা পরিহার করে সামষ্টিক কল্যাণের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে, না তাদের লালসা-কামনা-বাসনার নির্বিচার দাসত্বে সব শৃঙ্খলিত করে দেবে মানবতার কল্যাণে ও সৌভাগ্য বিধানের উপর ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে?

প্রথমোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বিশ্বের শান্তি ও মানবতার মর্যাদা অধিকারের স্থিতি অনিবার্য। আর শেষোক্ত পদক্ষেপের পরিণতিতে শুধু তাদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বমানবতার দুর্ভাগ্য, বিপর্যয় ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু মহান আল্লাহ্ মানবতার কল্যাণই চেয়েছেন, ধ্বংস ও বিপর্যয় নয়। ফলে রসূলে করীম (স.) যে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলেছিলেন, তাতে সাড়া দিয়েছিল মরু-আরবের মানুষ। তাদের মনে জেগে উঠেছিল ঈমান, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, পরকালীন মুক্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনার পবিত্র ভাবধারা। তাঁরা নিজেদের সবকিছু রসূলে করীম (স.)-এর হাতে ন্যস্ত করে দিলেন। তাঁরা জিহাদ করলেন আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-মাল-জীবন সবকিছু উৎসর্গ করে। বিশ্বমানবতা মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথে অগ্রসর হ'ল।

সূর্যের উদয়-অস্তের মাধ্যমে দিন-রাতের আগমন-নির্গমন সংঘটিত হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন—অব্যাহত ধারায়। কালের চাকা আবর্তিত হয়ে আবার ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে স্তব্ধ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার সেই প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে, বিশ্বমানবতা কোন্ পথে পা বাড়াবে?... কল্যাণের পথে, না ধ্বংসের পথে ?... যে পথেই তাদের পদবিক্ষেপ হবে

www.pathagar.com

সেই পথের স্বাভাবিক ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে। কাজেই তাদের অবলম্বিত পথ যদি কল্যাণের হয়, মুক্তির হয়, আল্লাহ্ ও রসূল প্রদর্শিত হয়, তাহলে সম্ভাব্য সার্বিক বিপর্যয় ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। আর যদি সে পথ আল্লাহ্দ্রোহীতার হয়, তাহলে সেপথে চলে তাদের ক্ষত-বিক্ষত ও লাঞ্ছিত অপমানিত অনিবার্য ভাবে।

তবে একথা নিশ্চিতভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক জিহাদ ভিন্ন মুসলিম উম্মাতের জন্য কল্যাণের আর কোন পথ থাকতে পারে না। সন্দেহ নেই, এই পথ কঠিন শ্রম, কষ্টস্বীকার, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ঘর্মাক্ততা, অশ্রুসিক্ততা ও রক্তাক্ততায় পরিপূর্ণ। অতীতে রসূলে করীম (স.)-এর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম উম্মাহ্ এই পথে অগ্রসর হয়েই নিজেদের এবং বিশ্বমানবতার মুক্তি অর্জন করেছিলেন। সে আজ দেড় হাযার বছর পূর্বের কথা। আজকের মুসলিম উম্মাতের সম্মুখেও এই পথই উন্মুক্ত। সে পথে চলার আকুল আহ্বান আজ নির্যাতিত-নিষ্পেষিত-বঞ্চিত মানবতার ফরিয়াদ হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই জিহাদের ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত আজ।

এই ডাকে সাড়া না দিলে মুসলিম উম্মাতের ধ্বংস অনিবার্য। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের তরে মুছে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই নিশ্চিত পরিণতি।

### শুধু ঈমান ও তাক্ওয়াই নয়—অস্ত্রও

যুদ্ধ-সংগ্রামে অস্ত্র যে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং তা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর (Factor) তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। অস্ত্রই যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করে। যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে কোনটি বিজয়ী হবে, তা এই অস্ত্রের প্রেক্ষিতে নিশ্চিত করেও বলা যায়। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হলে যুদ্ধরত শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটলে যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে, সাফল্য তখন দোরগোড়ায় সমুপস্থিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই কারণে আধুনিক কালের ও আজকের দিনের যুদ্ধসমূহ নিত্য নতুন অস্ত্রশস্ত্রের প্রবল দাবী জানাচ্ছে। আর সেই সাথে তাল রক্ষা করে চলেছে নিত্যনব অস্ত্র নির্মাণের প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা। যন্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণে

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রায় সবকয়টি উন্নত দেশেই চলছে। শূন্যলোকে ব্যবহার্য, জলভাগে ব্যবহার্য---এই সর্বপ্রকারের অস্ত্রই আজ হিসাবের সীমা অতিক্রম করে নির্মিত হচ্ছে।

বস্তুত অস্ত্রের দক্ষতা যুদ্ধের পরিসরকে সীমিত করতে পারে, পারে বিস্তীর্ণ করতেও। যুদ্ধের সময় সীমিতকরণ কিংবা দীর্ঘায়িতকরণও অনেকটা অস্ত্রের উপর নির্ভর করে। কাজেই মুসলিম মুজাহিদদের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যেমন ঈমান ও তাক্ওয়ার শক্তি একান্ত প্রয়োজন, সেই তুলনায় অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনও কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

ইসলাম যুদ্ধের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও আনুষঙ্গিক-ভাবে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সাজ-সরঞ্জামের প্রতি কিছুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি। বরং যুগের উপযোগী এবং শত্রুপক্ষের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে উন্নততর ও আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার করাই কর্তব্য বলে ঘোষিত। কেননা প্রকৃত সত্য দীন প্রয়োজনীয় শক্তির দ্বারা যদি সমর্থিত না হয় তা'হলে তার প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শুধু অসম্ভব নয়, তার শুধু টিকে থাকাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তখন সত্যের বিপরীত বাতিল শক্তিরই বিজয়ী হওয়া ও টিকে থাকা এবং সত্য দীনকে সর্বতোভাবে দুর্বল করে ফেলা—শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে ফেলাও বিচিত্র কিছু নয়। ঠিক এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রসূলগণের প্রতি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মু'জিযা দানের সাথে সাথে কিতাব ও 'মীযান' নাযিল করার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি 'লৌহ' অবতীর্ণ করার কথাও বলেছেন। এই 'লৌহ' বলতে যেমন 'রাষ্ট্রশক্তি' বোঝানো হয়েছে, তেমনি তীক্ষ্ণ শানিত সুদৃঢ় ইস্পাতের কথাও বোঝানো হয়েছে। আর তাতে যেমন শক্তি নিহিত থাকার কথাও বলেছেন, তেমনি মানুষের বিপুল অশেষ কল্যাণ নিহিত থাকার কথা বলা হয়েছে।[১] তার অর্থ, সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা, সত্য দীন ও আইন-বিধান এবং যাবতীয় কল্যাণ চিন্তা ও পরিকল্পনা কার্যত অপ্রচারিত ও অপ্রতিষ্ঠিত থেকেই যাবে, যদি শক্তি প্রয়োগে বাস্তবায়িত করা না হয়। সেই 'শক্তি' অর্জনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ -

১. সূরা আল-হাদীদ ২৫ নং আয়াত।

www.pathagar.com

এবং শক্তি সংগ্রহ ও প্রস্তুত কর শত্রুদের মুকাবিলা ও দমন করার লক্ষ্যে যতদূর তোমাদের পক্ষে সম্ভব।

'যতদূর সম্ভব' বলে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকালের উপযোগী প্রচলিত ও সংগ্রহ-সম্ভব সর্বপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্রই বোঝাতে চেয়েছেন। উপরন্তু সে শক্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র দীনের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করাই লক্ষ্য বলে এই নির্দেশে শত্রুদের হাতে ব্যবহৃত শক্তি—অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় অধিক শক্তি ও বেশী ঘায়েলকারী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশও রয়েছে। অন্যথায় মূল উদ্দেশ্য কখনই বাস্তবায়িত হবে না।

## যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক কর্তব্য ও দায়িত্ব

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এই নির্দেশ অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্য সম্বলিত, কেননা যে কোন যুদ্ধের যেমন রয়েছে অনেক দাবী ও দায়দায়িত্ব, তেমনি রয়েছে আনুষঙ্গিক অনেক কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা। সেজন্য প্রয়োজন ব্যাপক গভীর চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, সমস্ত প্রাসঙ্গিক অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও কলা-কৌশল গ্রহণ। যুদ্ধে প্রবেশ এমন একটা সূক্ষ্ম জটিল ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ, যার প্রস্তুতিপর্ব বহু আগে থেকেই সূচিত হতে হয়। আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই কার্যত যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল বলে মনে করা যায় না। তারপরও যুদ্ধের উপর প্রবর্তিত ফলাফল ও পরিণতির দায়িত্ব বহন করতে হয় দীর্ঘকাল ধরে।

যুদ্ধে প্রবেশ একটা বিশেষ প্রক্রিয়া। তার পূর্বে একটি পর্যায় অতিবাহিত হতে হয়, আর একটা পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয় যুদ্ধের পরে। যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ের তুলনায় কিছুমাত্র কম জটিল নয়।

যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শক্তি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তকরণ এবং ভাবগত ও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতকরণ, সুসংগঠিত করা শত্রুপক্ষের শক্তি প্রস্তুতি এবং রণকৌশল সম্পর্কে পূর্ণ ও নির্ভুল অবগতি অর্জন। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের দক্ষতা ও একাত্মতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাত্রা সম্পর্কেও সঠিক তথ্য সংগ্রহ। তাদের গতিবিধি ও আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ —আঘাত-প্রত্যাঘাতের কৌশল এবং অমোঘতা সম্পর্কেও আগে থেকেই স্পষ্ট ধারণা অর্জন একান্তই আবশ্যক।

www.pathagar.com

আর দ্বিতীয় পর্যায় যদিও যুদ্ধ সমাপ্তির পরের ব্যাপার; কিন্তু এই পর্যায়ের কার্যাবলীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় যা-ই হোক, অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র একত্রকরণ, পরাজয় হলে অবশিষ্ট সবকিছুর পুনরুদ্ধার, পুনঃ সংঘবদ্ধকরণ এবং জয় হলে বিজিত এলাকার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেননা মূল যুদ্ধে অর্জিত অনেক জয়ই যুদ্ধ শেষের সামান্য ও মুহূর্তের ভুলের দরুন মারাত্মক পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র বা অসম্ভব নয়, তেমনি মূল যুদ্ধে পরাজিত হলেও বিজয়ী পক্ষের ভুলের সুযোগে সেই পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তিত করে ফেলাও কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ইসলামের মুজাহিদগণ প্রথম থেকেই এই বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ও সচেতন ছিলেন। তাঁরা এইসব দিক সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি-অবগতি নিয়েই যুদ্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও এই কৌশলগত দক্ষতার ফলে জয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলতে গেলে যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের এই কৌশল-দক্ষতা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বস্তুত ইসলামী মুজাহিদগণ যুদ্ধ-পূর্ব প্রস্তুতিপর্বের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করার পরই যুদ্ধের সূচনা করেছেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে তাঁদের কাজ নিম্নোদ্ধৃত বিন্যাস অনুযায়ী সুসম্পন্ন হত :

১. মুসলিম জনগণ ও যোদ্ধাদের নিশ্ছিদ্র ঐক্য ও একাত্মতা ;
২. তাৎপর্যগত ও ভাবগতভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ;
৩. যোদ্ধা শক্তির শৃঙ্খলা বিধান ও সুসংগঠিতকরণ ;
৪. শত্রু পক্ষের শক্তি, অবস্থা ও রণকৌশল অধ্যয়ন ও নির্ভুল অবগতি লাভ ;
৫. গোপনীয়তা সংরক্ষণের নিরংকুশ ব্যবস্থাপনা ;
৬. সফল ও সুদক্ষ নেতৃত্ব বিন্যাস।

মুসলিম মুজাহিদগণ তাঁদের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধেই যুদ্ধপূর্বের প্রস্তুতি-পর্ব উপরোক্ত বিন্যাস অনুযায়ী সুসম্পন্ন করে নিয়েছিল বলে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে তুলনাহীন দক্ষতা ও নিপুণতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

## মুসলিম যোদ্ধাদের একাত্মতা

হিজরতের পর মদীনায় রসূলে করীম (স.)-এর নেতৃত্বে প্রথম ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তে এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল, তা ছিল মুহাজির ও আনসার মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বাস্তবায়ন। এ সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের তুলনায়ও অধিক প্রভাবশালী এবং অধিক কার্যকর ছিল। তাঁরা পরস্পরের ভাই হওয়ার সুবাদে পরস্পরের উত্তরাধিকারী পর্যন্ত হয়েছিলেন। বস্তুত ইসলামী বাহিনীর মধ্যে পরম ঐক্য, একাত্মতা ও সংহতি সৃষ্টির জন্য ছিল একটি বাস্তব পদক্ষেপ। তাঁরা যেমন এক আল্লাহ্ ও এক রসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে, একই দীন-ইসলামের অনুসরণ অবলম্বন করে আদর্শিকভাবে একমুখী হয়েছিলেন, তেমনি রসূল করীম (স.)-এর নেতৃত্বে পরম মাত্রায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর জন্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহও গড়ে তুলেছিলেন। অতঃপর তাঁরা যেমন ছিলেন না 'আউস' ও 'খাজরাজ' বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন বংশীয় পরিচিতি সম্পন্ন, তেমনি আনসার আর মুহাজির হিসেবেও ছিল না তাঁদের মধ্যে কোন দূরত্ব ও ভিন্নতা ; বরং সকলেই নীতি-আদর্শ ও বাস্তব জীবনধারা কর্ম-তৎপরতার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন সত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মক্কার কুরায়শ ও মদীনার য়াহূদী ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসেবে মুসলমানদের এই ঐক্য-বদ্ধতা ও সংহতি চূর্ণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়েছিল।[১]

এই পর্যায়ে রসূলে করীম (স.)-এর অবলম্বিত প্রত্যেকটি পদক্ষেপ পূর্ণ সাফল্য লাভ করে এবং কুরআনের নির্দেশ ও স্বয়ং রসূলে করীম (স.)-এর উপদেশাবলী পুরোপুরি কার্যকর হয়। গোটা মুসলিম সমাজের উপর তার ব্যাপক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। শত্রুর মুকাবিলায় ইসলামী শক্তি এই আদর্শিক একাত্মতা ও বাস্তব অভিন্নতার দরুন একটি প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে কুরআনের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছিল ঃ

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ -

---

১. سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۵۰۲، طبقات ابن سعد ج ۳ - ۲ — فقه السيرة الدكتور سعيد رمضان البوطى ص ۲۰۸



www.pathagar.com

এবং তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হবে না, তাহলে কিন্তু তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মধ্যকার প্রকৃত প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। —সূরা আনফাল ঃ ৪৬

এ ছিল নেতিবাচক নির্দেশ। আর এই পর্যায়ে ইতিবাচক আদর্শ ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল এই ভাষায় ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন—ভালবাসেন সেই লোকদের, যারা তাঁর পথে—তাঁর দীন কায়েমের লক্ষ্যে—যুদ্ধ করে সীসা ঢালাই করে তৈরী করা সুদৃঢ়-দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত হয়ে। —সূরা সফ্ ঃ ৪

নবী করীম (স.) যখন মক্কা বিজয়াভিযানে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সকল মুসলমানকে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানালেন, তখন সেই সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণকারী এক বিরাট জনতা মদীনায় সমবেত হয়, তখন তাদের মধ্যে যোদ্ধাদের সংখ্যাই হয়েছিল দশ সহস্র। তা মক্কার উপকণ্ঠে দেখতে পেয়ে মক্কার সরদার আবু সুফিয়ান বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলে উঠেছিল ঃ হে আব্বাস, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তো মহা সম্রাট হয়ে পড়েছেন! আর কুরায়শদের লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ হে কুরায়শ জনগণ! মুহাম্মদ তোমাদের সমুখে এমন শক্তি নিয়ে উপস্থিত যা পূর্বে তোমরা দেখনি।[১]

রসূলে করীম (স.)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন মুসলিম গোত্র যখন যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তখন খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ 'ওরা যদি যাকাতের একটি উট দিতেও অস্বীকার করে তা হলেও আমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' এই ঘোষণা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী গোত্রসমূহ মদীনার উপর হামলা চালাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তা জানতে পেরে মদীনায় মুসলিম জনতার সমাবেশ

---

১. قصة السيرة ص ٣٧٥—٣٧٣' و ابن اسحاق

www.pathagar.com

আহ্‌বান করলেন। সে আহ্‌বানে সাড়া দিয়ে এক বিরাট জনতা মদীনায় একত্রিত হয়। তখন তিনি তাদের সম্বোধন করে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলে-ছিলেন: এই এলাকাবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা তোমাদের সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করে অত্যধিক সাহসী হয়ে পড়েছে। বলা যায় না, তারা দিনে বা রাতের যে কোন সময়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। ওরা মনে করেছিল, আমরা ওদের সম্মুখে নতি স্বীকার করবো। কিন্তু আমরা ওদের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করেছি এবং কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়েছি। অতএব এখন তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর। পরে তিনি জনতাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী, যুবায়র, তাল্‌হা ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ বীর সাহাবীকে মদীনার প্রবেশপথ মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে।[১]

অতঃপর মুরতাদ হয়ে যাওয়া গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় এমন এক বিরাট জনতার সমাবেশ ঘটালেন, যেরূপ জনসমাবেশ সমগ্র আরব দেশে ইতিপূর্বে কখনই কেউ দেখেনি। মুসলিম সেনানীদের পতাকার সংখ্যা ছিল এগারোটি এবং তা ধারণ করে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর, ইকরামা, শারাহবীল, মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়্যা আল-মাখজুমী, সুয়াইদ ইবনে মাক্‌রান, আল-আলা ইবনুল হাযরামী, হুযায়ফা ইবনে মহসন, আরফাজাতা ইবনে হারসামাতা, মায়ান ইবনে হাজেজ আস-সুলামী এবং খালিদ ইবনে সায়ীদ প্রমুখ বড় বড় বীর সেনাধ্যক্ষ।

ইয়ারমূকের যুদ্ধকালে রোমানদের বিপুল সংখ্যা আরবদের রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলেছিল। তারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। তিনি হযরত খালিদ (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন: তুমি বাহিনী সমভিব্যাহারে রওয়ানা হয়ে যাও। ইয়ারমুক নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানদের সমাবেশ দেখতে পাবে।[২]

বস্তুত হযরত আবু বকর (রাঃ) বিভিন্ন সময় শত্রুর মুকাবিলায় মুসলমানদের বিরাট বিরাট সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।

---

১. سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی از محمد حسین ہیکل — اردو ص ۱۸۸

২. ঐ ৪৭৪ পৃঃ

www.pathagar.com

এসব ক্ষেত্রে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর বিরাট মর্যাদা হ'ত। এ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের শক্তি সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেনি, বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতা বিরাজ করছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়-করণের কোন সূত্র কার্যকর ছিল না। হযরত আমর (রাঃ) তখন এক ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীন সকল প্রকার সম্পর্ককে সমন্বিত করার চেষ্টা শুরু করেছেন। হযরত খালিদ (রাঃ) এই ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও সহ-যোগিতা করেন। রোমানদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে মুসলিম শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তারই ফলে তাঁদের পক্ষে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো এবং সেসব দেশে ইসলামের ব্যাপক প্রচার সাধন সম্ভবপর হয়েছিল।[১]

আরবীয় যুদ্ধের ইতিহাসে মুসলিম শক্তিসমূহ ও জনতার সমাবেশ ঘটানোর অনেক ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে; আরবের সামরিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেসব ঘটনার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অতঃপর মুসলমান ব্যক্তিগণের মধ্যেই শুধু ঐক্য ও সুসংবদ্ধতা গড়ে উঠেনি, তারা দল হিসেবেও সুসংগঠিত হয়ে উঠে এবং সুসংহত শক্তি হিসেবেই শত্রুদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতীতে ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি মত দেখা গিয়েছিল। একটি মত ছিল মদীনার শহরাভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার পক্ষে। স্বয়ং রসূলে করীম (স.) এই মতই পোষণ করতেন। আর দ্বিতীয় মত ছিল আক্রমণমূলক ভূমিকা গ্রহণের। প্রথম মতটি পেশ করেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। তিনি বলেছিলেন ঃ হে রসূল! অতীতে আমরা যুদ্ধ করেছি এভাবে যে, আমাদের মহিলা ও বালক-বালিকাদের এই দুর্গের মধ্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। তাদের নিকট রেখে দিয়েছি প্রস্তর খণ্ডসমূহ। মদীনা শহরকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত প্রতিরক্ষা ব্যূহে পরিণত করে নেওয়া হত। শত্রুসেনা এর মধ্যে উপস্থিত হলে আমাদের মেয়েরা ও বালক-বালিকারাই পাথর নিক্ষেপ করে তাদের পর্যুদস্ত করে দিত। আর আমরা—পুরুষেরা যুদ্ধ করেছি উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে অলিতে-গলিতে ও রাস্তাঘাটে। এর ফলে আমাদের মদীনা শহর সর্বতো-

---

১. حیات حضرت ابوبکر صدیق رض ص از محمد حسین ہیکل - اردو ص ۳۸۵

ভাবে সুরক্ষিত থেকেছে। শত্রু এর মধ্যে প্রবেশ করলেই আমরা তাদের নাস্তানাবুদ করে দিতাম। আর আমরা যখনই তাদের উপর আক্রমণ চালাতাম, তখন তারা আমাদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হ'ত। অতএব হে রসূল! এই ব্যাপারে আমার কথাটি মেনে নিন। আমি এই রণকৌশল আমাদের বড় ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট থেকে শিখেছি।

আর দ্বিতীয় মতটি উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল মদীনার মধ্য থেকে কুরায়শদের এই সুযোগ দেওয়া হলে তারা প্রত্যাবর্তন করে গিয়ে তাদের জনগণের নিকট গৌরবচ্ছলে বলবে, মুহাম্মদকে মদীনার অভ্যন্তরেই অবরুদ্ধ করে রেখেছি। তা'হলে তা তাদের জন্য উৎসাহ-ব্যঞ্জক হবে। তারা এই সুযোগে আমাদের আংগিনা ও দ্রব্য-সামগ্রী পদদলিত করবে। কিন্তু তা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে। আমাদের উপর আসন্ন বিপদ যদি আমরাই অগ্রসর হয়ে প্রতিরোধ না করি, তা' হলে পরিণতি আমাদের বিপক্ষে যাবে।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার ফলে মদীনার বাইরে গিয়ে আক্রমণ-মূলক ভূমিকা গ্রহণ করারই সিদ্ধান্ত হয় সর্বসম্মতিক্রমে।[১]

মুসলমানদের সামরিক ইতিহাসে লক্ষণীয় যে, তাঁরা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট রণ-কৌশল গ্রহণ না করে এবং তার উপর পূর্ণ ঐকমত্য সৃষ্টি না করে কখনই কোন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। আর সেই সাথে এ-ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাদের মধ্যে যখনই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তখনই তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধতা চূর্ণ হয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তাঁদের সামষ্টিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। মুসলিম জনতা নিজেদের বিশ্বমানবতার কল্যাণে যে বিরাট অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন, তার মূলে এই পরম সত্য নিহিত রয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন সর্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত।

## প্রস্তুতি ও আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা

সৈন্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি কখনই বিজয়ের নিয়ামক হতে পারেনি। সেজন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল সৈন্যদের মানসিক ও তাৎপর্যগত প্রস্তুতি ও একাগ্রতা। নিছক বস্তুগত প্রস্তুতি ও শক্তি সঞ্চয় সৈন্যবাহিনীকে কোথাও

১. رواه ابن اسحاق' و الامام احمد و الطبری بحواله فقـه السيرة ص ٢٥٠

www.pathagar.com

বিজয়ীর মাল্যে ভূষিত করতে পারেনি। চিন্তা ও মন-মানসিকতার প্রস্তুতি ও সংহতি সৃষ্টিই যুদ্ধজয়ের জন্য প্রথম শর্ত। দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিজয়-হরিণকে কেড়ে নিয়েছেন বস্তুগত শক্তির পরিবর্তে মানসিক ও ভাবগত শক্তির সাহায্যে। বহু কম সংখ্যক সৈন্যও যেনতেন প্রকারের প্রস্তুতি সত্ত্বেও যুদ্ধজয়ে সক্ষম হয়েছে বিরাট ও বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যদের মুকাবিলায়। কেননা বাহ্যত তাদের গুণতির সংখ্যা কম হলেও তাদের মানসিক, আদর্শ ও লক্ষ্যগত—তথা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির দিক দিয়ে তারা ছিল তুলনাহীন।

মুসলিম সেনাধ্যক্ষগণ তাদের অধীন সৈন্যবাহিনীর লোকদেরে উপরোক্ত ভাবধারায় পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন। যে-কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে এই কাজটি করাকে তাঁরা প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন।

বস্তুত মুসলমান এক আল্লাহ্, রসূল এবং দীন-ইসলামের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়েছিলেন। এই শক্তির বলেই তাঁরা মক্কী পর্যায়ে কুরায়শদের অমানুষিক অত্যাচার নিপীড়নের মুখে অবিচল পর্বত হয়ে দাঁড়িয়ে ও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শক্তি না থাকলে তাঁদের পক্ষে ইসলামের উপর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও থাকা কোনক্রমেই সম্ভব হ'ত না। উত্তরকালে তাঁদের এই শক্তি ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় বিজয়ী হওয়ার মূলে একটি সফল ও শাণিত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। রসূলে করীম (স.) এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনও এই কাজ করেছেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। ফলে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা শাহাদত লাভ এবং নিশ্চিতভাবে জান্নাত প্রাপ্তির জন্য উন্মুখ ও সদা-উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

সেনাপতি খালিদ পারসিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি, যারা মৃত্যুকে তেমনি ভালোবাসে যেমন তোমরা ভালোবাস জীবনকে। কিন্তু আমার সঙ্গীরা মৃত্যুবরণের জন্য তেমনিই উদগ্রীব, যেমন তোমরা উদগ্রীব মদ্যপানের জন্য।

আবূ সুফিয়ান তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করে রসূলে করীম (স.)-এর জন্য বিছানো শয্যার

www.pathagar.com

উপর বসতে চাইলে তিনি তা দ্রুতগতিতে গুটিয়ে ফেলেন। তখন আবূ সুফিয়ান তাঁর কন্যাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করে, হে কন্যা, এই শয্যাকে আমার যোগ্য মনে কর না কিংবা আমাকে এই শয্যার উপযুক্ত মনে কর না, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তখন উম্মুল মু'মিনীন বললেন ঃ আসল কথা হচ্ছে, এই বিছানা রসূলে করীম (স.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। তুমি তো মুশরিক, অপবিত্র। তুমি এর উপর বসবে, তা আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারিনে।[১]

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর সাথে কুর্রা ইবনে হুবায়রার সাক্ষাত হলে কুর্রা বলল, আরবরা খুব খুশীর সাথে তোমাদের খারাজ দিতে রাযী হবে না। তোমরা যদি তা ক্ষমা করে দিতে পার, তা হ'লে তারা তোমাদের কথা শুনবে এবং তোমাদের বশ্যতাও স্বীকার করবে। আর তা করতে অস্বীকার করলে তারা তোমাদের কাছেও আসবে না। জওয়াবে তিনি বলেছিলেন ঃ আরবদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কথা বলে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহ্র নামে শপথ! আমি তোমার মায়ের বসতবাটিতেই তোমার উপর দিয়ে অশ্ব চালিয়ে দেব।

মু'তা যুদ্ধের উভয় দিকে মুসলিম বাহিনীর আধ্যাত্মিক শক্তির অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। আরব সেনাধ্যক্ষগণ এই ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণ অপূর্ব যুদ্ধ দক্ষতা দেখানো, কাফিরদের বড় বড় অত্যাচারী সেনাপতিদের আক্রমণ প্রতিহতকরণ এবং তাদের সারিতে ব্যাপক ভাঙ্গন সৃষ্টি করে একের পর এক তিনজন প্রখ্যাত মুসলিম সেনাধ্যক্ষ শাহাদত লাভ করেন। সে তিনজন ছিলেন যায়দ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবূ তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। এঁদের প্রত্যেকের শাহাদাত বরণের প্রথম কারণই ছিল তাঁদের আত্মদানমূলক প্রবল ভাবধারা।[২]

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক সেনাধ্যক্ষেরই উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। সে সব

---

১. سیرة الرسول صلعم لابن عبد الوهاب ص ۲۹۲ سيرة النبوية لابى الحسن على الندوى ص ۲۷۳' ابن هشام ق ۲ ص ۳۹۵ — ۳۹٦ زاد المعاد ج ۱ ص ۳۲۰

২. السيرة النبوية لابى الحسن على الندوى ص ۲٦۷' سيرة ابن هشام ق ۲ ص ۲۷۳'

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ তাঁদের জন্য শাণিত অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে এবং তারাও তার সাহায্যে শত্রুর কলিজায় কম্পন জাগিয়ে দিয়েছেন। তারিক ইবনে যিয়াদ আন্দালুসিয়ার দিকে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এক সময় তাঁর পরিচালনাধীন সেনানীদের সম্মুখে ভাষণদান করে বলেছিলেন ঃ

> আল্লাহ্‌র নাম শপথ করে বলছি, তোমাদের সম্মুখে এখন একটি মাত্র উপায়ই রয়েছে. তা' হচ্ছে সততা, নিষ্ঠা এবং ধৈর্য ধারণ ও অবিচলতা অবলম্বন। এ ছাড়া আর কিছুই নেই।... তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে শত্রু পক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং তাদের হস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্র। তাদের শক্তি অফুরন্ত। এক্ষণে তরবারিই হচ্ছে তোমাদের অবলম্বন। তোমাদের অস্ত্র হবে তাই—যা তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে।

এইরূপ ভাষণে আন্দালুসীয় (স্পেনীয়) সৈন্যদের উপর মুসলিম বাহিনীর আতংক সৃষ্টিকারী প্রভাব পড়েছিল এবং তাদের মনে রীতিমত ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তাদের সেনাপতি তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো আরবদের তুলনাহীন যুদ্ধ দক্ষতা ও বিশেষ রণকৌশলের কথা, তাদের উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। বলেছিলো ঃ

> আমাদের দেশের উপর এমন লোকদের উপস্থিতি ঘটেছে, যারা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, না যমীন দীর্ণ করে বের হয়ে এসেছে, তা আমরা ঠিক করে বলতে পারবো না।

সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী তাঁর উত্তম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ক্রুসেড-যোদ্ধাদের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এমন একটা প্রচণ্ড ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মনে হয়েছিল যেন বজ্রপাত ঘটেছে। শত্রু বাহিনীর হৃদয় মনে তা রীতিমত বিহ্বলতা ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তারা বুঝে নিয়েছিল যে, এ সিংহনাদ তাদের সিংহ ধ্বনি থেকে অনেক বলিষ্ঠ, প্রচণ্ড এবং প্রলয়ংকর।[১]

আরব মুসলিমদের যুদ্ধ-ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনার কোন শেষ নেই। মুকাউকাসের প্রতিনিধিবর্গ হযরত আমর-এর সৈন্য বাহিনীর সাথে

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٠٨

www.pathagar.com

একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে অতি নিকট থেকে তাদের যে আধ্যাত্মিক-মানসিক শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করেছিল, তাতে তারা বিস্ময়াভিভূত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা গিয়ে মুকাউকাসের নিকট মুসলিম বাহিনীর সম্পর্কে বর্ণনা দান প্রসঙ্গে বলেছিল ঃ

> আমরা এমন এক জনগোষ্ঠীর সমাবেশ দেখতে পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকের নিকট জীবনের তুলনায় মৃত্যু প্রিয়তর। বিনয়-নম্রতা অহঙ্কার গৌরব অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয়। তাদের কারুর এই দুনিয়ার প্রতি নেই কোন কৌতূহল, কোন লোভ। তারা বসে মাটির উপর, খাদ্য গ্রহণ করে অশ্বপৃষ্ঠে বসে। তাদের সেনাধ্যক্ষ তাদের মধ্যকারই একজন। আর তাদের মধ্যে কে উচ্চতর ও কে হীন-নীচ, আর কে মনিব বা কে দাস, তা বাহ্যদৃষ্টিতে বুঝবার কোন উপায় নেই।'[১]

**যোদ্ধা শক্তিসমূহের সংগঠন**

যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য সামরিক শক্তিসমূহের সংগঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা পূর্ণমাত্রায় গড়ে না তুলে কোন বাহিনীই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না সাধারণত। এ কথায় দ্বিমত থাকার কোন অবকাশই নেই।

ইসলামের যুদ্ধ-ইতিহাস আমাদের সম্মুখে এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরে। ইসলামী বাহিনী কোন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই ক্ষেত্রের রূপরেখা, রণকৌশল এবং যোদ্ধাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেয়া হত। সম্মিলিত শক্তিসমূহের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা সৃষ্টির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। সম্ভবত যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সংগঠন ও সুসংবদ্ধকরণই যুদ্ধসমূহে তাদের জয় লাভের মূলে নিহিত বড় কারণ।

নবী করীম (স.)-এর সময়ে প্রচলিত যুদ্ধরীতি অনুযায়ী সৈন্যদের সংখ্যাল্পতা বা বিপুলতার দৃষ্টিতে এক বা একাধিক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। আর খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে সৈন্যসংখ্যা বিপুল হওয়ার কারণে সৈন্যরা নিজদিগকে কাতারবন্দী করে নিতেন তাঁদের অস্ত্র হিসেবে। সিফ্ফিন যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٨٩

www.pathagar.com

فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ وَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَأَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَعَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ -

অতঃপর তোমরা সীসা ঢালাই করে নির্মিত প্রাচীরের মত কাতার-বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। লৌহবর্ম পরিহিত সৈন্যদের অগ্রবর্তী করো এবং বর্মহীন সৈন্যদের পিছনে রাখো। অতঃপর দাঁতে কামড় দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। কেননা তরবারির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এ অতীব উত্তম পন্থা।[১]

উত্তরকালে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা যখন বিপুল হয়ে দাঁড়াত, তখনকার যুদ্ধসমূহে সৈন্যদের বিভিন্ন দল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী করে সজ্জিত করা হত। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ) ১৩ হিজরী সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের ৩৬টি খণ্ডে বিভক্ত করে দাঁড় করিয়েছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) ১৪ হিজরী সনে কাদেসিয়ার যুদ্ধে এবং উমাইয়া বংশের শেষ নৃপতি মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ দহ্‌হাক খারেজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। কালের অগ্রগতি ও যুদ্ধকৌশলের বিবর্তন ও পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পর্যায়েও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ক্রমশ অধিক কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার যুগের পূর্ব পর্যন্ত তা-ই কার্যকর হতে থাকে।

**শত্রুপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ**

যুদ্ধের ঘোষণা দান ও সৈন্য প্রেরণের পূর্বে সর্বাধিনায়কের আর একটি অতি বড় দায়িত্ব হচ্ছে শত্রুপক্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ করা। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের সমাহার ও গুণ প্রকৃতি, ক্ষমতা এবং যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কে

১. الامام علی ابن ابی طالب محمد رضا ص ۱۱۰

www.pathagar.com

যথার্থ তথ্য জানা না থাকলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা সুদূর পরাহত হয়ে থাকে। কেননা উক্ত তথ্য না জানতে পারলে সঠিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যোদ্ধাদের নির্ভুলভাবে পরিচালনা ও নির্দেশ দান কখনই সম্ভব হতে পারে না।

স্বয়ং নবী করীম (স.) সব সময়ই শত্রুপক্ষের যাবতীয় খুঁটিনাটি অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত থাকার জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি কুরায়শদের অবস্থা, মতিগতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে হযরত আলী, যুবায়র ইবনুল আওয়াম ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা দুইজন ক্রীতদাস ধরে নিয়ে রসূলে করীম (স.)-এর সম্মুখে হাযির করেছিলেন। তিনি সে দুইজনের সাথে অনেক কথা-বার্তা বলে কুরায়শদের সম্পর্কে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রসূলে করীম (স.)-এর জিজ্ঞাসাসমূহের জওয়াবে তারা বলেছিল ঃ কুরায়শরা খুব নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করেছে। সংখ্যায় তারা বিপুল, শক্তি তাদের বিরাট। তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা তারা জানে না, তবে তারা কোন কোনদিন নয়টি আর কোন কোনদিন দশটি উট যবাই করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এই কথা থেকে নবী করীম (স.) তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত হতে পারে তা সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন। কুরায়শ বাহিনীর কুরায়শ সরদারদের কে কে রয়েছে জানতে চাইলে দাস দুইজন মক্কার প্রায় সব কয়জন সরদারেরই নাম উল্লেখ করল। তখন নবী করীম (স.) বললেন ঃ

هٰذِهِ هِيَ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا -

এই মক্কা তার কলিজার টুকরাসমূহ তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করে দিয়েছেন।[১]

সেনাপতি আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-ও শত্রুপক্ষ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমন কি তিনি নিজে এই উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের দেশ ও অঞ্চলে গোপনে সফর করেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

---

১. زاد المعاد ج ٣ ص ١٨٥

www.pathagar.com

সেনাধ্যক্ষ আল্-মুসান্না ইবনে হারিসা শত্রুপক্ষের দুর্বল স্থানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও জ্ঞান অর্জন সেনাপতির একটি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি ইরাক দখলের পূর্বে খুব নিকট থেকে ইরাক সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। 'সওয়াদে অবস্থানকারী আরবদের মনোভাবও জানতে পেরেছিলেন। তিনি জেনে নিয়েছিলেন যে, অনারবরা আরবদের উপর নানা প্রকারে জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আরবদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করে। শত্রুর উপর আক্রমণ চালানোর পূর্বে সংগৃহীত এসব তথ্য ইরাকের উপর বিজয় পতাকা উড্ডীন করার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল।[১]

সেনাপতি মূসা ইবনে নসীর আন্দালুসীয় অঞ্চল সফর করার জন্য খলীফাতুল মুসলিমুনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। জওয়াবে খলীফা তাঁর নিকট চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ

> তুমি আন্দালুসিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে সেখানকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই কর, পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ কর। মুসলমানদের বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বিরাট সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রতারিত হয়ো না।

মূসা খলীফাকে লিখিতভাবে জানালেন ঃ

> 'না, এটা খুব বড় ও বিপজ্জনক কোন সমুদ্র নয়। ওর পশ্চাতে কি আছে, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীকে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও খলীফা তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশের উপরই অবিচল থাকলেন। জানিয়ে দিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়ার ও আক্রমণের পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া একান্ত আবশ্যক।[২]

তার অর্থ খলীফা যুদ্ধ পর্যায়ে রণকৌশল হিসেবে আক্রমণ ও যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই সমুদ্রের অবস্থা ও আন্দালুসীয় জনগণের মনোভাবটা খুব ভালোভাবে জেনে নেওয়া একান্তই কর্তব্য ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন, অন্যথায় জয়লাভ কখনই সুনিশ্চিত হতে পারে না।

সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী যখন বায়তুল মাক্দিস দখল করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তখন নগর-প্রাচীরে অবস্থিত দুর্বল স্থানসমূহ চিহ্নিত

---

১. تاریخ اقوام عالم - مرتضی احمد خان ص ٣٤٤
২. ঐ ৩৬৩ পৃঃ

www.pathagar.com

করার জন্যে গোপন তথ্য সংগ্রহকারী (Watcher) পাঠিয়েছিলেন। একাধারে পাঁচদিন পর্যন্ত তিনি এই অভিযান পর্যায়ের অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিমগ্ন থাকলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তর দিকের নগর প্রাচীরে বড় বড় ফাটল রয়েছে বলে জানতে পারেন। তখন তিনি সেইখানে দুর্গপ্রাচীর চূর্ণকারী যন্ত্র মিনজালিক[১] সংস্থাপন করলেন, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপণেরও ব্যবস্থা করলেন এবং সে সব দুর্বল স্থানে সৈন্যবাহিনীর লোকদের সক্রিয় করে রাখলেন। ফলে যুদ্ধ শুরু হতেই নগর অধিবাসীরা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।[২]

মুসলিম সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুপক্ষ সম্পর্কে যাবতীয় জরুরী তথ্য সংগ্রহের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন, সেই সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে কোন খবর বা তথ্যই যেন শত্রুপক্ষের গোচরীভূত হতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করতেন এবং কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ আরোপ করতেন। এই পর্যায়ে ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। রসূলে করীম (স.) খুব বেশী গোপনীয়তা সহকারে মক্কা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। সম্ভবত কোন একজন সাহাবীও বুঝতে পারেননি এই প্রস্তুতির লক্ষ্য কি এবং কোথায়? কিন্তু সাহাবী হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) আঁচ করে কুরায়শদের নিকট চিঠি লিখে মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। মক্কায় এই চিঠিখানি পৌঁছানোর জন্য 'সারা' নাম্নী এক মহিলাকে দশ দিরহামের বিনিময়ে নিযুক্ত করেন। মহিলাকে সতর্ক করে বলে দিলেন, 'যথাসম্ভব চিঠিখানি গোপন রাখবে। আর সাধারণের চলাচলের পথ দিয়ে যাবে না। কেননা সে পথের বাঁকে বাঁকে পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে।'

কিন্তু নবী করীম (স.) এই বিষয়ে অবহিত হন। তিনি অবিলম্বে হযরত আলী, যুবায়র ও মিকদাদ (রাঃ) এই তিনজনকে পত্রখানি উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা যেতে যেতে রাওজাতে খাখ নামক স্থানে এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট মক্কার কুরায়শদের নামে হাতিব ইবনে আবু বালতায়া লিখিত একখানি চিঠি পাবে। তা পাকড়াও করে নিয়ে আসতে হবে।

---

১. Mangonet

২. تاریخ اقوام عالم حصۂ اول مرتضی احمد خان ص ۱۰۳

www.pathagar.com

নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা দ্রুতপায়ে অগ্রসর হয়ে মহিলাকে পাকড়াও করলেন। কিন্তু তার নিকট কোন চিঠি থাকার কথা সে অস্বীকার করলো। তাঁরা বললেন ঃ 'শিগ্‌গির চিঠি বের করে দে।' রসূলে করীম (স.) নিশ্চয়ই মিছামিছি আমাদের পাঠাননি। চিঠি বের করে দিতে রাযী না হ'লে আমরা তোর পরনের কাপড় খুলে ফেলব। ভয় পেয়ে মহিলা চিঠিখানি বের করে দেয়। তাঁরা চিঠিখানি ফিরিয়ে নিয়ে রসূলে করীম (স.)-এর নিকট পেশ করলেন। চিঠিতে লিখা ছিল ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ عَظِيْمٍ لِيَسِيْرُ كَالسَّيْلِ فَوَاللّٰهِ لَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهٗ لَنَصَرَهُ اللّٰهُ وَاَنْجَزَلَهٗ وَعْدَهٗ فَانْظُرُوْا لِاَنْفُسِكُمْ -

রসূলে করীম (স.) একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আসছেন। এই বাহিনী বন্যা প্রবাহের মত ক্ষিপ্র-গতিতে চলবে। আর তিনি একাও যদি আসেন তা হ'লে জানবে, আল্লাহ্ তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাঁর প্রদত্ত আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কার্যকর করবেন। অতএব তোমরা নিজেদের ব্যাপারে শীঘ্র সতর্ক হয়ে যাও।[১]

বলা বাহুল্য এই চিঠি মক্কায় পৌঁছতে পারলেও কুরায়শদের পক্ষে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা পূর্বাহ্নেই গ্রহণ করা হলে মক্কা অভিযানের ভিন্নতর পরিণতি লাভ কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। অন্তত অতটা সহজে ও বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করা সম্ভব হ'ত বলে মনে না করার মূলে শক্ত ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্যী ছিল ভিন্নতর।

## পূর্ণমাত্রার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা

শত্রুর সাথে সাক্ষাত সংঘটিত হওয়া এবং সেজন্য যুদ্ধের কৌশল ও রূপরেখা নির্ধারণের পূর্বেই সেনাধিনায়ক নিজ শক্তির পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্ণ গোপনীয়তা

---

১. ঐ, ابوداؤد' ترمذی' بخاری ج ۷ ص ۲۳۷ فی المغازی' ابن هشام ج ۲ ص ۳۹۸' زاد المعاد ج ۳ ص ۳۹۱

www.pathagar.com

রক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপই এই নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হয়ে থাকে। তাই মুসলমানরা তাঁদের চোখের সম্মুখে এই কথাটি চির ভাস্বর করে রাখেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ -

তোমাদের প্রয়োজনাবলী পরিপূরণে পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্য সচেষ্ট হও।[১]

রসূলে করীম (স.) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে একখানি মুখবন্ধ চিঠি প্রদান করেন। দুই দিন পথ চলার পর তা খুলে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং তার পূর্বে চিঠি খুলতে নিষেধ করলেন। চিঠিতে যা কিছু লেখা দেখতে পাবে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কোন লোকের উপর সেজন্য জোর প্রয়োগ করবে না।

দুই দিন পর উক্ত বন্ধ চিঠিখানা খুলে আবদুল্লাহ্‌ রসূলে করীম (সঃ)-এর এই নির্দেশ পাঠ করলেন ঃ

আমার এই চিঠি যখন তুমি পাঠ করবে, তখনকার নির্দেশ হচ্ছে, সম্মুখে চলতে থাক। মক্কা ও তায়েফের মাঝ বরাবর একটি খেজুর বাগানে উপস্থিত হয়ে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং কুরায়শদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে, তাদের গতিবিধি তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করবে এবং তাদের সম্পর্কে খবর জানাবে।[২]

দেখা গেল, আবদুল্লাহ্‌ একটি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বের হয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা দায়িত্ব তাঁর জানা ছিল না। অভিযানে গমনকারী ক্ষুদ্র বাহিনীর নিরাপত্তাও এতেই নিহিত। কেননা এরূপ ব্যবস্থায় শত্রুপক্ষও এই ক্ষুদ্র বাহিনীর কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। শত্রুপক্ষ তা জানতে পারলে তাদের গোটা অভিযানই মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

---

১. زاد المعاد ج ٣ ص ١٦٨

২. الاصابه تميز الصحابه ج ٢ ص ٢٧٨' الطبرانى

ওহুদ যুদ্ধে এক য়াহূদী সৈন্যবাহিনী মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করার অনুমতি চেয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মাধ্যমে। কিন্তু নবী করীম (স.) সে অনুমতিদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কেননা যুদ্ধকালে য়াহূদী বাহিনীর লোকেরা মুসলমানদের মারাত্মক ধরনের ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে তিনি প্রবলভাবে সন্দেহ পোষণ করতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সহসা কুরায়শদের পক্ষপাতী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই রসূলে করীম (স.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ

لا ينتصر باهل الشرك على اهل الشرك مالم يسلموا -

কোন মুশরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে অপর মুশরিক বাহিনীর উপর কোনক্রমেই জয়লাভ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলাম কবূল করছে।

সিপাহ্সালার হযরত খালিদ (রা.)-ও দুর্বল ক্ষীণশক্তির লোকদেরকে তাঁর বাহিনীতে শামিল করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি তাদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিলেন। কেননা যুদ্ধ চলাকালে এই দুর্বল লোকদের হাতের অস্ত্র শত্রুপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই লোকগুলো ঈমান-আকীদার দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার দিক দিয়ে মূল বাহিনীর সমতুল্য নয় বলেও তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন। এরূপ অবস্থায় এই লোকগুলোকে বাহিনীতে শরীক হতে দিলে মূল শক্তিরই বিরাট ও অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হওয়ার আশংকা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন।[১]

ইবনে সাল্মা ইবনে আবদুল আযাদের নেতৃত্বে বনূ আসাদ গোত্রের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছিল। নবী করীম (স.) ইবনে সালমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ তুমি দিনের বেলা বাহিনী নিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। রাতের বেলা পথ চলবে। আর চলবে সাধারণের পথ ছেড়ে অন্য পথে, যে পথটি সাধারণ চলাচলের জন্য চিহ্নিত বা পরিচিত নয়।

---

১. تاريخ الطبرى ج ٣ ص ٣٤، شرح المواهب ج ١ ص ٩٤ - ٩٥ تاريخ ابن سعد ج ٢ ص ٦٢ - ٣٤، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ١٧٧/١٧٨ — سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٢٣

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) নিজে দত্ত মাতুল জান্দাল অভিযানে যাত্রা করেছিলেন। এই যাত্রা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে সম্পন্ন করা হয়েছিল। তার অর্থ, গোপনীয়তা রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল শক্তির নিরাপত্তা এরই উপর নির্ভরশীল, এ ব্যাপারে তিনি পুরাপুরি সচেতন ছিলেন।[১]

ইরাক অঞ্চলে অনুপ্রবেশকালে হযরত খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা.) সুয়াইদ ইবনে মাকরানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত করেন এবং তিনি যখন রহমান ইবনে জাযুয়ার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন, তখন পিছনের দিক থেকে তাঁকে সাহায্য দানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সম্ভবত হযরত খালিদ নবী করীম (স.)-এর সৈন্য মোতায়েন নীতি অনুসরণ করেই তা করেছিলেন। কেননা ওহুদ যুদ্ধে তিনি পেছনের পাহাড়ের উপর একদল তীরন্দাজ নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন কোনক্রমেই এই স্থান ত্যাগ করে চলে না যায় এবং পেছনের দিক দিয়ে মূল শক্তির সহায়তায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এই দু'টি কৌশলেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধে লিপ্ত মূলশক্তির সংরক্ষণ। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) আল্‌ফিউম অঞ্চলের দায়িত্বে থাকাকালে হেনা পরিচালিত একটি বাহিনীর দ্বারা উত্যক্ত হন। এই বাহিনীটি সব সময়ই তাঁর তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকত। হযরত আমর (রা.) এই বাহিনীটি থেকে নিষ্কৃতি লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে যান এবং আকস্মিকভাবে ফিরে এসে বাহিনীটির উপর আক্রমণ চালান। এই আক্রমণে হেনা নিহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি বাহিনী থেকে তাঁর নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হয় যা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২]

যাতুস্-সালাসিল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কতিপয় লোক তীব্র শৈত্য সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বালাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হযরত আমর এই কাজ থেকে তাদের বিরত থাকতে বলেন। পরবর্তীতে তাঁরা রসূলের নিকট অভিযোগ করলে তিনি এই বলে কৈফিয়ত দেন যে, আগুন জ্বালানো হলে শত্রুপক্ষ তাঁদের সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা দেখতে পেত। ফলে তাদের

---

১. زاد المعاد ج ۳ ص ۲۵۵

২. فتوح البلدان' طبری ابن کثیر تاریخ کثیر



www.pathagar.com

প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাঁদের টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। এই কারণেই রাত্রি বেলা আগুন জ্বালাবার অনুমতি দেয়া হয়নি।[১]

ইসলামের যুদ্ধ ইতিহাসে বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণকারী বাহিনী প্রেরণের মূল লক্ষ্যই ছিল আকস্মিকভাবে শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। ওরা মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত থাকে না। ফলে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ ও হতাশাগ্রস্ত করে দেয়া খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে মূল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়।

নবী করীম (স.) যখন বনু লিহইয়ানের উপর আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন না, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অপ্রকাশিতই থাকল। তার গতিবিধিকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও গোপন রাখলেন, যেন আকস্মিক আক্রমণের সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ও নিশ্চিত থাকে। তিনি শুধু ঘোষণা করলেন যে, সিরীয় অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হচ্ছেন। তিনি মদীনা থেকে উত্তর দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। ফলে বনু লিহইয়ান নিশ্চিতই থাকলো; মনে করে নিল যে, তাদের উপর আক্রমণ করা হবে না। কিন্তু পরে হঠাৎ করে দিক পরিবর্তন করে বনু লিহইয়ান গোত্রের উপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে উক্ত গোত্রের লোকজন চতুর্দিকে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।[২]

পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত খালিদ আকস্মিকভাবে তাদের নির্মিত পরিখা অতিক্রম করেন। এই পরিখা অতিক্রম করে কোন সময় তাদের উপর আক্রমণ চালানো কোন বাহিনীর পক্ষেই যে সম্ভব হবে, তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। হযরত খালিদ এই পরিখা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসা দুর্বল উটগুলো যবেহ করার এবং পরিখার সংকীর্ণতম স্থানে তা নিক্ষেপ করে তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। দুর্গরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি শেরজাদ মুসলিম বাহিনীর দুরতিক্রম্য পরিখা পার হয়ে মূল দুর্গের উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা দেখে নিজ হস্তে দুর্গের পতন

---

১. ঐ ৩৮৬ পৃঃ

২. زاد المعاد ج ٣ ص ٢٨٦

www.pathagar.com

ঘটাতে এবং সন্ধি করে দুর্গের কর্তৃত্ব মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। কেননা কেবলমাত্র এই আকস্মিক আক্রমণের কারণে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথই সে পায়নি।[১]

হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.) শত্রু বাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে যেমন তুলনাহীন সাহসিকতা ও বীরত্বের দাপটপূর্ণ নিদর্শন সংস্থাপন করেছেন, বিশ্ব ইতিহাস তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি বেবিলনের দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ও তাঁর সঙ্গের সৈন্যদের তথায় সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত যুবায়র নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে আল্লাহ্র জন্য সমর্পণ করেছিলেন। মুসলিম সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে দুর্গজয়ে সহজ করে দিয়েছিলেন। আক্রমণের সময় নির্ধারণ করে-ছিলেন অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে। সম্ভবত তিনি নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই সে বিষয়ে পূর্বাহ্নে জানতে পারেনি। দুর্গের প্রাচীরে তিনি এমন গোপনভাবে সিঁড়ি স্থাপন করেছিলেন যে, রোমানদের একটি লোকও তা টের পায়নি। অতঃপর মুসলিম বীর সন্তানেরা দুর্গের চূড়ায় উঠে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন, 'আল্লাহু আকবর' তকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ও সমস্ত দুর্গ প্রাকার প্রকম্পিত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত রোমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত পরাজিত অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা ছাড়া নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোন পথই পায়নি।[২]

ত্রিপলির দুর্গও মুসলমানগণ অনুরূপ প্রক্রিয়ায় জয় করেন। গোপনীতা ও আকস্মিকতার অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করে গোটা দুর্গবাসীর মধ্যে ব্যাপক ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালের প্রখ্যাত বীর সেনানায়ক মুসান্না ইবনে হারিসা আশ্-শায়বানী পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর নেতৃত্বাধীন সৈন্য বাহিনীকে অত্যন্ত গোপনীয়তা সহকারে পরিচালনা করেছিলেন। আকস্মিক আক্রমণের প্রক্রিয়াকেও তিনি পুরোপুরি প্রয়োগ করেছিলেন। বুয়াইব যুদ্ধে মুসান্না তাঁর সৈন্যদের বারবার বলতেছিলেন সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থাকতে এবং কোনরূপ উচ্চবাচ্য ধ্বনি না করতে। তিনি

---

১. تاریخ اقوام عالم ج ٢ ص ٣٠٧

২. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٠

www.pathagar.com

বাগদাদ দখল করার সংকল্প করেও কারুর নিকট সে কথা প্রকাশ করেননি। পারসিকদের জনৈক সরদার মিরজবানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ আমি মাদায়েনের উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে চাই। আমি আশা করি তুমি আমার সাথে টিনের পানি-পাত্রসমূহ ( pails ) প্রেরণ করবে এবং ফোরাত নদীর উপর একটি পুল বানিয়ে দেবে যেন আমরা নদী পার হতে পারি। মিরজবান মুসান্নার ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলে মুসান্না সৈন্যবাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে গেলেন। অর্ধেক পথ অতিক্রমের পর পথ প্রদর্শককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাগদাদ আর কত দূরে অবস্থিত?' পথপ্রদর্শক বললে ঃ মাত্র চার কিংবা পাঁচ ফারলং হবে। অতঃপর তিনি তাঁর বাহিনীর অগ্রবর্তী অশ্বারোহী অংশকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আরো নির্দেশ দিলেন যে, পথিমধ্যে যে ব্যক্তি বা কাফেলাই পাওয়া যাবে তাকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে, যেন বাগদাদে তাঁর আগমনের কোন সংবাদ আগেভাগে পৌঁছাতে না পারে। বস্তুত এরপর বাগদাদ দখল করে নেওয়ার পথে তাকে কোনরূপ প্রতিরোধেরই সম্মুখীন হতে হয়নি। এভাবে শহরের পর শহর ও অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে নেয়ার ব্যাপারে গোপনীয়তা ও আকস্মিকতা মুসলিম বাহিনীর বিশ্বজয়ের বড় শাণিত হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে।[১]

**সফল ও সার্থক সামরিক নেতৃত্ব**

বস্তুত যুদ্ধ-সংগ্রামে সফল-সক্ষম-সচেতন-সদাজাগ্রত সামরিক নেতৃত্ব সাধারণতই চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে সমর্থ হয়ে থাকে। এইরূপ নেতৃত্বই সৈন্যবাহিনীকে নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যের পানে পরিচালিত এবং তথায় পৌঁছাতে পারে। যত বড় কঠিন গুরুদায়িত্বই এইরূপ নেতৃত্বের স্কন্ধে অর্পণ করা হোক, পূর্ণ যোগ্যতাসহকারেই তা পালিত হবে বলে আশা করা যায়।

মুসলমানদের যুদ্ধ ইতিহাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে এরূপ সুদক্ষ নেতৃত্বের বিরাট ভূমিকা পালনের বিস্ময়োদ্দীপক ও রীতিমত রোমাঞ্চকর ভূমিকার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ইসলামী আদর্শভিত্তিক

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٥٠٠، تاريخ اقوام عالم ج ١ ص ٣٨٦

www.pathagar.com

স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের পরপরই বিপুল সংখ্যক সামরিক সুদক্ষ নেতৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁরা সামরিক অভিযানে লক্ষ্যস্থল অধিকার করে নিতে পূর্ণ দক্ষতার ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং রসূলে করীম (স.) যুদ্ধক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিশ্বের যুদ্ধ-ইতিহাসে তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি আদর্শস্থানীয় এবং দৃষ্টান্তহীন। যুদ্ধের ইতিহাসে তা সর্বদিক দিয়েই অতীব গৌরবের মহা মূল্য সম্পদ। খালিদ ইবনুল ওলীদ, আমর ইবনুল আস, সায়াদ ইবনে আবূ ওক্কাস, শারাহ্‌বীল ইবনে হাসানা, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আলী ইবনে আবূ তালিব, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ সরাহ্, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, তারিক ইবনে যিয়াদ, মূসা ইবনে নসীর, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, জাফর ইবনে আবূ তালিব, যায়দ ইবনে হারিসা প্রমুখ বড় বড় ও বিশ্ববিখ্যাত বীর সেনাধ্যক্ষ সামরিক ক্ষেত্রে যে তুলনাহীন অবদান রেখেছেন এবং নিজেদের যোগ্যতা বীরত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা চিরকালই অম্লান হয়ে থাকবে। এইসব দুঃসাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ক বিশ্বমানবতার মুক্তি সংগ্রামেরও অগ্রগতি বিধানে অতুনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অতীতের বিশ্ব-যুদ্ধ ইতিহাসে তাঁদের তুল্য নেতৃত্ব না পাশ্চাত্যের কোথাও দেখা গেছে, না প্রাচ্যের কোথাও। শুধু অতীতই নয়, আধুনিক বিশ্ব ও সমর দক্ষতায় তাঁদের আংশিক তুল্য নেতৃত্বের নিদর্শনও পেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁরা সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে শুধু যুদ্ধেই বিজয় প্রতিষ্ঠা করেন নি, মানবতার বহু জটিল সমস্যারও সমাধান করেছেন অত্যন্ত নিপুণ হস্তে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁরা যেসব নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তা যেমন মানবতাবাদী, তেমনি তা আজকের দিনের আণবিক যুদ্ধেও মানবতাবাদী নীতি হিসেবে বিশ্বমানবের জন্য অনুসরণীয়। বলা বাহুল্য ইসলামের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারিগণ 'আমীর' নামে অভিহিত হতেন।

যুদ্ধে সমস্ত সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ভাগকে এক একটি পতাকা দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হত। এই পতাকাবাহীই হতেন সেই ভাগের সৈন্যদের সেনাপতি—নেতা। এই বাহিনীর নেতা স্বভাবতঃই অত্যন্ত দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা হতেন। বহু ইসলামী ও সামরিক-মানবিক গুণের অধিকারী হতেন তিনি এবং তাঁর এই গুণ গরিমাই তাঁকে পতাকা বহনের মর্যাদাভিষিক্ত বানাত। তিনি হতেন অত্যন্ত নেক

www.pathagar.com

চরিত্রের, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল এবং উন্নত নেতৃত্বের গুণের ধারক। ফলে তিনি সাধারণ সৈন্যদের নিকট আদর্শ ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়াতেন।

সেনাধ্যক্ষের সেসব গুণের বাস্তব প্রতিফলন ঘটতো সাধারণ সেনানীদের উপর। ফলে সাধারণ সৈন্য ও সেনা নেতা পরস্পর সাদৃশ্য-পূর্ণ হয়ে উঠতো চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে। সাধারণ সেনাদের সাহসিকতা, শক্তিমত্তা ও সামরিক দক্ষতা তা-ই হত, যা তারা সেনা নেতার মধ্যে দেখতে পেত। আর তারা তার মধ্যে কোন-রূপ আলস্য বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করলে তারাও অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তো। তার মধ্যে কোনরূপ ভীতি ও ব্যর্থতা দেখতে পেলে তারা ভীত ও ব্যর্থ হয়ে যেত। পক্ষান্তরে তারা তার মধ্যে দৃঢ়তা, অনমনীয়তা লক্ষ্য করলে সংগে সংগে তারাও হয়ে উঠতো সুদৃঢ় ও অনমনীয়, ক্ষমাহীন। এটা অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার।[১]

শত্রুপক্ষ সৈন্যদের সংখ্যার উপর কোন গুরুত্ব দিত না। তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতো সেনাধ্যক্ষের উপর। তারা যদি দেখতো, সেনাধ্যক্ষ অত্যন্ত সাহসী, বীর, নমনীয়তা ও ভীরুতামুক্ত, শক্ত, দীনদার, পরাক্রমশালী, তাহলে তা-ই হত তাদের জন্য পরম ভয়ের কারণ। তারা তখন প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পণ ও সন্ধি-সমঝোতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

মুসলিম সেনানীদের অধিকার স্বীকৃত ছিল তাদের সেনাধ্যক্ষের উপর। সেনাধ্যক্ষ পথ চলার ব্যাপারে তাদের প্রতি নম্রতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। তিনি তাদের প্রতি কখনই নির্মমতা দেখাতেন না, রূঢ় কঠোর আচরণ করতেন না। কেননা তা করা হলে ওরা দুর্বল হয়ে পড়তো। রসূলে করীম (স.) কোন বাহিনী নিয়ে যখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করতেন, তখন পিছনের দিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতেন। কেউ দুর্বল হয়ে পড়লে সে তাকে শক্তি যোগাতো, কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতো। তিনি ছিলেন তাঁর সংগীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি সৈন্যদের যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কোন দুর্বল, রুগ্ন ঘোড়া বা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকেজো কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখতে দিতেন না। সৈন্যদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ١٠٠

www.pathagar.com

ভাগের সেনাপতি নিযুক্ত করে পুরোপুরি তত্ত্বাবধানেরও দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করতেন।[১]

ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনুল ওলীদ তাঁর সেনাবাহিনীকে অনুরূপভাবে পুনর্গঠিত ও সুসংবদ্ধ করেছিলেন। সৈন্যদের সমর-কৌশলের দিক দিয়ে উপযুক্ত স্থানে মোতায়েন করা এবং শত্রুপক্ষ যে দিক দিয়ে আক্রমণ করতে পারে বলে আশঙ্কা থাকে সেই দিকে তার মুকাবিলা করার জন্য রাখা, তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে থাকা সেনাপতির বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কাজ। তাদের মধ্যে বিজয়ের চেতনা জাগ্রত রাখাও আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট শুভফল পাওয়ার আশায় তাদের সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সেনানায়কের নিকট থেকে বিভিন্ন সময় যে সব ফরমান আসে তা-ও তাদের জানিয়ে দিতে থাকা আবশ্যক। সাধারণ সৈন্যদের নিয়মিত নৈতিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও কার্যকর রাখতে হবে। অন্যথায় যেকোন মুহূর্তে তারা বিভ্রান্ত ও আদর্শবিচ্যুত হয়ে পড়তে পারে। নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ

انهوا جيوشكم عن الفساد فانه ما فسد الجيش قط الا قذف الله فى قلوبهم الرعب وانهوا جيوشكم عن الزنا فما زنى جيش قط الا سلط الله عليهم الموتان وانهوا جيوشكم عن الغلول فانه ما غل جيش قط الا قذف الله الرعب فى قلوبهم -

তোমরা তোমাদের সৈন্যদিগকে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত রাখো। কেননা যে সৈন্যরা বিপর্যয়কারী হবে, আল্লাহ্ তাদের হৃদয়-মনে ভীতির

---

১. রসূলে করীম (স.)-এর এই আমলটা ঠিক যেন সূরা আল্-মায়িদার ১২ নং আয়াতের বাস্তব অনুসরণ।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে দেন। তোমাদের সৈন্যদের ব্যভিচার থেকে বিরত রাখো, কেননা যে সৈন্যরা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ তাদের উপর মহামারী চাপিয়ে দেন। তোমাদের সৈন্যদের খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ থেকে বিরত রাখো। কেননা কোন সৈন্য বাহিনীর লোকেরা এই কাজ করলে আল্লাহ্ তাদের মনে ভয়-আতংকের উদ্রেক করে দিয়ে থাকেন।[১]

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালিদকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ

يَا خَالِدُ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاِيْثَارِهٖ عَلٰى مَنْ سِوَاهُ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِهٖ وَالرِّفْقِ بِمَنْ مَعَكَ مِنْ رَعِيَّتِكَ فَاِنَّ مَعَكَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَهْلَ السَّابِقَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَشَاوِرْهُمْ فِيْمَا نَزَلَ بِكَ ثُمَّ لَا تُخَالِفْهُمْ ـ

হে খালিদ! আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত তোমার এবং অন্য সব কিছুর উপরে অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে মহান আল্লাহ্‌কে এবং এভাবেই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে হবে। তোমার সঙ্গে যে সব লোকজন রয়েছেন তাঁদের প্রতি পরম মমত্ব, সহানুভূতি, নম্রতা ও সহৃদয়তা রাখতে হবে। বিশেষ করে তোমাকে মনে রাখতে হবে, তোমার সঙ্গে রয়েছেন রসূলে করীম (স.)-এর প্রাথমিক পর্যায়ের আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণ। অতএব তুমি তাঁদের সাথে সম্মুখবর্তী সব ব্যাপারে পরামর্শ করবে এবং পরে পরামর্শভিত্তিক সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাদের বিরোধিতা করবে না।[২]

হযরত উমর (রা.) সেনাধ্যক্ষ হযরত সায়াদ ইবনে আবু ওকাস (রা.)-কে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٠٣

২. سوانح حضرت ابو بكر محمد حسين هيكل اردو ص ٣٩٨

www.pathagar.com

فَإِنِّي آمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ بِتَقْوَى اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأَقْوَى الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ وَلَا تَعْمَلُوا بِمَعَاصِي اللهِ وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَرَفَّقْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي سَيْرِهِمْ وَلَا تُجَشِّمْهُمْ سَيْرًا يُتْعِبُهُمْ وَأَقِمْ بِمَنْ مَعَكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ جُمُعَةً وَلَيْلَةً حَتَّى تَكُونَ لَهُمْ رَاحَةٌ يُجِمُّونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ وَيَرُمُّونَ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتَهُمْ -

আমি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গের লোকদিগকে আদেশ করছি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় মনে জাগরূক রাখার জন্য। কেননা আল্লাহ্‌র ভয় শত্রুর বিরুদ্ধে অতীব উত্তম হাতিয়ার এবং যুদ্ধে খুবই কার্যকর ফন্দি ও রণকৌশল। তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কোন কাজ করো না, এখন তো তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে নিয়োজিত। চলাচলের ব্যাপারে তুমি সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি নম্র আচরণ করবে, এমন পথ চলায় তাদের বাধ্য করবে না, যার ফলে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। তুমি সঙ্গীদের নিয়ে রাত ও দিনে সমাবেশ করবে। তাতে তারা বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাবে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও একাত্মতা গড়ে তুলতে এবং কাঁধের অস্ত্র ও মাল-সামানের বোঝা খুলে রাখতে পারবে।[১]

এ সময়ে সেনানায়কেরও অনেক অধিকার রয়েছে সাধারণ সৈনিকদের উপর। সাধারণ সৈনিকদের কর্তব্য নেতার আনুগত্য করা, তাঁর কর্তৃত্বের

---

১. فلسفة الجهاد في الإسلام ص ٣٠٣

www.pathagar.com

অধীন হয়ে থাকা। কেননা তাঁর অধীনতা গ্রহণ করে তার আনুগত্য করা একান্তই কর্তব্য সাধারণ সৈনিকদের জন্য। নেতার মতামতের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিবে। সেনাধ্যক্ষ ও সাধারণ সেনাদের মধ্যে কখনই মতপার্থক্য হওয়া উচিত নয়। মতপার্থক্য হলে তাদের ঐক্য ভেঙে যাবে এবং চরম বিপর্যয় দেখা দেবে, তা পরাজয় ডেকে আনবে এবং তাদের সুনাম-সুখ্যাতি সব বিনষ্ট হবে। বস্তুত নেতার আনুগত্য করা কর্তব্য, এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। নেতার এ আনুগত্য একান্তই নিরংকুশ, শর্তহীন। তবে সাধারণ সৈনিকদের মনে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে আসলে বা দৃষ্টিগোচর হ'লে সে বিষয়ে যথাসময়ে সেনা নেতাকে অবহিত করবে। সেনাধ্যক্ষ সে কথা গ্রহণ করে নিলে তো ভালই, অন্যথায় নেতার আনুগত্য করে কাজ করাই তাদের কর্তব্য।

সেনাপতি খালিদ তালীহাতার বিরুদ্ধে লড়াই শেষ করে 'বতাহ'-এর দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সঙ্গীর আনসার সেনাগণ ইতস্তত করতে লাগলেন। বললেন, খলীফা এরূপ কোন আদেশ আমাদের প্রতি করেননি, এজন্যে তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তিও ছিল না। তখন খালিদ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট না হয়ে তাদের নিকট প্রকৃত অবস্থার বিশদ বর্ণনা দিলেন। বললেন ঃ আপনাদের সাথে এ পর্যন্ত আমার চুক্তি থাকলে তা থাকতে পারে; কিন্তু আমার প্রতি তো নির্দেশ, আমি অগ্রসর হতে থাকব। আর এই বাহিনীর নেতা তো আমি-ই। উপর থেকে নির্দেশ তো আমার পর্যন্ত পোঁছায়। আমার নিকট নতুন কোন নির্দেশ না এসে থাকলেও অবসর ও সুযোগ থাকলে আমি অবশ্যই তার সদ্ব্যবহার করবো।

খালিদ তাঁর ঘোষিত নীতির উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকলেন। খুব নম্র ভাষায় বললেন, আমার সঙ্গী বহু মুহাজির সাহাবী ও তাবেয়ীন রয়েছেন। আমি তাঁদের জবরদস্তি বাধ্য করতে চাইনে। ইচ্ছা হলে আপনারাও আমার সঙ্গে যেতে পারেন, নতুবা এখানে থেকেও যেতে পারেন। পরে খালিদ রওয়ানা হয়ে গেলে গোটা সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে হবাব ইবনুল মুন্‌যির ইবনুল জুমূহ (রা.) এসে রসূলে করীম (স.)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

www.pathagar.com

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ هٰذَا الْمَنْزِلَ أَمَنْزِلًا أَنْزَلَكَهُ اللّٰهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرَّأْىُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ ؟

হে রসূল ! অবস্থানের এই স্থানটি আপনি কি এজন্যে বাছাই করেছেন যে, আল্লাহ্ই আপনাকে এখানে অবস্থান গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন ?... যদি তা-ই হয়, তাহলে তা ছেড়ে একবিন্দু সম্মুখে বা একবিন্দু পিছনে সরে দাঁড়ানোর অধিকার নেই। কিংবা এটা আপনার নিজের চিন্তা ও মত অনুযায়ী যুদ্ধ কৌশল বিবেচনার কারণে ? তখন রসূলে করীম (স.) বললেন :

بَلْ هُوَ الرَّأْىُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ -

না, এটা আমার ব্যক্তিগত মত এবং যুদ্ধের কৌশলগত দিক বিবেচনা করেই এই স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

তখন হুবাব বললেন :

فَإِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتّٰى نَأْتِىَ أَدْنٰى مَاءٍ مِّنَ الْقَوْمِ فَنَنْزِلَ ثُمَّ نُغَوِّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ الْقُلُبِ ثُمَّ نَبْنِىَ عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمْلَأُهُ مَاءً ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُوْا -

তা'হলে বলব এটা সঠিক স্থান নয় আমাদের অবস্থান গ্রহণের জন্য। বরং আপনি লোকজন নিয়ে এখান থেকে উঠে পানির নিকটবর্তী স্থানে

www.pathagar.com

চলে যান। সেখানেই আমাদের অবস্থান গ্রহণ করা আবশ্যক। পরে আমরা তার পিছনের মূল স্থানকে আড়াল করে দাঁড়াব। পরে আমরা সেখানে একটি জলাধার বানিয়ে নেব, তা পানি দিয়ে ভরে রাখব। অতঃপর আমরা শত্রুর সাথে লড়াই করতে সক্ষম হবো। যুদ্ধকালে আমরাই পানি পাব, ওরা পাবে না।[১]

অতঃপর এই কথার যৌক্তিকতা বিবেচনা করে রসূলে করীম (স.) হুবাবের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তদানুযায়ী কাজ করলেন।

ওহুদের যুদ্ধকালে শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার স্থান নির্বাচন নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে দুইটি মত প্রবল হয়ে উঠে। কিছু লোক মদীনায় অবস্থান করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। আর কিছু লোক বাইরে গিয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার যৌক্তিকতা পেশ করলেন। নবী করীম (স.) প্রধান সেনানায়ক হিসেবে উভয় মতের পক্ষের যুক্তি বিবেচনা করলেন এবং বাইরে বের হয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের যৌক্তিকতা অধিক অকাট্য এবং বলিষ্ঠ বলে মনে করলেন এবং সেই মতকেই গ্রহণ করলেন, যদিও তা স্বয়ং তাঁর নিজের মতেরও বিপরীত ছিল।

বস্তুত মুসলিম সেনানায়কগণ এমনসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন যা যুদ্ধসমূহে বিজয় লাভের 'ফ্যাক্টর' হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই গুণসমূহের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

প্রথম উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে, তাঁদের নিঃশংক নিরংকুশ ঈমান। ঈমান একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি। এ অবিচল ঈমানের দিক দিয়ে রসূলে করীম (স.) ছিলেন অতীব উত্তম ও প্রোজ্জ্বল আদর্শ। এই ঈমানের বলেই তিনি তাঁর চাচাকে যে কথা বলতে পেরেছিলেন, মানবতার ইতিহাসে তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

وَاللهِ يَاعَمّ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ

---

১. مختصر سيرة الرسول صلعم ص ١١٧ محمد ابن عبد الوهاب السيرة النبوة لابى الحسن على ندوى ص ١٧١ سيرة ابن هشام ق ١ ص ٦٢٠

www.pathagar.com

يَسَارِى عَلَى اَنْ اَتْرُكَ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يُظْهِرَهُ اللّٰهُ اَوْ اُهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ -

হে চাচা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও রেখে দেয় এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এই কাজ ত্যাগ করব ; জেনে রাখুন আমি তা কখনই ছেড়ে দেব না যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই কাজের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাবেন কিংবা আমিই এই কাজ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাব।[১]

ইসলামী জিহাদে যে ঈমান প্রয়োজন, তাতে বৈষয়িক স্বার্থ লাভের এক বিন্দু স্থান বা অবকাশ নেই। তাতে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তি।

এই ঈমানেরই উচ্চতর রূপ বর্ণনা করেছিলেন হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)। তিনি মুকাউকাসকে তাঁদের আদর্শের কথা বুঝিয়ে ছিলেন এই বলে যে, তাঁরা দুনিয়ার কোন স্বার্থে বের হয়ে আসিননি, দুনিয়ায় তাদের পাওয়ারও কিছু নেই। তাদের সকল লক্ষ্য নিবদ্ধ হচ্ছে পরকালের উপর।[২]

হযরত যায়দ ইবনুল খাত্তাব (রা.) মিথ্যা নবূয়ত দাবীদার মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করা কালে বলেছিলেন, ওদের পরাজিত না করা পর্যন্ত আমি আজ কোন কথাই বলব না। অথবা আমি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করে আমার যুক্তি প্রমাণসহ বক্তব্য পেশ করব।[৩] আবূ হুযায়ফার মুক্ত গোলাম মালেক সেই ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যখন বলেছিলেন আমি যদি অবিচল ও দৃঢ় না থাকি, তা'হলে তো আমি কুরআন ধারক হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট ব্যক্তি হয়ে যাবো।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে আত্মদৃঢ়তা ও অনড় আত্মবিশ্বাস নিজের উপর অবিচল আস্থা। এই গুণটি এতই প্রয়োজনীয় যে, এই গুণের কারণেই আল্লাহ্

---

১. سيرة ابن هشام ق ١ ص ٢٦٥-٢٦٦ السيرة النبوية لابى الحسن على ندوى ص ٩٠

২. تاريخ اقوام عالم ج ١

৩. سيرة ابوبكر رض محمد بن هيكل ص ٢٦٣

www.pathagar.com

তাআলা মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যদানের ওয়াদা করেছেন। এই অবিচল দৃঢ়তাই সকল কঠিনতা-কঠোরতাকে সহজ করে দিয়েছেন। সব বাধা-বিপত্তিকে অপসৃত করে দিয়েছেন। সেনানায়ক এই দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের বলেই যুদ্ধের বহু বিপদ ও ভয়াবহ অবস্থা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হতে থাকেন। রসূলে করীম (স.) আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল হওয়া সত্ত্বেও বারবার বলতেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ... لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا... أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ -

আমি তো একজন সাধারণ মানুষ, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ মাত্র। আমি নিজের জন্য কোন সুবিধা লাভ করতে সক্ষম নই যেমন, তেমনি কোন ক্ষতি বা কষ্ট এড়ানোর ক্ষমতাও আমার নেই।'

এই অবিচল দৃঢ়তার কারণেই হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুর্তাদ-বিদ্রোহীদের কার্যকরভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণকারীদের লক্ষ্য করে তিনি এই দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচল সংকল্পবদ্ধতার বলে বলতে পেরেছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْا نِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهٗ عَلٰى مَنْعِهٖ -

আল্লাহ্‌র নামে শপথ! রসূলের যামানায় দিত—এমন একটা রশি দিতেও যদি ওরা আজ অস্বীকার করে, তা'হলে এই অস্বীকৃতির কারণেই আমি ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

তিনি বলতে সক্ষম হয়েছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ -

www.pathagar.com

> আল্লাহর শপথ! নামায ও যাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, নামায পড়বে, কিন্তু যাকাত দেওয়া ফরয মনে করলেও দেবে না—আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে ধন বাবদ ধার্য হক।[১]

এই আত্মবিশ্বাসের বলেই হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) নিজ থেকেই খলীফার নিকট মিসর আক্রমণের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য বড় আকারের কোন লোক-লশকর দিয়ে সাহায্যের দাবী করেননি। মিসর বিজয় সম্ভব হবে মাত্র চার হাজার যোদ্ধার দ্বারা—এই বিশ্বাসই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদ এই মনোবলের দৌলতেই আরবী সামরিক জাহাজ (Fleet) সমুদ্রে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। শত্রুশক্তির মুকাবিলায় পরাজয়ের একবিন্দু ভয়ে তিনি ভীত হলেন না অথচ তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তারিকের নিজের সৈন্যদের চেয়ে অন্তত ছয়গুণ বেশী। তিনি এই অবস্থায়ও শত্রুবাহিনীর সম্মুখে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের অধীন সৈন্যদের সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

> হে মুজাহিদগণ! কোথায় পালিয়ে যাবে? তোমাদের পশ্চাতে বিশাল সমুদ্র, আর সম্মুখে বিরাট শত্রুবাহিনী। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহর কসম—সত্যের জন্য লড়াই করা এবং তাতে অবিচল থাকা ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন পথ খোলা নেই।[২]

সেনানায়কের তৃতীয় অপরিহার্য গুণ হচ্ছে—সাহসিকতা ও বীরত্ব। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেছেনঃ আমি রসূলে করীম (স.)-এর তুলনায় অধিক দুঃসাহসী সাহায্যকারী-সংরক্ষণকারী এবং সহজতা বিধানে অধিক প্রস্তুত আর কোন সেনাপতি দেখিনি।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ যুদ্ধের ময়দানে বিপদ ভয়াবহ হয়ে দেখা দিত এবং শত্রুপক্ষের অবরোধ সংকীর্ণ হয়ে আসতো, তখন আমরা রসূলে করীম (স.) সম্পর্কে খুব বেশী আশংকায় কাতর হয়ে পড়তাম। কিন্তু সেই সময়ও শত্রুর উপর অতি নিকট থেকে আক্রমণকারী তাঁর অধিক আর কেউ হ'ত না।

---

১. خلفاء راشدین اردو ص ۱۳ بخاری ج ۱ ص ۱۸۸

২. تاریخ اقوام عالم ج ۱

www.pathagar.com

হারা ইবনে আযিব (রা) বলেছেন ঃ হুনাইনের কঠিন যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় সবাই পালিয়েছেন। কিন্তু রসূলে করীম (স.) পালান নি।

হযরত খালিদের বীরত্ব ও সাহসিকতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। হযরত উমর ফারূক (রা.) ও তাঁর বীরত্ব ও অগ্রগামিতার প্রশংসা করে বলেছেন ঃ اِنَّ فِیْ سَیْفِ خَالِدٍ رَهَقًا - খালিদের তরবারি অমোঘ ও অব্যর্থ।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর উপর ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের পরাজয় অত্যাসন্ন মনে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত আমর ইবনুল 'আস ক্ষিপ্রতা সহকারে অগ্রসর হয়ে পতাকা উড্ডীন করে ধরেন এবং পরম পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর বীরত্ব দেখে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং রোমানদের উপর প্রতি-আক্রমণে পর্বতের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পরাজয় নিমেষের মধ্যে বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পারস্যের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ এক আতংক সৃষ্টিকারী হস্তী নিয়ে ময়দানে আসে। মুসলিম বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেনাপতি আল-মুসান্না অগ্রসর হয়ে হাতিটিকে হত্যা করেন এবং তা-ই পারসিকদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

বলা বাহুল্য যুদ্ধের ময়দানে সেনাবাহিনীর সফল নেতৃত্বদান একটি অতি বড় গুরুদায়িত্বের ব্যাপার। ঈমান, দৃঢ় মনোবল এবং অসীম সাহসিকতা ছাড়াও আরও অনেক গুণ-গরিমা প্রয়োজন এই দায়িত্ব পালনের জন্য। মূল দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন, সময়ের নাজুকতা অনুযায়ী অবিলম্বে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সৈন্যদের ভালোভাবে চেনা-জানা, কার মধ্যে কি গুণ ও যোগ্যতা রয়েছে সে বিষয়ে অবহিতি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তার মধ্যে ধৈর্য ধারণ ও সহিষ্ণুতার গুণ থাকা জরুরী বিপুল পরিমাণে। সৈন্যদের মধ্যে সব সময় সমতা ও সুবিচার রক্ষা করাও আবশ্যক।

---

১. سیرت ابوبکر رض از محمد حسین ہیکل اردو ص ۳۰۸

www.pathagar.com

বস্তুত ইসলামী জিহাদের সেনানায়কদের মধ্যে এসব গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল বলেই জিহাদের ক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্ব যেমন সফল প্রমাণিত হয়েছিল, তেমনি মুসলমানদের জন্য নিয়ে এসেছিল বিজয়ের ফুলের ডালা। তাই তাঁদের এই বীরত্ব গাঁথা শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসে চিরকাল শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়েই থাকবে।

### কুরআন উপস্থাপিত গুণাবলীর শর্ত

মুসলমানদের শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয়, সাধারণ সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যে গুণাবলীর কথা কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে, সংক্ষেপে ও মোটামুটিভাবে এখানে সেগুলোর উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. নেতাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন ও রসূলের সুন্নাতের বিশেষ আলিম হতে হবে। কুরআনী আইন-বিধানে হতে হবে পূর্ণ পারদর্শী। রসূলের হাদীসসমূহ—বিশেষ করে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের হাফেজ হতে হবে।

২. যুদ্ধবিদ্যায় ও তার কর্মকৌশল পর্যায়ে গভীর জ্ঞান ও অবহিতি থাকা আবশ্যক। যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ কর্মকুশলতা এবং যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলীতে তাকে ভূষিত হতে হবে।

৩. তাকে হতে হবে দৈহিক দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান, সাহসী, আক্রমণকারী মন-মেযাজ সম্পন্ন, বিজয়ী প্রকৃতির অধিকারী এবং তার অধীন সৈন্যদের অত্যন্ত আস্থা ও বিশ্বাসভাজন।

৪. দৃঢ় চিত্ত, অবিচল মন-মানসিকতাসম্পন্ন, শক্ত-অনমনীয়, দুর্ধর্ষ, সৈন্য পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে।

৫. চরম বিপর্যয়ের সময়ও অত্যন্ত সাহসী, বীর, কঠিনতম মুহূর্তে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণকারী এবং সর্বাবস্থায় অবিচল ধৈর্য ধারণকারী, নিজেদের লোকদের প্রতি পরম দয়া সহানুভূতিশীল হতে হবে। হতে হবে আত্মসংযম রক্ষাকারী।

৬. নিজের প্রতি, সাধারণ সেনানীদের প্রতি—এমনকি শত্রুপক্ষের প্রতিও তাকে হতে হবে সুবিচার ও ইনসাফের প্রতীক।



www.pathagar.com

৭. বিশ্বস্ত, আমানতদার, ওয়াদা পূরণকারী—বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ও জনগণ-অর্পিত আমানতের পূর্ণ সংরক্ষণকারী হতে হবে তাকে। ওয়াদা পূরণে এতটা অনমনীয় হতে হবে যে, তাতে নিজের ক্ষতি হলেও সে ক্ষতি সে অবলীলাক্রমে বরণ করে নেবে। ওয়াদা ও আমানত অমুসলিম সংশ্লিষ্ট হলেও তা রক্ষায় সে হবে না একবিন্দু কুন্ঠিত।

৮. তাঁকে হতে হবে পরিণামদর্শী, মিতব্যয়ী, মনোবলে বলীয়ান। দিশেহারা বা ইতঃস্তুতকারী নয়। সমস্ত ব্যাপার আঁচ করতে সক্ষম, পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী মিথ্যা পাপ বা গুজবে কর্ণপাতকারী নয়।

৯. পরম আত্মবিশ্বাসী। নিজ শক্তি সম্পর্কে তীব্র সচেতন। শত্রুর কোন পদক্ষেপে কিছুমাত্র ভীত নয়। কোন অবস্থায়ই সে হতাশাগ্রস্ত বা দুঃখ-কাতর হবে না।

১০. কোন্ অবস্থায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হবে এবং সেই সাথে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবে। কাজের পূর্ণ পরিকল্পনা হবে সুচিন্তিত ও নির্ভুল কার্যক্রম গ্রহণে সুপটু। চিন্তা-ভাবনা করেই সব কাজ করবে, না বুঝে ও তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবে না।

১১. সাধারণ সেনানীদের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগ রক্ষাকারী ও তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, তাদের অভিযোগ ও দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন।

১২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সব সময় পরামর্শকারী, স্বীয় একক মতের ভিত্তিতে কাজ করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী হবে না।

১৩. শত্রুপক্ষের সব খবরাদি তার নখদর্পণে থাকবে। মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য সংখ্যা, সৈন্যদের যোগ্যতা, সাহসিকতা এবং শত্রুর রণকৌশল সম্পর্কে তাকে পূর্ণ অবহিত হতে হবে। শত্রুর প্রতিরোধে সক্ষম, শত্রুপক্ষকে ধোঁকায় ফেলে কাতর করে দিতে নিপুণ।

১৪. সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম তাকে হতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি শক্ত ঈমানদার। আল্লাহ্‌র ভয় থাকবে তার মনে. প্রতি রগ-শিরা ও প্রতি রক্ত-বিন্দুতে প্রবহমান তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, বিজয় দানকারী একমাত্র আল্লাহ্। কোন অস্ত্র বা সৈন্য কিংবা কৌশল বলেই জয় হতে পারে না, হতে পারে ঈমানের বলে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে। অস্ত্রসহ অন্যান্য

www.pathagar.com

সব জিনিসেরই স্থান তার পরে। যুদ্ধের মূলে খালেস নিয়্যত থাকতে হবে। আর যুদ্ধের লক্ষ্য হতে হবে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্‌র ঘোষণা চিরন্তন, অবিনশ্বর ঃ

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

প্রকৃত মু'মিনদের সাহায্য করা ও তাদের বিজয়ী করা আমাদের বিশেষ কর্তব্যভুক্ত। এই পর্যায়েই স্মরণীয় আল্লাহ্ তা'আলার আকুল আহবান ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا

اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, অন্যদেরও ধৈর্য-ধারণে প্রস্তুত কর। প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত, সদা সতর্ক ও সর্বক্ষণ নিম্ন থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তা'হলেই আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভে ধন্য হবে। —সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০

উপরোক্ত গুণসম্পন্ন লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সেনানী হতে পারে ঃ

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ ٥

নিশ্চয়ই জানবে, আমার সৈন্যরাই সর্বাবস্থায় বিজয়ী হবে।'
—সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ১৭৩

আল্লাহ্‌র এই সৈনিকদের চেষ্টা ও সংগ্রামের ফলেই দুনিয়ার মানুষের জীবন সংশোধিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে পারছে। তাদের দ্বারাই সত্যের ঝাণ্ডা দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে উড্ডীন হয়েছে। তাদের ঝরানো রক্তেই দুনিয়ার ইনসাফ ও সুবিচারের মশাল জ্বলেছে, স্বাধীনতার সুউচ্চ বৃক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মানবতা দিতে পেরেছে তার হৃত মর্যাদা ও গৌরব। মানুষ এই দুনিয়ার জীবনে একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত ও একাত্ম হতে পেরেছে। তাই আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা যথার্থ ও সার্থক প্রমাণিত হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

ওরাই আল্লাহ্‌র দলভুক্ত লোক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দল-ই সাফল্যমণ্ডিত। —সূরা মুজাদালা ঃ ২২

ওরাই ছিলেন রাত্রিবেলা জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে ইবাদত গুজার এবং দিনের বেলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী দীনের যোদ্ধা।

কিন্তু আল্লাহ্‌র দলের এই লোকদের পাশাপাশি এমন কিছু লোকও থাকে, ছিল এবং এখনও দেখা যেতে পারে, যাদের প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্ তা'আলা হরণ করে নিয়েছিলেন, যারা স্বভাবতঃই নাফরমান, কুফরি তাদের হাড়ে মজ্জায় একাকার ঃ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

ওদের দিলের মধ্যে রোগে বাসা বেঁধেছে, আল্লাহ্ ওদের রোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং ওদের জন্য রয়েছে খুবই পীড়াদায়ক আযাব। —সূরা বাকারা ঃ ১০

এই লোকেরা ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, ওরা মুসলমান-দের সাথে নানাভাবে ধোঁকাবাজি করেছে। ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ওরা মুসলমানদের সাথে জিহাদে শরীক হয়নি। নানা কলা-কৌশল বা টালবাহানা করে করে জিহাদে শরীক হওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। ফলে ওরা জিহাদের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ওরা নিজেরাই নিজেদের জীবনকে মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ওদের ভাগ্যে জুটেনি। ওরা আসলে ভীরু, কাপুরুষ, ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা আল্লাহ্‌র শত্রুর ভূমিকাই পালন করেছে সারাটি জীবন ভরে, বন্ধুর নয়। ওদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা চিরসত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ

www.pathagar.com

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ -

ওদের উপরই আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেন, অভিশাপ বর্ষণ করে অন্যান্য বহু অভিশাপ বর্ষণকারীরা। —সূরা বাকারা ঃ ১৫৯

আসলে ওরা মহাকাশে দেদীপ্যমান মার্তণ্ডকেও দেখতে পায় না, দেখতে পেয়েও তা স্বীকার করতে রাযী নয়।

ওদের মধ্যে মন-মেযাজের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও ইসলামের বিরোধিতায় এবং ইসলামী জিহাদে শরীক না হওয়ায় ওরা সম্পূর্ণ অভিন্ন।

১. ওদের কতক নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোক ঃ

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا -

আল্লাহ্ ময়দানে জিহাদকারীদের নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের উপর অনেক বেশী মর্যাদা এবং বিরাট শুভ ফল দান করেছেন।

—সূরা নিসা ঃ ৯৫

কেননা এই মুজাহিদরাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রকারের কষ্ট, রক্তদান এবং জান ও মালের তুলনাহীন কুরবানী দিয়ে থাকেন।

২. জিহাদের ব্যাপারে অচলায়তন—

আল্লাহ্ তা'আলা এই লোকদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ - أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ - فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ -

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি হয়েছে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তোমরা যমীনের দিকে অচলায়তন হয়ে পড় ? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ? জেনে রাখবে বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী পরকালে খুব সামান্য মূল্যই পাবে। —সূরা তাওবা ঃ ৩৮

জিহাদে শরীক হওয়ার আহবান জানালেই তারা গড়িমসি করতে এবং কোন-না-কোন বৈষয়িক অসুবিধা দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকার বাহানা করে। আল্লাহ্‌ এদেরকে কাফির বলেন নি, 'ঈমানদার' বলেই সম্বোধন করেছেন। কিন্তু কার্যত এরা ঈমানদার হওয়ার দায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র ইচ্ছুক নয়, অথচ ঈমানদার হিসেবে তা ছিল তাদের জন্য একটি কঠিন দায়িত্ব। তারা বৈষয়িক আরাম-আয়েশে মগ্ন, জিহাদের ভয়ে ভীত, মৃত্যুর ভয়ে ভয়ানকভাবে কাতর। ফলে পরকালীন মর্যাদা ও আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তারা হবে বঞ্চিত।

৩. ধীর ও মন্থর গতির লোক ঃ

আল্লাহ্‌ এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ - فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ
أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا -

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা জিহাদে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেও আজ—যাই-কাল যাই করে ধীরতা ও মন্থরতার আচরণ করে। পরে তোমাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, আল্লাহ্‌ তো আমার উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, যেতে দেরী করে বিপদ থেকে বেঁচে গেছি, আমি ওদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না বলে, আর যদি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কোন অনুগ্রহ তোমাদের প্রাপ্ত হয়, তখন তারা বলে, হায় আমি কেন ওদের সাথে থাকলাম না, তা'হলে তো বিরাট সাফল্য পেয়ে যেতাম।... মনে হয়, তোমাদের সাথে ওর কোন পরিচিতি বা বন্ধুত্বই ছিল না কোন দিন। —সূরা নিসা ঃ ৭২-৭৩

এরা ঈমানের তাকীদে মুসলিম জনগণের সাথে শামিল হ'তে প্রস্তুত নয়, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যে এরা সাধারণ কল্যাণের দিকে দ্রুততা সহকারে এগিয়ে যেতে সম্পূর্ণ নারায। ফলে লোভ, লালসা ও আত্মম্ভরিতা বা আমিত্ব তাদের মনের উপর এতখানি প্রভাবশালী হয়ে বসে যে, ঈমানের দাবীতে তারা কোনরূপ ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকারে আগ্রহী হতে পারে না। সব মুসলিম যখন জিহাদে রওয়ানা হয়ে যায়, তখন তারা সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয় না, দেরী করে এবং শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকিকে এড়িয়ে যায়। মুসলমানরা যদি পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তখন তারা আনন্দিত হয়, মনে মনে বলে, যাক, বাঁচা গেল। কেননা তারা সঙ্গে থাকলে তাদেরও বিপদে পড়তে হ'ত। আর বিজয় ও গনীমত লাভ হলে তখন তারা দুঃখিত হয়, হায়, তারা কেন সঙ্গে থাকলো না। থাকলে তারাও তার অংশীদার হতে পারত।

৪. ধনশালী, সুখে লালিত-পালিত ব্যক্তিরা—

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۔

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۔

তিরস্কার করার পথ আছে সেই লোকদের উপর যারা—হে নবী তোমার নিকট জিহাদে না-যাওয়ার ও পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়। আসলে তাদের দিলের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মোহর করে দিয়েছেন, ওরা জানেই না (যে তারা কত বড় অপরাধ করছে)'। —সূরা তাওবা ঃ ৯৩

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলছেন, মুসলমানরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে ওরা তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের নানা অক্ষমতা পেশ করে না যাওয়ার কারণ হিসেবে। হে নবী, আপনি ওদের ওযর গ্রহণ করবেন না। ওদের বলে দিন যে, তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করি না। তোমরা এই অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। আপনি ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেও রাযী হবেন না। ওরা কিন্তু আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিরা-কসম করতেও কুণ্ঠিত হবে না। ওদের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ই রাযী নন, আপনিও রাযী হবেন না।

বস্তুত এই শ্রেণীর লোকেরা ধনশালী। ওদের বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়াই ওদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বৈষয়িকতার সাথে ওদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আসলে আল্লাহ্ ওদের দৃষ্টি ও বিবেককেই হরণ করে নিয়েছেন।

৫. অপেক্ষমান ব্যক্তিরা—

আল্লাহ্ ওদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي - أَلَا فِي الْفِتْنَةِ
سَقَطُوا - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ -

ওদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমাকে অনুমতি দিন, আমাকে কোনরূপ বিপদে ফেলবে না। বলুন, ওরা তো আগেই বিপদে পতিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো কাফিরদের পরিবেষ্টিত করেই রেখেছেন। —সূরা তাওবা ঃ ৪৯

এই শ্রেণীর লোকেরা মুখে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে; কিন্তু জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হলে ভয়ে ও বিপদাশঙ্কায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। তখন তারা নানা টালবাহানার আশ্রয় লয়। মুসলমানদের বিপদ হ'লে তারা খুশী হয় আর সুখ-সুবিধা বা বিজয় দেখলে মনে খুবই কষ্ট পায়।

www.pathagar.com

৬. আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য ও ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী লোকেরা—

আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে বলে দিয়েছেন ঃ

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ -
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ - يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا
يُبْدُونَ لَكَ - يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا -

আর একটি দল যাদের নিকট একমাত্র গুরুত্ব ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থের। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব জাহিলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা ছিল সত্যের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। তারা এখন বলে এই কাজ পরিচালনায় আমাদেরও কি কোন অংশ আছে? তাদের বলে দাও, (না, কারুরই কোন অংশ নেই) এই কাজের সমস্ত ইখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ। আসলে ওরা মনে এমনভাব লুকিয়ে রেখেছে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করছে না। তাদের আসল বক্তব্য হচ্ছে, কর্তৃত্বের যদি তাদেরও কোন ইখতিয়ার থাকত, তা'হলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৪

আসলে ওরা মন-মানসিকতার দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। আর এই কারণে ওরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সব সময়ই খারাপ ধারণা মনে পোষণ করে। আল্লাহ্ যে তাঁর নবীকে অবশ্যই সাহায্য করবেন, একথায় ওরা দৃঢ় প্রত্যয়শীল নয়। ওরা বলে, পলিসি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে থাকলে মুশরিকদের আমরা কখনই সুযোগ দিতাম না আমাদের হত্যা করার। আর আসলে আমরা যুদ্ধের ক্ষেত্রেই বের হতাম না। ওরা আমাদের নাগালই পেত না। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব ওদের হাতে নয়, আল্লাহ্‌র হাতে।

www.pathagar.com

এই কারণে আল্লাহ্ কাফিরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের ঘটনা ঘটিয়ে তার দ্বারা তিনি ওদের মনের প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ ঘটান। ওদের মনে যে আল্লাহ্-রসূল-মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা রয়েছে তা এসব ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়ে দেন। ওরা জগতের নিকট ধরা পড়ে যায়।

৭. সংশয়বাদী ও সন্দেহ পোষণকারী লোকেরা—

আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ -

প্রকৃতপক্ষেই যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়, যাদের মনে সন্দেহ প্রবল এবং সন্দেহের মধ্যেই আকুলি-বিকুলি খাচ্ছে, হে নবী কেবল সেই লোকেরাই জিহাদে যোগদানের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইবে। —সূরা তাওবা ঃ ৪৫

৮. পিছনে ফেলে যাওয়া লোকগুলো—

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا

أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ - قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا - لَوْ كَانُوا

يَفْقَهُونَ ٥

যাদের পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা রসূলুল্লা-হ্‌র সঙ্গে যেতে বাধ্য না হওয়া ও ঘরে বসে থাকবার সুযোগ পেয়ে

www.pathagar.com

খুবই উল্লসিত বোধ করছে। তারা আসলে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ নিয়োগ করে জিহাদ করাকেই অপছন্দ করেছে। তারা লোকদের বলেছে, এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না। তাদের বল, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও অনেক তীব্র গরম। হায়! ওদের যদি একটুও বোধোদয় হ'ত। —সূরা তাওবা ঃ ৮১

ওরা আগেই মনে মনে বাইরে জিহাদে না যাওয়ার সংকল্প করে রসূলের নিকট থেকে কোন মতে অনুমতি গ্রহণ করেছিল। কেননা ওরা ধরেই নিয়েছিল যে, জিহাদে গিয়ে তাদের কোন লাভ হবার নয়। আসলে ওরা জিহাদের গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারেনি, জিহাদে ধন-প্রাণ কুরবানী করার কোন মূল্য বা মর্যাদাও ওরা বুঝে না। সেজন্য ঘরে বসে থাকাকেই তারা অগ্রাধিকার দিয়েছিল। এরূপ অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহী লোকদের দিয়ে জিহাদের ময়দানে কোন কাজই হতে পারে না। এমন লোক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বরং অনেক বড় ঝুঁকির কারণ। তাই রসূল করীম (স.) ওদের ঘরে থেকে যাওয়ারই অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জিহাদ থেকে কৌশল করে বিরত থাকা ঈমানের পক্ষে কতখানি মারাত্মক এবং মুসলিম হিসাবে কতখানি লজ্জার বিষয়, তা অনুধাবন করার জন্য যে বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা-ই ওদের নেই। ফলে এর পরিণতি বুঝতেও ওরা সম্পূর্ণ অসমর্থ।

৯. নিষেধকারী ও বাধাদানকারী লোকগুলো—

আল্লাহ্‌ এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ
هَلُمَّ اِلَيْنَا - وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ٥

আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যের সেই লোকগুলোকে খুব ভালো করেই জানেন, যারা (জিহাদের কাজে) প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ওরা নিজেদের ভাইদের ডেকে বলে ঃ তোমরা আমাদের নিকট আস। ওরা কখনই যুদ্ধে আসে না, আসলেও খুবই সামান্য, নগন্য।

—সূরা আহযাব ঃ ১৮

www.pathagar.com

এই মুনাফিক লোকেরা নিজেরা জিহাদে যেতে প্রস্তুত নয়, অন্যদেরও তা থেকে বিরত রাখতে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করে। সেজন্য দল পাকায়, না যাওয়া লোকদের সাথে অন্যদেরও টেনে আটকে রাখতেও চেষ্টা করে। আর যদি কখনও যেতেই হয়—না যেয়ে কোন উপায় থাকে না, তখন তারা শুধু নামকাওয়াস্তে যুদ্ধ করে, যেন মুসলমানরা বলতে না পারে যে, তোমরা জিহাদে গেলে না? অতঃপর গনীমতের মাল বন্টনের সময় উপস্থিত হ'লে তারা সর্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের বড় মুজাহিদ হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

১০. লোকদের মনে ভয় ও আতংক সৃষ্টিকারী লোকেরা—

আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ـ

যেসব লোক মদীনায় ভয়াবহ ও আতংক সৃষ্টিকারী গুজবসমূহ রটায়, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা তোমাকে অবশ্যই প্রস্তুত করে দাঁড় করিয়ে দেব। অতঃপর তোমার প্রতিবেশী হয়ে ওদের বাস করাই কঠিন হয়ে যাবে। —সূরা আহযাব ঃ ৬০

বস্তুত এই শ্রেণীর লোক শান্তি-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। সেই কারণে সব সমাজ ও রাষ্ট্রই এই চরিত্রের লোকদের প্রতিরোধ করায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। ইসলামী সমাজেও এই হীন চরিত্রের লোকদের দমনের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তা আর বিচিত্র কি! ওরা শুধু মিথ্যাবাদীই নয়, সাধারণ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলার মারাত্মক দুশমনও।

১১. মুনাফিক লোকেরা—

আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

www.pathagar.com

مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের দিলে রোগ রয়েছে তারা সুস্পষ্ট করে বলতে শুরু করেছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের নিকট যে ওয়াদা করেছিল, তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। —সূরা আহযাব ঃ ১২

আল্লাহ মুসলমাদের সাহায্য দিবেন শেষ পর্যন্ত জয় তাদেরই হবে, রসূলে করীম (স.)-এর এই সুসংবাদকে মুনাফিকরা—আর যাদের দিলে রোগ রয়েছে তারা ধোঁকা বলে প্রচারণা করতে শুরু করছিল। অপর কিছু লোক মদীনাবাসীদের লক্ষ্য করে বলতে শুরু করেছিল যে, খন্দকের নিকটে দাঁড়িয়ে আর কি হবে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে কুলানো যাবে না—অতএব শহরের দিকে ফিরে চল। অপর কিছু লোক এসে রসূলে করীম (স.)-কে বলতে লাগলো, আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কাজেই ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আসলে এ সবই ছিল যুদ্ধ থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বাহানা মাত্র এবং এইরূপ বাহানা কেবল মুনাফিকরাই করতে পারে। করতে পারে এবং করেও থাকে কেবল তারা-ই যাদের হৃদয়-মন রোগাক্রান্ত, ইসলামকে বিজয়ী নয় পরাজিত এবং মুসলমানদের বিপদগ্রস্ত ও পর্যুদস্ত দেখতেই ওরা আগ্রহী। তাই জিহাদের ময়দানে গিয়েও সেখানে থেকে নানা বাহানার আশ্রয় নিয়ে সরে আসতে চেষ্টা করছিল। ওরা মনে করেছিল, তাদের এই মুনাফিকীর কথা রসূল (স.) নিজে এবং মুসলমানগণ আদৌ অনুধাবন করতে পারবেন না। কিন্তু তাদের চালচলন দেখে যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে তাদের মুনাফিকী ধরে ফেলতে পেরেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়ে দেয়া না হবে, তখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা ও তাদের মুনাফিক নামে অভিহিত করা সম্ভব ছিল না। তাই আল্লাহ্‌র এই আয়াত ওদের মুখোশ খুলে ওদের প্রকাশ্যে ধরিয়ে দিল, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেললো।

বস্তুত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদাতে কোনরূপ ফাঁক বা ফাঁকি নেই। আল্লাহ্‌র সাহায্য আসতে কখনও বিলম্ব হলে মনে করতে হবে, এই মুনাফিকদের মুনাফিকী-ই তার প্রধান কারণ। আল্লাহ্‌র সাহায্য

www.pathagar.com

পর্যায়ে এই কথা চূড়ান্ত। আল্লাহ্‌র সাহায্য দানের ওয়াদা যেমন চিরন্তন সে সাহায্য পাওয়ায় বিলম্ব কিংবা একেবারেই না-আসার মূলে মুনাফিকীরই প্রধান কারণ হওয়ার কথাও শাশ্বত। স্থান, কাল বা ব্যক্তি'র তারতম্যে এতে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যাবে না। এই কথা যেমন আল্লাহ্‌র রসূলের সময় সত্য ছিল, আজও এই কথা সত্য—তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।

## আল্লাহ্‌র সাহায্যের বিশেষ কারণসমূহ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইসলামী জিহাদের প্রথম পর্যায়ে মদীনীয় সমাজে বিভিন্ন মন-মেযাজ-চরিত্রের মুনাফিকের সমাবেশ ঘটেছিল এবং তাদের কারণে ইসলামী জিহাদ কোন কোন সময় কঠিন অসুবিধার মধ্যেও পড়ে গেছে। অন্তত তারা অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী জিহাদ কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি বরং ইসলামী বাহিনী চতুর্দিকে অভিযান চালিয়ে যে বিজয় প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়েছিল এবং তার পিছনে কি কারণসমূহ বর্তমান ছিল? এইরূপ প্রশ্ন দুনিয়ার মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে। বিশেষ করে সেই সময়কার দুনিয়ার দুইটি প্রধান রাষ্ট্র রোমান সাম্রাজ্য ও ফারেসী সাম্রাজ্যকে চূর্ণ করে দিয়ে ইসলামী বিজয়ের বৈজয়ন্তী উর্ধ্বে উড্ডীন করা ইতিহাসের সর্বাধিক বিস্ময় সৃষ্টিকারী ঘটনাবলীর অন্যতম, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই।

অতঃপর আমরা এই পর্যায়ে কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করতে চাই। ইতিহাস সাক্ষী, মদীনাকে কেন্দ্র ক'রে যে ইসলামী শক্তি'র অভ্যুদয় ঘটেছিল, যার ভয়ে তদানীন্তন পৃথিবীর জাহিলিয়তের তমসাচ্ছন্ন প্রাচীর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল এবং যার আঘাতে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সমগ্র সভ্য জগতকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, সে শক্তি রস গ্রহণ করেছিল, চারটি মৌল আদর্শিক উৎস থেকে ঃ

প্রথম ঃ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও পরিপূর্ণ নিখাদ একাত্মতা

দ্বিতীয় ঃ যুদ্ধ সংগ্রামে নির্ভেজাল মানবিকতা,

www.pathagar.com

তৃতীয়ঃ মহান বৃহৎ নেতৃত্ব ও পবিত্র আচরণ এবং

চতুর্থ ঃ এক আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান ও অবিচল প্রত্যয়।

বস্তুত ইসলামী জিহাদে বিজয়ের সূচনা করেছে ও মহাসাফল্য এনে দিয়েছে প্রধানত এই চারটি মৌল আদর্শ। যুদ্ধের মোড় মুসলমানদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেয়ার মূলে আরও কিছু আনুষংগিক কারণের অবদানও অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু সে সবের তুলনায় এই চারটিই হচ্ছে প্রধান। এক-এক করে এই চারটির বিশ্লেষণ করা হলেই আমাদের এই কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যাবে।

## আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও একাত্মতা

মদীনাকেন্দ্রিক ইসলামী সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমগ্র ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ একাত্মতা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। এ ঐক্য ও একাত্মতা সকল পর্যায়ে, সকল দিকে ও বিভাগে এবং সর্বকাজে। আর যে জনগোষ্ঠী আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে নিরাপত্তাপূর্ণ, নিশ্চিন্ত ও অভাব-অনটন মুক্ত হবে, যার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষই বিপদকালে ঐক্যবদ্ধ যে জনগোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে পারস্পরিক দয়া-সহানুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, বন্ধুতা যে জনগাষ্ঠী সংস্কৃতি ধন্য—নিজের কে শত্রু আর কে মিত্র তা গভীরভাবে জানে ও চিনে, যুদ্ধ সংগ্রামে যে জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি নর-নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, সামষ্টিক দায় দায়িত্ব পালনে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ, সে জনগোষ্ঠীর বিজয় ও অগ্রগতি দুনিয়ার কোন শক্তিই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে বিধ্বস্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ, দ্বন্দ্ব-বিক্ষত, হিংসা-দ্বেষ, কাড়াকাড়ি ও মারামারিতে চরমভাবে বিপর্যস্ত, ক্ষয়িষ্ণু, শান্তি-শৃঙখলা বঞ্চিত, অভাব ও প্রয়োজন পূরণ ব্যবস্থাহীনতার দরুন দারিদ্র্য জর্জরিত, তা হতভাগ্য, শাস্তিপ্রাপ্ত যে জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনি কোনদিন, যে জনগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরকে ভক্ষণ করে, একে অপরকে অত্যাচারে-নিপীড়নে জর্জরিত করে, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাতে সিদ্ধহস্ত, পরস্পর শত্রুতা-ভাবাপন্ন সাপ-বেজির ন্যায়, শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা-গিরি বা স্বার্থ উদ্ধারের কাজে সর্বদা নিমগ্ন, তার পক্ষে বিজয়ী জাতি হওয়ার সৌভাগ্য কোন দিনই সম্ভব হতে পারে না।

www.pathagar.com

যুদ্ধ কর্মে আত্মনিয়োগকারী সেনানী কার্যত অগ্নিকুণ্ডলির গহ্বর মুখে দাঁড়ানো ব্যক্তি। সে যদি তখন তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, তার বংশ ও গোত্রের, প্রতিবেশী ও জাতির জনগণের দিক দিয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হতে পারে, তা হলে সে উন্নত মানের মনোবল ও সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে, পারে তার দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বাধিক মূল্য দিতে, ত্যাগ স্বীকার করতে এবং প্রয়োজন হলে নিজের জীবনটাকেও অকাতরে উৎসর্গ করে দিতে। সে তখন যুদ্ধ করবে নিজের ঈমান-আকীদার তাকীদে, স্বীয় ঈমান আকীদা, দীন ও মান মর্যাদার স্বার্থে।

কিন্তু সে যদি অনুভব করে যে, তার দেশ তাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিচ্ছে না, তার জনগণ তার ত্যাগ-তিতিক্ষাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে এবং সে তা পরিবেশের মধ্যে যেন একজন বিদেশী, অপরিচিত, আপনত্ব বঞ্চিত, তা'হলে তার হাতে নিশ্চয়ই বন্দুক চলবে না, চললেও তা কখনই লক্ষ্যই ভেদ করতে পারবে না, সুযোগ ও ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলবে। সে হবে নেতৃত্বের অবাধ্য, বিদ্রোহী। সে তখন শত্রু পক্ষের যোগ-সাজশের শিকার হয়ে পড়বে, নিজের দেশের শত্রুতে পরিণত হবে।

বস্তুত যোদ্ধা সামরিক শক্তির নিরাপত্তা ও কার্যকরতার বেশীর নির্ভর করে যে দেশের পক্ষে তাকে লড়াই করতে হচ্ছে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ পরম শান্তি-শৃঙ্খলা, অভাবমুক্ততা, ঐক্য ও একাগ্রতার উপর। যেখানে তা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে, যুদ্ধ জয় কেবল সেখানকার যোদ্ধাদের পক্ষেই সম্ভব।

এপর্যন্ত বলা নীতিকথা মুসলমানদের অভ্যুদয়কালীন অবস্থার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য সম্পন্ন।

তদানীন্তন দুনিয়ার বৃহৎ ও সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল দুটি ঃ রোম্যান ও পারসিক, ইসলাম ও মুসলিম শক্তির আসল বৈরীতা ও সংঘর্ষ ছিল এই দু'টি শক্তির সাথে। মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়কালে এই দু'টি রাষ্ট্র ছিল পারস্পরিক কঠিন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত। মুসলিম শক্তির পক্ষে এই দু'টি পরাশক্তির সাথে যুদ্ধ করাটা একটা পরম বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার। সংঘর্ষের সূচনায় মুসলিম শক্তি আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে এক কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন ছিল। বিশেষ করে রসূলে করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর নবীন ইসলামী রাষ্ট্র একটি আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কিছু

www.pathagar.com

সংখ্যক লোক ও গোত্র ব্যবসায়িকদের ইসলাম ত্যাগকারী (মুরতাদ) হয়ে দাঁড়ায়। কতিপয় গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। কিন্তু এ সময় মুসলিম নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ), যিনি ঈমানী বলে সর্বাধিক বলীয়ান ব্যক্তিত্বে ও সংকল্পের দৃঢ়তায় পর্বত-সমান। সত্য ও নিষ্ঠায়—আন্তরিকতায় সমুদ্রের মত বিশাল। তিনি প্রবল প্রতিকূল ঝঞ্ঝার মুখে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলেন। অনতিবিলম্বে বিপর্যয় রোধ করে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরম শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। মুসলিম জনগণের মধ্যে গভীর, ব্যাপক ঐক্য ও একাত্মতার সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয় এবং একটি কল্যাণমুখী ও পুণ্যকামী জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। এই সময় পর্যন্ত মুসলিম শক্তি রোমান ও পারসিক শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রার শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠে। সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চলে এই শক্তির সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে মুসলিম শক্তির পক্ষে সর্বাত্মক বিজয় লাভ সম্ভব হয়।

এহল মুসলিম শক্তির দিক। আর শত্রু পক্ষের অবস্থা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সিরিয়া, ইরাক ও মিসর ছিল ছিন্নভিন্ন, পারস্পরিক কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগই ছিল না। এ সব কয়টি দেশে শাসকরা একদিকে, জনগণ সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে। শাসকরা তাদের কার্যকলাপে চরম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল আর শাসিতরা তাদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

সিরিয়ার য়াহূদীরা ছিল রোমানদের চির বিরোধী। য়াহূদীরা রোমান-দের উপর দিয়ে চরম প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট ছিল। সেজন্য তাদের ধনমাল ব্যয় করতেও কিছুমাত্র কুন্ঠিত ছিল না। তবে তাদের নিজেদের অর্থলোভ ছিল জীবনে বেঁচে থাকার চাইতেও অনেক তীব্র। সিরিয়ার এই য়াহূদীরা ছিল আরবদের সমর্থক। ওরা শহর নগরের, গোপন তথ্য আরবদের নিকট ফাঁস করে দিত, অজানা পথের সন্ধান জানিয়ে দিত। কায়সারীয়া দখলের ব্যাপারে তারা তাই করেছিল। মুসলিম শক্তি প্রায় সাতটি বছর পর্যন্ত এই শহরটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ নামক এক য়াহূদী মুসলিম শক্তির



www.pathagar.com

সেনাপতির নিকট উপস্থিত হয়ে শহর দখলের উপায় বলে দেয় এই শর্তে যে, তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মুক্তি দেয়া হবে এবং সেই সাথে কিছু অর্থ-সম্পদও দেয়া হবে। পরে মুসলিম শক্তি নগরটিকে জয় করতে সমর্থ হন।

এই সময় মিসরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। মিসরের প্রাচীন অধিবাসী কিবতীরা বহিঃশক্তি'র সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছিল এই আশায় যে, যে কোন উপায়ে তাদের শাসক শক্তি'র অমানবিক অত্যাচার ও আইন বিধান থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে। তারা মুসলমানদের উন্নত মানবিক আদর্শ, ন্যায়বাদী আচার-আচরণ এবং ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। তারা এও জানতে পেরেছিল যে, ইসলাম ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সুবিচারের আহবান জানায়। কল্যাণ ও জীবনের উৎকর্ষের পক্ষপাতী। জুলুম, বিপর্যয়, অশান্তি, শোষণ, বঞ্চনা, স্বৈরতন্ত্র ও সীমালংঘনের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ ক্ষমাহীন। তারা মনে-প্রাণে এই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা এই বিশ্বাস মনে স্থান দিয়েছিল দৃঢ়ভাবে যে, রোমানদের অত্যাচার, জুলুম, শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে তারা ইসলামের ধারক ও বাহক শক্তি'র হাতেই নিষ্কৃতি পেতে পারবে। ফলে মুসলিম শক্তি যখন মিসরের সীমান্তে উপনীত হ'ল, মিসরের আভ্যন্তরীণ ফাটল ও কোন্দল তাদের জন্য বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিল। বস্তুত ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে ফারেস ও রোমান শক্তি'র বিরুদ্ধে এমনিভাবেই বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছিল। মুসলিম শক্তি আল্লাহদ্রোহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি'র অবসান ঘোষণা করলো। তার পরিবর্তে ইসলামের সুবিচার পূর্ণ মানবতাবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলো। জনগণের মধ্যে প্রশান্তি, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সুমধুর প্রবাহ বইতে লাগলো।

## নির্ভেজাল মানবতাবাদী যুদ্ধনীতি

'ইসলামে শান্তি' পর্যায়ের আলোচনায় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, ইসলামের যুদ্ধনীতি মূলত শান্তি ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা। ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতি চূড়ান্ত মাত্রার কল্যাণকামী। ইসলাম প্রকৃতই এক দয়া ও মানবিকতার বিধান। এই কারণে ইসলামের যুদ্ধ-সংগ্রামও নির্ভেজাল মানবিকতাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত করা হয়। ইসলাম কোন-

www.pathagar.com

দিনই এই উন্নত মানবিকতা থেকে একবিন্দু বিচ্যুত হয়নি। এখানে এই আদর্শের রূপ এক-এক করে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

১. জুলুম, যেনা-ব্যভিচার, নিগ্রহ-নিপীড়ন প্রতিরোধ। সীমালংঘন ও আল্লাহদ্রোহীতা দমন। প্রাণ-জীবন-বংশ, ধন-মাল এবং দেশ ও দীনের পূর্ণ সংরক্ষণ। রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ -

যে লোক তার ধন-মালের কারণে নিহত হবে, সে শহীদ। যে লোক তার নিজের রক্তের বিনিময়ে নিহত হবে, সে শহীদ। যে লোক তার দীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে, সে শহীদ, যে তার পরিবার-বর্গ রক্ষার্থে নিহত হবে, সেও শহীদ।

[ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ সাদ ইবনুয্-যুবাইরের সূত্রে ]

হযরত আমর ইবনুল 'আস ( রাঃ ) বলেছেন ঃ আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ أُرِيْدَ مَالُهٗ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ -

তবে ইসলামের শর্ত হচ্ছে সীমালংঘন যতটা, প্রতিরোধ ঠিক সেই মাত্রায় হতে হবে। সীমালংঘনের কোন অনুমতি ইসলাম কাউকেই দেয়নি। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যারা তোমাদের উপর সীমালংঘনমূলক আচরণ করবে, তোমরাও তাদের উপর অতটা মাত্রার সীমালংঘনমূলক আচরণ কর।

—সূরা বাকারা ঃ ১৯৪

www.pathagar.com

২. দীন বা ধর্ম ও বিশ্বাস গ্রহণ পালন ও অনুসরণের স্বাধীনতার পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া সে সব মুসলিমদের জন্য যারা কাফিরদের অত্যাচার নিপীড়নের মুকাবিলা করছে নিজেদের ধর্ম ও বিশ্বাস রক্ষার্থে ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ -

এবং ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর—করতে থাক, যতক্ষণ না ফিত্না—অখোদায়ী বিধান নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন—আনুগত্য, শাসন ও আইন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। —সূরা বাকারা ঃ ১৯৩

৩. নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা কার্যকরকরণ ও সমর্থন দান। এই ব্যাপারে সকলের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য ও একাত্মতা সৃষ্টিই লক্ষ্য। কেননা ইসলাম তো এক সামাজিক সংশোধনমূলক সর্বাত্মক বিপ্লবী আদর্শ। সর্বপ্রকারের উন্নতমানের সত্য, কল্যাণ ও সুবিচার সমন্বিত একক আদর্শ। এ আদর্শের লক্ষ্য সমগ্র মানুষ শ্রেণী, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ও বংশের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রসূলে করীম (সঃ) এই মর্যাদা নিয়েই প্রেরিত হয়েছিলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا -

হে নবী! আমরা আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক করে পাঠিয়েছি। ইসলাম চায়, সর্বসাধারণ মানুষ ইসলামের মৌলিক আদর্শ, রীতি-নীতি ও আইন বিধান পুরোপুরিভাবে জানুক, ইসলামকে নিজেদের পূর্ণাংগ জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করুক। এইরূপ অবস্থায় কেউ যদি ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে কেউ যদি ভয়ের কারণ হয়ে পড়ে, তা'হলে তা অপমৃত করা ইসলামেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সেই প্রতিবন্ধক বা ভীতির কারণ বর্তমান থাকলে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। এই কারণেই ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ٥

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বেঈমান, আল্লাহ্ ও তার রসূলের হারাম করা জিনিসকে হারাম করে না এমন এবং আহ্‌লি কিতাবের মধ্য থেকে সত্য দীনকে দীনরূপে গ্রহণে নারায লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক—যতক্ষণ না তারা পরাজয় স্বীকার করে নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হবে। —সূরা তাওবা ঃ ২৯

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ - اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -

অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধু পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কেননা শয়তানের চাল খুবই অশক্ত ও অস্থায়ী। —সূরা নিসা ঃ ৭৬

এই দৃষ্টিতেই রসূলে করীম (সঃ) ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

www.pathagar.com

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। তা যদি তারা করে তা'হলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মাল রক্ষা করলো। তবে ইসলামের দাবীতে কিছু নিতে হলে তা ভিন্ন কথা আর তার হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট অর্পিত।

৪. চুক্তি ভঙ্গকারীদের শিক্ষাদান। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ○
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ○

ওরা যদি তাদের চুক্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তা করার পর এবং তোমাদের দীনের উপর দোষারোপ করে, তা'হলে এই কুফরীর বড় বড় পাণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর—কেননা আসলে ওদের চুক্তি প্রতিশ্রুতি একেবারেই মূল্যহীন। তা হলে আশা করা যায়, ওরা (এই দুষ্কৃতি থেকে) বিরত হবে। তোমরা কি এমন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা তাদের ওয়াদা চুক্তি ভঙ্গ করেছে ... ... ?

—সূরা তাওবা ঃ ১২-১৩

৫. দুনিয়ার যে কোন দেশের মজলূম মুসলমানদের ফরিয়াদ শুনে তাতে সাড়া দেয়া এবং জালিমদের পাঞ্জা থেকে তাদের উদ্ধার করা। নির্দেশ হয়েছে ঃ

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ -

www.pathagar.com

মজলুম লোকেরা যদি তোমাদের নিকট দীন রক্ষার কাজে সাহায্য চায়, তাহলে সে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য—তবে যে জাতির সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হলে নয়।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছো না কেন... অথচ অবস্থা এই যে, দুর্বলতর পুরুষ, নারী, বালক-বালিকারা ফরিয়াদ করছে ঃ হে আমাদের আল্লাহ্‌ ! আমাদেরকে এই বসতি থেকে বাইরে নিয়ে যাও যার কর্তা-অধিবাসীরা হচ্ছে অত্যাচারী। তুমি আমাদের জন্য তোমার নিকট থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক বন্ধু বানিয়ে পাঠাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্যে একজন বড় সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। —সূরা নিসা ঃ ৭৫

এ এক সাংঘাতিক ধরনের জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা দুনিয়ার সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিশেষ করে দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র ও সার্বভৌম জাতিসমূহের প্রতি। এ জিজ্ঞাসার জওয়াবে সাড়া না দিয়ে পারে না এমন কোন ব্যক্তি যার অন্তরে এক বিন্দু ঈমানও রয়েছে।

৬. শত্রুরা যুদ্ধ বন্ধ করলে তবে যুদ্ধ পরিহার করা চলবে, তার পূর্বে নয়। এটাই আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান।

কুরআনের ঘোষণা ঃ

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ -

www.pathagar.com

ওরা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে ওদের উপর কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তবে জালিমদের বিরুদ্ধে অবশ্যই (শক্ত থাকতে হবে)।
—সূরা বাকারা ঃ ১৯৩

শান্তির একবিন্দু সম্ভাবনা দেখা দিলেই মুসলিমদের বাহু বিস্তার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত করার জন্য চেষ্টার একবিন্দু ত্রুটি করা চলবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু শান্তি ও সন্ধির সব চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলে তখন নিরুপায় হয়েই যুদ্ধ করা যাবে—তার পূর্বে নয়।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ -

ওরা যদি শান্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তোমরা সে প্রস্তাব গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর।
—সূরা আনফাল ঃ ৬১

এমনকি শত্রুপক্ষের শান্তি প্রস্তাবের অন্তরালে কোন কঠিন ষড়যন্ত্র নিহিত আছে বলে আশংকা হলেও সে প্রস্তাবকে তোমরা অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করবে না।

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي

أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ -

শত্রুপক্ষ যদি সন্ধি-প্রস্তাব দিয়ে তোমাকে ধোঁকাও দিতে চায়, (তবু সে প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধা করো না) কেননা তোমার জন্য তো আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে তাঁর নিজের সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা সহায়তা দিয়েছেন।
—সূরা আনফাল ঃ ৬২

৭. যুদ্ধকে যুদ্ধমান বাহিনী ও লোকজন পর্যন্তই সীমিত করে রাখতে হবে। বেসামরিক ও নারী-বৃদ্ধ-বালক-বালিকাদের হত্যা করা চলবে না। ধর্মীয় পুরোহিত পাদ্রীদেরও বাঁচাতে হবে। রসূলে করীম (সঃ) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ -

বালক-বালিকা ও ধর্মীয় উপাসনালয়ের পরিচালকদের হত্যা করবে না। বলেছেন ঃ

لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً -

থুরথুরে বৃদ্ধ, ছোট বয়সের লোক (বেসামরিক) ও নারীদের হত্যা করবে না।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) যখন কোন সেনাবাহিনী কোথায়ও প্রেরণ করতেন, তখন সেনাধ্যক্ষকে নসীহত করতেন আল্লাহ্‌র ভয় মনে সর্বক্ষণ জাগরূক রাখার এবং সংগী মুসলিম যোদ্ধাদের কল্যাণ কামনার জন্য। অতঃপর বললেন ঃ

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ،

اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا -

তোমরা আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ করবে তার বিরুদ্ধে, যে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে। তোমরা যুদ্ধ করবে, বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করবে না। তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকাবাজী করবে না। কোন লাশ বিকৃত করবে না এবং বাচ্চাকে হত্যা করবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) উসামা (রাঃ)-কে বাহিনী প্রেরণের সময় উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে ঃ

لَا تَخُونُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا طِفْلًا وَلَا شَيْخًا

كَبِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا وَلَا تُحَرِّقُوهُ وَلَا تَقْطَعُوا

شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا للاكل -

তোমরা আমানতে খিয়ানত করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ করবে না, লাশ বিকৃত করবে না—বালক, বেশী বৃদ্ধ ও নারীকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না, জ্বালিয়েও দিবে না, ফলদার গাছ কাটবে না, ছাগল, গরু, উট খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া যবেহ করবে না।

৮. ধন-মাল অকারণে বিনষ্ট করা ইসলামী যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—হারাম। মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনু নজীর য়াহূদী গোত্রের বিশ্বাস-ঘাতকতার কারণে তাদের উৎখাত করার নির্দেশ দিয়ে তাদের গাছপালা জ্বালিয়ে দিতে নিষেধ করলেন। সেই সাথে সকল শত্রু দেশেই ধ্বংসাত্মক কাজ করার ব্যাপারেও স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

৯. শত্রুদের ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে মারা সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। আবু সুমামাতা ইবনে আমাল কুরায়শদের সাপ্লাই লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কুরায়শরা না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায় তারা চামড়া সিদ্ধ করে এবং মরা খেতে শুরু করেছিল। এই অবস্থার কথা জানতে পেরে রসূলে করীম (সঃ) সাপ্লাই লাইন উন্মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১০. বন্দীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বন্দীদের খাবার দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার বিপুল সওয়াবের কথা বলা হয়েছে এবং যারা বন্দীদের খাবার দেয় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে :

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا -

এবং তারা আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার খাওয়ায়। সূরা দাহর : ৮

১১. যুদ্ধে দয়া, করুণা প্রদর্শন এবং মানবিকতার আচরণ রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ। অতএব যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুসলমানকে উদার মানবিকতা ও দয়া অনুকম্পার নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য :

www.pathagar.com

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا
أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا -

তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন গর্দান মারা—হত্যা করাই হবে একমাত্র কাজ। এভাবে যখন তোমরা পূর্ণ মাত্রায় হত্যা-কার্য চালিয়ে যাবে (অতঃপর অবশিষ্ট যারা থাকবে তাদের) শক্ত করে বাঁধবে (বন্দী করবে)। তারপর হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের ছেড়ে দিবে, কিংবা ছেড়ে দিবে বিনিময় মূল্য নিয়ে। এই কাজের মাধ্যমেই যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করবে। —সূরা মুহাম্মদ : 8

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, শত্রু পক্ষের উপর যখন মুসলিম শক্তির বিজয় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন হত্যাকার্য সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। তখন শত্রু পক্ষের যাদের পাওয়া যাবে, তাদের হত্যা না করে বন্দী করতে হবে। পরে তাদের মুক্তির কোন-না-কোন পন্থা উদ্ভাবন করে তাদের স্বাধীন করে দিতে হবে। ইসলাম এভাবেই শত্রু পক্ষের সৈন্যদের প্রতি দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শনের পথপ্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ প্রথমে হত্যাকার্যকে বন্দীকরণে পরিবর্তিত করতে হবে এবং পরে তাদের মুক্তি লাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

১২. যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে মুসলিম শক্তির পক্ষ থেকে যুদ্ধের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে হবে। এর মূলে নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুদ্ধকে কোনক্রমেই ধোঁকা ও বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যম বানানো যাবে না। নির্দেশ হয়েছে :

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ -
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ -

www.pathagar.com

তোমরা কোন জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা বোধ করলে সন্ধি চুক্তি তাদের দিকে প্রত্যাহার করে দিয়ে উভয়পক্ষ সমান অবস্থান গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের ভালোবাসেন না—পছন্দ করেন না। —সূরা আনফাল : ৫৮

অর্থাৎ সন্ধি বা অনাক্রমণের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও শত্রু পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রথমে সে সন্ধি বা চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে হবে প্রকাশ্যভাবে। তার পরে যুদ্ধ করতে পারা যাবে। একদিকে অনাক্রমণের সন্ধিও থাকবে, আর তা থাকা অবস্থায়ই গোপনে যুদ্ধ শুরু করা হবে, তা ইসলামে চলতে পারে না। কেননা তাতে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ হয়। আর বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যুদ্ধের সূচনা হওয়ার পূর্বে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে শত্রুতার অপনোদন করাই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ যদি শেষ পর্যন্ত অপরিহার্যই হয়ে পড়ে তা' হলে তা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েই করতে হবে, গোপনে ও অতর্কিতে অজ্ঞাতসারে করা যাবে না।

১৩. যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় ক্ষেত্রেই সকল প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। শত্রু পক্ষের সাথে যত প্রকারের চুক্তি-প্রতিশ্রুতিই হোক না কেন, তা পুরোপুরি-ভাবে রক্ষা করার জন্য ইসলামে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এমন কি অপর পক্ষ এককভাবে সে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করলেও মুসলমানদের পক্ষে সে কাজের কোন অনুমতিই ইসলাম দেয়নি। এ পর্যায়ে কুরআনে কঠোর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে স্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে :

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ـ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ

তোমরা যখন পরস্পর কোন ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হও, (তখন তা মূলত আল্লাহ্‌র সংগে করা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি হয়ে যায়)

www.pathagar.com

অতএব তোমরা তা অবশ্যই পূরণ করবে। কিড়া-কসমগুলো খুব শক্ত করে করার পর তোমরা তা কিছুতেই ভঙ্গ করবে না। কেননা এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কেই দায়িত্বশীল বানিয়েছো।... তোমরা কি কর, তা আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন। —সূরা নাহল ঃ ৯১

কুরআনে এই কাজকে সেই মেয়ে লোকটির সাথে তুলনা করা হয়েছে —যে নিজ হস্তে সূতা কাটে, আবার নিজেই কেটেকুটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়।

ওয়াদা পূরণ করাকে মু'মিনদের অবিচ্ছিন্ন গুণ বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ـ

তারা যখন পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়, তাতে তারা তা পূরণকারী হয় (পরম পুণ্যশীলতার প্রমাণ করে)।—সূরা বাকারা ঃ ১৭৭

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا
وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

কিন্তু তোমরা যে সব মুশরিকের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, পরে তারা সে চুক্তি একবিন্দু ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতাও করেনি, তাদের সাথে করা এ চুক্তিকে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণভাবে রক্ষা করে যাও। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন। —সূরা তাওবা ঃ ৪

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ـ

www.pathagar.com

এবং ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবে। কেননা ওয়াদা পূরণ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। —সূরা ইসরা : ৩৪

রসূল করীম (সঃ) বলেছেন :

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا - أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ

شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপর যে জুলুম করবে, কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করবে, অথবা তার সামর্থের ঊর্ধ্বে কোন বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে বা তার সন্তুষ্টি ব্যতীতই তার কোন জিনিস নিয়ে নিবে, কিয়ামতের দিন আমিই হব তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারী ও ফরিয়াদী।

১৪. কুরআন ঘোষণা করেছে, সব মুসলমান এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিমকেই ইসলামের সৈনিক হতে হবে। এ ব্যাপারে বড়-ছোট ও নারী-পুরুষে কোনরূপ তারতম্য করা হয়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যেককেই প্রয়োজনকালে অস্ত্রধারণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র এই দীনের দাওয়াত প্রচারে ও এই দীনের ভিত্তিতে বিপ্লব সাধনে সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তবে সম্মুখ সমরকালে রোগাক্রান্ত, বয়োঃবৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক কিংবা অর্থব্যয়ে অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য ব্যতিক্রম স্বীকার করা হয়েছে।

১৫. বিজয়-গৌরবে মত্ত হতে, শক্তির অকারণ প্রদর্শনী করতে এবং শুধু লোক দেখানো কাজে প্রবৃত্ত হতেও ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

যে সব লোক তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অহংকারপূর্ণ দর্প নিয়েও লোক দেখানো জাঁকজমক নিয়ে বের হয়েছে, তোমরা হে মুসলমান তাদের মত হবে না কখনই। —সূরা আনফাল : ৪৭

১৫. বিজয় লাভের পর সুবিচার ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে কুরআনের এ আয়াতটিতে :

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

আল্লাহ্‌র প্রকৃত সাহায্যকারী তারা, যাদের আমরা ক্ষমতাসীন করে দিলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় বন্টনের ব্যবস্থা করবে এবং ন্যায়ের বিধান কার্যকর করবে ও অন্যায়, পাপ, বন্ধ করবে। —সূরা হজ্জ ঃ ৪১

১৬. ইসলামে যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এজন্য নয় যে, জনগণকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কেননা ইসলামী দাওয়াত কোন জোর প্রয়োগকে সমর্থন করে না। তা প্রচার, আহবান-আমন্ত্রণ, চিন্তা-বিবেচনা, যুক্তি বিশ্লেষণ ও সদুপদেশ সমন্বিত কাজ। এই কাজে কোনরূপ জোর-জবরদস্তির আশ্রয়-প্রশ্রয় ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৭. ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য নয় গনীমতের ধন-মাল লুন্ঠন। এজন্য কঠোরতা অবলম্বন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে অস্ত্র প্রয়োগ বা যুদ্ধ করাকেও সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোন লোক শান্তির প্রস্তাব দিলে বা আত্মসমর্পণ করলেও তাকে হত্যা করাকে নিতান্তই অযৌক্তিক বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ -

www.pathagar.com

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন সব বিষয়ে সঠিকরূপে জেনে নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যে লোক তোমাদের প্রতি 'সালাম' (শান্তি নিরাপত্তা লাভ) করতে চাইবে তাকে তোমরা বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। এই লক্ষ্যে যে, তাকে হত্যা করে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইবে। আল্লাহ্‌র নিকট তো বিপুল গনীমতের মাল রয়েছে।

—সূরা নিসা : ৯৪

বস্তুত রসূলে করীম (সঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ পাওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, পরকালে সে কোন শুভ প্রতিফলই পাবে না।

ইসলামের ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কোন মুসলমানই শুধু বৈষয়িক স্বার্থ বা গনীমতের সম্পদ লাভের লক্ষ্যে জিহাদ করেনি। আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই চিরকাল ছিল ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য এবং জিহাদকারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮. ইসলাম বিজিত দেশে অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে 'জিযিয়া' গ্রহণের বিধান বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত করেছে। তারও মূলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং সেই দেশের ভৌগোলিক সীমান্ত রক্ষায় সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা। বিশেষত সে দেশের উপর আক্রমণ হলে তার প্রতিরক্ষা যুদ্ধে মুসলমান সৈনিকদের সাথে শামিল হওয়ার দায়িত্ব থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হয় বলে। কিন্তু তারা যদি বিশ্বস্ত নাগরিক হয়ে সে দেশের প্রতিরক্ষায় একনিষ্ঠভাবে শামিল হয়ে যায় তা'হলে জিযিয়ার বাধ্য-বাধকতা প্রত্যাহৃত হবে। তখন তারাই সে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

১৯. মুসলমানদের দু'টি বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতেও নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করবে—আর এক মুসলমানের রক্তপাত করবে, ইসলাম তা আদৌ বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়। এমন কি কোন মুসলিম ভুলক্রমেও যদি অপর মুসলিমকে হত্যা করে, তা'হলে তাকে তার কাফ্‌ফারা দিতে হবে এবং দিয়েত দিতে হবে নিহতদের উত্তরাধিকারীদের হাতে। আর ইচ্ছামূলকভাবে কোন মুসলিমের অপর মুসলিমকে হত্যা করা অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষমার অযোগ্য

www.pathagar.com

অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। তার শাস্তি হচ্ছে কাফিরের ন্যায় চিরন্তন জাহান্নামের আযাব ভোগ করা।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -

> যে মু'মিন লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম—চিরদিন সেখানে থাকবে। আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট, তাকে অভিশাপ দিবেন এবং তার জন্য মহাকঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। —সূরা নিসা : ৯৩

দুই মুসলিম শক্তির মধ্যে দুর্বোধ্যভাবে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে, ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী তাকে জিহাদ বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় অনতি-বিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা ও তাদের মধ্যে অস্ত্র সংবরণ ও সন্ধি-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে সমস্ত মুসলমানদেরকে। কেননা তারা তো আসলে ভাই ভাই। তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত তো দূরের কথা, কোন বিবাদ বা ঝগড়া-ঝাটি হওয়াও বিধেয় ও বাঞ্ছনীয় নয়। বলা হয়েছে :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا -
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

> মু'মিনদের দুটি বাহিনী যদি পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অবিলম্বে সন্ধি প্রতিষ্ঠা কর। অতঃপর এক পক্ষ



www.pathagar.com

অন্য পক্ষের উপর সীমালংঘনমূলক কাজ করলে সেই সীমালংঘনকারীর বিরুদ্ধে তোমরা সকলে মিলে যুদ্ধ কর—যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র বিধানের নিকট নতি স্বীকার করে। যদি নতি স্বীকার করে তা হলে অতঃপর আবার তাদের মধ্যে নতুন করে ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত কর। এই গোটা ব্যাপারে—হে মুসলিম জনগণ—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে তোমাদের। কেননা আল্লাহ্ নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন। —সূরা হুজুরাত ঃ ৯

কেননা নির্বিশেষে সব মুসলিমই পরস্পরের ভাই। আর ভাইয়ে ভাইয়ে কোন যুদ্ধ হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অবিলম্বে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ্র রহমত বর্ধিত হওয়ার ব্যবস্থা করা সকলেরই দায়িত্ব।

**বীরত্ব সমন্বিত নেতৃত্ব**

ইসলামী সেনাবাহীনির নেতৃত্বে চিরকাল এমন সব মহান ব্যক্তি আসীন ছিলেন, যাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শক্ত, দুর্জয় ও অসাধারণ বীর সাহসী। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যেসব গুণ একান্ত জরুরী, তা তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা বিশেষ বিশিষ্টতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধ কৌশল, ক্ষেত্র ও স্থান নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধ পরিকল্পনা ও রূপরেখা গ্রহণে তাঁরা ছিলেন তুলনাহীন সিদ্ধহস্ত। আর সফল সেনাপতির পরিচালনায় সৈন্যবাহিনী অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবে, তা-ই তো স্বাভাবিক। বিশেষ করে এজন্য যে, সাধারণ সৈন্যদের উপর সেনাধ্যক্ষের ব্যক্তিত্বের ও গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে থাকে। তারা প্রতি মুহূর্ত ও প্রতিটি ব্যাপারেই সেনাধ্যক্ষকে অনুসরণ এবং অনুকরণ করে থাকে। তারা তাকেই আদর্শ নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের আদর্শ উভয়ই মনে করে। সেনাধ্যক্ষ যখন অগ্রসর হয়, তারাও অগ্রসর হয়। তিনি ক্ষান্ত হতে বললে বা নিজে ক্ষান্ত হলে তারাও ক্ষান্ত হয়ে যায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত সেনাধ্যক্ষের ইচ্ছা-বাসনা বা নির্দেশে প্রাণ-জীবন দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

হযরত খালিদ (রাঃ) একজন আদর্শ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর নাম শুনলেই ইসলামের দুশমনদের মনে ও দেহে রীতিমত কম্পন ও শিহরণ শুরু হয়ে যেত। হযরত আমর ইবনুল 'আসও তাঁর তুলনায় কোন দিক দিয়ে কম নন। হযরত খালিদ (রাঃ)-কে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

প্রেরণের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন খালিদের নাম শুনেই রোমানরা শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে যাবে।[১]

বস্তুত এরা দু'জন তাঁদের তরবারির দ্বারাই বিজয় লাভ করতেন, শুধু নিজেদের নামে শত্রু পক্ষকে কাঁপিয়ে দিতেন—পরাজিত করতেন।

ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সুবিন্যস্তভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথম কাতারের তুলনায় দ্বিতীয় কাতারের নেতৃত্ব বড় একটা ন্যূন ছিল না। সাহস, শক্তি, দক্ষতা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা প্রভৃতি নেতৃত্ব সুলভ গুণাবলীর দিক দিয়ে ইসলামী যুদ্ধের ইতিহাসে যারা বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন খালিদ ইবনুল অলীদ, আলী ইবনে আবু তালিব, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্, সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস, হাম্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, খালিদ ইবনে সায়ীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান প্রমুখ। এদের ও এদের মত আরও অনেকের প্রতিভাই ইসলামী শক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব বিজয় লাভের মূলে অতি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলা বাহুল্য, একটি আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের বিজয় সাধনে এসব অসম সাহসী ব্যক্তিদের ন্যায় প্রচণ্ড নেতৃত্বের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। তাই হযরত হামযা ও হযরত উমর (রাঃ) যে দিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, সেদিন নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন ঃ

> আজকের দিনে হামযা ও উমরের দরুন ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

হযরত খালিদ (রাঃ) পারস্য অভিযানে অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পাঠালে হযরত আবু বকর (রাঃ) কা'কা' ইবনে আমর আত্ তামীমীকে পাঠালেন। তাতে লোকদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন ঃ

لَا يُهْزَمُ جَيْشٌ فِيْهِ مِثْلُ الْقَعْقَاعِ -

---

১. حضرت ابو بکر رض از محمد حسین ہیکل اردو
এই গ্রন্থে খালিদ এবং আমর ইব্‌নে 'আস্-এর বীরত্ব কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্নিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কা'কা'র মত লোক যে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, তার পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১]

অনুরূপভাবে হযরত খালিদের মত একজন বীর সেনাধ্যক্ষের ইসলামের বিজয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই যে দিন তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন, সেদিন রসূলে করীম (সঃ) খুব বেশী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

তুলনামূলকভাবে জনশক্তির ও অস্ত্রশক্তির দিক দিয়ে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শক্তির বিশ্ব বিজয়ী ভূমিকার অন্তরালে এসব ঐতিহাসিক বীর সন্তানদের অবদান কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও প্রকৃত ব্যাপার অন্য।

আমরা জানি, ইসলামের ভূমিকা হচ্ছে আল্লাহ্, রসূল, পরকাল ও আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং মানুষের গোলামির শৃংখল চূর্ণ করে আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার, দুনিয়ার সংকীর্ণতার পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে দীনের উদার বিশাল ক্ষেত্রে উত্তরণ এবং মনগড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম পরিহার করে সত্য সনাতন নির্ভুল দীনকে পূর্ণাংগ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ।

এ থেকে বলা যায়, ইসলাম নিষ্প্রাণ-নির্বীর্য মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের সূচনা করেছে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আসলে কাঁচা-মালের স্তূপ বিশেষ। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাতে ঈমান ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব একত্বের প্রতি অকৃত্রিম দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে দিয়েছে। নবতর প্রাণের উদ্বোধন হয়েছে তাতে। তাতে নিহিত স্বভাবগত শক্তি সামর্থ্য নতুন করে জেগে উঠেছে। অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় ভাবধারা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে, যেন অগ্নিস্ফুলিংগ-সমূহ হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছে, আলো প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। দীন-ইসলাম সমগ্র জগতের উপর তার আলো ও চাকচিক্য সজীবতার চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি তার জীবন লক্ষ্যের ব্যাপারে তীব্র সচেতন হয়ে উঠে। সমগ্র বিশ্ব ঈমানদার লোকদের বিস্ময়কর কীর্তি-কলাপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। তাঁদের কর্মক্ষেত্র জীবনের বিশেষ একটি দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলো না, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে—দিকে ও বিভাগে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্থান ও কাল যেন এদ্দিন শূন্য হয়ে পড়েছিল এবং এরূপ কর্মচাঞ্চল্যের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

---

১. سیرت ابو بکر رض از محمد حسین ہیکل اردو

www.pathagar.com

এ ঈমানদার ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পূর্বে ছিল নিষ্প্রাণ-নিষ্পন্দ প্রস্তর। ঈমানের প্রচণ্ডতায় তা সহসাই যেন ক্রমবৃদ্ধিমান উদ্ভিদে পরিণত হল। হয়ে দাঁড়াল পরিণামদর্শী ও দায়িত্বসচেতন মানুষ। মূর্খতা ও পশুত্বের চাপে তারা ছিল মৃতপ্রায়। মুহূর্তে ইচ্ছা ও তৎপরতাপূর্ণ জীবন্ত মানুষ হয়ে গেল। যেন অন্ধ ছিল, পথ দেখতেও পারছিলো না; নিমেষে শুধু দৃষ্টিমানই নয়, পথপ্রদর্শক হয়ে অযুত-লক্ষ অন্ধ ও পথভ্রান্তদের মনযিলের-দিকে পরিচালনাকারী হয়ে দাঁড়াল চোখের পলকের মধ্যে। দুনিয়ার মানুষকে লক্ষ্য-সচেতন বানিয়ে দিল, জাতি ও জনগোষ্ঠী সমষ্টি গড়ে তুলতে শুরু করে দিল। তারাই হ'ল তখনকার জগতের মানুষের আস্থা-ভাজন ও কল্যাণকামী নেতা। এই কথাই ইশারা-ইংগিতে বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا -
كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অথবা দৃষ্টান্ত যেন এইরূপ, যে লোক ছিল মৃত, তাকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করলাম এবং তার জন্যে একটা 'আলো' বানিয়ে দিলাম, তার আলোকে সে লোকজনের মধ্যে চলাফেরা করতে শুরু করলো। এই ব্যক্তি কি তার মত হতে পারে কখনও, যে অন্ধকারের মধ্যেই জীবন লাভ ও বসবাস করেছে, তা থেকে কখনই নির্গত হয়ে আসেনি?... কাফিরদের কার্যকলাপ এমনভাবেই তাদের জন্য চাকচিক্যময় ও লোভনীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরা আন'আম ঃ ১২২

ইসলাম সর্বপ্রথম আরবদেরই খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করেছে। তাঁরাই ইতিহাসের ধারায় এক বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেন, যা ছিল অদৃষ্ট-পূর্ব, সম্পূর্ণ অভিনব। ইতিহাসের ধারাকেই তারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেন। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন একজন রাখাল মাত্র, উট-চালনাই তাঁর প্রধান কাজ। সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তায় কুরায়শদের মধ্যে মধ্যম মানের ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

কোন উচ্চতর মর্যাদা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁর সম্পর্কে ছিল না লোকদের কোন বড় ধরনের ধারণা। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও অনুপম সাংগঠনিক শক্তি বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তাঁর সর্বত্যাগী জীবন ধারার দাপটে কিসরা ও কাইজার থর থর করে কাঁপতে ছিল অহর্নিশ। তাদের দু'জনের সিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তুলনাহীন সুবিচার ন্যায়পরতার আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র।

খালিদ ইবনুল অলীদ ছিলেন কুরায়শদের একজন অশ্বারোহী যুবক। সংকীর্ণ গোত্রীয় কোন্দলে তিনি একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা মাত্র ছিলেন। গোত্রীয় যুদ্ধ দ্বন্দ্বে গোত্রপতিরা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতো, তাতে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি তাদের প্রশংসা অর্জন করতেন। আরব উপদ্বীপের বাইরের জগত তাঁকে জানতো না, চিনতো না, কিন্তু ইসলাম তাঁকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' বানিয়ে দিয়েছিল। যার চমক রোম ও ফারেসের উপর বিদ্যুতের মত আপতিত হয়েছিল। বিশ্বমানবতার ইতিহাসে তিনি এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে রইলেন।[১]

আবূ উবাইদা (রাঃ) একজন বিচক্ষণ আমানতদার-বিশ্বস্ত ও জনদরদী ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি খণ্ড যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সহসাই তিনি বিরাট ইসলামী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসলেন। সমগ্র সিরীয় উর্বর শস্য-শ্যামল অঞ্চল থেকে হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্য খতম করে দিলেন। অতঃপর তিনি বিজিত এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় বিদায়ী বাক্য হিসেবে উচ্চারণ করলেন, বিদায় হে সিরিয়া, তোমাকে সালাম। আর কোনদিন হয়ত তোমার সাথে সাক্ষাত হবে না।

আমর ইবনুল 'আস কুরায়শ সমাজে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে গমনকারী মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনিই প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী কালে তিনিই মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হয়ে মিসর জয় করেন। তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি আজও ইতিহাসের গৌরবমণ্ডিত পিরামিডরূপে প্রতিভাত হয়ে রয়েছে।

---

১. سیرت ابو بکر رض از محمد حسین ہیکل اردو

www.pathagar.com

ইসলাম-পূর্ব আরব-ইতিহাসে সায়াদ ইবনে আবু অক্কাস কোন উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। ইসলামে তারই হস্তে বাহিত হয় 'মাদানে'র চাবিকাঠি। ইরাক-ইরান বিজয়ে তাঁর নাম ইতিহাসের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। কিস্‌রার দরবার কক্ষই তাঁর জন্য মসজিদে পরিণত হয়েছিল।

সালমান ফারসী ছিলেন ফারেসের একটি গ্রামের অধিবাসী 'মু'বিযান'-এর পুত্র। তিনি আরব উপদ্বীপে ছিলেন ক্রীতদাস। প্রায় দশ জন মনিবের দাসত্ব করার পর শেষ পর্যায়ে রসূলে করীম (সঃ)-এর হাতে আসেন। উত্তর-কালে তিনি পারস্য সম্রাটের রাজধানী মাদায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। উপরন্তু অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার, এই অতীব উচ্চতর পদও তাঁর দরিদ্র জীবন যাপন এবং নিজ হাতের কাজের উপার্জনে খাওয়া-পরা সম্পন্ন করাকে বন্ধ করতে পারেনি। বাস করতেন কুঁড়ে ঘরে। মাথার উপর বহন করতেন নিজের ও অন্য লোকদের বোঝা।[১]

বিলাল হাবশী (রাঃ) নিজ গুণ-গরিমা, আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা ও যোগ্যতার প্রতিমূর্তি। দ্বিতীয় খলীফা উমর (রাঃ)ও তাঁকে 'সাইয়েদ' সম্বোধন করতেন।

আবু হুযাইফা' (রাঃ)-এর মুক্ত গোলাম সালেমকে হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ সালেম বেঁচে থাকলে আমি তাঁকে আমার খলীফা বানাতাম।

যায়দ ইবনে হারিসা মদীনার উকায বাজারে দাস হিসেবে ক্রীত হয়েছিলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরার জন্য। তিনি তাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন নবী করীম (সঃ)-কে তাঁর সাথে তার বিয়ে হওয়ার পর।[২] উত্তর-কালে তিনি মু'তা'র যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব, খালিদ ইবনুল অলীদ-এর মতো প্রখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞগণ। আর তাঁরই পুত্র হযরত উসামা নেতৃত্ব দিয়েছেন যে সেনাবাহিনীর তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় মহাসম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

---

১. الاستيعاب فى اسماء الاصحاب (لابن عبد الله القرطبى ج ٢ ص ٥٣)

২. الاصابة فى تميز الصحابة لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٥٣٥

www.pathagar.com

আবুযার গিফারী, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবুদ-দারদা আম্মার ইবনুল ইয়াসার, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কায়াব প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি এই ঈমানের দৌলতেই হয়েছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, পথভ্রান্ত মানুষের পথের দিশারী। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ জ্ঞানের অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলেন। তাঁদের কন্ঠে উচ্চারিত হত মহামূল্য জ্ঞানসমৃদ্ধ বাণী, তাঁরা ছিলেন সব মানুষের তুলনায় আল্লাহ্‌র অধিক অনুগত বান্দা। তাঁরা যখন কথা বলতেন কালস্রোত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত তা শুনবার জন্য। তাঁরা যখন জনতার সম্মুখে ভাষণ দিতেন, তখন ইতিহাস রচিত হ'ত।

### এ এক বিস্ময়কর ঈমান

কিন্তু এইসব ব্যক্তি এত বড়—এত মহান হয়েছিলেন কিসের দৌলতে? দুনিয়ার বুকে বিস্ময়কর অবদান সৃষ্টিতে তাঁরা কেমন করে হয়েছিলেন এতবেশী পারঙ্গম?

বস্তুত একমাত্র ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার দরুনই এইসব 'কাঁচামাল' হয়ে উঠেছিলেন ইস্পাত-কঠিন, দুর্জয়। অসম্ভবকে তাঁরা করেছিলেন সম্ভব, অসাধ্য সাধন করে তাঁরা হয়েছেন বিশ্বের ইতিহাসে অমর, চির অম্লান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ)-ই এই ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন সর্বপ্রথম। এই ব্যক্তিগণ অনতিবিলম্বে তাঁর দাওয়াত কবুল করে তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর নিকট থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে এই গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন করে জরাজীর্ণ লৌহও হয়ে উঠে খাঁটি সোনা। রসূল করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে একটি সুসংবদ্ধ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত মূর্খতা, পাশবিকতা ও অজ্ঞানতার ধারক শক্তিসমূহের মুকাবিলায়। তাঁরা বিস্তার করেছিলেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও নিপীড়নে জর্জরিত মানবতার উপর শান্তি ও সমৃদ্ধির চাদর। প্রেম, ভালোবাসা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিলিয়েছিলেন মানব সমাজের সর্বত্র। আল্লাহ্‌র দীনকে তাঁরা কার্যত কায়েম করেছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে, দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে

www.pathagar.com

তুলে ধরেছিলেন এক তুলনাহীন 'মুক্তি সনদ' রূপে, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার ঢালরূপে।

এই ঈমানী শক্তির বলেই তাঁরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন সব বিপরীত প্রতিরোধক শক্তিকে। তাঁরা জয় করেছেন দেশের পর দেশ, জনপদের পর বিস্তীর্ণ জনপদ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন মানুষের নিকৃষ্ট গোলামি থেকে। দাসত্বের শৃঙ্খলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। অসাম্য ও শোষণের সব জাল ও ফাঁদ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। সব মানুষকে একান্ত আপনার বানিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের অগ্রযাত্রাকে একবিন্দু ব্যাহত করতে পারেনি দুনিয়ার কোন শক্তি। যে শক্তিই তাদের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে প্রথম আঘাতেই। আরব উপদ্বীপ থেকে উত্থিত হয়েছিল এক সর্বপ্লাবী বন্যা এবং নিমেষে গ্রাস করেছিল সমস্ত পৃথিবী।

প্রত্যেক মুজাহিদই হয়েছিল এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক, আল্লাহ্‌র অকৃত্রিম আনুগত্যের বাস্তব প্রতীক। তাঁর মস্তক হয়েছিল উন্নত—গায়রুল্লাহের সম্মুখে দুর্বিনীত, দুর্জয়। বক্ষ উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন কুফর ও জাহেলিয়তের প্রবল শক্তির সম্মুখে। তাঁর দিল ছিল পবিত্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ, দেহ ছিল সকল মলিনতা থেকে পবিত্র, নির্মল। মন, আত্মা ও হৃদয় ছিল কুটিলতাহীন, অনমনীয়, শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার।

এই ঈমানই ছিল আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, প্রেরণার একমাত্র মৌল উৎস। এই ঈমানই একজনকে যোদ্ধা বানায়। সে নিজেকে এরই ভিত্তিতে গড়ে তোলে। একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারুর সম্মুখেই মাথা নত না করা, আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কারুর রচিত আইন মেনে না নেয়া এবং মানুষের উপর মানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করাই হয় তার বিশেষ গুণাবলী। সে হয় বিদ্রোহী, বিপ্লবী। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আগুন অহর্নিশ তাকে দগ্ধ করে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করে। অতএব অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা গৌণ এবং জিহাদকারীর নিজেরই কার্যত শাণিত অস্ত্রে পরিণত হয়ে যাওয়া মুখ্য এবং অত্যধিক কাম্য ব্যাপার।

কাজেই যে যুদ্ধ ঈমানভিত্তিক নয়, ঈমানী তাকীদে করা হয় না যে যুদ্ধ, তা একান্তই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে রক্তের হোলি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তার পরিণতি চরম পরাজয় ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ কারণে ঈমান-সচেতন বিপ্লবী-বিদ্রোহী যোদ্ধা সংখ্যায় খুবই স্বল্প ও সামান্য হওয়া সত্ত্বেও বিপুল-বিরাট বাহিনীকে অতি সহজেই পরাজিত করে দিতে সক্ষম হতে পারে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ - وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ -

বহু ক্ষুদ্র বাহিনীই বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেছে—

—সূরা বাকারা ঃ ২৪৯

এটাই ইতিহাসে শিক্ষা এবং তা সম্ভবপর হয় এই ঈমানের বদৌলতে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই ঈমান সৃষ্টির জন্যই চেষ্টা করেছেন তাঁর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে।

এই দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমানকে নিজেদের মন ও মগজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেই গড়ে উঠেছিলেন রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণ। এই কারণেই তাঁদের ভয়ে কেঁপে উঠেছিল বাতিলপন্থী কাফির সমাজ। ইসলামী বাহিনী যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেল। নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো পৃথিবী। একমাত্র আল্লাহ্‌র আদর্শ ও বিধানের ব্যাপক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ব সমাজের উপর। মুসলিম শক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করার জন্য যেসব শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সব শক্তিরই মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সকলেই অবনত হয়ে দাঁড়ালো ইসলামী বাহিনীর অগ্রগতির সম্মুখে।

এই অগ্রগতি ও বিশ্ববিজয়ের মূলে নিহিত ছিল কেবলমাত্র সেই ঈমানী শক্তি। সংখ্যায় তারা কোনদিনই প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক ছিল না। কিন্তু তারা বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণ করে দিল যে, আদর্শবাদী লক্ষ্য-সচেতন যোদ্ধাদের সম্মুখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটা দুর্বহ বোঝা মাত্র। আর ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান সংখ্যাল্পতাও বিরাট সাফল্য লাভে পারঙ্গম।

রসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাহিনী প্রবল ও দৃঢ় প্রত্যয়সমৃদ্ধ ঈমানদার মুজাহিদরা এই দৃঢ় অবিচল সংকল্প নিয়েই ময়দানে

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যে, 'হয় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' তাঁদের কথা ছিল হয় জীবন ও বিজয়, না হয় মৃত্যু ও শাহাদাত। বেঁচে থাকা মুখ্য নয়, লক্ষ্য নয়, মৃত্যুবরণ ও শাহাদাত লাভই পরম কাম্য। কুরআনে এই কথাই বলা হয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

> নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের মন-প্রাণ-জান এবং তাদের ধনমাল—এই মূল্যের বিনিময়ে যে, তাদের জান্নাত দেয়া হবে। (এই বিক্রয়ের পরই) তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। —সূরা তাওবা ঃ ১১১

ইসলামী মুজাহিদগণ প্রকৃতই নিজেদের মন-মানস ও ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন পরকালে জান্নাত পাবেন আল্লাহ্র এই ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এই কারণেই তাঁরা অত্যন্ত নির্ভীক হয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদে অবতীর্ণ হতে পেরেছিলেন। বস্তুত এরূপ মন-মানসিকতা ও পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গীকৃত ভাবধারা নিয়ে যারাই যুদ্ধ করবেন, তাঁদের পরাজিত করা নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোন বাহিনীর পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। তদানীন্তন রোমান ও পারসিক শক্তির মুকাবিলায় ইসলামী শক্তির দ্রুত বিজয় লাভের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েছে।

**ঈমানই জীবন গঠন করে**

এইরূপ ঈমানী শক্তিই মুসলমানদের জীবন গঠন করেছিল এবং সকল বিরুদ্ধ শক্তির উপর সর্বাত্মক প্রাধান্য লাভে সহায়তা করেছিল। এই ঈমানই বাস্তব করে দিয়েছিল ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর্যায়ে তাদের সব স্বপ্ন, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা।

এই ঈমানই মুসলিমদের বানিয়েছিল বীর, দুঃসাহসী। ফলে তারা তদানীন্তন জন-মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন সর্বপ্রথম। এই ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই ওহুদের যুদ্ধে উম্মে আইমন

www.pathagar.com

(রাঃ) যখন দেখতে পেয়েছিলেন যে, রসূলে করীম (সঃ) নিঃসঙ্গ ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে—লোকেরা প্রতিপক্ষের তীব্র তীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, তখনই নিমেষের মধ্যে তরবারি হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং লোকদের ডেকে ডেকে আবার একত্র করেছিলেন। হযরত নসীবা ও খান্‌সা প্রয়োজন মুহূর্তে শাণিত তরবারি হাতে নিয়ে দুশমনের সম্মুখে বীর-বিক্রমে দাঁড়িয়ে যেতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হননি। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই।

এইরূপ ঈমানের বলেই প্রাথমিক কালের মুসলমান সুসংবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে পেরেছিলেন, সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্বের বুকে এক নবতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। মরু-প্রান্তর থেকে শুরু করে বিশাল বিস্তীর্ণ জনপদের উপর উড্ডীন করেছিলেন ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের কর্তৃত্ব এই ঈমানের কারণে। তাঁরাই হয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য জননেতা ও জাতীয় দিশারী।

এই ঈমানের নির্মল আলোক ধারায় দূরীভূত হয়েছিল যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষে মানুষে, বর্ণে বর্ণে, বংশে-বংশের বিরোধ পার্থক্যের নিঃছিদ্র অন্ধকার। নির্বিশেষে সব আদম সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবীয় ঐক্য ও একত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এবং যোগ্যতা ও আল্লাহ্‌ ভীতিকেই মানুষের মধ্যে মর্যাদা-পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড।

উবাদা ইবনুস্‌-সামিত (রাঃ) ছিলেন একজন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সাহাবা। মিসর অধিপতি মুকাউকাসের নিকট তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোরতর কালো, দীর্ঘাংগ, বিশালাকৃতি সম্পন্ন। ইসলাম তাকে দিয়েছিল উচ্চতর মর্যাদা। তাকে দেখলে মানুষ হয়ে যেত ভীত-সন্ত্রস্ত। মুকাউকাসও তাকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হল। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলোঃ এই ভয়াবহ ঘন কৃষ্ণ ব্যক্তিকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও। অন্য কাউকে তার স্থানে পেশ কর।

উবাদার সংগী মুসলমানগণ বলে উঠলেনঃ

إِنَّهُ أَفْضَلُنَا رَأْيًا وَعِلْمًا وَهُوَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَكْرَمُنَا

مَوْضِعًا وَسَابِقَةً وَعَقْلاً وَرَأْيًا -

তিনিই আমাদের মধ্যে উত্তম অভিমতদানকারী, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য। তিনিই আমাদের সরদার—নেতা, সর্বাধিক কল্যাণময়, মর্যাদার দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে সকলের তুলনায় অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন, অগ্রবর্তী, অধিক বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী।

এই কথা শুনে মুকাউকাস উবাদার মুখেই কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়। তখন হযরত উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

হে শাসক! আমি আপনার কথা শুনেছি। আমি আপনার সম্মুখে আমার এক সহস্র সংগী-সাথীর প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলতে এসেছি। আমার পিছনে থেকে যাওয়া আমার সে সংগী-সাথীরাও আমারই মত, কিংবা আমার চেয়েও অধিক কৃষ্ণবর্ণ। দেখতে আমার চেয়েও অধিক ভয়াবহ। আপনি যদি তাদের দেখেন তা'হলে আমাকে দেখে যতটা ভয় পেয়েছেন, তার চাইতেও অধিক ভয় পেয়ে যাবেন। আমাকেই দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে, আমার সংগী জওয়ানদের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা আমিই করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর, আমার শত্রু পক্ষের একশ জনকেও আমি একবিন্দু ভয় পাইনে—যদি কখনও তারা যুদ্ধের ময়দানে আমার সম্মুখে এসে পড়ে। আমার সংগীরাও আমারই মত নির্ভীক, বীর সেনানী।

তার কারণ হচ্ছে, আমাদের একমাত্র কাজ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি, তাদের সাথে কোন শত্রুতা পোষণ করে যুদ্ধ করি না। দুনিয়ার কোন বস্তুগত স্বার্থ লাভের জন্য আমাদের যুদ্ধ নয়। সম্প্রসারণ নীতিতে দেশের পর দেশ দখল করাও আমাদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। আমরা শুধু এতটুকুই গ্রহণ করি, যতটা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য হালাল করেছেন কিন্তু আমাদের কেউ যদি স্বর্ণের বহুকয়টি স্তূপও লাভ করে, তা হলে আমরা তা সব-ই আল্লাহ্‌র পথে—আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যয় করে দেই।

মুকাউকাস হযরত উবাদার জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রদত্ত এই দীর্ঘ ভাষণ নীরবে শ্রবণ করলে, পরে দরবারী লোকদের সম্বোধন করে বললে ঃ

هَلْ سَمِعْتُمْ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامَ قَطُّ ؟ لَقَدْ هِبْتُ مَنْظَرَهُ وَاَنَّ قَوْلَهُ لَاَهْيَبُ عِنْدِىْ مِنْ مَنْظَرِهِ مَا اَحْسِبُ اِلَّا اَنَّهُمْ سَيَمْلِكُوْنَ الْاَرْضَ كُلَّهَا ـ

তোমরা কি এরূপ কথা কখনও শুনেছ? আমি তো তাকে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার কথা তো আমার নিকট তার চেহারার তুলনায় অধিক ভয়াবহ। আমি নিশ্চিতই মনে করি, এই লোকেরা শীঘ্রই সমগ্র পৃথিবী জয় করে নেবে।

অতঃপর মুকাউকাস উবাদাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়ে গেল এবং বলল ঃ

হে মহান ব্যক্তি আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনি আপনার নিজের ও আপনার সংগীদের সম্পর্কে যা বলেছেন, তা-ও আমি শ্রবণ করেছি। শপথ করে বলছি, আপনারা যতটা অগ্রগতি লাভ করেছেন, তা শুধু সেই জন্য যার কথা আপনি নিজে বলেছেন। আর যাদের উপর আপনারা বিজয়ী হয়েছেন তা শুধু এজন্য যে, তারা ছিল দুনিয়ার পূজারী। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি আপনারা রোমানদের সংগে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন—এই দেখে। কেননা তারা সংখ্যায় অগণিত ; বীরত্ব, সাহসিকতা ও শক্তিমত্তায় অতুলনীয়। আমি জানি, আপনারা তাদের উপর অধিক শক্তিশালী কখনই হতে পারবেন না। আর আপনাদের দুর্বলতা ও সংখ্যাল্পতার কারণে তাদের পরাজিত করতে পারবেন না কখনই। আমরা খুশী মনে আপনাদের সাথে সন্ধি করতে রাযী আছি এই শর্তে যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দু'টি স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) ধার্য করব এবং আপনাদের খলীফার জন্যে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ধার্য হবে। আপনারা তাই গ্রহণ করুন এবং যে শক্তির মুকাবিলা করতে

www.pathagar.com

আপনারা কখনই পারবেন না, সেই শক্তির গ্রাসে পড়ার পূর্বেই এখান থেকে চলে যান।

হযরত উবাদা মুকাউকাসের এই অপমানকর দীর্ঘ বাচালতা বড় ধৈর্যসহকারে শুনছিলেন এবং নিজের বিদ্রোহী মনকে বড় কষ্ট করে দমন করে রাখছিলেন। বললেন ঃ

হে ব্যক্তি শুন! তুমি এবং তোমার সংগী সভাসদরা আত্মপ্রতারিত। রোমানদের বিপুল সংখ্যক সেনানীর সমাবেশের কথা বলে আমাদের ভয় দেখালে! বললে, আমরা তাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী নই। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ এসব কথা বলে তোমরা আমাদের ভীত করতে পারবে না। আমরা যা রয়েছি তা থেকে কম মনে করাতেও পারবে না। তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়, তা হলে তাদের সাথে যুদ্ধে যে পরিণতি হবে তা-ই আমাদের অধিক কাম্য। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমরা এজন্যও অধিক আগ্রহী। কেননা তা হবে আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করার জন্য অনেক বড় ওযর। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে যদি নিহত হয়ে যাই, তা'হলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভ করা আমাদের জন্য অধিক সহজ ও সম্ভব।

তার চাইতে অধিক আর কিছু নেই আমাদের চোখ শীতল করার, হৃদয় পরিতৃপ্ত করার, তার চেয়ে বেশী কিছু কাম্য বা প্রিয়ও নয় আমাদের নিকট। তোমাদের সাথে যুদ্ধে দু'টির যে কোন একটি পরিণতিই সম্ভব। এই উভয় পরিণতিই অতি উত্তম। হয় আমরা জয়ী হব, তাহলে আমরা দুনিয়ার বিরাট সম্পদ গনীমতস্বরূপ পেয়ে যাব কিংবা তোমরা জয়ী হবে, আমরা হব পরাজিত। তা'হলে আমরা পাব পরকালের তুলনাহীন জান্নাতের গনীমত। দু'টির যে-কোন একটি লাভ করার জন্যই আমাদের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা। আমাদের প্রত্যেকেই সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে শাহাদাত লাভের জন্য। নতুবা তিনি যেন তাকে তার দেশে, তার পরিবার বর্গের নিকট ফিরিয়ে না নেন। আমাদের পিছনে যারা রয়ে গেছেন পরিবার বর্গের লোক, তাদের সবাইকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমানতস্বরূপ সোপর্দ করে এসেছি। আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় আমাদের সম্মুখবর্তী জিহাদ।

www.pathagar.com

তুমি মনে করেছ, আমরা জৈবিক দিক দিয়ে খুব সংকীর্ণতা ও অনটনের মধ্যে রয়েছি। আসলে আমাদের রয়েছে বিপুল প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। সারাটি দুনিয়াও যদি আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে যায়, তবু এখন যতটা আছে তার চাইতে একবিন্দু অধিকের প্রতি আমাদের লোভ থাকবে না। তোমরা মন-মানসিকতার দিক দিয়ে সেরূপ হতে পারবে না কখনও।[১]

**উবাদা-ই একমাত্র নন**

উবাদার এই দীর্ঘ ভাষণ থেকে ইসলামী মুজাহিদদের যে নৈতিকতা ও মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, সেদিক দিয়ে তিনি একাই তার প্রতীক নন। তাঁদের সংগী-সাথী সব মুজাহিদই অনুরূপ মন-মানসিকতার ধারক ও বাহক! তাঁদের দৃষ্টি সম্মুখবর্তী চাকচিক্যের উপর নিবদ্ধ ছিলো না, ছিলো সমুদ্রের উত্তাল তরংগ মালার শীর্ষে। তারই ফলে তাঁরা ইসলামের বিজয় সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মহৎ গুণাবলীর সুখ্যাতিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বমানবতার আশা-ভরসার স্থল।

উপরে হযরত উবাদার যে ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা তার শুধু মুখের কথাই ছিল না, তা ছিল তাঁর অন্তরে পোষিত ঐকান্তিক বিশ্বাসের স্বঃতস্ফূর্ত প্রকাশ। তা একা তাঁরই কথা ছিলো না, তা ছিলো সমগ্র ইসলামী বাহিনীর প্রত্যেকেরই মনের কথার প্রতিধ্বনি এবং ইসলামের মৌল ঈমানীয়াতই তাঁদের এরূপ বানিয়েছিল। এই ঈমানই ছিল ইসলামকে বিজয়ী করণের মহাযাত্রার একমাত্র সম্বল, প্রবল পরাক্রান্ত ও বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একমাত্র শানিত অমোঘ অস্ত্র। কঠিন বিপদের সময় ত-াই ছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন।

এ ঈমানই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তির মুহূর্তে হযরত খাব্বাব ইবনুল ইবৃত-এর মুখে উচ্চারিত করিয়েছিল :

وَلَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُؤْمِنًا

عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِىْ -

---

১. فلسفة الجهاد فى الاسلام ص ٣٣٠–٣٣٩

www.pathagar.com

মু'মিন হিসেবেই যখন আমি নিহত হতে যাচ্ছি, তখন কোন্ পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় আমি প্রাণ দিচ্ছি, সে চিন্তায় আমি একবিন্দু কাতর নই।

এই ঈমানই তাঁদের মনে এই নিশ্চয়তার প্রস্তর সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, মৃত্যু অবধারিত। আমি যেখানেই যে অবস্থায়ই থাকি, নির্দিষ্ট মুহূর্তে মৃত্যু আমার উপর কালো হাত বিস্তার করে দেবে। তা থেকে নিষ্কৃতি নেই, হতে পারে না।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ...

মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই, যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তোমরা যদিও সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করো না কেন।

—সূরা নিসা : ৭৮

বস্তুত তাকদীরকে তাঁরা এমনিভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাকদীরের নেতিবাচক তাৎপর্য কখনই গ্রহণ করেন নি, সদাসর্বদা সম্মুখে রেখেছেন তার ইতিবাচক অর্থ। এই তাৎপর্যের ফলেই তাকদীরকে তাঁরা কর্মজীবনের মাধ্যমে বিপুল অর্থবহ করে তুলেছিলেন। তাতে নিহিত ছিল বিরাট সম্ভাবনা। এরই ফলে তাঁদের জীবনে শক্তির ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের বলেই তাঁরা তাঁদের সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছেন স্থলভাগে, শূন্য বালুকাময় মরুভূমিতে। তাঁদের আরোহিত করেছেন তরংগ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে গমনকারী জাহাজে এবং তাদের নিয়ে গমন করেছেন ঊর্ধ্ব-আকাশে। তাঁরা সকলেই সুসমৃদ্ধ ছিলেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্—এই কালেমার প্রতি ঈমানে। আর তাঁদের বিজয়লাভ ও শক্তি প্রতিষ্ঠার মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েছে।

এই তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাঁরা সকলেই চিন্তা-বিশ্বাসে, মনোভাবে ও মানসিকতায় ছিলেন এক অভিন্ন অবিভক্ত সত্তা। সকলেরই মর্যাদা ছিল চিরুনির কাঁটাগুলোর অগ্রভাগের ন্যায় সম্পূর্ণ সমান। সেনাধ্যক্ষেরও কোন অধিক মর্যাদা বা অধিকার ছিল না সাধারণ সেনানীদের উপর—তাক্ওয়া ও নেক আমল ছাড়া।



www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সম্মুখেও তাঁরা ছিলেন সমান। তাঁদের রক্তের মূল্য পার্থক্য-হীন। তাঁদের একজন সাধারণের নেতৃত্বে কাজ করতেন উচ্চতর মর্যাদার লোকও। অন্যদের সম্মুখে তাঁরা ছিলেন মুষ্টিবদ্ধ একটি হাত।

দেখানোপনা, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর এবং মিথ্যা অহংকার-গৌরব করাকে তাঁরা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তাঁরা যুদ্ধ করতেন প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ্‌র কালেমা উন্নত, উচ্চতর ও বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। কাফিরী মতাদর্শ ও শক্তি আধিপত্য কর্তৃত্বকে চিরতরে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের সর্ব প্রকারের কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার ছিল কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাঁরা ছিলেন কুরআনের এ আয়াতটির মূর্ত প্রতীক :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -

যে লোক সত্যিকারভাবে তাঁর আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাওয়ার আশাবাদী, তার উচিত একান্তভাবে নেক আমল করা এবং তার আল্লাহ্‌র বন্দেগীর ক্ষেত্রে একবিন্দু শির্‌ককে প্রশ্রয় না দেওয়া। —সূরা কাহাফ : ১১০

আল্লাহ্‌ই ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য, আশা-ভরসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। ইহকাল ও পরকালে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষী। তাঁরা বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত থাকলেও পদমর্যাদার পার্থক্যের কারণে উঁচু-নীচুর তারতম্য ছিলো না তাঁদের মধ্যে। পদ লাভের জন্যে তাঁরা ছিলেন না একবিন্দু লোভী ও লালায়িত। পদ তাঁদের প্রতারিত করেনি কখনও। পদের অহমিকা তাঁদের দিশেহারা বানায়নি কখনও।

তাঁরা যখন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধকাজে লিপ্ত হতেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকেই এই অনুভূতি তীব্রভাবে অনুভব করতেন যে, এ কাজটি একা তাঁর। এ কঠিন দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে। ইসলামী সেনাবাহিনী একচ্ছত্র নেতা হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। চারদিকে তাঁর তুলনাহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার

www.pathagar.com

জয়জয়কার। খলীফা উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ পৌঁছলো—সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব আবূ উবায়দার হাতে অর্পণ কর। অথচ আবূ উবায়দা তাঁরই অধীন একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসেবেই যুদ্ধ করে আসছিলেন।

যেমন নির্দেশ, কাজও তেমনি। তিনি সেনাধ্যক্ষের উচ্চতর মর্যাদা-সম্পন্ন পদ ছেড়ে দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিকের পদে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এতটুকু 'টু' শব্দ করলেন না, না কোন প্রতিবাদ, না প্রকাশ করলেন কোন ক্ষোভ—না অনুভব করলেন এতটুকু অপমান বোধ।...আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন তিনি।

বলতে গেলে এইসবই ছিল মুসলমানদের বিশ্ববিজয়ের মূলে নিহিত তুলনাহীন, দৃষ্টান্তহীন গুণাবলী। আসলে তাঁরা শত্রুর উপর বিজয় লাভের আগেই জয়লাভ করেছিলেন নিজেদের লোভ-লালসা ও অন্যায় কামনা-বাসনার উপর।

## ঈমান ও ধৈর্য

শুধু ঈমানই নয়, যুদ্ধের ভয়াবহ হিংস্রতা ও রক্ত লোলুপতার প্রেক্ষিতে অবিচল ধৈর্য ধারণ ও তাঁদের অতুলনীয় তাক্ওয়া আল্লাহ্-ভীতি এবং কল্যাণ-মুখিতার অকাট্য নিদর্শন, সন্দেহ নেই। আর তাই হচ্ছে তাদের বিজয় লাভের মূলে নিশ্চিত কারণ। আল্লাহ্তা'আলা এই কারণেই মুজাহিদদের নির্দেশ দিয়েছেন অবিচল ঈমান ও অপরিসীম ধৈর্যশীল হওয়ার জন্যে, এ দুটিকে শক্তভাবে চিরদিনের জন্যে ধারণ করে রাখতে। পক্ষান্তরে যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়, তাদের প্রতি তীব্র রোষ ও গজব বর্ষিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তাদের পরিণতি জাহান্নাম হবে, সেকথাও বলে দিয়েছেন অত্যন্ত নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা সহকারে। যে সাতটি কাজ মানুষের জন্য কিয়ামতের দিন মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে, রসূলে করীম (স.) এই যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে যাওয়াকে তার মধ্যের একটি কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঈমান হচ্ছে জিহাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সিঁড়ি বিশেষ আর জিহাদে অবিচল হয়ে থাকা ও ধৈর্য ধারণ হচ্ছে তার প্রধান অংশ। পলায়নপরতা কোন বন্দীকে মুক্ত করতে পারে না, পারে না অদৃষ্টলিপিকে একবিন্দু পরিবর্তন করতে।

www.pathagar.com

আর এই কারণেই আল্লাহ্‌‘তাআলা এ বিষয়ে তাকীদ করেছেন এবং নবী করীম (স.) ও তাঁর সংগীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমান ও ধৈর্য হচ্ছে বিজয়লাভের দুইটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন বাহু।

একথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলমানরা যখন আরব উপদ্বীপ থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন অতীব স্বল্প ও নগণ্য। সংখ্যাল্পতার সাথে সাথে সুব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে খুবই অপরিপক্ক, অদক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের এই গুণগত নগণ্যতা তাঁদের অগ্রগতি লাভের পথে কিছুমাত্র বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, যুদ্ধের সুব্যবস্থাপনায় তাদের শত্রুরা ছিল অধিকতর দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে নিজেদের সব অক্ষমতা ও অব্যবস্থাপনাকে অতিক্রম করে নিয়েছেন পৃথিবীর একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশ, মহাদেশ। যে কোন মহাশক্তি তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে তারাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ তখন পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ বুঝতেই পারেনি যে, মুসলমান একটা স্বতন্ত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি, তাদের একটা দীন রয়েছে, আছে রাষ্ট্র, শক্তি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এমনিভাবেই ইসলাম একের পর এক তিনটি মহাদেশে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। পরাজিত করেছে এই অঞ্চলের সব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাতি ও শক্তিকে, ফলে কুরআনের ঘোষণা—‘বহু কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকের উপর বিজয়ী হয়েছে’ এই পরম তত্ত্বের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের এই পর্যায়ের অন্যান্য ঘোষণাও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ -

তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন যোদ্ধাও যদি অতীব ধৈর্যসম্পন্ন হয়, তবে তারা শত্রুপক্ষের দুইশ জনকে পরাজিত করবে। আর

www.pathagar.com

যদি তোমাদের এই গুণসম্পন্ন একশজন হয়, তা হলে তারা কাফিরদের এক হাজার সৈন্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। তার কারণ হচ্ছে, এই কাফির লোকেরা (রণকৌশল) অনুধাবন করতে পারে না।

সূরা আনফাল ঃ ৬৫

মানুষের চরিত্রে নিহিত অপরিসীম শক্তি-রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছে কুরআন। দেখিয়েছে এই শক্তি মানুষের দেহে নয়, আত্মায় নিহিত। দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তি যতই বলবান হোক, একটি সুসংগঠিত সৈন্য-বাহিনীকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু সংখ্যায় কম লোকেরা যদি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে, তা হলে বিশ্বজয় তাদের জন্য কঠিন থাকে না। সে আত্মিক শক্তির মূল উৎস হচ্ছে নৈতিকতা। ইসলাম এই নৈতিকতাভিত্তিক আত্মিক শক্তির বলেই বিশ্বকে জয় করেছে এবং চতুর্দিকে অকল্পনীয় দ্রুততা সহকারে বিস্তার লাভ করেছে।

মুসলমান এই ঈমান ও ধৈর্য—আত্মিক ও নৈতিক শক্তির বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই মৃত্যুকে তাঁরা সাদর সংবর্ধনা জানিয়েছেন, ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাঁরা গ্রহণ করেছেন আল্লাহ্‌র পথে শাহাদতকে। এই কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ
لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ○
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ○
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

এ আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথে যারাই যুদ্ধ বা জিহাদ করবে, তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের নফ্‌স ও ধনমাল আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রয় করে দেওয়া। আর বিক্রয় করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজে-

www.pathagar.com

দেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট উৎসর্গ করা। এই স্থির মনোভাব নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়া যে, আমার সত্তা, আমার জীবন-প্রাণ এবং আমার ধনমাল বলতে যা কিছু আছে তার মালিক আমি নই, স্বয়ং আল্লাহ্‌ 'তাআলা। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব আমার নয়—আল্লাহ্‌র। অতএব আল্লাহ্‌র দীন কায়েম বা তার সংরক্ষণের জন্যে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই নিয়োজিত হবে।

সূরা তওবা ঃ ১১১

বস্তুত যেসব যোদ্ধা এইরূপ আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁরা শত্রুদের যেমন হত্যা করবেন, তেমনি নিজেরাও নিহত হবেন। এরূপ যুদ্ধ করা এবং তাতে নিহত হওয়ার বিনিময়েই পরকালীন জীবনে লাভ করা যাবে জান্নাত।

আসলে আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের জান ও মাল বিক্রয় করার ব্যাপারটি সম্পন্ন হয় একটি আনুষ্ঠানিক বায়'আতের মাধ্যমে। সে 'বায়আত' নিজেদের সবকিছু আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করার চুক্তি বিশেষ, যা মুসলমানরা করেন সচেতনভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ কালেমার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে। নিজেদের সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গ করার ব্যাপারটি আসলে এই কালেমার প্রতি ঈমান গ্রহণের অনিবার্য ফলশ্রুতি মাত্র।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি, যাঁরা যুদ্ধ করবেন, যুদ্ধে বিজয় লাভ কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব এবং প্রাথমিক কালের মুজাহিদরা এইরূপ আত্মোৎসর্গীকৃত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই যুদ্ধের ইতিহাসে বিজয় কেবল তাঁদের জন্যেই লিখিত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা যেমন ঈমানের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন ধৈর্য ধারণের অপূর্ব পরাকাষ্ঠা। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনস্বরূপই তাঁরা এই কঠিন কাজের দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন কাফির সৈন্যদের বিপুল সমাবেশের উপর আক্রমণ করবে, তখন তোমরা কোনক্রমেই তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। —সূরা আনফাল ঃ ১৫

www.pathagar.com

মু'মিন যোদ্ধারা যেহেতু নিজেদের সবকিছু আগেই আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গ করেছেন, কাজেই মৃত্যুভয় বলতে কোনকিছুই তাঁদের ছিল না। মৃত্যুভয় কেবল তাদের হতে পারে, যারা নিজেদের হস্তস্থিত জানমালকে নিজেদের মনে করে। কিন্তু মু'মিনরা তো ঈমান গ্রহণ করে সবকিছু আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রয় করে দিয়েছেন। তাঁদের নিজেদের বলতে তো কিছুই নেই। অতএব তাঁরা যত বড় শক্তিশালী এবং বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যের সম্মুখবর্তীই হোন-না-কেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কোন কারণই তাঁদের দেখা দেয় না। সেখানে তো তাঁরা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকে অতীব বাস্তব করে তুলে ধরবেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা খুব দৃঢ়-অবিচল হয়ে থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে খুব বেশী করে। তা'হলে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হতে পারবে। —সূরা আনফাল ঃ ৪৫

এক কথায় এইসব গুণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনই ছিল যুদ্ধ সংগ্রামে মুসলমানদের বিজয় লাভের কারণ। এইগুলোই হ'ত যুদ্ধের ময়দানে ইসলামী সেনাবাহিনীর নিত্য সহচর। যে সব উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা, লুটতরাজ, অকারণ নরহত্যা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বংসকারিতা আজকের দুনিয়ার বিভিন্ন সভ্যতাগর্বী জাতির সৈন্যবাহিনীর হাতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়, ইসলামী বাহিনীর সাথে তার দূরতম সম্পর্কও কোনদিনই দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে প্রাথমিককালে ইসলামী বাহিনীর ক্ষেত্রে যা সত্য, তা আজকের প্রকৃত ইসলামী বিপ্লবী বাহিনীর ক্ষেত্রে তাই সত্য। এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে না।

বস্তুত ইসলামী বাহিনীর বিজয়ের কারণ তাদের ঈমান, তাদের 'সবর' এবং এই ঈমান সবর পরিপন্থী সব কার্যকলাপ পরিহার। আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান পুরোপুরি পালন ও অনুসরণ এবং তার বিরোধিতা পূর্ণমাত্রায় বর্জন। যে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁদের ঈমান, সেই আল্লাহ্‌র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সূচিত এই জিহাদ। অতএব এই লক্ষ্যকে

www.pathagar.com

অর্জন করার উপরই তাদের লক্ষ্য একান্তভাবে নিবদ্ধ। তার সাথে মিশ্রিত হয়নি নিজস্ব কোন কামনা-বাসনা, যুক্ত হয়নি কোন স্বার্থোদ্ধারের পংকিলতা, এজন্যেই তাঁদের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা জমি-ক্ষেত সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ। এখানে একনিষ্ঠতা ও চূড়ান্ত মাত্রায় ত্যাগ-তিতিক্ষাই তাঁদের একমাত্র চরিত্র, একমাত্র ভূষণ। আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানী এড়িয়ে চলা, সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে পুরোপুরি বিমুখতাই তাদের সাজ ও সজ্জা। কেননা এগুলো কাফির শত্রু অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক তাদের জন্য। এই অনুভূতি তাঁদের মধ্যে তীব্রভাবে জাগরূক। তারা নিজেদের পুরোপুরি জয় করেছেন বলেই ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় মস্তক মাটিতে লুটিয়ে দিতে পেরেছিলেন একান্তভাবে। তাই তাঁদের হস্তেই উড্ডীন হতে পেরেছিল ইসলামের বিজয় নিশান।

তাঁরা দেশ জয় করেন নি, ইসলামের নবতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রতিটি জনপদের নর-নারীকে। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের অধীন বানিয়ে দিয়েছিল ইসলামী জীবন-বিধানের। তাঁরা নিপীড়িত-বঞ্চিত-পদদলিত মানবতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলেই কোটি কোটি মানুষ নিজেদের মুক্ত করেছিল সব আল্লাহ্দ্রোহী শক্তির দাসত্ব ও পূজা-উপাসনার শৃঙ্খল থেকে।

তাই ইসলামী মুজাহিদরাই ছিলেন বিশ্ব-মানবের মুক্তিদাতা। ইসলামী মুজাহিদরা তাই পেয়েছিলেন বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ এবং অসীম সাহায্য। পুরোপুরিভাবে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল মহান আল্লাহ্র ঘোষণা।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মু'মিনদের সাহায্য করা ছিল আমার উপর ধার্য হওয়া একটা হক্।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে এই দিনই মু'মিনরা হবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত।

---

IFB—85-86—P/3439—5250—1. 3. 1986

www.pathagar.com

# গ্রন্থপঞ্জি


১. কুরআন মজীদ।

২. আল জামে' লি-আহকামিল কুরআন।

৩. আত্-তাফসীরুল মাযহারী ঃ সানাউল্লাহ পানীপতি।

৪. মুফরাদাতে ইমাম রাগেব আল-ইসফাহানী।

৫. যাদুল মা'আদ ঃ ইবনুল কাইয়্যেম আল জাহজীয়া।

৬. সীরাতে ইবনে হিশাম।

৭. মুখতাসার সীরাতুন্নবী (স.) ঃ শেখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী।

৮. সীরাতুন্নববীয়া ঃ আবুল হাসান আলী নদভী।

৯. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ঃ নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্—সিহাহ্ সিত্তা।

১০. মুসনাদে ইমাম আহমদ।

১১. Encyclopaedia of Religion and Ethics.

১২. The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal.

১৩. তাফসীর মাহাসিনিত্ তা'বীল।

১৪. ফাল্সাফাতুল জিহাদ ফিল্ ইসলাম ঃ সাইয়্যেদ আবদুল হাফীয আবদে রাব্বুহ্।

১৫. আল্ মিকাত শরহি মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ মুল্লা আলী আল-কারী।

১৬. আল-জিহাদ তরীকুন্ নস্র।

১৭. তাফহীমুল কুরআন (উর্দূ) ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৮. ফী যিলালিল কুরআন (আরবী) ঃ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ।

১৯. তাফসীরে আবুস্ সয়ূদ।

২০. তাফসীর আল-মারাগী।

২১. তাফসীর ফতুহুল কাদীর ঃ ইমাম শাওকানী।

২২. তাফসীরে কবীর—ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী।

২৩. ফিক্হুস সীরাহ ঃ ডঃ মুহাম্মাদ সায়ীদ রামাযান-আলবুতী।

২৪. নূরুল ইয়াকীন।

২৫. ফুতুহুল বুলদান ঃ বালাযুরী।

২৬. কিতাবুল আমওয়াল ঃ ইমাম আবু উবাইদ।


www.pathagar.com

২৭. আহকামুল কুরআন ঃ আবু বকর আহমদ আল জাস্‌সাস।
২৮. অপরাধ দমনে ইসলামী আইন (পাণ্ডুলিপি) ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।
২৯. কিতাবুল খারাজ ঃ ইমাম আবু ইউসুফ।
৩০. মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ (হাদীস গ্রন্থ)।
৩১. তারীখুত্‌ তাবারী---আবু জাফর আত্‌-তাবারী।
৩২. আস্‌সিয়াসাতুশ্‌ শরীয়া ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া।
৩৩. আল-আহকামুস সুলতানীয়া (উর্দূ)।
৩৪. কানযুল উম্মাল--(হাদীস সংকলন)।
৩৫· তারীখুদ দাওয়াত অত্‌-তারশীরিল ইসলামী ঃ টমাস আর্নলড।
৩৬. আল-মুহাল্লা ঃ ইমাম ইবনে হাজম।
৩৭. উমদাতুলকারী ঃ বদরুদ্দীন আইনী।
৩৮. মুস্তাদরাক ঃ আল-হাকেম।
৩৯. ইমাম আলী ইবনে আবী তালিব ঃ মুহাম্মদ রিযা।
৪০. খলীফাদের শাসনাধীন প্রাচ্য ঃ (আরবী) ভনক্রেমার।
৪১. তারীখে আকওয়ামি আলম (উর্দূ) ঃ আহমদ মুরতাজা খান (১ম খণ্ড)।
৪২. আল-ইসাবা-লি-তামীজে সাহাবাহ ঃ ইবনে হাজার আসকালানী।
৪৩. সীরাতে আবু বকর ঃ মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল (উর্দূ)।
৪৪. খুলাফায়ে রাশেদীন (উর্দূ) ঃ শাহ মুয়ীযউদ্দিন।
৪৫. আল-ইস্তিয়াব ফী আসমাতিল আসহাব ইবনে আবদুল বার।
৪৬. তারীখে ইসলাম (উর্দূ) ঃ কাযী সুলায়মান।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ